সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

একশো বছরের সেরা সরস গল্প

www.banglabooks.in

একশো বছরের
সেরা সরস গল্প

সম্পাদনায়

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

SUVOM

সাহিত্যম্ ।। ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট. কলকাতা-৭৩

EKSO BACHARER SERA SARAS GALPO
Edited by Sanjib Chattopadhaya

প্রথম প্রকাশ মহালয়া, ১৪১৩
জানুয়ারী ২০০৭

SAHITYAM
18B, S.C. Dey Street
Kolkata - 700 073

Price Rs. 300.00

কার্যনির্বাহী সম্পাদক : উজ্জ্বলকুমার দাস

প্রকাশক :
নির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান
নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৭

বর্ণ সংস্থাপনা
কম্প-অ্যাক্ট
সিজি-৮০, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
শঙ্কর বসাক

মুদ্রক
প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

দাম টাকা

নীরস জীবনটাকে একটু
সরস করে তুলতে চাই

বাংলা সাহিত্যের সমুদ্র হইতে
আরো কিছু মনি-মুক্তো সংগ্রহ করুন

নীচের লিংক হইতে

www.banglabooks.in

উৎসর্গ

গোমড়ামুখো বাঙালি
পাঠক-পাঠিকাদের জন্য—

ভূমিকা

আগেকার দিনের মতো জীবন আজ আর ধীর গতিতে চলে না। সেই সত্যযুগ থেকে পর পর সব যুগ পার করে এখন চলছে কলিযুগ। এই কলিযুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর একটা যুগও নাকি এসে পড়েছে। অনেক বাঙালি আবার এই যুগের নাম দিয়েছেন জেট যুগ। মানে সব কিছুই খুব দ্রুতগতিতে চলছে। তাই জীবনও এখন এই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে।

আমাদের জীবনের ফেলে আসা বছরগুলো আজ আর স্বপ্নমাখা নয়, যেন দুঃস্বপ্নের বছর। স্মৃতিও আজ আর সুখের নয়, স্মৃতি আজ বড়োই বেদনার। তবুও আমরা বেঁচে আছি। দুঃখের মাঝেও খুঁজে নিতে চেষ্টা করি সামান্য একটু সুখের, কান্নার মাঝে হাসির, বেদনার মাঝে খুঁজতে চাই আনন্দ। তাই তো আমরা এখনও এই নীরস জীবন নিয়ে বেঁচে আছি। আর সেই সঙ্গে বেঁচে আছে আমাদের নিত্যসঙ্গী টেনশন। সকাল হতেই যার পারদ আমাদের জীবনে হু হু করে বেড়ে চলে। আর তারই চাপে পড়ে নানারকম রোগ এসে বাসা বাঁধছে আমাদের শরীরে। তাই ডাক্তারবাবুরা আজকাল রোগীদের পরামর্শ দিচ্ছেন—'টেনশনকে ছক্কা মারতে হলে প্রাণ খুলে হাসুন।'

আজ অনেকেই তাই সাত সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছুটছেন লাফিংক্লাবে। যদি এই নীরস জীবনটাকে একটু রসে টইটুম্বুর করে রাখা যায়। আর সেই সঙ্গে ফ্রি পাওয়া যায় টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশ্বাস।

মানুষের নীরস জীবনটাকে একটু সরস করে তুলতেই 'একশো বছরের সেরা সরস গল্প' বইটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

একশো বছরের গল্প নিয়ে এ সংকলন গ্রন্থিত হয়েছে তবুও আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করবেন, এ ঘোষণায় খানিক উনকথন ঘটেছে। এ সংকলনের প্রথম গল্পকার প্যারীচাঁদ মিত্র জন্ম ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং শেষ করা হয়েছে উজ্জ্বলকুমার দাসের গল্প দিয়ে, যাঁর জন্ম ১৯৬৩ সালে। প্রায় দেড়শো বছর কালসীমার মধ্যে অজস্র গল্পকার অনেক সরস গল্প লিখেছেন। তাদের মধ্যে থেকে লেখক-লেখিকা নির্বাচন করা ও তাঁদের সেরা লেখাটিকে খুঁজে বার করা খুব একটা সহজসাধ্য কাজ নয়। এই কাজটি করতে চেষ্টা করেছেন এই সংকলনের কার্যনির্বাহী সম্পাদক উজ্জ্বলকুমার দাস।

এমনও হতে পারে, কোনও পাঠক হয়ত তাঁর কোনও প্রিয় লেখককে এই সংকলনে খুঁজে পাবেন না। হয়তো সেই লেখকের উপযুক্ত কোনও রচনা খুঁজে পাওয়া যায় নি। হয়ত অসাবধানতায় কিছু লেখকের নাম বাদও পড়তে পারে। এ সমস্ত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। গল্পের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনেকের সঙ্গে মতভেদ ঘটবে। সেক্ষেত্রেও আমরা নিরুপায়। তবে সকলের বক্তব্য শোনার জন্যই আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা রইল।

শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের কথা

বাঙালির জীবন আজ বড়ো নীরস। এই নীরস জীবনটাকে একটু রসে টইটুম্বুর করে তুলতে ও দুঃখের মাঝেও তাদের ঠোঁটের কোণে যদি সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে তোলা যায়, সেইজন্যই এই 'একশো বছরের সেরা সরস গল্প' সংকলনটির প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংকলনের উদ্দেশ্য নামের মধ্যেই পরিস্ফুট। আমরা সরস গল্প পরিবেশন করতে চেয়েছি মাত্র। তাদের কোনওটিতে তীব্র ব্যঙ্গ বা কঠিন শ্লেষ হয়ত নিহিত আছে। কিন্তু একান্তভাবে শ্লেষমূলক রচনাকে যতটা সম্ভব বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত হাসির উপাচার সাজানোই এই সংকলনের মূল উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের আয়তন বিশাল হয়ে যাওয়ায় কিছু লেখা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ দিতে হয়েছে। এজন্য প্রকাশক ক্ষমাপ্রার্থী।

'একশো বছরের সেরা সরস গল্প' বইটি পাঠকপাঠিকাদের কাছে যদি সমাদৃত হয়, তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে বলে মনে করব।

সূচিপত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র	জাতি মারিবার মন্ত্রণা	১১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ভ্রান্তিবিলাস	১৮
দীনবন্ধু মিত্র	পোড়া মহেশ্বর	২১
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কমলাকান্তের জোবানবন্দী	২৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ	নাক-কাটা বঙ্ক	৩৮
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	ডমরুধরের গল্প	৪২
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিলি ব্যবস্থা	৫৪
অমৃতলাল বসু	দ্বন্দ্বে মাতনম্	৫৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মুক্তির উপায়	৬০
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভোলানাথের উইল	৬৭
প্রমথ চৌধুরী	ফরমায়েশি গল্প	৭১
দীনেন্দ্রকুমার রায়	গল্প লেখার বিড়ম্বনা	৮৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি	৯৪
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ছেলেধরা	১০২
রাজশেখর বসু	স্বয়ম্বরা	১০৬
জগদীশ গুপ্ত	চার পয়সায় এক আনা	১১৫
সুকুমার রায়	হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি	১২৩
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	কেলো কামড়ায়	১২৮
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বাক্স-বদল	১৩৫
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	হাজারিবাগ	১৪৫
পরিমল গোস্বামী	রূপান্তর	১৫৩
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পণ্ডিতমশাই	১৫৯
বনফুল	ঐরাবত	১৬৮
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	ঝি	১৭৪
সজনীকান্ত দাস	ললিতা পাঠাগার	১৭৮
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে	১৮৭
মনোজ বসু	একদা নিশীথকালে	১৯৩
প্রমথনাথ বিশী	'ন-ন-লৌ-ব-লিঃ'	২০১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	একটুকু বাসা	২০৮
শিবরাম চক্রবর্তী	ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি	২১৪

সৈয়দ মুজতবা আলী	বিষের বিষ	২২৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র	মাহুরি কুঠিতে এক রাত	২২৮
অন্নদাশঙ্কর রায়	গাধা পিটিয়ে ঘোড়া	২৩৮
বুদ্ধদেব বসু	চিঠি	২৪৯
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	কীজ্‌বাব্‌	২৫৪
লীলা মজুমদার	সাংবাদিকের ডায়রি	২৬৩
আশাপূর্ণা দেবী	মুস্কিল-আসান	২৬৬
সুমথনাথ ঘোষ	কুহু	২৭৪
বিমল মিত্র	জেনানা সংবাদ	২৮০
প্রতিভা বসু	অবশেষে	২৯৬
কুমারেশ ঘোষ	অচল টাকা ও চালু মাল	৩০২
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	নাম	৩০৪
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	তপনের চৌরচর্চা	৩১০
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	পিক পয়েন্ট	৩১৭
বিমল কর	রত্নলাভ	৩২৩
রমাপদ চৌধুরী	এক সের বেগুন	৩৩৫
গৌরকিশোর ঘোষ	কাটামুণ্ডের উপাখ্যান	৩৪০
সমরেশ বসু	প্রেমঢাকের বোল	৩৪৫
মহাশ্বেতা দেবী	অনবরত অবিশ্বাস্য	৩৫০
হিমানীশ গোস্বামী	গুরুতর কিছু নয়	৩৫৫
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	আকারন্ত	৩৬৪
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	ফুল আঁকা রুমাল	৩৬৯
শংকর	আজব টিকিট	৩৭৬
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	বকরাক্ষস	৩৮৮
প্রফুল্ল রায়	বিরুদ্ধ পক্ষ	৩৯২
আনন্দ বাগচী	অতিথি	৩৯৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	রানি ও অবিনাশ	৪০৫
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	পেয়ালা পিরিচ	৪১৪
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	খগেনবাবু	৪২৫
তারাপদ রায়	ভালোবাসা-ভালোবাসা	৪৩৪
বুদ্ধদেব গুহ	চেয়ার	৪৩৮
নবনীতা দেবসেন	মেজকাকিমার গল্প	৪৪৯
দিব্যেন্দু পালিত	শুক্রে শনি	৪৫৭
সুচিত্রা ভট্টাচার্য	ঊনসত্তর আর তেষট্টি	৪৬৬
উজ্জ্বলকুমার দাস	ডিগবাজিল্যান্ড	৪৭৬

জাতি মারিবার মন্ত্রণা

প্যারীচাঁদ মিত্র

কলিকাতায় শনিবারকে কোন২ বাবু মধুর শনিবার ও কোন২ বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন, কারণ শনিবার রাত্রে নানা প্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্করবাবু কুঠির কর্ম আস্তে ব্যস্তে শেষ করিয়া আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠকখানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতে২ বাবুর পারিষদগণ প্রেমচাঁদ দত্ত, দিগম্বর বাচস্পতি ও হলধর গোস্বামী উপস্থিত হইলেন।

ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবেলার নল ভড়র২ টানিতেছিলেন, পারিষদ্দিগকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্ব কেন কেন? অদ্য শনিবার—তোমরা কি ঘুমাইয়াছিলে?—অরে—বলা—বলা—বলা!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখ্ দেখি হানপে্ আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রান্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর মোশাই কাল বলেছিল যে হানিপ দাড়ি কামায়ে মালা পরে এস্‌বে—সে সব করেছে—এজ তাকে গোঁসাই গোবিন্দর মত দেখাচ্ছে।

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে২ আসিতে বল্, আর তুই বোতল টোতল গুলা এনে দিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাঁড়া। যে আসিবে তাকে বল্‌বি আমার বড় মাতা ধরেছে—বুঝ্‌লি?

বলরাম। এজ্ঞে।

হানিপ টিপি২ বৈঠকখানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসের কাবাব ব্যঞ্জন ও পোলাও ও রুটি উপস্থিত করিয়া দিল, এবং চতুর্দিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান লইল।

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! আসুন ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।

বাচস্পতি। ওহে ভাই! একবার কোশাকুশীটা নেড়ে এলে ভালো হয় না? আমি এ সকল কিছুই মানি না, কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—সেখানে তেমন।

গোস্বামী। আমিও কোশাকুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থানবিশেষে বুঝে চলি। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে তিলক করি ও কৃষ্ণ২ বলি, আবার তেমন২ জায়গায় গিয়া রক্ত চন্দনের ফোঁটা করি ও দুর্গা২ জপি, কোন২ স্থানে নাস্তিকতা প্রকাশ করি। আমি সকলকে তুষ্ট রাখি—আমার কুহক বুঝিতে পারে না।

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই, তবে সায়ং সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক কি?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু২ পাকা মাল খাও। পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রান্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। ওহে ভাইসকল—যে শীতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সামগ্রী পেটে গেলে পুত্রশোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পুজরি বামুন এসেনি—মা ঠাকরুণ বল্‌লে যে বাচ্‌রপতি গিয়া ঠাকুরের আরতি করুক।

বাচস্পতি। সর্বনাশ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বল্‌গে যা—আমি সায়ং সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাইওয়ালার দোকানে একজন ব্রাহ্মণ আছে তাকে লয়ে কর্ম শেষ করিয়া দিগে।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম। কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি!

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন, হরিনাথ দত্ত ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্যরূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিষ্টিয়েন কিনা তা ঠিক বলতে পারি না কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের ন্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্য দুইজন পারিষদ। তার সন্দেহ কি? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অখাদ্য খাবি ঘরে বসে খা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার কর্—ইংরাজদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যরূপে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে বেটা যেমন ধাষ্টেমো করে তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্তব্য; তাহার নিমন্ত্রণে যে২ ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগকে দল হইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও অন্যান্য ব্যবহারে অতি ভদ্র।

বাচস্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভদ্রতা কি প্রকারে হইবে?

ভবশঙ্কর। তবে আমি কালই দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ত্বরায় বৈঠক করিব।

বাচস্পতি। অবশ্য—অবশ্য—, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদাই করিতে হইবেক। আপনার পিতৃপিতামহ পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় দ্বাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অন্যান্য সৎ কর্মদ্বারা আপনার বংশ ধন্য হইয়াছে। হিন্দুয়ানি যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এমত করিবেন না। উদ্‌যোগী হউন ও পাপের দণ্ড করুন।

ভবশঙ্কর। আমি অবশ্য যত্নবান হইব—এক্ষণে আর একটু২ কুক্কুটের মাংস আহার কর—তোমাদের যে কিছু খাওয়াই হইল না?

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বিধি দেন যে বনকুক্কুট আমাদিগের খাদ্য। পূর্বে ঋষিরা গোমেদ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত, তবে দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে?

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা! একটু পায়ের ধূলা দেও—তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি।

গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্য পান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হান্‌পে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের হোটেলে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।

প্রেমচাঁদ। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার কর না কি?

গোস্বামী। হাঁ বাবা, আমি কি কাঁচা ছেলে! মুখে চক্ষে কাপড় মুড়ি দিয়া এমন২ কর্ম শেষ করিয়া আসিয়াছি যে কাক পক্ষী·টের পায় নাই।

প্রেমচাঁদ। তবে ভাল—দেখ যেন ধরা পড়ে মজো না—ভবশঙ্কর বাবু বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের সাধে জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ বেটার বাটীতে যে২ গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি মারিব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে, আর একটু মদ দেও, খাই। আজ রাত্রে আমার যাওয়া হইবেক না। মুখে কাপড় মুড়িয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছ আমিই জানি। এখানে মুড়ি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব, তাহার পর দেখিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচস্পতি মহাশয়! কালেতে সব ধর্ম নষ্ট হইল। হায়, হায়, হায়!—আফ্‌শাষ রাখিবার স্থান নাই।

বাচস্পতি। কেন হে বাপু ব্যাপারটা কি? বাটী যাইবে না কেন? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি?

প্রেমচাঁদ। না মহাশয় বাজারের মহাজনের নিকট হইতে জিনিস লইয়া ব্যবসা করিয়াছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু দিব না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সুখে কাল কাটাইব। সকল বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, এ জন্য আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পড়িলে জেলে যেতে হইবে।

বাচস্পতি। তা বটে তো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বচ্ছন্দে থাক—হানি কি? আর কিছুকাল লুকিয়ে থাকিলে গেরেপ্তারি কেটে যাবে। তারপর খুব বড়মানুষি করিয়া সব বেটাকে কাণা করিয়া দেও। হাতে টাকা থাকিলে সকলকে—"অর্থস্য পুরুষো দাসঃ"—পুরুষ অর্থের দাস।

গোস্বামী। অরে বলা! আর একটা বোতল খোল—আমার গলা শুকিয়ে উঠিতেছে।

কথাবার্তা কহিতে২ চারিজনায় ক্রমে২ এত মদ্য পান করিলেন যে সকলেই বেহুঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি কলিকা হইতে হইতে দু তিন খানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্‌মচ্ করিয়া খাইতে২ বলিলেন, হায়! কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টতাও গেল।

প্রেমচাঁদ। দেখো, বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তা না হইলে আমার আসা ভার।

বাচস্পতি। তুমি থাকিলে বক্তৃতা কে করে? তোমার তুল্য কৌশল বক্তা কে আছে। বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগানন্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

প্রেমচাঁদ। মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমার প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই মামা—ভাই একটা যাত্রার গান গাও না। (এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট টিপ টিপ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)।

বাচস্পতি। শাস্ত্র ব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে হয়। গোঁসাই মামা বলিয়া কি ভাই বলে? বলিতে হয়—গোঁসাই বাবা—ভাই একটা গান গাও না।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটুম্বিতার কথা বলিয়া সম্বোধন কর আমি সেই গোঁসাই। আমার জ্ঞান টনটনে—আমি গাই—শুন।

এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগিণীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—মোঁ—য়ে—য়ে—য়ে—য়ে—লা— লা—লা—লা—গি—গি—গি—

বাচস্পতি। আরে বাবু এ গান বুজিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্শি পড়িতে হয়। সাদা সিদে রকম মজাদারি একটা আড়খেম্‌টা যাত্রার গান গাও।

গোস্বামী যাত্রার গান আরম্ভ করিবামাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং ধিং করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নেসার জোরে পা নেটিয়া পড়িল, এজন্য টুপভুজঙ্গ হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার ন্যায় করিয়া পড়িয়া গেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিতে লাগিলেন। বলরাম এ সকল দেখিয়া প্রদীপ নির্বাণ করণান্তর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরোয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, ভাই, পেটের জ্বালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু এ ভণ্ড ব্যলিক বেটার হাত হইতে কবে মুক্ত হইব!

জাতি রক্ষার্থ সভা

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতিরক্ষার্থে এক মহা সভা হয়। অনেক অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয়, সে ইংরাজী রকম সাজান অর্থাৎ তথায় মেজ, চৌকি, কৌচ ইত্যাদি সকল ছিল।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—আহা কি অপূর্ব সভা হইয়াছে! এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায়—কলিকাতার পুলস্ত্য অঙ্গিরা গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য ও ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে, আর ভবশঙ্কর বাবুর ভবন কৈলাসধামতুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব!

সভার দশ পনরো জন। অহে রাজীবকে ডাক—রাজীবকে ডাক—কর্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্য সকল চিঠি বাঁটা হইয়াছে?

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশঙ্কর। কেমন উমাশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাহার একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা পড়িয়াছে। তিনি দিনরাত সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাঁহার তিলার্ধ অবকাশ নাই।

ভবশঙ্কর। কালীশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্য চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেন্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন, আর অদ্য তাহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে, তাঁহার বাগানে অদ্য রাত্রে খ্যামটার নাচ হইবে এজন্য ছেলে-পুলে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। রামশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি মদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়া লইয়াছেন এজন্য চারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অদ্য প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন।

ভবশঙ্কর। হরিশঙ্করবাবু কি বলিলেন?

রাজীব। (কাণে কাণে) তাঁহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা খানা আছে, আর তিনি নেশা করিয়া পড়িয়া গিয়েছিলেন, পা ভাঙিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। শিবশঙ্করবাবুর সহিত কি দেখা হইয়াছিল?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার মত উলট্—তিনি বলেন আজ্‌কের কালে কে না কি করিতেছে?—ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড় হইবে, বরং শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ভাল—অধিক খোঁচা খুঁচি করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুঁড়িতে২ সাপ বেরোয়।

বাচস্পতি। প্রাচীন হইলে প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নাস্তিকতার দমন করা কর্তব্য নয়? মরি, কি সার বুঝেছেন! সে যাহা হউক, এক্ষণে সভার কার্য আরম্ভ করুন।

ভবশঙ্কর। সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এজন্য দল সংক্রান্ত ভাল কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচস্পতি, দাদার মত যে আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিষ্কৃত করা কর্তব্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন তাঁহাদিগেকেও ঠেলা উচিত। হরিনাথ দত্ত সর্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সত্যবাদী মিষ্টভাষী সৎ এবং পরোপকারী বটে—কিন্তু "গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়"। হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া প্রকাশ্য রূপে ইংরেজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন, আমি হিন্দু ধর্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের তোয়াক্কা রাখি না—আমি কোন বড় মানুষের খাতির করি না, কেবল সৎমানুষকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা অবশ্যই করিব। এসব কথাতো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের মত কি?

বাচস্পতি। কর্তবাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে বিন্দু বিসর্গ ভুল নাই। ভগবান ভবিষৎ পুরাণে বলিয়াছেন—কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি ঘটিবে, কিন্তু আপদ পড়িলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে? অগ্নি গৃহে লাগিলে বিনা জলে কি নির্বাণ হয়। রোগী পীড়াতে শয্যাগত হইলে বিনা ঔষধে কি আরোগ্য হয়? তেমনি বিনা উদ্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্নে—বিনা—উদ্যমে বিনা প্রবল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা যাইতে পারে? দুষ্ট লোককে শীঘ্রই দমন করা কর্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ঃ

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন
যুগে২ জন্ম লই কুন্তীর নন্দন"।

আর২ সকলকে বোঝাতে পারিছি,না ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম অতি বড় ভয়ানক। শাস্ত্র বলে, যদ্যপি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানজ্ঞ যোগী যোগ বলে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন তথাপি লৌকিকাচার বিরুদ্ধ কর্ম কখন মনেতেও আনিবেন না।

গোস্বামী। (সমস্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মস্তকে নামাবলি বান্ধা—গায়ে তুলসীমালার গোচ্ছা ও হস্তে একটা প্রকাণ্ড কুঁড়োজালি—হাই তুলিতে২ বলিতেছেন "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা") আহা! বাচস্পতির মহাশয়ের কথা গুলিন বেদবৎ প্রমাণ। কাহার বাপের সাধ্য তাহার তু ব চ কাটে। প্রভু নিত্যানন্দন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু স্থায়িই বা কি? যদুপতির সে অযাধ্যা পুরীই বা কোথায় ও রঘুপতির সেই উত্তর কৌশলই বা কোথায়? সূর্যের গমনাগমনে প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

প্রেমচাঁদ। গোঁসাই মামার শ্মশান বৈরাগ্য দেখে আমি যে আর বাঁচি না! উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ দেও—এখন উদ্যমের সময়—আপনার কথা বার্তা শুনিলে উদ্যম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যে২ গিয়েছিল, সে সব বেটাকে এক ঘরে করা যাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্কর বাবুর সহিত আমার কেবল পাক পৈতার ভেদ—আমাদিগের একই

মন—একই প্রাণ—তিনি যে পথে যাইবেন—আমিও সেই পথে যাইব—তিনি যা করিবেন—তাহাই আমার সম্পূর্ণ মত।

বাচস্পতি। এই তো বটে, না হবে কেন—যেমন বংশে জন্ম সেই মত কথাবার্তা—অহে বলরাম, নস্য দানিটা কোথায় ফেলিলাম? গলাটা শুষ্ক হইতেছে এক ছিলিম তামাক পাইলে ভাল হইত।

বলরাম। (বাচস্পতির বড় অনুগত, কারণ তিনি কর্তার ডানহাত) মোশায়ের গলা শুংয়েচে এবং এজন্য আমি তাই২ এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাসের ঢাকুনি খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতর বরফ ও ব্রাণ্ডি। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসারা করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন।

হেমচন্দ্র দে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্ট বক্তা—গ্লাসের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ও?

বাচস্পতি। আমার পৃষ্ঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্য বলরাম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নূতন রকম এরণ্ড তৈল এবং সৈন্ধব দেখিলাম। সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে বুঝি?

রাজীব। মহাশয়! হরেকৃষ্ণবাবু ও রাজকৃষ্ণবাবু টুপভুজঙ্গ রকমে দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র। টুপভুজঙ্গ কি?

বাচস্পতি। "ভুজঙ্গঃ পবনাশনঃ ইত্যমরঃ"। টুপভঝঙ্গ অর্থাৎ অতি ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় সতর্ক।

রাজীব। (সাদাসিদে লোক—কোর কাপ বুঝে না) আজ্ঞে—তা নয়, টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি অর্থাৎ মদ্যপানের পর বাকশক্তি ও গতিশক্তিহীন অবস্থাপন্ন, ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও দুটি চোখ ঝিমোয় ও মিট২ করে, আর ইচ্ছ হয় যে পক্ষী হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ ও টুপভুজঙ্গ এরা মামাতো পিতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্মে যাও—শব্দের অর্থ করা আমার কর্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান, তোমার কর্ম অর্থের শব্দ করা। বড় মানুষের বাটীতে থাকিলে সব ঢেকে ঢুকে চলিতে হয়। পুরুষ সাকুব না হইলে তাহার নানা বিপদ ঘটে।

হরেকৃষ্ণ। (শরীর টলমল রামকৃষ্ণ বাবুর কাঁধে হাত) ভবশঙ্করবাবু! আমি তো প্রস্তাবে পোষকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেসায় খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন) হরেকৃষ্ণ দাদা কিছু বেহিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্রেতেই লইবে—আমার একটা গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রাণ যায়"!

রামকৃষ্ণ যেমন তেড়ে গান ধরিয়াছেন, হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন।

প্রেমচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া দুইজনকে পার্শ্বের ঘরে শুয়াইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেকৃষ্ণবাবু পড়িলেন কেন?

বাচস্পতি। তাঁহার মৃগী রোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানান্তর করা ভাল হইয়াছে, তিনি প্রস্তাব সকলে পোষকাত না

করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা করুন।

প্রেমচাঁদ। এক্ষণে এই স্থির হইল, হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা যাইবে।

সীতাপতি। মহাশয়! আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণে যাই নাই।

বাচস্পতি। কেন তুমি তো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে?

সীতাপতি। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম।

বাচস্পতি। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস সেখানে অবস্থিতি হইল কেন?

সীতাপতি। আজ্ঞা ঐটী আমর ভুল—আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রেমচাঁদ। আচ্ছা বিষ্ণস্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর২ সকল দোষিরা ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম তেমনি ফল।

হেমচন্দ্র। আমার ইচ্ছা ছিল না সভায় কিছু বলি, কিন্তু অন্যায় সহিষ্ণুতা করিতে পারি না। আমি কলকাতায় অনেক দিন আছি—অনেক লোককে জানি, কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় বাটী বাটীতে অন্বেষণ করিলে খানার ও মদের বিল ঝুড়ি২ বাহির হইবে, তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?

বাচস্পতি। তোমার মত কয়েক লোক হইলেই হিন্দুয়ানি ত্বরায় অন্তর্ধান করিবে। বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে হিন্দুয়ানি ঘাতক কর্ম কে করে? অন্যান্য কর্মে পার আছে, কিন্তু এ কর্মে যে সর্বনাশ উপস্থিত হইবে।

হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্য রূপে খাইলে পাপ। কপটতা পূজ্য—সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফ্রেবি জুলুম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ ও সকল কুকর্ম বলিয়া ধর্তব্য নয়—এ সব কর্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না—চমৎকার বিধি। চমৎকার শাসন। ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুস্কর্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতিরূপে করিলে জাতিচ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ কি?

প্রেমচাঁদ। (কোপিত হইয়া) তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?—মুখ সাম্‌লিয়া কহ—ভদ্রলোকের গ্লানি করিস? শীতল সিংহ!

হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো সব জানা আছে—আর ঘাঁটাও কেন?—শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম সিংহ হইব।

প্রেমচাঁদ দন্ত কড়মড় পূর্বক মেজে আঘাত করিয়া মার২ বলিয়া হেমচন্দ্রের উপর পড়িল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাঁদকেই তিনটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন, পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্য কর্তাবাবুকে ইসারা করিয়া আপনি বাটীর বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশাকুশি লইয়া বম২ বম২ শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্য দিকে দেখেও দেখেন না। ভবশঙ্কর অন্তঃপুরে গিয়া পত্নির অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাঁদ ভাবিলেন অদ্য রাত্রে বেলি গারদে থাকিলে কল্য দেওয়ানি মোকদ্দমার গেরেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে এ কারণে গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া অধোমুখে আস্তে ২ প্রস্থান করিলেন। গোস্বামী "কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা" বলিতে বলিতে সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। সভার অন্যান্য লোক সকল মারামারি দেখিয়া ভয়ে ছুটে পলাইয়া গেল। হেমচন্দ্র ক্রমে ২ সভা শূন্য দেখিয়া হাসিতে ২ বলিতে ২ চলিলেন বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্মে মতি—যেমন বিবেচনা—যেমন মন্ত্রণা—তেমন একাগ্রতা—তেমন বল—তেমনি সাহস!

ভ্রান্তিবিলাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যাবিধ কার্য্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটরাজ্যেও জয়স্থলবাসী লোকদিগের পক্ষে অবিকল তদ্রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিত রূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় রাজ্যের উল্লিখিত নৃশংস ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বহুবিস্তৃত বাণিজ্য এককালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্ত নামে এক বৃদ্ধ বণিক ঘটনাক্রমে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক! তুমি প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ, এই দণ্ড দিতে না পার সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সোমদত্ত বলিলেন মহারাজ! ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণদণ্ড করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। আমি অহর্নিশ দুর্বিষহ যাতনাভোগ করিতেছি; মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্যটন করিতেছি। যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পরে যে বিরোধ ঘটিয়াছে এবং ঐ উপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। যদি প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধির সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না, ধর্ম্মপ্রাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং জয়স্থলে হেমকূটবাসীলোক দিগের পক্ষে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবনিক্ দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধিপ্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও তোমার মত না জানিয়া হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ নবপ্রবর্ত্তিত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের অর্থদণ্ডবিধান করেন।

অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অবশেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থলবাসীদের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমি প্রচলিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার প্রতি দয়াপ্রর্শন করিতে পারিব না। অবিলম্বে পাঁত সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে তুমি অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার। কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না; কারণ তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ের মূল্য উর্দ্ধসংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ং কালে তোমার প্রাণদণ্ড একপ্রকার অবধারিত বলিতে হইবেক।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই। আপনার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, এক ক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন এই মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগ হইলে আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্যের শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতূহল উদ্ভূত হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণকামনা করিতেছ; কি হেতুতেই বা তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসর কাল দেশপর্য্যটন করিতেছ; কি উপলক্ষেই বা তুমি অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমি পরিত্যাগের ও দেশপর্য্যটনের কারণনির্দেশ করিতে গেলে আমার শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনকার আদেশপ্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আপনকার সন্তোষার্থে সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্তবর্ণন করিতেছি। তাহাতে আমার এক মহৎ লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক আমি কেবল পরিবারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আমার এই প্রাণদণ্ড কোনও গুরুতর অপরাধ নিবন্ধন নহে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূট নগরে জন্মগ্রহণ করি। যৌবন কাল উপস্থিত হইলে লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না তেমনই সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, অবিচ্ছিন্ন, সুখসম্ভোগে সংসার যাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্ম্মাধক্ষ্য ছিলেন, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়াতে তত্রত্য কার্য্য সকল সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুনিয়া অতিশয় ব্যকুল হইলাম, এবং সহধর্ম্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুরপ্রস্থান করিলাম। ছয় মাস অতীত না হইতেই লাবণ্যময়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনধিক কালের মধ্যেই অন্তর্বত্নী হইয়া যথাকলে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন কুমারযুগলের অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্ব্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে উভয়ের ভেদগ্রব কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাস অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারী ও সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া এই দুই যমজ সন্তানের বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে আমি ক্রয় করিয়া পুত্রনির্বিশেষে উহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলাম যমজেরা সর্ব্বাংশে একাকৃতি বলিয়া এক নামে এক এক যমজের নামকরণ করিলাম; পুত্রযুগলের

নাম চিরঞ্জীব, ক্রীত শিশুযুগলের নাম কিংকর রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে আমার সহধর্ম্মিণী হেমকূট প্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য হইয়া সর্বদা উৎপীড়ণ করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই চারি শিশু সমাভিব্যাহারে আমরা অর্ণবপোতে আরোহন করিলাম। মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাতাস বহিতে লাগলি; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া প্রতিক্ষণেই মৃত্যুপ্রতিক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী সাতিশয় আর্ত্ত স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুই তনয় ও দুই ক্রীত বালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুল লোচনে অতি কাতর বচনে মুহুর্মুহু বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমরা মরি, তাহাতে কিছু মাত্র খেদ নাই, যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কোন উপায় কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা পোতরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। অর্ণবপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল; একের প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুর প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর বন্ধন পূর্ব্বক, আমরা স্ত্রী পুরুষের ঐকৈকের অপর প্রান্তভাগে এক একজন করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে উহারা ঐ রূপে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে সূর্য্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম দুই অর্ণবপোত অতি বেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। বোধ হইল, আমাদের উদ্ধরণের জন্যই আসিতেছিল। তন্মধ্যে একখানি কর্ণপুরের অপরখানি উদয়নগরের। এ পর্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল, কিন্তু উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আকস্মিক-বায়ুবেগবশে পরস্পর অথিশয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা বন্ধনমোচন পূর্ব্বক আমার গৃহিণী, পুত্র, ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই অপর পোত আসিয়া আমাদের তিনজনের উদ্ধরণ করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকের সেরূপ নহেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া আমাদের উদ্ধারকেরা আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্যুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে যাইতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্র ও প্রেয়সীর সহিত বিযোজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই—

এই কথা বলিতে বলিতে সোমদত্তের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমার যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল সমুদায় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে; সবিস্তর বর্ণন করিলে আমি অনুগৃহীত বোধ করিব। ❦ *(অংশবিশেষ)*

পোড়া মহেশ্বর

দীনবন্ধু মিত্র

ইস্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা স্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়া মহেশ্বর-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে, সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য কামালপুর। বহুকালাবিধি কামালপুর অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন নিদিশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত পটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যপক অতি বিরল, বোধ হয় বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশত্রয় পশ্চাতে পতিত হইলে খলসির বিল নামে একটি সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপরনাই পরিপাটি; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা নির্ম্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টিগোচর হয়। কুন্দ কুমুদ কহ্লার কুবলয় কমলসমূহে জলাশয়টি অতি সুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম এক স্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ। জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক পদ্মপত্রে আবৃত, সেখনে বোধহয় পদ্মপত্র বিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভাঃ নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুম সৌরভামোদিত শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপ পক্ষী সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকে নিধনকরণভিলাষে সময়ে সময়ে কিরাতস্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

খলসির বিলের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে সরাবপুর গ্রামঃ অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বাসিন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়া মহেশ্বর বিরাজিত। পূর্ব্বকালে একটি সুদীর্ঘ মন্দির ছিল; তন্মেধ্যে পোড়া মহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দিরের সম্যক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিক স্তূপাকারে নিপাতিত, দেখিলে বোধহয় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়, এই স্তূপপোরি পোড়া মহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়া মহেশ্বর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত, হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই,

একখানি সুগোল শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটি বর্তুলবৎ। পোড়া মহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকা মধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্যন্ত গমন করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা প্রতীতি হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া লড়াইলে শিবের শরীর ঢক্ ঢক্ করিয়া লড়িতে থাকে। পোড়া মহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি যে বৃহৎ , তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়া মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে। কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল, তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিংবদন্তী, পোড়া মহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাহারও জানিবার সম্ভবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেব-দুর্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইল একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পর্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের সম্মুখে অশ্বত্থবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘকলেবর; প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় রূপ, শ্বেত কুন্তল, এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়দণ্ড, বাম হস্তে কমণ্ডলু গাত্রে গাছের বল্কল। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক গ্রীবা-সঞ্চালন পর্যন্তও করেন না। দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, রবশূন্যবদনে, অবিচিলিতচিত্তে আরাধ্যদেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে স্বয়ং ভগবান্ ভবানপতি কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবধ্বংসে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসী সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কথা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর ঘাট হইতে দুটি কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদয় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসন খানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিতসিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিয়ে যায়, লোকে দুদ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুদ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, সুমিত্রার দুদ যেন বটের আটা। রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা যাচাঞা করে, তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁঠাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্ত বস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁঠাল দিল; ভ্রমরার বিলে বা'চ হইতেছে শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা, জাল, পলো, দুঁড়ে, ঘুনি লইয়া মাচ ধরিতেছে, একটি আঁশ মাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না। সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মান হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা, লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনাবৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়। ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া

কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, গাছপালা, লতা পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে। সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুর স্বরে ফটিক জল ফটিক জল বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা বামলোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য-হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহর্নিশি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্র-বসনধারিণী সুমিত্রা সগৌরবে বলিলেন, 'হতভাগিনী বন্ধ্যে! অচিরাৎ পুত্রবতী হও' সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ্যারা প্রসববেদনা; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না; জননী সেজন্য যারপরনাই দুঃখিনী, চলপড়া, মাচপোড়া, বার্‌কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যার শেকড়, কন্যার বামচরণের রেণু জামাইকে কত খাওয়ালেন। বশীকরণ মন্ত্র যেখানে যাহা ছিল সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা কয় না, সুমিত্রা প্রদত্ত রক্তবশনের একগাছি দশী জননী অতীব ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুমিত্রা সম্বন্ধে আর একটি অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাঞ্চনবরণ, চিকুর-গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুগ্ধের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী; সুমিত্রা সতী বলেই হোক কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখনও কানাকানি করে নাই; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিত সিক্তবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেতভূমি পরিহারপুরঃসর উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্যে ম্যাজেণ্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়া ছিল।

দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথসময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্টা সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে মহীরূহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশান বিহারী ভূত পেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোন মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাসগত অপদেবতাদিগের সহিত তড়্‌বড়্‌ করিয়া কথা কহিতেছেন। যমরাজ গৃধিনীযুগলপ্রযোজিত অশ্ব-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশ্মশ্রু মাম্‌দো ভূত শকটের সারথি, উদ্বন্ধনে মৃত মানবের নাড়ী ভুঁড়ির বল্‌গা; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ; নবশিশুমুণ্ডবিমণ্ডিতমুক্তমালাঙ্কৃত যুবরাজ মহারাজের সমভিব্যাহারে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে যমরাজ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষোবিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গি দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড় বিড় করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন; দামু ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণা নভিজ্ঞা; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম্ম

নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহন না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া কহিলেন, "হে ভূতকুল শিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মদৈত্য মহোদয়! এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি একপ্রকার রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্বনাশ করিতে বোধহয় বাবাজীর মত দুটি নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন"। সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবরাজ তোমার বয়স কত?"

যুবরাজ। আজ্ঞে বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান?

যুবরাজ। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বয়ের বয়স কত?

যুবরাজ। আজ্ঞে বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি?

যুবরাজ। নিশীথে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয়?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন!

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শট্‌কেতে কিঞ্চিৎ কঁম মজ্‌বুত আঁতুড়ঘরে আরশুল্যায় বাবাজীর মস্তিস্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘঁটে বুদ্ধি।

যমরাজ। যুবরাজ ঘুঁটে বুদ্ধি বটেন; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার কিন্তু তাঁহার এমন অভিপ্রায় নহে যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসংগত সংহার করে; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতাপল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ সহকারে সৌরভবিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা; পরশ্রীকাতর, পাষণ্ড, নির্দ্দয়, নীচাত্মার কাননের কোমল পত্র ছিন্ন করে, বসন্তনিলান্দোলিত মুকুলভারাবনত

লতিকার উচ্ছেদ করে,পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকশিত কুসুমসমহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাতাঘাতে নিপতিত হয়, যে সকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং আসংলগ্নদাম হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জ্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষণ্ড তোমার গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্বনাশামোদী, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগ্‌বান ভোলামহেশ্বর ভাঙ্‌ধুতুরায় নিশিযামিনী বিভোল, দূর প্রদেশের শাসন-প্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটি তোমার অতিশয় ভ্রম; তোমার দৌরাত্ম্য তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে; সেই দণ্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী অকালমৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকালমৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যানুসারে এক আষাঢ় দণ্ডাঘাতে তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব! কল্য প্রাতে লোকে দেখিবে দুটি দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না। আমার জ্ঞানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন আমি প্রতিবাদ করতে সক্ষম হই। আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ তুমি হস্তিমূর্খ, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম অকালমৃত্যু বীরদম্ভে বিহার করিতেছে, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত বিচারালয়ে নবীন বিচারপতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনি শুষ্ক জিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকাভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ তোমার নূতন লেখনীর শত শত উদাহরণ দিতে পারি তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত, অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল সন্ধান করিয়াছ; যে সকল মানবের জীবন পাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে—মীনহট্ট নামে বারমহিলাপল্লীতে দেখিলাম, একজন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ির দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধানে কালপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপেটি জুতা, কোমরে সোনার গোট, গোট হইতে সোনার চাবিশিক্‌লি লম্বমান্, মাসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে' মালা, দন্তে গোলাপি মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাসিলেন, স্মৈরিণী অমনি একটি কুসুমগোচ্ছা তঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ঝর্‌ঝর্ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল—দাঁতগুলি কৃত্রিম!

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ—তাহার পুত্রেরা তাহার

শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠ তণ্ডুল তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার যোড়শ পর্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটি যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটি রূপার ষোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমন নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ শ্বশুরকে গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়শটি বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে।

যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধনা করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অহিতাচারের সন্তোষ-জনক কারণ দর্শাইতে না পার এই দণ্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। একদিন সমস্ত দিন স্বকার্য সাধনানন্তর সন্ধ্যাকলে শমনবাণটি মহাদেবের মন্দিরের পশ্চাৎ শিমূল গাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে কন্দর্প কাকা সেখানে উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটি ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমূল ফুলেব কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাঁড়ীচাচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতে যাইতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার তখনও ঘুম ভাঙে নাই। হঠাৎ ঠাকুরদাদার রথ-চক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমনবাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীর মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায় অপ্সরা-মনোরঞ্জন বেশবিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ?

যুবরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্চি না।

সন্ন্যাসী। তুমি অদ্য শিমূল বৃক্ষে ফুলবান লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বানের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমূল বৃক্ষের নিকট যায় না।

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন এমত সময়ে রাখালেরা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে দীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটি হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহ্বর রাখালদিগের নয়নগোচর হইল, অমনি তাহার দৌড়াইয়া দূরে পলায়নপরায়ণ হইল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাদুলি, মস্তকে কেশবিন্যাস করিয়া ঝুঁট বাঁধা, তাহাতে সোণার পুঁটে, কর্ণে কুণ্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগেকে যারপরনাই ভীত করিল তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ির বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদ্ঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে এক দিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-করনিকরে অবনীদগ্ধবৎ পুষ্করিণীর নীর সীতাকুণ্ডোদকা পেক্ষাও উষ্ণ দুঃসহ-আতপ তাপিত গাভীকূল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস-সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ বিজাতীয় রৌদ্র কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে; এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্তমস্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল যে, 'কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর'। কৃষকেরা, রাখালেরা, গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একটি অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জ্বালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে, 'সেই পাগল ব্যাটা রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই'।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, সন্ন্যাসী একদিন বড় বড় কাষ্ঠেক কুঁদা স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সমুদয় পাঁজা সাজানের ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারাগ্নি-কুণ্ড-দগ্ধ-লৌহবৎ পার্ব্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধশালী অনল-জ্বালা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতীব কাতরতা সহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, 'কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর'। গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিতে পাইত বলিয়া এবং প্রত্যহই

পাগল সন্ন্যাসীর ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া তৎপ্রতি মনযোগ করিত না, অদ্যও সকালে সেই ব্যাপার স্থির করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করিল না; মহাদেব নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রদোশকাল উপস্থিত; কাঞ্চনকান্তি সূর্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিমগ্ন; বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গমন করিতেছে; গাভীদল দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগত; ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে; বামাকুল পরিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র হৃদয়ে গোলায়, গোয়ালঘরে তুলসীপিড়িতে দীপ দেখাইতেছে; এমন সময় প্রবল হুতাশুনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মূর্দ্ধদেশ-নিহিত স্পর্শমণি ছিটকাইয়া সমীপস্থ ক্ষেত্রোপরে নিপতিত হইল। তদ্দণ্ডে সে স্থলে একটি হ্রদোৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্ত্যভিলাষে তিনি নানা দেশে পর্য্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বত্থমূলে অনাহারে কালযাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল, হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্ব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশে সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যাবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই নবোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হওয়ায় স্পর্শমণি প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্তিমান্ হইল। সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলনপূর্ব্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগ্রত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খোশনবীশ জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোনও সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারি আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনস্টেবল দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনস্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্‌লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডেপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারার পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল—"হাস কেন"?

কমলাকান্ত জোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পূরিলে"?

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়"।

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু"।

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে"—

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি"?

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমাই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলি,"তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল,"ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধহয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—?"

ফরিয়াদী উকিল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকিল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না। এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল"।

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the Protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "O Baboo ! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like".

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটা জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া আদেশ করিলেন যে "ওথের প্রতি সাক্ষীর Objection আছে—উহাকে Simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল"।

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সের্‌কশ্‌।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive"

কমলাকান্ত। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের

বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত কার, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল,"শোন্, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তাহার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও"।

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না"।

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহৎ খুব"। উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদায়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন,"হুজুর! এ সব Contempt of Court." হুজুর, উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী"। সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে"।

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল। আঃ কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ"। তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়েছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন, এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কমলা। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?"

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগ্‌বান জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিলঃ বলিল, 'এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বলবে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন পেশা ভিক্ষা"।

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না"।

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখনও একটি পয়সা কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?"

কমলা। না।

প্রসন্ন হাকিল। "সে কি, ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা তো বল্‌তেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ;যখনই দেখ্‌তে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দুধ। দুধ দই চিনি নে?"

প্রসন্ন নাক ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকলে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেলঃ তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামুনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যেটা আমায় শিখাইবেন? —আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গরুচুরি দেখিয়াছ?

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বক্‌না—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে।। তাহা হইলে আপনারও কাজে সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতের হাল লইবার ইচ্ছায় উকীলের কাণে কাণে বলিয়া দিল, "ও বামুন সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে"।

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি, গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি—নহিলে কি আপনার সাথে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—"ও সব রাখ"। প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটিকে চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন গোরুটি কি? এই বই তো সাম্‌নে নাই"?

কমলা। আপনি দেখিতেছেন, একটি—আমি দেখিতেছি, অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতেপাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ সামলাও চুরির না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt Of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা"।

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে একমাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন না কি?"

হাকিম তখন একজন কনস্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনস্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিংওয়ালা গোরু—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা থাক—আমি সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল,"তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।"

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনুমান্, তুমি আজও হও নাই। এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্‌গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলুথালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!'—উকীল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয় তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি, তারপর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলি হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশাঞ্চ চিন্তয়েৎ।"

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তারপর সে হবে।

কমলা। তবে জল্‌দি জল্‌দি বল—জল্‌দি জল্‌দি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে উত্তরাধিকারীর, দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন ঐ গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞে, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ওই খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকিল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস করিব"।

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্ করিলেন, পবনাঞ্জাজ মহাশয়। তারপর ক্রস্ করিলেন, কুমার বাহাদুর।[১]

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়!

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?"

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন, বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির দিব্য, তোর ফাঁদি-নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, 'বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।[২] এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আব পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস্ জুনিয়র

---

১. অঙ্গদ।

২. শান্তিপর্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

নাক-কাটা বঙ্ক

কালীপ্রসন্ন সিংহ

হরিভদ্দর খুড়োর কথামত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরি জেনেও আমরা একদিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্কবেহারিবাবুর বাড়ীতে গেলুম। বেহারীবাবু উকিলের বাড়ীর হেড কেরাণী—আপনার বুদ্ধি কৌশলবলেই বাড়ী ঘর-দোর ও বিষয়-আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘাঁতে ঘোঁতে ফেরেন—যে রকমে হোক, কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারিবাবু ছেলেবেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতিপালিত হতেন, সুতরাং তার লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলতি হয়। একদিন মামার বাড়ী খেলা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভিতর পড়ে যান,—তাতে নাকটি কেটে যায়, সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাককাটা বঙ্কবেহারী" বলেই তাঁরে ডাকতো; শেষে উকীল-বাড়ীতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারীবাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম; তাঁর দাদা সেলারদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভায়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকাগুলিও রকমারী বটে! সুতরাং নানাপ্রকরা বদমায়েস পাল্লায় থাকবে, বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারীবাবু সিমলের একজন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠলেন। হঠাৎ কিছু সঙ্গতি হলে, লোকের মেজাজ যেরূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝতে পারেন; (বিশেষতঃ আমাদের মধ্যে কোন দুই একজন বঙ্কবেহারীবাবুর অবস্থার লোক না হবেন)। ক্রমে বঙ্কবেহারীবাবু ভদ্রলোকের পক্ষে প্রকৃত জোলাপ হয়ে পড়লেন।

হইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ীর প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত সকলেই আইনবাজ হয়ে থাকে; সুতরাং বঙ্কবেহারীবাবু যে তুখোড় আইনবাজ হবেন, তা পূর্ব্বেই জানা গিয়েছিলো। আইন আদালতের পরামর্শ, জাল জালিয়াতের তালিমে, ইকুটির খোচ ও কমনলার প্যাঁচে—বঙ্কবেহারীবাবু দ্বিতীয় শুভঙ্কর ছিলেন! ভদ্দর লোকমাত্রকেই তাঁর নামে ভয় পেতে হত; তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন; এমন কি টেকচাঁদ ঠাকুরের ঠক্ চাচাও, তাঁর কাচে পরামর্শ নিতেন।

আমরা সন্ধ্যার পর বঙ্কবেহারীবাবুর বাড়ীতে পৌছলাম। আমাদের বুড়ো রাম ঘোড়াটির মধ্যে বাতশ্লেষ্মার জ্বর হয়। সুতরাং আমরা গাড়ী চড়ে যেতে পারি নাই। রাস্তা হতে একজন ঝাঁকামুটে ডেকে তাঁর ঝাঁকায় বসেই যাই, তাতে গাড়ীর চেয়ে কিছু বিলম্ব হতে পারে! কিন্তু ঝাঁকামুটে অপেক্ষা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় যাওয়ায় আরাম আছে। দুঃখের বিষয় এই যে, সেটি সব সময় ঘটে না। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে যদি ঐ ঝোলায় একবার সোয়ান হন, তা হলে জন্মে আর গাড়ী-পাল্কী চড়তে ইচ্ছ হবে না; যাঁরা চড়েচেন, তাঁরাই এর আরাম জানেন—যেন

স্প্রীংওয়ালা কৌচ!

আমরা বঙ্কবেহারীবাবুর বাড়ীতে আরো অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখতে পেলেম, তাঁরাও "সোণা করার" বুজরুকী দেখতে সভাস্থ হয়েছিলেন। ক্রমে সকলের পরস্পর আলাপ ও কথাবার্ত্তা থামলে সন্ন্যাসী যে ঘরে ছিলেন, আমাদেরও সেই ঘরে যাবার অনুমতি হলো। সেই ঘরটি বঙ্কবাবুর বৈঠকখানার লাগাও ছিল, সুতরাং আমরা শুধু পায়েই ঢুকলেম। ঘরটি চারকোণা সমান; মধ্যে সন্ন্যাসী বাগছাল বিছিয়ে বসেচেন; সাম্নে একটি ত্রিশূল পোঁতা হয়েচে; পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সাম্নে শোভা পাচ্চেন; পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলি ও আগুনের মালসা। সন্ন্যাসীর পেছন দু জন চেলা বসে গাঁজা খাচ্ছে তার কিছু অন্তরে একটা হাপর, জাঁতা, হাতুড়ি ও হামান্‌দিস্তে পড়ে রয়েচে—তারাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে, সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন; অনেকে নিমগোছের ঘাড় নেয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডায় সার দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকে বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য। এই কঙ্ককাটা। এই ব্রহ্মদত্তি! এই রক্তদন্তী কালী—শেতলা। ছেলেদের কথা দূরে থাকুক, বুড়ো মিন্সেদেরও ভয় পাইয়ে দেয়। সন্ন্যাসী যে রকম সজ্জা-সজ্জা করে বসেছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দু-সন্তান মাত্রকেই শেওরাতে হয়েছিল! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচেন—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেছে, আজ তার পৌত্তর সেই পাথরের ওপর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না। রে বিশ্বাস! তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যার দাস হয়ে একজনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং পূর্ব্বে যার ঘোরনাদী বজ্রে, জলে, মাটী ও পাথরের ঈশ্বর বলে পূজা করে গেচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টাখানেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা শুনে, যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম! ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোছলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন। আজকাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অব্যর্থ নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি ও নিয়ম এড়াচ্চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যেরা সেটি অস্বীকার করেন—ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিতেই বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাধ করে 'ঘোড়ার ডিম' ও 'আকাশকুসুমের' দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং একদিন আমরা তাঁরে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকতে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বসতে বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময়ে বঙ্কবেহারীবাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারীবাবুর মাথায় একটি জরীর কাবুলি তাজ, গায়ে লাল গাজের একটি পিরাহান, "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবি হয়ে" পেড়ে শান্তিপুরের ধুতি ও ডুরে উড়ুনী মাত্র ব্যবহার করেছিলেন, আর হাতে একখানি লাল রঙের রুমাল ছিল—তাতে রিংসমেত গুটিকত চাবী ঝুলছিল।

বঙ্কবেহারীবাবুর ভূমিকা, মিষ্ঠ আলাপ, নমস্কার ও স্যেকহ্যাণ্ড চুকলে পর, তাঁর দাদা সন্ন্যাসীকে হিন্দীতে বুঝিয়ে বল্লেন যে, এই সকল ভদ্দর লোকেরা আপনার বুচরুকী ও ক্যারামত দেখতে এসেচেন; প্রার্থনা—অবকাশ মত দুই একটা জাহীর করেন, তাতে সন্ন্যাসীও কিছু কষ্টের পর রাজী হলেন। ক্রমে বুজরুকীর উপক্রমণিকা আরম্ভ হলো, বঙ্কবেহারীবাবু প্রোগ্র্যাম স্থির কল্লেন, কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে প্রথমে ঘটের উপর থেকে একটি জবাফুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। ঘটের উপর থেকে জবাফুল বর্ষাকালের কড়কট্যে ব্যাঙের মত থপাস্ করে লাফিয়ে উঠলো, সন্ন্যাসী তাঁর দুহাত তফাতে বসে রয়েচেন—এ দেখলে হঠাৎ বিস্মিত হতেই হয়। সুতরাং ঘরশুদ্ধ লোক খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন—সন্ন্যাসীর গম্ভীরতা ও দর্পভরা মুখখানি ততই অহঙ্কারে ফুলে উঠতে লাগলো। এমন সময়ে একজন চেলা এক বোতল মদ এনে উপস্থিত কল্লে—মদ দুধ হয়ে যাবে। পাছে ডবল বোতল বা অন্য কোন জিনিস বলে দর্শকদের সন্দেহ হয়, তার জন্য সন্ন্যাসী একখানি নতুন সরায় সেই বোতলের সমুদয় মদটুকু ঢেলে ফেল্লেন, ঘর মদের গন্ধে তর্‌র্ হয়ে গ্যালো—সকলেরই স্থির বিশ্বাস হলো, এ মদ বটে।

সন্ন্যাসী নতুন সরায় মদ ঢেলেই একটি হুঙ্কার ছাড়লেন, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা আঁতকে উঠলো, বুড়োদের বুক গুর গুর কত্তে লাগলো; একজন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'গুরু! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায়?" সন্ন্যাসী, "দুধ হো বেটা"! বলে তাতে এক কুশী জল ফেলবামাত্র সরার মদ দুধের মত সাদা হয়ে গেল—আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম। এইরকম নানা প্রকার বুজবুকী ও কাদ্দনী প্রকাশ হতে হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল; সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্কবাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো; আমরা রামরকমের একটা প্রণাম দিয়ে, একটি উল্লুক হয়ে বাড়ীতে এলেম। একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকামুটেটি যে রাৎকাণা, তা পূর্ব্বে বলে নাই; সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে আধক্রোশ পথ উজোন ঠেলে তাকে কাঠের দোকনে পৌঁছে রেখে, তবে বাড়ী যাই। দুঃখের বিষয়, আবার সে রাত্রে বেড়ালে আমাদের খাবারগুলি সব খেয়ে গিয়েছিল; দোকানগুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে। সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হতভোম্ব হয়ে, সে রাত্রি অতিবাহিত করি!

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি, "দশ দিন চোরের এক দিন সেধের"। ক্রমে অনেকেই বঙ্কবাবুর বাড়ীর সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কত্তে লাগলেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরি ধত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে, বঙ্কুবাবুর বাড়ীতে গেলেম।

পূর্ব্বদিনের মত জবাফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো, এমন সময়ে মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ক্লাসের একজন বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন। শেষে হুড়োমুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি ঘোড়ার বালুঞ্চি দিয়ে, তার নখের সঙ্গে লাগান ছিল।

সংসারের গতিই এই! একবার অনর্থের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বেরুলে, ক্রমে বহুলি হয়ে পড়ে। বালুঞ্চি বাঁধা জবাফুল ধরা পড়তেই, সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তোবড়া তুবড়ি খানা-তল্লাসি

কত্তে লাগলেন; একজন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোণ থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী একদিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দেন, সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না পেরে, ঘরের কোণেই (ফ্লোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখেছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটী চাপাতে পারেন নাই; পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিল—সুতরাং একজনের পায়ে ঠ্যাকাতেই অনুসন্ধানে বেরুলো; সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুধ করেছিলেন, সেদিন তারও জাঁক ভেঙে গেল, সেই মজলিসের একজন সব অ্যাসিষ্ঠান্ট সার্জ্জন বল্লেন যে, আমেরিকান (মার্কিণ আনীস) নামক মদে জল দেবা মাত্র সাদা দুধের মত হয়ে যায়। এই রকম ধরপাকড়ের পর বঙ্কবেহারীবাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করেন। আমরা রৈ রৈ শব্দে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম, হরিভদ্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি কেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেইদিন থেকে এই রকম বুজরুক সন্ন্যাসীদের উপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্ঠচর ব্যাপারের যেরকম প্রার্দুভাব ছিল এখন তার অংশে আধগুণও নাই। আমরা সহরে কদিন কটা উর্দ্ধবাহু, কটা অবধুত দেখতে পাই? ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চরীরও লাঘব হয়ে আসচে; ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না; সুতরাং উৎসাহদাতা-বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুসঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে। কিন্তু কল্‌কেতা সহরের এমনি প্রসবক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্ছেন যে, তাঁরা যাতে এই সকল বদমায়েসী চিরদিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নীচে ফেলে তার জন্যই শশব্যস্ত! একজনেরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল; একদিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা! তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ।" সেই রকম একদিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভা" বলেও ডাক্‌তে পারি—কল্‌কেতার কি বড় মানুষ, কি মধ্যবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্ঠান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচনকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

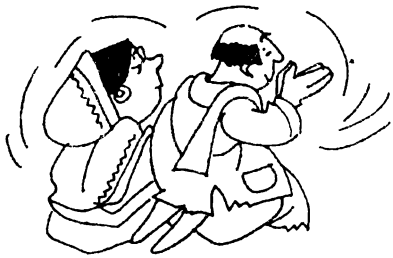

ডমরুধরের গল্প

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাহেবের সাজ

ডমরুধরের বাস কলিকাতার দক্ষিণ, যেস্থানে অনেক কাটি-গঙ্গা আছে। প্রথম অবস্থায় ইনি দরিদ্র ছিলেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে ধনবান হইয়াছেন। এলাকেশী ইঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ডমরুধর বৃদ্ধ, সুপুরুষ নহেন। তথাপি এলোকেশীর সর্বদাই সন্দেহ। গত বৎসর দুর্লভী বাগদিনী ডমরুধরকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে এলোকেশীও তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ডমরুধর সন্ন্যাসী বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি দুর্গোৎসব করেন। সুন্দরবনে ডমরুধরের আবাদ আছে। প্রজাদিগের নিকট হইতে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস প্রভৃতি আদায় করেন। প্রতিমাটি গড়া হয়, কিন্তু পূজার উপকরণ,—প্রায় সমস্তই কাটি-গঙ্গার জল। আজ পূজার পঞ্চমীর দিন, দালানে প্রতিমার পার্শ্বে বন্ধুগণের সহিত বসিয়া ডমরুধর গল্প-গাছা করিতেছেন।

লম্বোদর বলিলেন,—"এবার তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ, যে ভয়ানক রোগ হইয়াছিল, তাহাতে পূজার সময় তোমার গল্প যে আবার শুনিব, সে আশা আমরা করি নাই।"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! এবার আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। মা দুর্গার আমি বরপুত্র। সেবার সন্ন্যাসী-বিভ্রাট হইতে তিনি আমায় রক্ষা করিয়াছলেন। তাঁহার কৃপায় গত বৎসর বাঘের মুখ হইতে বাঁচিয়াছিলাম। এবার উৎকট রোগ হইতে তিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। সমুদয় দুর্ঘটনা নষ্টচন্দ্র দেখিয়া ঘটিয়াছিল।

আধকড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নষ্টচন্দ্র দেখিয়া কি হইয়াছিল"?

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সে কথা এতদিন আমি প্রকাশ করি নাই। কি হইয়াছিল তাহা শুন। এবার আমি নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলাম। নষ্টচন্দ্র দেখিলে চুরি করিতে হয়। মনে করিলাম যে, দুর্লভীর উঠানে যে শশা গাছের মাচা আছে তাহা হইতে শশা চুরি করিয়া আনি। বাহিরে যাহাই বলুক, কিন্তু দুর্লভীর মনটা আমার উপর আছে। শসা চুরি করতে গিয়া যদি ধরা পড়ি, এলোকেশী যদি কিছু বলেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, নষ্টচন্দ্র দেখিয়া চুরি না করিলে কলঙ্ক হয়।

চুপে চুপে আমি শশা চুরি করিতে যাইলাম। কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, দুর্লভী কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া ঠেঙা হতে করিয়া দাওয়াতে বসিয়া আছে। তাহার উগ্রমূর্তি দেখিয়া অগ্রসর হইতে আমি সাহস করিলাম না।

সে রাত্রি আমার চুরি করা হইল না। মনে করিলাম যে, আজ রাত্রিতে না হউক, তিনদিনের

মধ্যে চুরি করিলেই নষ্টচন্দ্রের দোষ কাটিয়া যাইবে। কোথায় কি চুরি করি রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুর্লভীর বাড়ীর পার্শ্বে গদাই ঘোষের পুষ্করিণী আছে। তাহাতে অনেক মাছ আছে। গদাই ঘোষ দুর্লভীর জিম্মায় পুষ্করিণীটি রাখিয়াছে। মনে করিলাম যে, কাল বৈকালবেলা ছিপ ফেলিয়া সেই পুষ্করিণী হইতে মাছ চুরি করিব।

সুন্দরবনে আমার আবাদের নিকট একবার জনকয়েক সাহেব শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি টুপি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। টুপিটি কুড়াইয়া আমি বাড়ী আনিয়াছিলাম। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই টুপিটি বগলে লইয়া ছিপ হাতে করিয়া আমি গদাই ঘোষের পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইলাম; যে ধার দিয়া লোক গতায়ত করে, তাহার বিপরীত দিকে এক কোণ বনে পূর্ণ ছিল। ঝোপের ভিতর গিয়া আমি সাহেবদের সেই কালো রঙের ধুনুচির মত লম্বা টুপিটি মাথায় দিলাম। আজকালের বাবুদের মত গায়ে আমি জামা পরি না। কোমরে কেবল ধুতি ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে যে, সাহেব মাছ ধরিতে আসিয়াছে। সাহেব দেখিলে কেহ কিছু বলিবে না।

নিকটের জল—নাল-ফুল ও কলমি শাকের গাছে পূর্ণ ছিল। কেবল এক স্থানে একটু ফাঁক ছিল। ময়দার টোপ গাঁথিয়া আমি সেই পরিষ্কার স্থানে ছিপ ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পর বোধ হইল যেন মাছে ঠোকরাইল। আমি টান মারিলাম। বঁড়শি জলের ভিতর নাল গাছে লাগিয়া গেল। অনেক টানাটানি করিলাম, অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না, তখন বুঝিলাম যে, জলে নামিয়া না খুলিলে আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু কাপড় ভিজিয়া যাইবে, জলে কি করিয়া নামি! চারদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কেহ কোথাও নাই। কাপড় খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া জলে নামিলাম। একবুক জল হইল। অতি কষ্টে নাল গাছের ডাঁটা হইতে বঁড়শি খুলিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় পরিতে যাই—সর্বনাশ! যে স্থানে কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলাম সে স্থানে কাপড় নাই। বনের ভিতর চারিদিকে অনেক খুঁজিলাম, কাপড় দেখিতে পাইলাম না।

তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই। সে উলঙ্গ অবস্থায় আমি বাটী ফিরিয়া যাইতে পারি না। কি করিব। চার করিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এ সেই কেষ্টা ছোঁড়ার কর্ম্ম, সে আমার টাকের বর্ণনা করিয়া আমাকে ক্ষেপায়। সে দূর হইতে আমাকে বলে—টাক-চাঁদ, টাক—বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর।

কেষ্টা ছোঁড়ার অগম্য স্থান নাই। যখন জলে নামিয়া, পিছন ফিরিয়া এক মনে আমি বঁড়শি খুলিতেছিলাম, সেই সময় সে আমার কাপড় লইয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে। সে দুর্লভীকে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল। কারণ, অল্পক্ষণ পরেই দুর্লভী ও হিরী বাগদিনী আসিয়া পুষ্করিণীর অপর পাড়ে দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া দুর্লভী বলিল,—"একটা সাহেব!"

হিরী বাগদিনী বলিল,—"সাহেবটার গায়ের রং কালো মিশমিশে। যাহারা পাখী মারিতে আসে; সেই সাহেব।"

দুর্লভী বলিল,—"তা নয়। ওটা নেঙটা গোরা।"

হিরী বলিল,—"সর্বনাশ! নেঙটা গোরা! তবে আমি পলাই; যাকে বলে ব্রান্ডি, তাই উহারা খায়।"

দুর্লভী বলিল,—"চল গদাই ঘোষকে বলি গিয়ে।"

আমি ভাবিলাম,—"ঘোর বিপদ হইল। সমস্ত গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া গদাই ঘোষ হয়

তো এখনি উপস্থিত হইবে। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথায় কেবল এক সাহেবি টুপি। এ অবস্থায় সকলে হয় তো আমাকে এলোকেশীর নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবে। সাহেবের পোষাক পরিয়া দুর্লভীর ঘরের নিকট আমি গিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে এলোকেশী আর রক্ষা রাখিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারিকেলের বোরা

ছিপগাছটা আমি ফেলিয়া দিলাম। প্রথম বনের ভিতর দিয়া, তাহার পর পুকুরপারের নীচে দিয়া দুর্লভীর পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হইলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে, তাহার ঘরে কেহ নাই। দ্বারটি কেবল ভেজানো আছে। চুপ করিয়া আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার। চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। একখানি কাপড় কি একখানি গামছা দেখিতে পাইলাম না। কি করি টুপি মাথায় দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে একটু অন্ধকার হইলে পলায়ন করিব। আর যদি দুর্লভী দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সাহেবের পোষাক দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইবে।

ওদিকে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। গদাই ঘোষ গ্রামের চৌকিদার ও অন্যান্য লোক লইয়া পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইল। মহা গোল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইলাম। ভয়ে সর্বশরীর আমার কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের সেই কোণে বনের ভিতর তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিল। ছিপ দেখিতে পাইল। কিন্তু সাহেবকে তাহারা দেখিতে পাইল না। হতাশ হইয়া সকলে বাড়ি ফিরিয়া গেল। তখন দুর্লভী আসিয়া আপনার দাওয়া বা পিঁড়িতে বসিল।

এমন সময় রসিকের মা আসিয়া বলিল, 'দুর্লভী! আমাকে শশা দিবি বলিয়াছিলি, কৈ দে।'

দুর্লভী বলিল,—'শশা তুলিয়া রাখিয়াছি। ঘরের বাম কোণে ডালায় আছে, গিয়া লও।'

আমি ঘরের বাম কোণে বসিয়াছিলাম। আমার ভয় হইল। কোণের দিকে আরও ঘেঁসিয়া বসিলাম। রসিকের মা ঘরের ভিতর আসিয়া কোণের কাছে অন্ধকারে হাতড়াইতে লাগিল। সহসা ঝনাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাম হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমার গায়ে তাহার হাত ঠেকিয়া গেল।

সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘরের ভিতর একটা ভূত বসিয়া আছে। সে আমার হাতে কামড় মারিয়াছে। আমার আঙ্গুলগুলো চিবাইতেছে। এখন আমার সর্বশরীর খাইয়া ফেলিবে।

পরে শুনিলাম, ঘরে যে দুর্লভী করাতে ইঁদুরকল পাতিয়া রাখিয়াছিল, রসিকের মায়ের হাত তাহাতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি হইয়াছে, কি হইয়াছে বলিয়া দুর্লভী দৌড়িয়া আসিল। দ্বারের নিকট তাহাকে ঠেলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন দুর্লভী আমাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভূত নহে, ভূত নহে, এ সেই নেঙটা গোরা; এতক্ষণে নেঙটা গোরা আমার ঘরের ভিতর বসিয়াছিল।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি আর বাটী পলাইতে অবসর পাইলাম না। কিছু আগে পথের বামদিকে বিন্দু ব্রাহ্মণীর ঘর। বিন্দু ব্রাহ্মণী তখন গোয়ালে বসিয়া ঘুঁটে ধরাইয়া ধোঁয়া করিতেছিল। তাহার সেই একখানি মেটে ঘরের দ্বার খোলা ছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ঘরের ভিতর মিটমিট করিয়া এক কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল। বিন্দু ব্রাহ্মণীর কেহ নাই। একলা সে সেই ঘরে বাস করে। তাহার অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল ও আতা গাছ আছে। তাহার ফল বেচিয়া সে দিনপাত করে।

আমি দেখিলাম যে, ঘরের এককোণে অনেকগুলি নারিকেল স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে পাঁচ বোরা বা গুণের থলি নারিকেল পূর্ণ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া বিন্দু সারি সারি উচ্চভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাহিরে গোল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, নেঙটা গোরা এইদিকে আসিয়াছে। এস, বিন্দুর ঘরের ভিতর দেখি। হয় তো এই ঘরের ভিতর সে বসিয়া আছে। আমি তখন মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম যে,—'মা! নষ্টচন্দ্র দেখিলে লোককে কি এত সাজা দিতে হয়? প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করি, এ বিপদ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

তোমাদিগকে আমি বার বার বলিয়াছি যে, আমার উপর মায়ের অপার কৃপা। মা তৎক্ষণাৎ আমার মনে বুদ্ধি দিলেন। নিকটে একটি খালি বোরা পড়িয়াছিল। সেই বোরার মুখে আমি আমার মাথা গলাইয়া দিলাম, তাহার পর টানিয়া আমার সর্ব শরীর পা পর্যন্ত তাহা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলাম। অবশেষে নারিকেলপূর্ণ থলির ন্যায় অপর পাঁচটি বোরোর পার্শ্বে আমিও বসিয়া রহিলাম। তিন চারজন গ্রামবাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিল যে, নেঙটা গোরা ঘরের ভিতর নাই। কেবল ছয়টি নারিকেলপূর্ণ থলি সারি সারি বসিয়া আছে।

ঘরের ভিতর নেঙটা গোরাকে দেখিতে না পাইয়া সকলের ভয় হইল। একজন বলিল, —'তাহাকে এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। তবে এখন কোথায় গেল? এ নেঙটা গোরা নহে; এই বর্ষাকালে জল-কাদায় নেঙটা গোরা কোথা হইতে আসিবে? তাহার পর নেঙটা গোরা এত মিশমিশে কালো হয় না। এ নেঙটা গোরা নহে, এ নেঙটা ভূত।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ বলাই চিন্তির বিবরণ

ভূতের কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। বিন্দু আপনার দাওয়াতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল যে, কি কপাল করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রিতে ভূতে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন সময় গরুর গাড়ী লইয়া বলাই চিন্তি বিন্দুর গৃহে উপস্থিত হইল। বলাই জাতিতে সদ্‌গোপ। আমাদের গ্রাম হইতে আধক্রোশ মাঠ পরে আমডাঙ্গায় তাহার বাস। বিন্দুর ফলপাকড় সে হাটে বিক্রয় করে।

বলাই বলিল—"মা ঠাকুরাণি! গাড়ী লইয়া আমি নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিলাম। বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছি। নারিকেল দিবে বলিয়াছিলে, কই দাও। আজ আমার বাড়িতে রাখিয়া দিব। কাল, ভোরে ভোরে হাটে লইয়া যাইব।"

বিন্দু বলিল,—"ঘরের ভিতর বোরো করিয়া আমি একশত নারিকেল রাখিয়াছি। আজ তাহা লইয়া যাও। বাকী পরে দিব।"

আমি সম্মুখেই বসিয়াছিলাম। আমার থলিটি সে প্রথম তুলিয়া লইল। পা দুইটি আমি থলির ভিতর গুটাইয়া লইলাম। 'সব ঝুনো' একবার বোঁটা দেখে, এই কথা বলিয়া সে আমাকে গাড়ীর সম্মুখভাগে বসাইয়া দিল। তাহার পর আর পাঁচটি নারকেলের থলি আনিয়া আমার পশ্চাতে উচ্চভাবেই বসাইয়া দিল।

নারিকেল লইয়া বলাই গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বাড়ি যাইতেছে, সেজন্য গরু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর বসিয়া থলির ভিতর যে স্থানে আমার চক্ষু দুইটি ছিল, সেই দুইটি স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমি অল্প ফাঁক করিয়া লইলাম। তাহার পর থলির ভিতর হইতে আমি আমার হাত দুইটি বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময়

আমার মাথা দিয়া বলাইয়ের পিঠে ঢু লাগিয়া গেল। বলাই আপনা-আপনি বলিল,—"সম্মুখের থলিটা নড়িতেছে। এখনি পড়িয়া যাইবে। ভাল করিয়া রাখি।"

এই কথা বলিয়া সে গাড়ী থামাইল ও বাম পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। সেই অবসরে আমিও দক্ষিণ পাশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলাই ভাবিল যে, থলিটা পড়িয়া গেল। গরুর সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া সে আমাকে তুলিতে আসিল। তাহার পর সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। নিশ্চয় সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে,—এতকাল নারিকেল বেচিতেছি, নারকেলপূর্ণ বোরার ভিতর হইতে কালো কালো দুইটা পা বাহির হইতে কখনও দেখি নাই। সেই কালো কাল্লো পা দুইটা দিয়া নারিকেলের বোরো যে ছুটিয়া পলায়, তাহাও কখনও দেখি নাই।

কিছুকাল সে সেই পা-ওয়ালা বোরার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর 'বাপ' এইরূপ শব্দ করিয়া মাঠের মাঝখানে গাড়ী ফেলিয়া অ-পথ দিয়া ক্ষেত্রের আলি দিয়া পুনরায় আমাদের গ্রামের দিকে দৌড়িল। কিন্তু সে যে আমার ভয়ে সোজা পথ দিয়া আসিতে সাহস করে নাই, তখন তাহা আমি জানিতাম না। পাছে সে আসিয়া আমাকে ধরে, সেজন্য শরীর হইতে বোরা খুলিবার নিমিত্ত আমি আর দাঁড়াইলাম না। গুণে আবদ্ধ শরীরেই যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সোজাপথে আমি গ্রাম অভিমুখে দৌড়িলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে নেকো পালের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুণের ঈষৎ ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, তাহার দোকান খোলা রহিয়াছে, দোকানে আলো জ্বলিতেছে। অনেকগুলি লোকের কথাবার্ত্তা আমার কানে প্রবেশ করিল। দেখিলাম যে, দোকানের সম্মুখে একখানি খালি পাল্কি রহিয়াছে। এমন সময় একজন মানুষের সহিত আমার ধাক্কা লাগিয়া গেল। সেও পড়িয়া গেল, আমিও পড়িয়া যাইলাম। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও উঠিয়া পাছে চীৎকার করে, সেজন্য পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বনে গিয়া আমি প্রবেশ করিলাম। বন দিয়া আরও কিছুদূর গিয়া মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘরের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হই। শরীর হইতে গুণটা খুলিয়া কোমরে জড়াইলাম। গুণ হইতে একটু সূতা বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলাম। এখনও আমার মাথায় সেই সাহেবী টুপি ছিল। তাহার পর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া চারদিক আমি দেখিতে লাগিলাম।

টুপিটি এখন আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম যে, নেকোর দোকানের সম্মুখে সে পাল্কি নাই। কিন্তু সে স্থানে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। তাহার সকলেই বলাই চিন্তির বিবরণ শুনিতেছে। বলাই বলিতেছে,—"বিন্দু ঠাকুরাণীর নারিকেলের বোরোর ভিতর ভূত ছিল। ভূত লইয়া আমি গাড়ীতে বোঝাই করিয়াছিলাম। মাঠের মাঝখানে সে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবার উপক্রম করিয়াছিল। অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।"

এমন সময় কেষ্টা ছোঁড়া সেই স্থানে আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ঠাকুরমা কোথায়? অনেকক্ষণ হইল তেল লইতে আমার ঠাকুরমা দোকানে আসিয়াছিলেন। আমার ঠাকুরমা কোথায়?"

কিছুদিন পূর্বে কেষ্টা আমার বাগানে বাতাবি লেবু চুরি করিয়াছিল। সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম। অনেক মিনতি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বলিয়া দিয়াছিলাম যে, পুনরায় যদি সে আমার কোন বস্তু চুরি করে, অথবা আমাকে ক্ষেপায়, তাহা হইলে তাহার নামে আমি নালিশ করিব। আজ আমার কাপড় লইয়া সে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে আমি নালিশ করি, সেই ভয়ে সে কাহারও নিকট আমার নাম করে নাই। "ঐ

পুকুরে কে মাছ ধরিতেছে" দুর্লভীকে কেবল এই কথা বলিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এখন কেষ্টার ঠাকুরমা কোথায় গেল? কেষ্টার বাপ ও প্রতিবেশীগণ লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্রমে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলিল যে, নেঙটা ভূত কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। গোল শুনিয়া মেনী গোয়ালা-ছুড়ী ঘর হইতে বাহির হইল। মেনীর বয়স দশ বৎসর। ছয় বৎসর বয়স্ক একটি ভাই ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহ নাই। কয় বৎসর হইল, তাহাদের বাপ ও মা মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাসী কলকাতার এক বাবুর বাড়িতে ছিল। মাসী ইহাদিগকে টাকা দিত। মাসীও এখন মরিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মেনী ও ভিলে

মেনীর ছয় বৎসর বয়স্ক ভাইয়ের নাম ভিলে। ভিলের হাত ধরিয়া মেনী ঘর হইতে বাহির হইল। পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আমি যে বনের ভিতর বসিয়াছিলাম, কেষ্টার ঠাকুরমাকে অনুসন্ধান করিতে পাছে লোকে সেই স্থানে আসে, সেই ভয়ে মেনীর ঘর খালি পাইয়া আমি তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। মনে করিলাম যে, গোলটা একটু মিটিলে মেনী ও তাহার ভাই নিদ্রিত হইলে আস্তে আস্তে আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব; গুণ পরিয়া বাহির হইলে লোকে আমাকে সন্দেহ করিবে।

ভিলের হাত ধরিয়া মেনী পথের ধারে দাঁড়াইল। সুগন্ধী গোয়ালিনী ও অন্যান্য লোক পথ দিয়া যাইতেছিল। মেনী জিজ্ঞাসা করিল,—"গন্ধী মাসি! কি হইয়াছে? চারিদিকে এত গোল কেন?"

সুগন্ধী উত্তর করিল,—"আর বাছা, বলিব কি, সর্বনাশ হইয়াছে! কোথা হইতে একটা নেঙটা গোরা ভূত আসিয়াছে। বলাই চিন্তিকে সে খাইতে গিয়াছিল। তাহাকে খাইতে না পারিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বলি যে, সে কেষ্টার ঠাকুরমাকে খাইবে না। সেটা গোরা ভূত, কেষ্টার ঠাকুরমাকে মেম করিবে, সেই জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

ভূতের নাম শুনিয়া মেনী তাড়াতাড়ি ভাইকে লইয়া ঘরে আসিল ও ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে শয়ন করিল! আমি ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম।

ভিলে বলিল,—"দিদি! রায়েদের বাড়ি হইতে ভাত আন না কেন? কাল কেবল একটা তাল খাইয়া আমরা ছিলাম। আমাকে সমস্ত দিয়াছিলে, তুমি কেবল একটুখানি খাইয়াছিলে। আজ আমরা কিছুই খাই নাই। রায়েদের বাড়ি হইতে কবে ভাত আনিবে?"

মেনী কেনারাম রায়ের শিশু-পুত্রকে লইত, তাঁহারা দুইবেলা দুইটি ভাত দিতেন। বাড়িতে আনিয়া সেই ভাত ভাই-ভগিনীতে ভাগ করিয়া খাইত। আজ দুদিন হইল রায়ের শিশুপুত্র এক সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল, মেনী তাহা দেখে নাই, সেজন্য মেনীকে তাঁহারা ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

মেনী উত্তর করিল,—"রায়েদের খোকা সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল। সেজন্য তাঁহারা আর আমাকে ভাত দিবেন না?"

ভিলে বলিল,—"তবে দিদি, আমাদের কি হবে? ভাত কোথা হইতে আসিবে? ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

মেনী উত্তর করিল,—"দেখ ভিলু! পাড়ার লোকের নিকট হইতে কাল তোমাকে দুইটি ভাত আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু চাউলের দাম বাড়িয়াছে, রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? আমাদের দশা কি হইবে, তাহাই এখন ভাবিতেছি!"

ভিলে বলিল,—"তবে দিদি কি হবে, ভাত না খাইয়া আর আমি থাকিতে পারি না। আজ

সমস্ত দিন কিছু খাই নাই, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।"

মেনী বলিল,—"আর বৎসর ভড়েদের বাড়ি তুমি দুর্গা ঠাকুর দেখিয়াছিলে। সেই দশ হাত আর কত রাঙতা? ভড়েরা তোমাকে মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু দিয়াছিল? পূজা হইয়া গেলে বোসেদের গঙ্গায় তাহারা ঠাকুর বিসর্জন করিয়াছিল, মা দুর্গা বোসেদের গঙ্গার ভিতর আছেন। কাল যদি তোমাকে দুইটি ভাত দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা দুইজনে বোসেদের গঙ্গায় যাইব। তোমাকে কোলে লইয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব; জলের ভিতর মা দুর্গা আছেন; তাঁহার কাছে আমরা যাইব। তিনি আমাদিগকে অনেক ভাত দিবেন, আমাদের সকল দুঃখ ঘুচাইবেন।"

ঘরের কোণে বসিয়া ভাই-ভগিনীর কথোপকথন আমি শুনিতেছিলাম। অল্পক্ষণ পরে দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি তখন কেবল নয়টা হইয়াছিল, আমার বাড়ির দ্বার বন্ধ হয় নাই। চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুণ ফেলিয়া কাপড় পরিলাম। তাহার পর এলোকেশীর মুখে শুনিলাম যে, কেষ্টার ঠাকুরমাকে লোকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের হীরক লাভ

মেনী গোয়াল-ছুঁড়ীর ঘর ঠিক আমার বাগানের পাশে। ঐ স্থানটিতে আমার বাগানের একটু খোঁচ হইয়া আছে। মেনী ও তাহার ভাই মরিয়া গেলে ঐ ভূমিটুকু আমি লইব। তাহা হইলে আমার বাগানের খোঁচটি ঘুচিয়া যাইবে। তাহারা সত্য সত্যই বোসেদের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পরদিন প্রাতঃকাল বেলা দশটার সময় আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। পথে দেখিলাম যে, কেষ্টাদের বাড়িতে হু হু করিয়া একখানা পাল্কী আসিয়া লাগিল, পাল্কীর ভিতর হইতে কেষ্টার ঠাকুরমা বুড়ী বাহির হইল; তাহার পর লাঠি ধরিয়া ঠুক ঠুক করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বুড়ী কোথায় গিয়াছিল ও কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি সে স্থানে যাইলাম। শুনিলাম যে, গোবর্ধনপুর হইতে একজনদের বৌ লইয়া একখানা পাল্কী নিশ্চিন্তপুরে গিয়াছিল। বৌ রাখিয়া খালি পাল্কি সন্ধ্যার পর ফিরিয়া যাইতেছিল। নেকোর দোকানে পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ তামাক খাইতেছিল। সেই সময় কেষ্টার ঠাকুরমা তেল লইতে দোকানে আসিতেছিল। বোরার ভিতর থাকিয়া যে নেঙটা ভূতটা বলাই চিন্তিকে খাইতে গিয়াছিল, সেই ভূতটা আসিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া যাইতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সে বাতাসে মিশিয়া গেল। কেষ্টার ঠাকুরমা উঠিয়া ঘোরতর ভয়বিহ্বল হইয়া, সম্মুখে একখানা পাল্কী ও তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর দ্বার বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বেহারাগণ তাহা জানিতে পারে নাই। বলাই চিন্তিব নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কী তুলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহারা গোবর্ধনপুর পৌঁছিল। সেই স্থানে গিয়া পাল্কীর ভিতর বুড়িকে দেখিতে পাইল। কিন্তু ভূতের ভয়ে সে রাত্রিতে বুড়িকে ফিরিয়া আনিতে পারিল না। কারণ, এ সামান্য ভূত নহে, এ নেঙটা গোরা ভূত! আজ প্রাতঃকালে বুড়ীকে বাড়ী ফিরিয়া আনিল। আমি ভাবিলাম যে, সামান্য একটা সাহেবের টুপি পরিয়াছিলাম, তাহাতে কি কাণ্ড না হইল। এ সব নষ্টচন্দ্রের খেলা!

গোয়ালা-ছুঁড়ী মেনীর বাড়ি গিয়া দেখিলাম যে, যাহারা শিশি-বোতল ক্রয় করে, সেইরূপ একটা লোক সে স্থানে বসিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা বোতল ও একটা শিশি আনিয়া

মেনী তাহাকে দেখাইতেছে। শিশির ভিতর ছোট একখণ্ড কাচের ন্যায় কি ছিল। ভিলে তাহা বাহির করিয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ক্ষুদ্র কাচটাতে পল কাটা আছে, আর সেই পল হইতে নানা বর্ণের আভা বাহির হইতেছে। আমি ভাবিলাম যে, এরূপ কাচ ইহাদের ঘরে কোথা হইতে আসিল, যে স্থান হইতে আসুক, এ সামান্য কাচ নহে। বোতল ও শিশির লোকটি মেনীকে চারিটি পয়সা দিল। ভিলের নিকট হইতে আমি কাচখণ্ড চাহিলাম। ভিলে দিতে সম্মত হইল না। দুই পয়সা দিয়া তাহা আমি কিনিতে চাহিলাম। তখন মেনী বলিল,—"দাও, দাদা, দাও। কাচটুকু লইয়া তুমি কি করিবে? ডমরুবাবু দুই পয়সা দিলে আমাদের ছয় পয়সা হইবে। ছয় পয়সার চাউল কিনলে দুইদিন তোমাকে পেট ভরিয়া ভাত দিতে পারিব।"

ভিলে বলিল,—"বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি কলাপাতা কাটিয়া আনি?"

মেনী বলিল,—"না ভাই, এখন নয়। রও, আগে নেকোর দোকান হইতে চাউল কিনিয়া আনি, ভাত রাঁধি, তখন কলাপাতা কাটিয়া আনিও।"

শিশি-বোতল লইয়া লোকটি চলিয়া গেল। কাচখণ্ড লইয়া আমিও বাটী আসিলাম! মনে করিলাম, কখনই এ সামান্য কাচ নহে। এবার কলকাতা গিয়া কোন জহুরীকে দেখাইব।

কিন্তু সেইদিন বৈকালবেলা আমি বিষম গোলযোগে পড়িলাম। কলিকাতা হইতে একটি লোক আসিয়াছিল। সে কেষ্টার বাপ, গ্রামের চৌকিদার, শিশি-বোতল ক্রেতা; মেনী, ভিলে ও অন্যান্য গ্রামবাসীকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার সেই লোকটা বলিল,—"আমি যোগেশবাবুর সরকার। আমার বাবুর বাড়ীতে এই বালিকার মাসী চাকরাণী ছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রী ঘোরতর পীড়িতা হইয়াছিলেন। ইহার মাসী তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিলেন। যোগশেবাবুর স্ত্রীর কানে দুইটী হীরার টপ ছিল। কিছুদিন পূর্বে একটি টপ হারাইয়া গিয়াছিল। ভালরূপ জোড়া মিলাইতে না পারিয়া অপর টপটী তাঁহার বাস্‌কয় তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ইহার মাসীকে তিনি সেই টপটী দিয়াছিলেন। তাহার সোণাটুকু ইহার মাসী বোধ হয় বেচিয়া ফেলিয়াছিল। কাচ মনে করিয়া হীরকখণ্ড শিশির ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মূল্য চারিশত টাকা। আপনি দুই পয়সায় তাহা ফাঁকি দিয়া লইয়াছেন। যে টপটী হারাইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহা মিলিয়াছে। সেজন্য জোড়া মিলাইবার নিমিত্ত এই বালিকা ও তাহার ভ্রাতাকে চারিশত টাকা দিয়া হীরকখণ্ড লইতে বাবু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হীরকখণ্ড আপনি আমাকে প্রদান করুন।"

পয়সা দিয়া কিনিয়াছি, কেন আমি দিব, এইরূপ বলিয়া প্রথমে আমি দিতে সম্মত হই নাই। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে, যোগেশবাবু আমাকে সহজে ছাড়িবেন না। চিরকাল মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছি। মামলা মোকদ্দমা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি বুঝিলাম যে, মোকদ্দমা হইলে হীরা আমি রাখিতে পারিব না, চাই কি আমার সাজা হইলেও হইতে পারে। ফলকথা, হীরা আমাকে ফিরিয়া দিতে হইল। যোগেশবাবু হীরার মূল্য চারিশত টাকা মেনী ও ভিলের নামে একস্থানে জমা রাখিয়াছেন। এক্ষণে প্রতি মাসে তিনি তাহাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেছেন।

হীরকও গেল, বাগানের খোঁচটীও ভাঙ্গিল না। মনে আমার ঘোরতর দুঃখ হইল। মা দুর্গাকে ভর্ৎসনা করিয়া আমি বলিতে লাগিলাম,—"মা! কেন আমার এরূপ হরিষে বিষাদ করিলে? চারি শত টাকা আমার হাতে দিয়া কেন আবার কাড়িয়া লইলে? এবার হইতে আর মা, তোমার আমি পূজা করিব না।"

পূজা করিব না শুনিয়া মা দুর্গার বোধ হয় রাগ হইল। আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত

পরদিন জ্বরাসুরকে প্রেরণ করিলেন। কম্প দিয়া আমার জ্বর আসিল। একদিন গেল, দুই দিন গেল, জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিন দিনে আমি বেচু ভূঞাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। বেচু জাতিতে কৈবর্ত। প্রথম সে চাষ করিত, এখন করিরাজ হইয়াছে। চারি পাঁচখানা গ্রামে বেচুর বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। আমার হাত দেখিয়া বেচু শ্লোক পড়িয়া বলিল,—

"কম্প দিয়া জ্বর আসে কম্প দেয় নাড়ী।
ধড় ফড় ক'রে রোগী যায় যম-বাড়ি।

ইহাকে বিষ-বড়ি দিতে হইবে।।"

এলোকেশী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—"সে কি! তিন দিনের জ্বরে বিষ-বড়ি?"

বেচু বলিল,—"এ সামান্য বিষ-বড়ি নয়। এ নূতন ঔষধ সম্প্রতি আমি নিজে মনগড়া করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে কোন দোষ নেই। ইহার গুণ অনেক। এই দেখ, আমি নিজে আস্ত দুইটা খাইয়া ফেলি।"

এই কথা বলিয়া বেচু নিজে দুইটা বড়ি গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর মধুর সহিত খলে মাড়িয়া আমাকে ক'টা বড়ি খাইতে দিল।

বেচু চলিয়া গেল। তিন ঘণ্টা পরে তাহার ঔষধের গুণ প্রকাশিত হইল। আমার চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রাণ যায় আর কি! এলোকেশীর মেজাজটা কড়া বটে, কিন্তু শরীরে অনেক গুণ আছে। মাটিতে পড়িয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ডমরুধরের বন্ধু আধকড়ি বলিলেন,—"হাঁ, সেই সময় তোমার বাড়িতে আসিয়াছিলাম। তোমার সেই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বেচু ভূঞাকে ডাকিতে যাইলাম। বেচু ঘরে ছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে, সে এক পানা-পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটি জবাফুলের ন্যায় হইয়াছে। পানা-পুকুরের পচা পাঁক তুলিয়া মাথায় দিতেছে। আমি বলিলাম,—'বেচু করিয়াছ কি? ডমরুধরকে তুমি কি ঔষধ দিয়াছ? তোমার ঔষধ খাইয়া ডমরুধর মারা পড়িতে বসিয়াছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু উত্তর করিল,—'বড়ি খাইয়া আমিই বা কোন ভাল আছি।' আমি বুঝিলাম যে, সে অবস্থায় তাহাকে আর কোন কথা বলা বৃথা। পুনরায় তোমার বাটীতে আসিয়া মাথায় অনেক জল দিয়া সে যাত্রা তোমার প্রাণ আমরা রক্ষা করিলাম।"

ডমরুধর বলিলেন,—বেচুর ঔষধ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু জ্বর আমার গেল না। পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তোমরা সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতে। তোমরা সকলেই মনে করিয়াছিলে যে, সে যাত্রা আমি আর রক্ষা পাইব না। একদিন রাঘব ও নকুল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিছানার দুইপার্শ্বে বসিয়া আমাকে অনেক আশ্বাস ও ভরসা দিতে লাগিলেন।

রাঘব বলিলেন,—"দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অঙ্গদ মজুমদারকে আপনি জানিতেন? তাহার শরীরটি ঠিক ডমরুধরের মত ছিল। এইরূপ কাটি কাটি হাত, এইরূপ কাটি কাটি পা, শরীরে চর্বি একটুও ছিল না। তাহার পীড়াটিও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। চিতার উপর তাহাকে শোয়াইয়া যখন আমরা আগুন দিলাম, তখন সেই আগুনের তাতে তাহার শরীরটি শট্‌কে উঠিল। ধনুকের মত হইয়া তাহার মাজাটা চিতার উপর উঠিয়া পড়িল। কাঠ সব পুড়িয়া গেল। কিন্তু অঙ্গ পুড়িল না।

তাহাকে আমরা জলে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু আমরা স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে, পাঁচ

ছয়টা কুকুর ও শৃগাল আসিয়া জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ডমরুবাবু, তোমার শরীরটিও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু তোমার ভয় নাই। আমরা অধিক কাঠ দিয়া দেখিব। তবে নিতান্তই যদি তুমি পুড়িয়া না যাও, তাহা হইলে কাজেই তোমাকে আধপোড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।"

নকুল ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিলেন,—"তোমার পুরোহিতের বাড়ি এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ। মন্ত্র পড়াইতে রাত্রিতে যদি আমাকে ঘাটে যাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ আমাকে দিয়া করাইতে হইবে। নিজের পুরোহিতকে দিয়া করাইতে পারিব না। তুমি সে কথা বাড়িতে বলিয়া রাখ। মৃত্যু হইয়া গেলে আর কথা বলিতে পারিবে না,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।।

এলোকেশী পাশের ঘরে বসিয়া এইসব কথা শুনিতেছিলেন। সহসা খেঙরা হস্তে উগ্রচণ্ডার ন্যায় রণমূর্তিতে আসিয়া সপ্ করিয়া এক ঘা নকুলের পিঠে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর আর এক ঘা রাঘবের মাথায়। ঘর হইতে দুইজনে পলাইলেন। এলোকেশী তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া আরও দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ডমরুধরের বুকে প্যাঁক

ঈষৎ হাস্য করিয়া আমি বলিলাম,—"এলোকেশী! তুমি এখন যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্ধেক রোগ ভাল হইয়া গেল। আর আমাকে কোনরূপ ঔষধ খাইতে হইবে না।" এলোকেশী সে কথা শুনিলেন না। পরদিন গোবর্ধনপুরে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন, জিহ্বা দেখিলেন, পেট টিপিয়া দেখিলেন। বুকের উপর বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির ডগা দিয়া অনেক ঠোকঠুকি করিলেন। তাহার পর আমার বুকে চোঙ বসাইলেন। চোঙের অন্যদিকে কান দিয়া তিনি বলিলেন,—"এখানে একটা প্যাঁচ আছে।" এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা তিনি বলিলেন। প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার বুকে যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে, তখন আমি মরিব না, বহুকাল আমি বাঁচিব।

ডাক্তার তাহার পর পুলটিস ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খাইবার নিমিত্ত আমাকে সাবু দিতে বলিলেন। সাবুর নাম শুনিয়া আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,—"কি! সাবুদানা? বিলাতী জিনিষ। তাহা আমি কখনই খাইব না। চিরকাল আমি পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। অখাদ্য খাইয়া আমি অধর্ম করিতে পারিব না। ডাক্তারবাবু! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর যমের বাড়ি গিয়াছিল! যখন আমার বিচার হয়, তখন আমি যমকে বলিয়াছিলাম যে, একাদশীর দিন কখন আমি পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই। যম সেই কথা শুনিয়া প্রসন্নবদনে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে পুলকিত মনে বলিলেন,—সাধু সাধু সাধু! এই মহাত্মা একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করেন না। ইঁহার পদার্পণে আজ আমার যমপুরী পবিত্র হইল। শীঘ্র তোমরা যমনীকে শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাগণকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী-কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত, কোকিল-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত, অপ্সরা-পদ-নূপুর-ছঞ্জনিত, হীরা-মাণিক্য-খচিত, নূতন এক স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।' শুনিলেন

ডাক্তারবাবু! খাদ্যখাদ্যের বিচার করিলে কত ফল হয়? আমি আশ্চর্য্য হই যে, টিকিনাড়ারা এখানে-ওখানে যায় কেন, ধর্মকথা শিখিতে আমার কাছে আসে না কেন?"

আমি পুনরায় বলিলাম,—"ডাক্তারবাবু! বুকে আমি তোমার ও জগদ্দল পাথর মস্‌নের পুলটিস চাপাইব না, তোমার ঔষধও আমি খাইব না। কেবল আমি মা দুর্গাকে ডাকিব, আর আমাদের কাটিগঙ্গার জল খাইব। আমাদের কাটিগঙ্গার জল মকরধ্বজের বাবা।"

আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেইদিন হইতে আমি কেবল কাটিগঙ্গার জল খাইতে লাগিলাম! সেই রাত্রিতে মা দুর্গা শিয়রে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, —"ডমরুধর! বাছা! তুমি আমার বরপুত্র। কেন তুমি বলিয়াছিলে যে, আর আমার পূজা করিবে না। সেই জন্য তোমাকে এই রোগ দিয়াছি। কিন্তু ভয় নাই, তোমাকে আমি রোগ হইতে মুক্ত করিলাম। তাহার পর আরও একটু নূতন বুদ্ধি তোমাকে আমি দিলাম। এই বুদ্ধিটুকু তুমি খেলাইবে। তাহা হইলে হীরাখণ্ড হাতছাড়া হইয়া তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার দশগুণ তোমার লাভ হইবে। কিন্তু বাছা, তোমার পূজায় আমি যে তৃপ্তিলাভ করি, বঙ্গদেশে কাহারও পূজায় সেরূপ তৃপ্তিলাভ করি না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ ডমরুধরের নূতন বুদ্ধি

সেই দিন হইতে আমার রোগ দূর হইয়া গেল। জ্বর গেল। দিন দিন শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। রোগের পর আমার যেন নূতন শরীর হইল। এখন মা যে নূতন বুদ্ধিটুকু আমাকে দিয়াছেন, তাহা খেলাইয়া হীরকের দশগুণ টাকা আদায় করিতে আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একদিন বসিয়া বুদ্ধি খেলাইতেছি এমন সময় আমার মনে কোন বিষয় উদয় হইল। আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম। এলোকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাসিতেছ কেন?" আমি বলিলাম, —"চুপ কর। বুদ্ধি পাকিয়া আসিতেছে।"

খুলনা জেলায় বাঘেরহাটের নিকট নীলামে আমি এক মহল কিনিয়াছিলাম। তাহা লইয়া আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ত্রিশঙ্কুবাবুর সহিত মোকদ্দমা চলিতেছিল। অন্য বিষয়ে আমি টাকা খরচ করি না বটে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য টাকা খরচ করিতে কখনও কাতর হই না। এক একটা দলিল জাল করাইতে আমি পাঁচশত টাকা ব্যয় করি। এক এক জন মিথ্যা সাক্ষীকে আমি পাঁচ হইতে দশ টাকা দিয়া বশ করি। মিথ্যা মোকদ্দমা আমি যেন সাজাইতে পারি, মিথ্যা সাক্ষীদিগকে আমি যেমন শিখাইতে পারি, এমন আর কেহ পারে না। আদালতে হলফ করিয়া আমি নিজে যখন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি, তখন কোন উকীল জেরা করিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। ত্রিশঙ্কুবাবু আমার সহিত পারিবেন কেন? দুটা আদালতে তিনি হারিয়া গিয়াছেন?

মহলের একস্থানে বনের ভিতর প্রাচীন ইঁটে গাঁথা একটি প্রাচীর ও শানের চাতাল ছিল। সেই চাতালের কথা আমার মনে পড়িল। আমি কলকাতায় যাইলাম। কোন লোককে টাকা দিয়া একখানি তামার পাতে সে কালের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি কথা খোদিত করাইলাম। তাহা লইয়া ঘিটটু ধাঙ্গড়ের সহিত আমি বাগেরহাট মহলে গমন করিলাম। ঘিটটুকে সেই চাতালের উপর সপরিবারে বাস করিতে বলিলাম। গাছের ডালপালা দিয়া তাহার উপর সে এক ঝুপড়ি প্রস্তুত করিল। ত্রিশঙ্কুবাবু বন্দুক লইয়া একটি কুকুরের সহিত প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই পথ দিয়া গমন করেন। আমি টোপ ফেলিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবু এখন কি করেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি খুলনায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিশঙ্কুবাবু মহলের নিকট সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, ঘিটটু ধাঙ্গড়ের বৃদ্ধ মাতা ছোট একখানি তামার পাত মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ত্রিশঙ্কুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর হাতে ওটা কি?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"জানি না বাবু কি! উনুন করিবার নিমিত্ত চাতালের শান খুঁড়িতে এইটা আমি পাইয়াছি।"

ত্রিশঙ্কুবাবুর হাতে করিয়া দেখিলেন। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় তাহাতে যে কথাগুলি লেখা ছিল তাহার একটু দেখিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। এক টাকা দিয়া তামার পাতটী বৃদ্ধার নিকট হইতে তিনি কিনিয়া লইলেন। তাহার পরদিন খুলনার বাসায় তিনি আমার নিকটক আসিয়া বলিলেন,—"ডমরুধরবাবু সামান্য ঐ মহলটা লইয়া মিছামিছি আর মোকদ্দমা কেন? আপনারও টাকা খরচ হইতেছে, আমারও টাকা খরচ হইতেছে। দুইশত টাকায় আপনি মহলটী কিনিয়াছেন, পাঁচশত টাকায় মহলটী আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

আমি উত্তর করিলাম,—"মহলটীর জন্য আমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি উহা ছাড়িব না।"

ত্রিশঙ্কুবাবু মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার, চারি হাজার পর্য্যন্ত উঠিলেন তথাপি আমি সম্মত হইলাম না। চারি হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়া তিনি বলিলেন, —"আর আমি পারি না। আর আমার ক্ষমতা নাই।"

অবশেষে সাড়ে চারি হাজার টাকায় তাঁহাকে মহলটী বিক্রয় করিলাম। ধাঙ্গড়দিগকে লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পরে শুনিলাম যে, ত্রিশঙ্কুবাবু প্রায় বিশ হাত গভীর করিয়া সেই চাতাল ও নিকটবর্ত্তী স্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছিল। মাটীর ভিতর হইতে একটী পয়সাও বাহির হয় নাই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি পাইবেন তিনি আশা করিয়াছিলেন?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—"পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় সেই তাম্রফলকে লেখা ছিল—

বিসমিল্লা! আমি মহম্মদ তাহির প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক্ষণে পীর খাঞ্জে আলি সাহেব হইয়া মুসলমান হইয়াছি। আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের বংশধরগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এই চাতালের দশহাত নিম্নে আমি এক লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা পুঁতিয়া রাখিলাম। এই অর্থ জিন্দাগাজী সাহেবের আশ্রয়ে রাখিলাম। যখন আমার ব্রাহ্মণ বংশধরগণ নিতান্ত দরিদ্র হইবে, তখন তিনি এই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। ইতি ১৫ই জিলহিজ্জা ৮৬২ হিজরি।"

ঐ তাম্রপত্র আমি লেখাইয়া আনিয়াছিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবুকে দেখাইবার নিমিত্ত আমি ধাঙ্গড় বুড়িকে দিয়াছিলাম। মায়ের কৃপায় বুদ্ধি খেলাইয়া হীরার দশগুণ মূল্য আমি লাভ করিলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—"ভাদ্র মাসে ভূত ভূত বলিয়া গ্রামে একটা গোল উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তুমি যে তাঁর গোঁসাই, তাহা জানিতাম না।"

সকলে বলিল,—"ধন্য ডমরুধর, ধন্য তুমি।"

ডমরুধর বলিলেন,—"তাই তোমাদের সকলকেই আমি বলি, মা দুর্গাকে তোমরা ভক্তি কর। মা দুর্গা তোমাদিগকে ধন দিবেন, মান দিবেন, সব দিবেন। আর হাওয়াখোর বাবুদের আমি বলি যে, মায়ের পূজা ছাড়িয়া বিদেশে তোমরা হাওয়া খাইতে যাইও না। ঘরে থাকিয়া ভক্তিভাবে মায়ের পূজা কর। যত হাওয়া চাও, মা তোমাদিগকে দিবেন। ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া হাওয়া খাইতে পারিবে।"

বিলি ব্যবস্থা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন আষাঢ় মাসে রথ যাত্রার পরেই,—এখন ত আর সে সাবেক শিবদুর্গা নাই, এখন সকলেই সভ্য ভব্য হ'য়েছেন—চুলোর মুখে, সন্ধ্যাবেলা সপরিবারে বসিয়া খোশগল্প হইতেছে। চুলোর মুখে বসা, সভ্যতার একটা বাঁধা ব্যবস্থা, বিলেতে সবাই বসে। শিব, বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতেছেন, মধ্যে মধ্যে বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন, ক্ষণে বা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। দুর্গা শিবের একপাটি ছেঁড়া মোজার মুড়ি সেলাই করিতেন। "গুরুমা" হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া কাশ্মীরি খেমটা তালে তালে 'মনে করো শেষে রো সে দিনো ভয়ঙ্কর" ধরিয়াছেন। গণেশ একপাশে জয়ার গালের কাছে শুঁড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুস ফুস করিয়া কি বল্‌তেছেন, আর জয়া মুখে রুমাল দিয়ে হাস্‌চে। কার্ত্তিক যেন বিজয়ার সঙ্গে একটু বেলেল্লাগিরি করিতেছেন বলিয়াই বোধ হয়। ফলে মজলিশ পুরা। সভ্য, নির্দ্দোষ, গার্হস্থ্য আমোদ যেমন হইতে পারে, তাহাই হইতেছে।

এমন সময়ে দুর্গা হঠাৎ মুখ তুলে ডাকলেন—"নন্দী?"

দরজার বাহিরেই পর্দ্দার ঠিক ওপিঠেই বসিয়া নন্দী কি একটা সেলাই করিতেছিল। তলবমাত্রে প্রবেশ করিয়া মাথাটি নোয়াইয়া যোড় হাতে বলিল—"হুজুর।"

দুর্গা একটু হিন্দী করিয়া—কেন না, খানসামাদের কাছে বাঙ্গালা কথাটা সভ্যতার রীতি বিরুদ্ধ—নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেঁ রে, এই সময় আমরা একবার বাঙ্গালায় যেতাম না?"

হিন্দী আমাদের আসে না, বাঙ্গালাতেই বলিয়া যাই।

"খোদাবন্দ! সেত সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, এখন নয়।" দুর্গা বলিলেন—"বহুৎ আচ্ছা।" নন্দী সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার বাহিরে গিয়া সূচ সূতা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিল।

শিব একটু হাসিয়া বলিলেন—"সে যে পূজার ছুটিতে।"

দুর্গা। তাই বটে, সময়টা আমার ঠিক মনে আসছিল না। বর্ষার কাছাকাছি, তাই মনে হচ্ছিল।

গুরুমা। পৌত্তলিক কাণ্ডে প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয়। এবার কোন মতেই যাওয়া হোতে পারে না।

দুর্গা। আমি প্রায় যাচ্ছি!

গণেশ। আমার ত যাবার ইচ্ছা থাকলেও ফুর্‌সৎ নেই। সেই সময়েই আমাদের সোশ্যাল কনফারেন্স বোসবে।

কার্ত্তিক। আমি ত টেক্যে রেখেচি, কুকেরা অর্থদক্ষ হিন্দু টুরিষ্ট পার্টি অর্গেনাইজ কোচ্চে, আমি এবার ছুটিতে বিলেত বেড়িয়ে আস্‌ব।

শিব, ভাল কথা, তোমাদের কনফারেন্সে সহবাসের বয়স কি কোচ্চো বলো দেখি?

গণেশ। আমি ত বোধ করি যে, নিদেন এক ছেলের মা না হ'লে সহবাসে সম্মতি দিতে পার্ব্বো না, এই নিয়ম হওয়া উচিত। বারো চোদ্দ কি ষোল বছরেও আমি নিরাপদ মনে করি না। তবে কি না ভোটের কাজ, ভোট যা হবে, তাইত হবে।

শিব। তুমিই ত গণপতি হে। তোমার দলেই যারা মানুষের মতন, তারা সকলেই আছে?

গুরুমা। লেডীদের সামনে, নয় ও কথাটা এখন নাই হলো।

ঝাঁ করিয়া অমনিই গল্পটা ফিরিয়া গেল। আবার পূজার কথা; পূজার কথা হইতে পথের কথা, যাতায়াতের অসুবিধার কথা, আলোচালের নৈবেদ্যের কথা,—নানান কথা আরম্ভ হয়ে গেল। স্থির হইল যে, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, যাওয়া হইতেই পারে না। কার্ত্তিকমাসে যাওয়াই স্থির।

শিব যে এখন সওদাগর হইয়াছেন, সে কথাটা পূর্ব্বে বলা হয় নাই। বড় গোছের একটা ডিস্‌পেন্সারি করিয়াই শিবের কিছু সংস্থান হইয়াছে, ব্যবসাবুদ্ধিটাও খুব পাকিয়া উঠিয়াছে। শিব প্রস্তাব করিলেন যে, বুড়া ষাঁড়ে ত কোন কাজ হয় না, ওটাকে কসাইদের কাছে বেচিলে হয় না? দুর্গার তাহাতে আপত্তি নাই, তিনি এখন পাকা গৃহিণী। সিংহটা এখন কোথায় বিক্রী হয় কি না তাই ভাবিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাদের ঘরে ঘরেই একটা 'জু' হইতে পারে—এত জানোয়ার আমাদের কাছে।

কথোপকথন এইরূপ হইতেছে, ষাঁড়টা, কুঠির হাতাতেই চরিয়া বেড়াইতেছিল, পরামর্শটা শুনিতে পাইল। তবু শিবের ষাঁড়, বুদ্ধিশুদ্ধি এক রকম আছে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটাইয়া পরদিন প্রাতঃকালেই মিউনিসিপাল অফিসে গিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গেই ময়লার গাড়ীতে অনরারী বাহাল্ হইয়া গেল। ষাঁড় ঠিক ঠাওরাইয়াছিল যে, এক ত অনরারী পদটা ভাল, তা যাই কেন হউক না। তাহার উপর নির্ব্বাচনী প্রণালী যখন প্রচলিত আছে, কালে মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান হইয়া অনরারী রাজাগিরির ভরসা পর্যন্ত থাকিতে পারে। শিবের পাল্লায় থেকে শেষে কসাইয়ের হাতে প্রাণটা কেন যায়?

ষাঁড়তো সটান সটকান দিল। সিংহও বুঝিল বেগতিক, সেও প্রস্থান করিল। কোথায় যাই ভাবিতে ভাবিতে মহিষাসুরের কাছে গিয়া উপস্থিত।

সিংহকে দেখিয়াই ত মহিষাসুরের চক্ষুস্থির। ভাবিল—"বেটা এবার এত সকাল সকাল ধোর্ত্তে এল কেন?"

মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া মহিষাসুর সিংহকে সমাদর পূর্ব্বক বসিতে দিল। এ কথা সে কথা পাঁচ কথার পর মহিষ বলিল—"দেখুন সিংহ মশাই অনেকদিন থেকে একটা কথা আপনাকে বোল্‌বো বোল্‌বো মনে করি, তা বলবার সুযোগটা হৈয়েই ওঠে না।"

সিংহ অমনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"হান্‌কি! বলই না!"

মহিষ। বলি, তাই বোলচি যে আপনার ত দেখা পাবার যো নাই। যা দেখা পুজোর কটা দিন।

সিংহ। তা বৈ কি? ফুরসুৎ ত নেই।

মহিষ। আপনারা বড় লোক, বড়লোকেদের কাছে থাকা। আপনাদের কি ফুরসুৎ হয়? তা সে পূজোর কদিনও না-দেখারই মধ্যে। আমায় কামড়ে আপনারও সে কদিন মুখ জোড়া থাকে, আর আমার ত কথাই নেই।

সিংহ। তা বটে হে! তোমার ত অসুখ বটেই, আমারও ত সুখ নেই।

মহিষ। আমরা আবার মানুষ, আমাদের আবার অসুখ। অসুখ যা তা আপনারই। দেখুন কত নৈবিদ্দি, ভোগ-রাগ, লুচি, সন্দেশ, পাঁটা, মোষ—তা আপনার ত কিছু করবার যো নেই। সেই আমার হাতে কামড় মেরেই মুখ জুড়ে বসে থাক্‌তে হয়, গিলতেও পান না, ওগ্‌লাতেও পান না। সত্যি বলছি সিংহমশাই আপনার জন্যে আমার কান্না পায়।

সিংহ। হ্যাঁ হে, তুমি ত বড় ভাল লোক দেখচি। এমন তরো লোক তুমি জানলে যে তোমার একটা—তা আমায় দিয়ে তোমার কি উপকার হোতে পারে বল দেখি?

মহিষ। দেখুন আমি আপনি মনে কল্লে কি না হোতে পারে? আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত।

সিংহ। বলই না, কি কত্তে হবে? তাই করা যাবে এখন।

মহিষ। তা কি কর্ব্বেন?

সিংহ। কর্ব্বো না কেন? বলো।

মহিষ। বোল্‌চি কি, আপনি আমায় ছেড়ে পারেন।

সিংহ। তা কেমন করে হোতে পারে?

মহিষ। আজ্ঞে আমিও ত তাই বোলছিলাম, তা কেমন কোরে হবে? তা হবে না কেন, হয়; আপনি মনে কোল্লোই হয়।

সিংহ। মনের কথাটাই ছাই ভেঙে বলো না?

মহিষ। বোল্‌ছিলাম কি, বলি, ওদের কাকেও না যেতে দিয়ে আপনি আর আমি পুজোর বাড়ীতে যাই, সে কেমন হয়?

সিংহ। তাঁরা তা শুন্‌বেন কেন?

মহিষ। তাঁদের শোনাশুনির ভার আমার। আপনি রাজি হলেই হলো।

সিংহ দেখিল শাপে বর। পরামর্শটা সর্বাংশে ভাল। আরও একটু সুবিধার চেষ্টায় বলিল, —"ভাল আমি যদি রাজি হই, পুজোর ব্যাপারটা কি রকম হবে?"

মহিষ। পুজো যা হবে, তা আপনারই; আমি বোসে বোসে আপনার লেজে তেল দিতে থাক্‌ব তখন। ভোগ রাগ নৈবিদ্দি যা হয়, সবই আপনার, প্রসাদটা আস্‌টা দেন ভালই, না দেন, নেই। পুজোর কদিন কামড় খোস্‌বে, সেই যে আমার পরম লাভ। তার আবার অমনতরো কোরে আপনার কাছে ঘেঁসে বোস্‌তে পাবো, আমার মান বৃদ্ধি হবে কত?

সিংহ। ভাল, দুর্গাকে যেন মানালে। লক্ষ্মী সরস্বতী, তারা অন্য জায়গা হোতে আসে, তারা ছাড়বে কেন?

মহিষ। আপনি মাত্রে রাজি থাকুন, ছাড়বে সবাই। আমার আসুরী বুদ্ধিখানাই দেখুন না। আপনি যেখানে সহায়, সেখানে আমি লাগ্‌লে লক্ষ্মীকেও ছাড়াবো, সরস্বতীকেও তাড়াবো। সব ভার আমায় দিন, আপনি কেবল যথাকালে অনুগ্রহ কোরে লেজটি দিবেন, আর কিছুই ভাবতে হবে না।

সিংহ বলিল—"তথাস্তু।" সন্ধি হইয়া গেল। সিংহের পোয়াবারো। ষোল আনাই লাভ। লেজে তেল দিতে পারিয়াই অসুর পরিতুষ্ট।

দ্বন্দ্বে মাতনম্

অমৃতলাল বসু

স্বস্তি-বাচন

(ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে উপাসক উপাসিকাগণ)

গীত।

নারীগণ।

তেত্রিশ কোটীর ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেশ্বরী।
নারদ ঋষির মানস-কন্যা দম্ভে লম্বোদরী।।
আত্ম-বন্ধু প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,
তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা করে দলাদলি,
মদ না খেয়ে পদের তরে ঢলাঢলি ঘরাঘরি।

পুরুষগণ।

আমরা দলের পাণ্ডা, মেজাজ ঠাণ্ডা ক'র্‌তে
ডান্ডা ধরি।
কোথা-ও পাঠাই দৈত্য দানা।
কোথা-ও পাঠাই পরী।।

নারীগণ।

ভোটেতে যে একটি দিন ছোটোর বাড়ে গর্ব্ব।
মুটের দোরে রাজা লুটে বলে আমি খর্ব্ব,
বিলাত থেকে খেলাৎ ব'লে পর্ব্ব এল শুভঙ্করী।

পুরুষগণ।

ভোটে ইষ্ট, নেতা তুষ্ট, দল পুষ্ঠ কষ্টে কাতরং।
দ্বন্দ্ব গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতরং'।।

সকলে।

বরদে এ বিরোধে পরিয়েছ মা সাদা গরদ,
দ্বেষাদ্বেষীর নাম দে'ছ গো দেশের দরদ,
পূজে তোমার পদ, ক'রে গুরুবধ,
নাম কিনেছি মস্ত মরদ্।
অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান,

গেছে হিন্দু-পরিচয়;—
অজাত বলিয়া বিখ্যাত জগতে
শুধু কুড়াইয়া ভোট হ'ব সব লোট্
কোট বজায়ে বর ভিক্ষা করি;—
সুহৃদ-মর্দ্দিনী বিরোধ-বর্দ্ধিনী,
ব্রিটিশ তোষিণী দেবী ভয়ঙ্করী

বোধন

কলিকাতা। একটি বস্তী-পল্লী

[নিতা প্রত্যক্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই দৃশ্যে নাটোক্ত ব্যক্তি ব্যতিত অপর পাত্র-পাত্রীর পয়সা-গমন ও আঙ্গিক-ক্রিয়াদি দ্বারা যথার্থ সম্পাদনের চেষ্টা করা উচিত]

(গোব্‌রার মা ঘুঁটে গুনিয়া গুনিয়া ঝুড়িতে ভরিতেছে।)

গোব্-মা। নাচ গণ্ডা—নাচ গণ্ডা—ছ'গণ্ডা, ছ'গণ্ডা—ছ'গণ্ডা—সাত গণ্ডা;—সাত গণ্ডা—আট গণ্ডা;—আট গণ্ডা—

(চমনিয়ার প্রবেশ)

চমনিয়া। এ গোবর কি মাতারি—এ গোবর-কি-মাতারি—

গোব্-মা। এই ল'গণ্ডা;—ল'গণ্ডা ল'গণ্ডা—

চমনিয়া। আরে শুস্তি নেহি গোবর্‌কা মাতারি, টুঁড়াৎ টুঁড়াৎ—

গোব্-মা। আরে মর আঁটকুড়ী ভুলিয়ে দিলে, আট না ল'গণ্ডা—কি ছাই গুনুন।

চমনিয়া। আরে কয়ঠো বাবুনে তুহার দর্‌ওয়াজা'পর খাড়া হোকে তুকে বোনাতে।

গোব্-মা। তোর সাতানির সাতপুরুষকে বন কেটে বাস এ পাড়ায়, কেউ কখন-ও কোনো কুচ্ছু কথা বল'তে পারে না; আমায় বাবুতে বোলাচ্ছে!

চমনিয়া। আরে চিড়্‌তে হো কাহে মায়ী? গালি জিন্ দেও; ভালা ভালা বাবু হাওয়া গাড়ী সে উতারকে খাড়ে হ্যায়

(গোব্‌রার মা উঠিয়া কোমর বাঁধিয়া)

গোব্-মা। তবে রে ছুঁচোর বেটী পাজিনী, আমাদের গয়লার বংশকে বাবু দেখাতে এয়েছিস্? আ মর খোট্টানি, তেড়ীওলাকী, ছোলা-ভাজানি, ছাতু কোটানী, তোর দর্‌জায় হাওয়াগাড়ী দাঁড়াক্, জুড়ী, জুড়ী গাড়ী দাঁড়াক্, ময়লাফেলা গাড়ী দাঁড়াক—

চমনিয়া। ভালা! বাঙালীন্‌কো ভালা বাৎ কহে তো চোটী বান্‌কে মার্‌নে ধাওয়ে! বাবলোক আয়ে ভোট মাঙনেকে লিয়ে, তুহার এক্‌ঠো ভোট বাটন্—

গোব্-মা। কি—কি হ'য়েছে?

চমনিয়া। আরে তুহার এক্‌ঠো ভোট আছো—ভোট আছো।

গোব্-মা। আ মর্ মাগী! নগদ ট্যাকা দিয়ে কেনা আমার সব গরু-বাছুর, আর বলে কিনা আমার ঘরে ভোট আছে; যত চোরাই মালের আড্ডা তোর ওই ভুনোওলা মিন্‌সের ঘরে, আমি জানি নি বটে!

চমনিয়া। চোরি কা বাৎ কোন্ কহল্? গোয়ালকা লাইসেনী তুহার নাম্‌মে আছো? না মেরি

নাম মে আছা?

গো-মা। আমার গোয়ালের লাইসিনী আমার নামে থাক্‌বে না তো তোর শাউড়ীর নামে থাক্‌বে?

(নীরদ ও ক্ষীরোদের প্রবেশ)

নীরদ। এই যে গোবরবাবুর মা এখানে!

গোব্‌-মা। (মাথায় কাপড় টানিতে চেষ্টা করিয়া) ওমা এ কারা গো! (প্রকাশ্যে) তা বাবা আছে ক'টা গরু বটে, লাইসিনী তে দিই; দুধে জল, তা বাবা এক গলা গঙ্গা-জলে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তে পারি—

ক্ষীরোদ। না—না—না—ও দুধে জল টলের জন্যে আমরা আসি নি। এই খড়-খোলের বাজার চড়া, তা একটু আধটু কলের জল যদি না দুধে দেবে তো চ'ল্‌বে কেন? আমরা আসছি নির্ব্বাণ-বাবুর তরফ থেকে।

গোব্‌-মা। না বাবু না। নিবারণবাবু আমার দুধ বন্ধ করে দিয়েছেন।

নীরদ। তা দিন গে। তোমার ভোটটা কিন্তু তাঁকে দিতে হবে; আমরা এসে সঙ্গে করে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার সুখের শরীর, রিক্স চ'ড়্‌তে পার্‌বে না, জুড়ি চাও, মোটর চাও, যা বল আনবো।

গোব্‌-মা। হ্যাঁ বাছারা, আমার কি বাগান যাবার বয়েস আছে! ছিঃ আমায় ঠাট্টা করতে নেই।

ক্ষীরোদ। ঠাট্টা! সে কি? আপনার মুখ ঠিক আমার ন'পিসিমার মতন; তা পিসিমা গোবরবাবুর কাছেই আসতুম—

গোব্‌-মা। ও মা, আমার গোব্‌রা আবার বাবু হল ক'বে গো? দুধের মস্ত মস্ত টিনের ওই গুলো হয়েছে, সে গুলো বাঁকে ক'রে বইতে পারে না তাই একখানা ভাঙা চোরা গাড়ী রেখেছে। তা'বলে বাবু ফাবু ব'লে তা'কে অপমান্যি করবেন না মশাই।

নীরদ। অপমান। আপনি বোধ হয় পরশুকার 'বুকের পাটা' পড়েন নি? গোপ-মহাত্ম্য ব'লে তা'তে একটা দেড় কলম আর্টিকেল বেরিয়েছে, গোবরবাবুর নাম তিন তিন বার সেখানে উল্লেখ আছে, আমি নিজে লিখেছি। তা' এই কথা রইলো...আপনি তৈরী থাকবেন। লাল নিশেন গাড়ী এইটে মনে রাখবেন। (চমনিয়ার প্রতি) মক্কা-পোড়ানি ভগ্নি! তোমার স্বামিকো—আদ্‌মীকো—খসম্‌কো—

চমনিয়া। ও নীলবাবু পাকাড়্‌ লে গিয়া পাঁচ পাঁচ বাবু আ কর উন্‌কো লে গিয়া; ও নীলবাবু কা ওয়াস্তে ভোটাইয়ে গা।

ক্ষীরোদ। তবে সর্ব্বনাশ হোগা। শুনুন গোবরচন্দ্রবাবুর মা, আপনি নির্ব্বাণবাবুকে ভোট দিলে দুধের লাইসেনী অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। ফুকো দেবার ব্যবস্থা—যা বেদে আছে, তা'জার্ম্মাণী থেকে বই আনিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবেন আর কসাইকে গরু বেচ্‌লে যে তোমাদের গাল দেবে, তার মেয়াদ হবে।

চমনিয়া। আরে মেরি দেওর পান বেচ্‌তা, উস্‌কো চোর কহল্‌।

নীরদ। ওই নীলুবাবু নীলবাবুকে ভোট দিলে এখন চোর ব'ল্‌ছে, তখন ডাকাত বল-বে। আর নির্ব্বাণবাবু একেবারে মাটির মানুষ! হাজার খিলি পান তাঁর নিত্য খরচ। তোমার দেওরের দোকান থাকতে পোলিং এর দিন তিনি কি আর কোথাও থেকে পান নেবেন? তবে আমরা চ'ল্‌লুম—ঠিক রইলো সব। [উভয়ের প্রস্থান]

মুক্তির উপায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধার এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায়। এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে; বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভগবত পাড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্‌গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যদি হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীরপ্রকৃতির ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির করিতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে বরিল, 'বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করে। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতির, কোনো প্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও কেদিনক গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছুদিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফঁকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথ-পার্শ্ববর্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। দারাপুত্র ধনজন কেউ কারো নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল।--

"শোন্ রে শোন্, অবোধ মন।
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।"

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও ! বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবে তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপ টেনে নিয়ে যাবেন, পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি!"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী। দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের 'পরে ঝুঁকিয়া বুড়োমানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—

"এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।"

বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল, "বাবা মাখন।"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়! পূর্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পার।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না। বাবা, তুই কোন দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী; বড়োটিকে না ভালোবাসিস ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ, কদিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁতকিয়া উঠিয়া কহিল, "কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, "মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।"

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় ছিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেউ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ায় চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোক আরাম পায়। তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না; আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অত ভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপস্বী হয়েছেন। চিরটাকাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফরসা করলি কী করে?"

ফকির উত্তর দিল, "যোগ অভ্যাস করে।"

সকলেই বলিল, "যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব!"

একজন উত্তর করিল, "আশ্চর্য আরে কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন কিছুতেই তুলতে পারলেন না! সে কী করে হল। সে তো যোগবলে।"

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, "বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।"

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, "তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্কুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল, ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমাদের সন্তান।"

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত বাজিয়া উঠিল, "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বললি কাকে।"

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস! তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, "আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন।"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, "ঢের দেখছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব?"

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ, ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল, "এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁশব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

ফকির কড়জোড়ে কহিল, "মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা, তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, "মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললাম।"

বৃদ্ধ এমন উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, "ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।"

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায়, পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এমনি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের একঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফদাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফদাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল—প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া ওঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফরমাশ করিতে লাগিল আধুনিক বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার, নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট, গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেসুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। বেকল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কিনা চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন; আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রখিয়াছিলেন। দুই

মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না; তাহাদিগকে তিনি কীটপতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জইস অক্ষরের ছোটোবড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

৭

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।"

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, "জানেন আপনার দুই স্ত্রী?"

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্য।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন, দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন, তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলুম।

ফকির সবচেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে খাতির করে না, প্রকাশ্যে অপমান করে, এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল—উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

যষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল, এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালকবালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া

ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল—এমন-কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে?"

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, "এ যে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল, উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।" দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।"

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

ভোলানাথের উইল

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বে ভাগলপুর বাংলার অন্তর্গত থাকায় সেখানে বহু বাঙালীর বাস, অনেকেই সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে ক্রমে উন্নতির সহজ উপায় সকল উদ্ভাবিত হওয়ায়, যেমন একান্নবর্তিতাকে বাহান্নবর্তিতায় রূপান্তরিত ক'রে সত্বর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা ও স্বাতন্ত্র্যে সুখানুভব করা, সেইরূপ শিক্ষিত বিহারী বন্ধুরা বিহারকে বাংলা হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বাতন্ত্র্য খোঁজায়, বাংলাকে বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে ক্ষীণ হতে হয়; ভাগলপুরকেও সেই হতে হারানো হয়। পথের ধারে প্রাচীন বাড়ি ঘর বাগান আজও বাঙালীদের পূর্ব-সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়।

পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে ভোলানাথের পিতা ভবনাথবাবু চাকুরিসূত্রে ভাগলপুরে এসে বাস করেন। বাঙালীর সময়টা তখন মোড় ফিরছে—গ্রহ রন্ধ্রগত হবার রাস্তা নিয়েছে। আমরা স্বরাজের আওয়াজ পেয়েছি, বঙ্গভঙ্গে সকলে বেজায় উত্তেজিত, 'বয়কটে' উৎকট প্রেম, বিলাতী নিবের বদলে কঞ্চি দিয়ে "Your most obedient servant" লিখছি। এই তেরস্পর্শে মহাহর্ষে মেতে রয়েছি ও প্রভুদের শুভদৃষ্টি হতে হ'টে চলেছি—দিন দিন তাঁদের বিষ-নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ছি।

এই অবস্থায় অনেক বাবুর মত ভবনাথবাবুরও চাকুরি সইল না। মতি তখন উলটো পথ ধরেছে। বাহবা সম্বলে বাহাদুরির হাসি হাসতে হাসতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির শান্তিকুঞ্জে আগুন লাগল, আলো দেখা দিল বাইরে আর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়,—ছাই পড়ল সংসারে, আঁধার হ'ল প্রিয়ার মুখ, আবদার ও কান্না বাড়ল সন্তানদের।

বাড়িতে থাকা দায়। সেগুলো হ'ল পাঁচিল-ঘেরা, ছাদ-আঁটা গারদ—বেকাঁরের বনবাস। কেবল নাই নাই—চাল নাই, ডাল নাই, বাজারের পয়সা নিত্য চাই, ঘুম না ভাঙতেই ভূতো জিলিপি চায়, লিলির তরল-আলতা জবাকুসুম ফুরিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চাই। পূজো যত কাছাচ্ছে, ভবনাথ কুঁজো মারছেন। জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় প্রহরের দিকে চাওয়া বরং সহজ, কিন্তু মুখ তুলে পত্নীর মুখপানে চায় কার সাধ্য! আড়াচোখে সশঙ্কে তাঁর মেজাজটা যাচাই করতে গেলে হৃদ্‌কম্প হয়। চা-খাবার দু-চারটি ডেলি-প্যাসেঞ্জার—সুধাংশু বিমল ডাক দিলে, ভবনাথের মুখ বুক দুই শুকিয়ে যায়, লিলি গিয়ে বলে, "এখনো দুধ আসে নি।"

কেরানীদের চিরদিন ধারই লক্ষ্মী, মুদী কিন্তু হাত গুটিয়েছে। কেরানী কোন দিন পয়সায় সচ্ছল নয়, সচ্ছল সে পোশাক-পরিচ্ছদে, সচ্ছল দেনায়। ভবনাথ কূল পাচ্ছেন না, পাশের বাড়ির গ্রামোফোনটা কানে কেবল বিষ ঢালছে।

বেচারার অবস্থা শুনে পূর্বপরিচিত মতিচাঁদ মাড়োয়ারী নিজের কারবার থেকে কাপড় প্রভৃতি কিছু মাল নিয়ে তাঁকে একখানি ছোট দোকান খুলিয়ে দিলে। ভবনাথবাবু বললেন, "বিলিতী কাপড় কিন্তু রাখবে না মতিচাঁদ।" মতিচাঁদ একটু হেসে বললে, "ব্যবসায় ওসব বিচার রাখবেন

না, খরিদ্দার সে বিচার করুক। আপনাকে তো বিলিতী মাল কিনতে হবে না; সে তো আমি দিব।" তারপর বহু পরামর্শ, উপদেশ, শর্ত ও ব্যবসায় গূঢ় মন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করিয়ে দিলে। তিন মাস সংসার চালাবার মতও কিছু দিলে, আর বললে, "যা যা বলেছি, ঠিক ঠিক সেই মাফিক চললে তিন মাস পরে আপনে চালাতে পারবে, সেই হোবে আপনকার বুদ্ধির যাঁচ (যাচাই)।"

কয় মাসেই ভবনাথবাবুর জীবনে বিতৃষ্ণা ও সংসারে বৈরাগ্য দাঁড়াচ্ছিল, অবশ্য অভাবে; এমন সময় মাড়োয়ারী বন্ধুর সাহায্যে ও উপদেশ পেয়ে উৎসাহের সহিত তিনি সাধনায় মন দিলেন। একে মাড়োয়ারীর পরামর্শ, তার ওপর ভবনাথবাবুর ঠেকে শেখা অবস্থা, দুয়ে মিলে অল্পদিনেই ব্যবসার ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি এনে দিলে। মতিচাঁদ খুশি হয়ে বললে, "ব্যস্, অব্ পাক্কা হো গিয়া। এর মধ্যে আর কিছু ঘুষিও না, রোজগারকে ধেয়ানামে চৌব্বিশ ঘণ্টা লাগা রহনা—সাচ্চা আনন্দ ও-ই দেগা। আওর সব আনন্দ উসিকা গোলাম হায়। গোলমকো গদ্দিমে ঘুষনে না দেও, ইয়াদ রাখ্‌খো।"

গুরুমন্ত্রে শ্রদ্ধা রাখায় ভবনাথবাবু দিন দিন উন্নতি করতে লাগলেন এবং বিশ-বাইশ বৎসরের সাধনায়—অর্থ, বাড়ি, বাগান, সম্পত্তি রেখে চ'লে গেলেন। যাবার সময় ছেলেকে সাধনায় দীক্ষা দিয়ে বললেন, "টাকা থাকলে তার মধ্যে সবই থাকে, মুখ্যানন্দ টাকাতেই, আর সব আনন্দ তার গোলাম—গৌণানন্দ। গোলামদের বাড়তে দিও না, গদিতে ঢুকতে দিও না, তারা আসে ডোবাতে।" আর ব'লে গেলেন, "আমাদের যেমন মোটা বিক্রির মরসুম আনন্দময়ীর আগমনে, সেইরূপ স্থানীয়দের মোটা খরিদের মরসুম "দশেরা" পর্বে, অর্থাৎ দশমীতে। সেইটে মাল সাবাড়ের বিক্রি। সেইটাই আনন্দময়ীর নাম সার্থক ক'রে থাকে। উপদেশমত কাজ করলে সকলেই খুশি হবে, নিজেরাও কম আনন্দ পাব না।" ইত্যাদি।

ছেলে ভোলানাথ ছিল পিতার বাধ্য ও যোগ্য পুত্র। কারবার পূর্বের মতই চলতে লাগল, বরং নবোদ্যম যোগ হওয়ায়, দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। আগমনীর সুর উঠতেই দোকানটিকে ভোলানাথ দর্শনরঞ্জন মালের প্রদর্শনীতে পরিণত ক'রে রাখলে। মায়ের ছিল ঘোটকে আগমনের কথা, তিনিও সত্বর এসে পড়লেন।

বেপরোয়া বাঙালীরা বাড়ির তাগদামত আপিস যেতে আসতে দু বেলা পূজার মালের খবর নিচ্ছিলেন। মহালয়ার (শ্রাদ্ধের) দিনে শো-কেসে শাণিত 'মদনবাণ'-শাড়ি ঝুলতে দেখে তাঁরাও গলা বাড়িয়ে ঝুলে পড়লেন, ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ভোলানাথবাবুকে নগদ কিছু দিলেই তিনি খুশি, বাকি পরে দিও, কড়া তাগাদা নেই। সপ্তমীর মধ্যে বাঙালীদের খরিদ এক প্রকার শেষ, কেবল মহাষ্টমীতে দেবীকে দেবার মত সস্তা কস্তা-পেড়ের জন্যে তেমন তাগাদা ছিল না। এক জোড়া নিলেই ঝিয়েরও একখানা হবে, দুর্গারও একখানা হবে।

২

পূজার 'সেল' ভোলানাথকে খুশির স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। এইবার সে দশমীর রেশমী মাল সাজাতে বসল। জাপানের পূর্বরাগরঞ্জিত সূর্যোদয়মার্কা পেনি, ফ্রক আর ব্লাউজে স্টোর- হাউসে নানা বর্ণের প্রজাপতি উড়তে লাগল। আনন্দে তখন নিজের অজ্ঞাতেই ভোলানথের গলায় গুনগুন স্বর ভর করেছে, অবিচ্ছেদে চলছে। যদিও ভোলানাথের বংশে কেউ কোনদিন সঙ্গীত বা সুর চর্চা করে নি বা কেউ তা করতে শোনে নি, প্রকৃতই শত্রুতেও তাদের সে অপবাদ দিতে পারে না, তবু এরূপ হয়। অত্যধিক আনন্দের চাপেই ওটা অজ্ঞাতেই বেরোয়। এটাও তা ছাড়া আর কিছু ছিল না।

মহাষ্টমী থেকেই 'দশেরা'র বিক্রি শুরু হয়েছে। হেনকালে যেন দৈব-প্রেরিতভাবে একটি যুবকের আবির্ভাব।

"এস, এস ভাই, বহুদিন দেখা নেই। কি করছ বল?"

বিদ্যানন্দ ভোলানাথের সহপাঠী ছিল। বললে, "পঁচিশ-ত্রিশ টাকার চাকরি করতে প্রাণ চাইলে না। আমাদের গ্রামখানি গণ্ডগ্রাম, অনেকেই ইংরেজী সভ্যতার স্বাদ পাওয়া লোক। ইস্কুল, গার্লস-ইস্কুল থাকায়—কাপড়, জামা, শাড়ি, শেমিজ, ব্লাউজ, আর এসেন্স, সাবান, পাউডার, কলিনসের কাটতিতেই আমার বেশ চ'লে যায়। লোক রেখে স্যান্ডেল ও শু'র (shoe) ডিপার্টমেন্ট খুলছি। কাকেও আর টাউনে না আসতে হয়, ইত্যাদি। তোমার কারবারের নাম-যশই আমাকে এ পথে টেনেছে। আমি প্রায় হাজার খানেক টাকার সওদা করতে বেরিয়েছি ভাই। তোমার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর ক'রেই আমি মাল নিয়ে যাব। 'দশেরা'য় কোন্ মালের কিরূপ কাটতি কোন্ ফ্যাশানের চাহিদা কিরূপ, তোমার নিশ্চয়ই ভাল জানা আছে। আমার এই ফর্দ নাও—তোমার ইচ্ছামত কাটছাঁট ক'রে তোমার পছন্দমত মাল দাও। আমি আজই নিয়ে যেতে চাই। বিকেলে পাঁচটার বাসে আমি রওনা হবে ভাই।"

চা পান দিয়ে আর একটি সিগারেটের টিন খুলে দিয়ে, ভোলানাথ মাল-বাছাইয়ে মন দিলে ও কর্মচারীদের কাজে লাগিয়ে নিজে চেয়ার টেনে ব'সে দেখতে লাগল।—বিদ্যানন্দ ও তার সঙ্গীকে তাদের যাওয়ার আগে জল খাওয়ালেই হবে। লুচি তরকারি হালুয়ার অর্ডার বাড়িতে দেওয়া হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যানন্দকে রকমফের মাল "অ্যাপ্রুভ" করানোও চলল।

বেলা প্রায় তিনটে, কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিদ্যানন্দ ঈজিচেয়ারখানায় চোখ বুজে একটু নিশ্চিন্তে আরাম করছে।

ভোলানাথ একদিনের জন্যেও পিতৃ-উপদেশ ভোলে নি। পরিবর্তনের মধ্যে স্ফূর্তি হ'লে নিজের অজ্ঞাতেই তার কণ্ঠে গুনগুনানি আসত।

পাশের আপিস-রুমে গিয়ে মালের দর-দামের হিসাব লেখা চলছিল। শেষ হ'লে কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে একা ব'সে হিসাবে চোখ বোলাতে বোলাতে, বাল্মিকীর কণ্ঠে "মা নিষাদে'র মত, তার কণ্ঠ হতে সহসা—

"আজ বিদ্যানন্দকে গলেমে চাকু চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
মওকা পাকে কেয়া চালায়ি—ঈ-ঈ-ঈ—
হুঁ হুঁ, আরে বিদ্যানন্দকে গলেমে—"

এই কথাগুলি সুরে শব্দিত হয়ে উঠল।

এটা ছিল সত্যই একটা অভাবনীয় ঘটনা, তাই তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারী উঁকি মেরে দেখে, বাবুই তো বটে! তারা কেউ মুখ টিপে, কেউ চোখ টিপে হাসলে, যেহেতু কেউ কোনদিন বাবুকে গাইতে শোনে নি।

যাক, কথাটা হচ্ছে—ঘটনার মাস কয়েক পূর্বে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে দুর্বৃত্তে হত্যা করে,—চাকু চালিয়ে নয়, রিভলবার চালিয়ে। ভিক্ষুকেরা অতশত জানে না, তারা পথে পথে বোধ হয় ঐরূপই গাইত, অবশ্য শ্রদ্ধানন্দের নাম ক'রে। ভোলানাথের কস্মিনকালে সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না—কোনও গান জানা ছিল না। শ্রদ্ধানন্দজীর হত্যায় সারা ভারত বিচলিত হয়। ভাগলপুরেও কম উত্তেজনা দেখা দেয় নি। তাই বোধ হয় ভোলানাথের মস্তিষ্কে বিকৃতভাবে তার ভগ্নাংশ র'য়ে গিয়ে থাকবে। শ্রদ্ধানন্দের স্থানে 'বিদ্যানন্দ' যে কি ক'রে এলেন, সেটা বোঝা কঠিন

নয়, যেহেতু ভোলানাথের মাথায় সারাদিন আজ পূর্বসহপাঠী আগন্তুক 'বিদ্যানন্দ' ঢুকে ছিলেন। আসল কথা, জয়দেবের পুঁথিতে "দেহি পদপল্লবমুদারমে'র মত ভোলানাথের মস্তিষ্কেও 'শ্রদ্ধানন্দ' বেমালুম 'বিদ্যানন্দ' হয়ে পড়েছিল। গান কখনো আপনা-আপনি থেমেছে, তার খেয়ালও নেই, কারণ সেটা ভোলানাথের চেষ্টাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ছিল না। ক্লক-ঘড়িটায় চারটে বাজতে শুনে সে চঞ্চল হয়ে মাল বিক্রির বিস্তারিত হিসাবের কাগজটা নিয়ে উঠে পড়ল।

দোকানে ঢুকে দেখে, ইজি-চেয়ারে বিদ্যানন্দ নেই। চারিদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বিদ্যানন্দ কোথায় গেল?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তো কিছুক্ষণ হ'ল উঠে গিয়াছেন, বোধ হয় অন্যান্য কাজ সারতে। বাসের সময় হয়ে এল, এখুনি নিশ্চয় ফিরবেন।"

মুহূর্তে ভোলানাথের প্রাণটা দ'মে গেল—"তোমরা আমায় জানাও নি কেন?"

"আজ্ঞে, তিনি কি করতে উঠলেন, সেটা তো তখন—"

ভোলানাথ মোটা টাকার হিসেব হাতে ক'রে ব'সে পড়ল।—"তার জলখাবার প্রস্তুত, সে গেল কোথায়?"

একজন কর্মচারী বললে, "তিনি তা হ'লে বোধ হয় খাবার কথা জানেন না।—একবার খাবারের দোকানগুলো দেখি। বোধ হয়—"

"হ্যাঁ, (চঞ্চল হয়ে) আর দেরি করছ কেন বিধু? নিমাই, তুমি যে বড় দাঁড়িয় রইলে? উঃ, এদিকে যে সাড়ে চারটে—! দেখ, দেখ—"

কর্মচারী দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। মোড় ফিরেই দুজনের হো-হো হাসি। তারা সিগারেট বার ক'রে ধরালে। কর্মচারীরা বিড়ি খায় না, দোকানের মর্যাদা মাটি করে না।

বিধু বললে, "কি হ'ল বল দিকি, ব্যাটারটা কি?"

নিমাই বললে, "আমিও বুঝতে পারতুম না, বাবু যদি না আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে ঈজিচেয়ার খালি দেখে 'আনঈজি' হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "বিদ্যানন্দ গেল কোথায়?"

বিধু বললে, "তাতে কি?"

নিমাই বললে, "তাতে কি? বাবুর গানটা শুনিস নি? "বিদ্যানন্দকে গলেমে—"

বিধু চীৎকার স্বরে—"ওঃ হো" হেসে তিন তুড়িলাফ মারলে।

নিমাই বললে, "ঠিক বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয়, ওই চাকুই সর্বনাশ ক'রে থাকবে।"

বিধু। নো সন্দেহ সার্,—নাউ আই ক্যান সোয়ার!

নিমাই। গ্রহ যে কোন্ পথ ধ'রে মুকংকে করোতি বাচালাং আর ঘরে আসা টাকা করোতি হরণং, তা দেবা ন জানান্তি! যাক্ চল চল, এখন চলন্তি। (ব'লে বিধুর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে) চল, চারুর রেস্তোরাঁয় চা খাওয়া যাকগে। বিদ্যানন্দ আর এ-মুখো হচ্ছে না, নিশ্চয়ই সটকেছে—"

দুদিন নিলে ভোলানাথের বুদ্ধি থিতুতে। তারপর সোজা—পাকা প্রাচীন "মুসুবিদা মাস্টার" অ্যাডভোকেট অটলবাবুর কাছে গিয়ে উইল লিখিয়ে বাড়ি ফিরল। সংক্ষেপ মর্ম—

"আমার বংশে যিনি গীত-বাদ্যাদির চর্চা করিবেন, আমার কারবারে বা বা দোকানের স্বত্বে বা অংশে তাঁহার কোনও অধিকার বা দাবি থাকিবে না। এই শর্ত পুত্রাদি ও অন্যান্য উত্তরাধিকারী হইতে—জামাই, ভগ্নীপতি পর্যন্ত সমপ্রবল ও বলবান থাকিবে। গদিতে অস্ফুট গুনগুন শব্দ পর্যন্ত ধারার অন্তর্গত রহিল এবং গ্রামোফোনেরও প্রবেশ নিষেধ থাকিল।"

ভোলানাথ ফিরে এসে গম্ভীরভাবে বললে, "দাও, দু কাপ চা দাও।"

ফরমায়েশি গল্প

প্রমথ চৌধুরী

মকদমপুরের জমিদার রায়মশায় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায়মশায় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বললেন, "ঘোষাল! গল্প বলো।"

রায়মশায়ের মুখ থেকে কথা পড়তে-না-পড়তে তাঁর ডান ধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক হাসিমুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে,

"যে আজ্ঞে হুজুর, বলছি।"

"আজ কিসের গল্প বলবি বল্ তো?

"বর্ষার গল্প, হুজুর।"

"একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়?"

একটি অস্থিচর্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এক টিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করলেন, "তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মশায়ের মতো গুণগ্রাহী লোক ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?"

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে, "মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?"

রায়মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

"আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।"

ঘোষাল পণ্ডিত মশায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, "এ লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটাও ভয়ে কাঁপানো সংগত। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে গেলে গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।"

পণ্ডিতমশায় এ কথা শুনে মহা খুশি হয়ে বললেন, "তা তো বটেই! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই তো ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্তমান, তাতেই-না অলংকারশাস্ত্রে ওর নাম আদিরস।"

রায়মশায়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরোচ্ছিল,

এইবার আবার কথা বেরোল; কিন্তু তারা ধারা ক্ষীণ নয়।

"আপনার অলংকারশাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা হচ্ছে এই, এখন বুড়ো হতে চললুম—বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভালো লাগবে? ওসব গল্প, যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।"

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে, রায়মশায় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথায় আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বললে, "হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে, হুজুরের তো আর সে ভয় নেই।"

"দেখছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবী লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন্ কথা বলতে হয়, তা ও জানে।"

"সে কথা আর বলতে! শাস্ত্রে বলে, যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সেই যথার্থই রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে-সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়সেও যে রস আছে, এ কালের যুবাদের মধ্যে হাজারে একজনেরও তা নেই।"

"ঠিক বলেছেন পণ্ডিতমশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটাই গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের এম.এ.-র কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে; বললে অশ্লীল।"

"কোন্ গানটা ঘোষাল?"

"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদু ডারা—"

"কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইস্টুপিট্ কানে হাত দিলে? অমন কান মলে দিতে পারলি নে? হতভাগাদের যেমন ধর্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান! ইংরেজি পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল!"

এই কথা শুনে সে-সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ অতি তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

"তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বলনীলমণি?"

রায়মশায় যাঁকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করলেন, তার নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে 'গোস্বামী'টি কেটে দিয়ে সুমুখে 'উজ্জ্বল' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়—ঘোর শ্যাম; আর-এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন, "আজ্ঞে, ইংরেজিনবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনেশুনেই বলছি। আমারই জনকত পাস-করা শিষ্য আছে,-যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত—

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি

তা হলে আমি হলপ করে বলতে পারি তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।"

"ও দুয়ের তফাতটা কোথায়?"

'তফাতটা কোথায়?—বললেন ভালো পণ্ডিতমশায়! একটা টপ্পা আর একটা কীর্তন!"

"অর্থাৎ তফাত যা, তা নামে!"

"অবাক করলেন। তা হলে সোরী মিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে? নামের ভেদেই তো বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক, আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান তো আর টোলে জন্মায় না।"

"বটে! অমরুশতক থেকে শুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তা হলে মনু থেকে শুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করেও ধর্মজ্ঞান জন্মায় না।"

"রাগ করবেন না পণ্ডিতমশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃত কাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

"আপনি তো দেখছি এক কথারই বারবার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায় তা তো আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।"

"তফাত আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি এক বস্তু নয়—একটায় নেশা হয়, আর-একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখনো ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়?"

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "পণ্ডিতমশায়, আপনিও এই-সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তমনি তার বুদ্ধি।"

রায়মশায় ঘোষালকে চব্বিশ ঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। 'আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না'—এই ছিল তাঁর 'মটো'। তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন, "কেন, ওর বুদ্ধিটা কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বলনীলমণি! তোমাদের মতো ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে; তাগমাফিক অমনি একটি জুতসই উপমা লাগাও তো দেখি!"

"আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু রসজ্ঞান নেই।"

"রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো তো অমনি একটা রসিকতা!"

"আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!"

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না; বললেন, "এ আবার কি অদ্ভুত কথা! ঘোষালের ধর্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?"

"অবশ্য না। ও দুই তো আর পৃথক জ্ঞান নয়?"

"আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে!"

"শুনুন পণ্ডিতমশায়, যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্মজ্ঞান; আর যার নাম ধর্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে তো বস্তুর প্রভেদ হয় না।"

"বলেন কি গোঁসাইজি! তা হলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারই নাম ধর্ম, আর যার নাম অর্থ তারই নাম মোক্ষ?"

"আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।"

"বুঝছেন না পণ্ডিতমশায়, কথা খুব সোজা! গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজাচাল তারই নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।"

মদের পিঠ-পিঠ এই চাটের উপমা আসায় রায়-মশায়ের পাত্রমিত্রগণ মহাখুশি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনীর অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বলনীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র তার মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুটিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য 'হুঁচ্চ' ধ্বনি নির্গত হয়ে উজ্জ্বলনীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্য-রসে সিক্ত করে দিল। তিনি অমনি 'রাধামাধব' বলে সরে বসলেন। রায়মশায় এই-সব ব্যাপার দেখে-শুনে ভারি চটে বললেন, "তোমার কটায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে তো হে! আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা শুরু করে দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনো মাথামুণ্ডু থাকে! ঘোষাল! গল্প বলো।"

"হুজুর, এই বললুম বলে।"

"শিগগির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?"

উজ্জ্বলনীলমণি বললেন, "আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে-সভায় ঘোষাল বক্তা, সে-সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি তো আমার নামই নয়—"

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলঃ জলদাগমে।"

"পণ্ডিতমশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা তো সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে তো প্রত্যক্ষ।"

উজ্জ্বলনীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে—"তবে বলি, শ্রবণ করুন।"

"দেখ্, মধুর রসের গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস নে। একটু নুনঝাল যেন থাকে।"

"হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, একেবারে যেন সাদা না হয়।"

"আর দেখ্, একটু অলংকার দিয়ে বলিস, তা কি আর জানি নে!"

"অলংকারের শখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান শখ, তা তো আর কারো জানতে বাকি নেই।"

"কিন্তু সে অলংকার যেন ধার-করা কিংবা চুরি-করা না হয়।"

"হুজুর। ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তা হলে গোঁসাইজি তা হেঁচকা টানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড়ো অনুগ্রহ করে তো—গিল্টি।"

"অন্যে যে যা বলে তা বলুক; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।"

"হুজুর জহুরী, সেই তো ভরসা। তবে শুনুন।

"শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্যোগ। চার দিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুস কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়—একদম আলকাতরা। আর তার এক-একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—"

"কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়বে বল্ তো মূর্খ? যখন বর্ণনা শুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল্, জল চুঁইয়ে পড়ছে।"

"হুজুর বলতে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি না। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—"

"দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না।"

এই শুনে দেওয়ানজি বললেন, "দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।"

"সে আর বলতে। হুজুর হিসেব-নিকেশ যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তাঁর বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যাঁর চালে খড় ছিল না।"

"তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?"

"যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে? যাক ও-সব কথা, এখন গল্প শুনুন।"

"এই দুর্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।"

"কি বললি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাতদুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে, আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস! ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখানে থেকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"হুজুর, অধীর হবেন না; উদ্ধার তো করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ তো আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।"

"তা তো জানি, কিন্তু তুই হয়তো ঐখানেই আর-একটাকে এনে জোটাবি। গল্প শুরু করে দিলে তোর তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।"

"দেখুন রায়মশায়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলংকারশাস্ত্রের হিসেবে কোনো দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও তো অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।"

"দেখুন পণ্ডিতমশায়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাত নিউমনিয়া হবে। 'এ যে বাঙলাদেশে, তায় আবার কলিকাল!"

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন, "তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে দেখবেন, কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং তাতে করে তাঁদের কারো যে কখনো অপমৃত্যু ঘটেছে এ কথা কোনো পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলেছে, বাইরের জলে তার কি করবে?"

"হুজুর তো ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে, কিন্তু তাই

বলে ব্রাহ্মণসন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বলতে পারে? অভিসারক বলে তো আর কোনো জানোয়ার নেই! দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি আর পায়ে বুটজুতা। তার পর শুনুন—"শুধু ঝড়জল না। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার! লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাওয়াই উড়ছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।"

"কি বললি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি!—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!"

"আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে তো সমস্ত ক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিতমশায়?"

"তা তো ঠিকই। আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুশি তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।"

"শুধু করতে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে তো আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত তা হলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি তো নয়ই—"

"উনি তো ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন!"

"হুজুর, আমি কোথাও যেতে চাই নে, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।"

"যেখানে আছেন সেইখানেই থাকতে চান! যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেলেন! তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি।"

"হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

"দেখছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক্, লোকটা অনুগত বটে। যাক ও-সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। তুই এখন বল, তার পর কি হল!"

"তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুক চিরে ব্রাহ্মণের ছেলের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মতো এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ল। তার আলোতে দেখা গেল যে দশ হাত দূরে একটা পর্বতপ্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে হুংকার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়কো খুলে দিলে। তারপর ব্রাহ্মণ সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড়-জল হো হো করে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়ল, আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।"

"মন্দিরে ধুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে তো!"

"হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই, রবারের।"

"এই যে বললি বুট?"

"বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর, আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?

"তার পর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে জ্বালিয়ে

দেখলে যে বাঁ দিকে একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জ্বেলে দেখতে পেলে ডান দিকে দেয়ালের গায়ে খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মতো একটি মূর্তি। আর সে কি মূর্তি! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণসন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মতো জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মতো, চোখ-দুটি পদ্মফুলের মতো, গাল-দুটি গোলাপফুলের মতো, ঠোঁট-দুটি ডালিম ফুলের মতো, কান-দুটি—"

"রাখ্, তোর রূপবর্ণনা। লোকটি দেখছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম করলে না!"

"আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্তিটি যে কোন্ দেবতার, তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। কালী শীতলা মনসা চণ্ডী প্রভৃতি কোনো জানাশুনো দেবতা তো নয়।"

"তা নাই হোক, দেবতা তো বটে!" দেবতা তো তেত্রিশ কোটি—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম করবে না?"

"আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের তো কোনো ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নেই, ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।"

"দেখ্ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।"

"আজ্ঞে মিথ্যা কথা নয়, তার গলা-ওলটানো কোটের ভিতর দিয়া পৈতা দেখা যাচ্ছিল।"

"আবার বলছিস সন্ন্যাসী! দেখ্, যে কোন সাধু-সন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এইসব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বল, অবধূত বল, নাগা বল, আকলি বল, গিরি বল, পুরি বল, ভারতী বল, বাবাজি বল, আর কত নাম করব—রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা ঊর্ধ্ববাহু দাদূপন্থী অঘোরপন্থী—দেশে এমন সাধু-সন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারো তো কখনো পৈতা দেখিনি—এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও তো বাবা, পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে ছড়ানো থাকে।"

"হুজুর, এ ছোকরা ও-সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী তো বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিস নে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না?"

"হুজুর, আমি বার করি নি, এরা নিজেরাই বেরিয়েছে। এরা ভিখ্ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টোঁ টোঁ কোম্পানীর দল নয়। এরা দিক্ষীত নয়, শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো-মোজাও পরে, স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও শহুরে, এরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী।"

"এরা কিছু মানে-টানে?"

"আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।"

"কথাটা ভালো বুঝলুম না।"

"বোঝা বড় শক্ত হুজুর! এরা সব বৈদান্তিক শাক্ত।"

"বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্মমত পয়দা করলে কে?"

"হুজুর জর্মনরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মতো ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে! ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল

বুনে এ দেশে চালান দেয়, তেমনি ওরা শংকরের সঙ্গে শংকরী মিলিয়ে এ দেশে চালান দিয়েছে।"

"চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

"আজ্ঞে সস্তা বলে।" ত

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন, "ঘোষাল যাদের কথা বলছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাস-করা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।"

"অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুশিমত 'সা'র জায়গায় 'নি' এবং 'নি'র জায়গায় 'সা' বসিয়ে দেন।"

রায়মশায়ের আর ধৈর্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চিৎকার করে বললেন, "তোমার টীকা-টিপ্পনী রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইস্টুপিটরা দুপাতা পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা-সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃস্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।"

"হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তা হলে আমার গল্প মারা যায়।"

"আর যদি প্রণাম না করে তো কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।"

"হুজুর, তা হলেও আমার গল্প মারা যায়।"

"যাক মারা। আমি ঐ-সব গোঁয়ার গোবিন্দ লোকের যথেচ্চারের কথা শুনতে চাই নে।"

"হুজুর, যদি জোর করেন তো আমি নাচার। গল্প তা হলে এইখানেই বন্ধ করলুম।"

"বেশ! এ মাসের মাইনেও তা হলে এইখানেই বন্ধ হল।"

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল, "হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?"

"এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ।"

"দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ তো আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা তো সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে, তবে আমি তো আর পুরাণকার নই। এরকম ওলোটপালোট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনোযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জনপ্রাণী না থাকত তা হলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল মন্দিরের মধ্যে অপর কোনো কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনি যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মতো নয় তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।"

"খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস বটে!"

"ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিশ্বাস পড়ছে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকল না যে স্বর্গের কোনো অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পুজো করতে পারত, মানবী হলে

প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর এক দিক থেকে ভক্তি আর-এক দিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।"

"কি বললি, ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই তো একসঙ্গেই থাকে?"

"ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি, আর প্রীতি অপরাভক্তি।"

"মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন-সতীনের মতো।"

"ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়। অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে তো হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?

"হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষ পাগল হয়।"

"কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম শৌখিন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যমনারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিতমশায়?"

"প্রমাণ তো হাতেই রয়েছে—বিক্রমোর্বশী।"

"শুনলেন হুজুর, পণ্ডিতমশায় কি বললেন? এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ সন্তানটিকে কি করে ভালোবাসায় ফেলি?"

"তা হলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হল?"

"আজ্ঞে তাও কি হয়! যা হল তা শুনুন—

"ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উস্‌খুস্ করতে দেখে সেই মূর্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তাঁর কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝেছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায় পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরী! তার উপর আবার দুর্যোগের সুযোগ! এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে তো মাত্র বালাযোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল; ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়নচোখ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বামাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে-সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল, আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে শুরু হল। তার মনে হল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা হল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে, তার বুকের ভিতর ভালোবাসা জন্মাচ্ছে।"

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন, "আহা! পূর্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব, তার উপমা হল কিনা ম্যালেরিয়া জ্বর! ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল তখনই জানি ও শেষটায় বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!"

ঘোষাল এ-সব কথার কোনো উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায়, জবাব দিন।

স্মৃতিরত্ন বললেন, "ত্রিগুণের সাম্যবস্থাতেই তো চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিক ভাব বলছ, সেও তো একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?"

"পণ্ডিতমশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরো অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসের ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন খাওয়ালে ভালোবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।"

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন, "কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি-শিশি কুইনিন গিলেছি, কিন্তু আমার পিলে—"

রায়মশায় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কান দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কানে পৌঁচেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন, "চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড়ো হয়ে উঠেছে সে কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কই, ও তো তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার-তার কাছ নাকে-কাঁদতে বসে না! পিলে-যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের—হৃদ্‌রোগ। ও যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি! সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুর একটা তেপান্তরের মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই, সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারো খেয়াল দেই। হ্যাঁ, দেখ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বলনীলমণি যে বলেছিল তো ধর্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি সে কথা ঠিক।"

"আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্বরাগ তো আর জাতবিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, 'পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি'—"

"বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি বদনায় করে। তার পর এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।"

"হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন, শধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। 'পানি' না বলে 'ব্রাণ্ডিপানি' বললে আর কোনো গোলই হত না। জল অবশ্য যার-তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালোবাসা জিনিসটে তো দুনিয়ার সেরা মদ।"

"তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস ভালো। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন, তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণির দোহার। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিতমশায়ের মত শুনতে চাই, তোদের কথা শুনতে

চাই না।"

"অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি ভালোবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা দয়মন্তী মালবিকা বাসবদত্তা রত্নাবলী মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই তো—"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে, আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।"

"কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টো হয়, তা হলে মানুষে কোন্‌টা মেনে চলবে?"

"দুটোই। কাজকর্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।"

"দেখুন রায়মশায়, ঐখানেই তো স্মার্ত ভট্টাচার্য মশায়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেরই হোক আর কাব্যেরই হোক।"

"তা হলে আপনারা কি চান যে গল্পটা হোক জীবনের মতো, আর জীবনটা হোক গল্পের মতো?"

"আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য-মতে জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।"

"তুমি থামো ঘোষাল, এ-সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিমাণবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে—"

"ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও-সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলংকারশাস্ত্র যদি ধর্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তা হলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন তো।"

"ঠিক বলেছেন পণ্ডিতমশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তার পরে মৃত্যু। আর কাব্যে হয় আগে ভালোবাসা, তারপর হয় বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক-কথায়, মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত। কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।"

"তা হলে তুই দেখছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মারবি, নয় প্রাণ মারবি।"

"আজ্ঞে প্রাণে মারতে পারি, কিন্তু জাত কিছুতেই মারব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই?"

"দেখ্ তোকে আগেই বলেছি, ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।"

"আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ প'ড়ে লোকটা মারা যায়, সেও কি আমার দোষ? এ দুর্যোগ কি আমি বানিয়েছি?"

"কি বললি? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু—মন্দিরের ভিতরে—আর আমার সুমুখে! বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে পারিস মিলনান্ত করতেই হবে— বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।"

"আজ্ঞে আমিও তো সেই চেষ্টায় আছি; তবে ঘটনাচক্রে কি হয় তা বলতে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ—দুই টিকিয়ে রাখব,

তার পর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে না থাকেন তা হলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি এগোয় তো তার অন্তই বা হবে কি করে।"

"আচ্ছা। বলে যা।"

"তবে শুনুন—

"ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাকল না। সব বিপদের মতো ভালোবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুশকিল, তার পর তা সয়ে যায়। ক্রমে যখন তার জ্ঞান-চৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চুড়ো করে বাঁধা, আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে, বোধ হয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তার পর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব! তার দেহটি ছিল তার চোখের মতো লম্বা, তার নাকের মতো সোজা তার ঠোঁটের মতো পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ি চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মপ্রাণী কাঁদতে শুরু করে দিল।"

"চলে নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।"

"কি? কি? উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে?"

"হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন, চলে নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।"

"ঘোষাল! মেয়েটার পরনে কি রঙের শাড়ি ছিল রে?"

"হুজুর, লাল।"

"আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!—চলে লাল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর বললে ও কবিতার আর থাকে কি! আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কিনা জাত মেরে দিলে!"

"গোঁসাইজি, গোসা করছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরান যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে বেরোবে তার রঙ তো লাল। তবে বলতে পারি নে, হতে পারে যে কারো কারো রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।"

"নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়ছ!"

"রাগ করেন কেন মশায়! কোনো সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তা হলে তো সে না চাইতে চাকরি দেয়।"

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায়মশায় হুংকার ছেড়ে বললেন, "যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তা হলে রাত-দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব?"

"হুজুর, তর্ক আমি করি! আমি একজন গুণী লোক—নভেলিস্ট। কথায় বলে, যাদের আর-গুণ নেই তাদের ছার-গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই তো তর্ক করে।"

"ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বলছেন!"

"বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি; আপনি গোঁসাইজি, তার পর চালান দেখি তো

কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন।"

"ওরে ঘোষাল, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর-একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়েস কত?"

"উনিশ কি বিশ।"

"সধবা কি বিধবা?"

"কুমারী। কাব্যে হুজুর, কুমারী ছাড়া আর-কিছু তো চলে না।"

"আমাকে বোকা পেয়েছিস, না খোকা পেয়েছিস? ছ ছেলের মার বয়েসি, আর তিনি হলেন কুমারী! বাঙালি ঘরে কোথায় এত বড়ো আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল্ তো?"

"হুজুর, মেয়েটি তো বাঙালি নয়—হিন্দুস্থানী।"

"যেই একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে অমনি আর-একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস! কোথাও কিছু নেই, বলে দিলি হিন্দুস্থানী!"

"হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ির সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।"

"হোক-না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানীও তো হিন্দু, আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। জানিস, দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোনো হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়িতে অত বড়ো মেয়ে আইবুড়ো দেখেছিস—বল্ তো গাধা!"

"হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।"

"কি বললি? মুসলমান! হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে—রাস্‌কেল, মুসলমান ঢুকিয়েছিস! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনই মন্দির থকে বার করে দে।"

"হুজুর, এই দুর্যোগের মধ্যে—"

"দুর্যোগ-ফুর্যোগ জানি নে, এই মুহূর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্ধচন্দ্র।"

"হুজুর, বাইরে তো দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন তো বেচারা যায় কোথায়? হোক-না মুসলমান, মানুষ তো বটে, আমাদের মতো ওরও রক্তমাংসের শরীর।"

"খুপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কি না বল? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি। এই জামাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল্ দেও।"

"হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"আবার মিথ্যে কথা! কুলীনের মেয়ের গায়ে ওড়না ওড়ে আর সে কেঁচো দিয়ে শাড়ি পরে!"

"হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়িটে ভিজে সুমুখের দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।"

"এই যে বললি সলমাচুমকির কাজ করা?"

"হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মতো দেখাচ্ছিল।"

"তাই বল্। আঃ। বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।"

"হুজুর, আপনার না হোক আমার তো তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে তো আমার পাঁচ-প্রাণ দশ দিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা—"

"অমন ভুল করিস কেন?"

"হুজুর, অমন ভুল অনেক বড়ো বড়ো কবিরাও করেন, আমি তো কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে-সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।"

"সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে—এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটায় ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই তো বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস বল্ তো? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব?"

"হুজুরের প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব, তার পরে মুখ দিয়ে বেরোবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হল শুনুন—

"ভালোবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা একজনের মনের সিগারেট থেকে আর-এক জনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলী দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে, ব্রাহ্মণের ছেলের ভালোবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে শ্যাম্পেনের নেশার মতো আস্তে আস্তে ভালোবাসার রঙ ধরতে শুরু করল।"

কি বললি? শ্যাম্পেনের নেশার মতো আস্তে আস্তে! গাছে না উঠেতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস আর বেঁফাস বকছিস! বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস! পোর্ট বল, ক্লারেট বল, জিন বল, রম্ বল, হুইস্কি বল, ব্রাণ্ডি বল আমার তো আর কিছু জানতে বাকি নেই! শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরে না, নয় চট করে মাথায় চড়ে যায়। ভালোবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস তো শেরীর সঙ্গে তুলনা দে—গেলাসের পর গেলাস বা রেক্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়।"

"হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালোবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর, এইখানে একটু মুশকিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোনো বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তা হলেই বুঝতে হবে সে-সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।"

"তবে কি ওদের মনের কথা জানবার জো নেই।"

"আমি তো তা বলি নি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ, তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন—

"তার চোখের ভিতর একটা অতি টিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুৎ, স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অতি ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, তার পর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।"

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস, অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাস।"

"উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে হে?"

"আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।"

"আখরই দিন আর যাই দিন আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ 'নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসে'র বেশি আর আমি যেতে দেব না।"

"আজ্ঞে এর একটা তো আর-একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।"

"রাখো হে তোমার পরিমাণবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।"

"হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোনো বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে ওঠে চুম্বক।"

"বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেল না, দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন! যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বলনীলমণির—এখন দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই!"

"হুজুর, বড়ো বড়ো কবিরাও এ কাজ পূর্বে করে গিয়েছেন।"

"সত্যি নাকি পণ্ডিতমশায়?"

"আজ্ঞে, আমি তো কোনো সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে দেবলায় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।"

"আমাদের পদাবলীতেও ও-সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, 'যব গোধূলি সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি'।"

"ঘোষাল, নিজে করবি কুকীর্তি আর বড়ো বড়ো কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ!"

"হুজুর, আমি মিথ্যে বলি নি, বাঙলার বড়ো বড়ো লেখকরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে আমি আগে-ভাগেই তা করে বসব, আমি তো একজন ছোটো গল্পকার। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' হিসেবেই আমি চলি।"

"বাঙলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজীর! মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চা আর বেশি করতে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।"

"তা হলে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।"

"আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলছিস মন্দির, আর এখন বলছিস ভোগের দালান!"

"হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভিতর ঠাকুর থাকত না? আগেই তো বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্তি ছিল না।"

"তাও তো বটে! খুব ডিগবাজি খেতে শিখেছিস। তুই আর-জন্মে ছিলি গেরবাজ।"

"হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি।"

"আচ্ছা থাক, এখন তুই গল্প বলে যা, এতক্ষণে জমছে।"

"হুজুর, তার পর ব্রাহ্মণসন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণকন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে তার গায়ে সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়ল, আর তা অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মতো লালটুকটুকে হয়ে উঠল।"

"রোস রোস, সিঁদুরের কথা কি বললি?"

"কই হুজুর, সিঁদুরের নামও তো ঠোঁটে আনি নি!"

"উঃ, তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস।"

"তা হলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে হয়ে গেছে।"

"ও-সব জুয়োচুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে, রাস্‌কেল, আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিলি!"

"আজ্ঞে সধবাই যদি হয়, তাতেই-বা ক্ষতি কি?"

"কি বললে উজ্জ্বলনীলমণি, ক্ষতি কি?"

"আজ্ঞে আমি বলছিলুম কি, নায়িকা তো পরকীয়াও হয়—"

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি-ছি করে উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন, "হয় কি না তা বিবর্তবিলাস, মীরাবাইয়ের কড়চা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন-কি, কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত—"

এই কথায় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে জলে, সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে—কেউ কার কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বলনীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। 'পিকোলো'র আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে, তাঁর আওয়াজও এই হৈ চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে তিনি বলছেন, "আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন তার পর যত খুশি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া তো পদকর্তাদের মতে 'কর্মীনারী'—সে না হলে সংসার চলে না; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান তো পদাবলীতে—"

"রক্ষা করুন গোঁসাইজি, থামুন, আপনার ও-সব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস করা শিষ্যেরা হলে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না পণ্ডিতমশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন! আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিতমশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে, কিন্তু পরকীয়া নয়।"

"তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয় গিয়েছিস, যা মুখে আসছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হল সধবা, অথচ কারো স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।"

"হুজুর আমি মিছে কথা বলিনি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটায় হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে তখন তাকে বেওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।"

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। এ কালে ও-সব কথা মুখে আনতে নেই, কেননা তা শুনে অর্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও-সব কাব্যে চালাও, দুদিন পরে তা সমাজে চলবে, তারপর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে, তখন তুমি এত প্রলাপ বক যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠানো ভার। আজ যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।"

এই বলে পণ্ডিতমশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে তাঁর গতিরোধ হল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে—"আপনি আমার ধর্মবাপ। আপনার পায়ে ধরি, আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার

কোনোই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলেই যে সধবা হতেই হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল সিঁদুর।"

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায়মশায় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদি অন্ত নেই। আজ তোর রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।"

"হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি গেরস্তর ঝি-বউ লাল শাড়ি পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা-কোঁচা দেয়, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—"

"হোক-না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কি রে?"

"হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য ধরে থাকলেন, তবে আর-একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন। শুনুন—

"ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বললে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বাস করলে না। 'আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয়ে যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।' এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে-স্বপনে সে ঐ মূর্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিনতে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়োসড়ো হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। তারপরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণসন্তান বুঝতে পারল—এই সেই; অমনি সেই বৈদান্তিক শাক্ত 'তত্ত্বমসি' বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছু পেলে না, শুধু দেওয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল, আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখা গেল মন্দির একেবারে শূন্য!"

"এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি!"

"হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, তাই শোনালাম।"

বলা বাহুল্য, ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায় সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বলনীলমণি। তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প।"

এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল মা ঠাকুরানীর মাথা ধরেছে। রায়মশায় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও সেদিনকার মতো ভঙ্গ হল।

গল্প লেখার বিড়ম্বনা

দীনেন্দ্রকুমার রায়

কুলধর্মে আমি বাণিজ্যব্যবসায়ী, কিন্তু কালধর্মে আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহিত্য চর্চাও হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই আমার একটু আধটু গল্প লেখার সখ আছে, কিন্তু কাজের চাপে বড় একটা সময় পাইয়া উঠি না। ব্যবসায় উপলক্ষে আমাকে প্রায়ই দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, রেলপথের সুদীর্ঘ সময় আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। ঐ সময়টা আমি মাঝে মাঝে তাই কিছু লিখিয়া কিম্বা পড়িয়া কাজে লাগাইয়া লই। কিছুদিন পূর্বে একবার কার্যোপলক্ষে কুষ্টিয়া হইতে কলিকাতা যাত্রা করিরেছিলাম। পথে একটা স্টেশন হইতে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কিনিয়া লইলাম। সেই কাগজখানা পড়িতে পড়িতে একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। সে বিজ্ঞাপনের সারমর্ম এই,—"অভিনব ভাবপূর্ণ কোন গল্প বা প্রবন্ধ উক্ত পত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে লেখককে ১৫ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।" খবরের কাগজ পড়া শেষ হইল; আর কিছু করিবার নেই। কোন লেখাও আপাততঃ মাথায় নাই, সঙ্গে কোন বইও নাই, প্যাসেঞ্জার ট্রেন গজেন্দ্রগমনে ঢিকোতে ঢিকোতে চলিয়াছে। ভারি বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের সেই বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া ঐ কাগজখানার জন্য কিছু লিখি না কেন? পঞ্চদশ মুদ্রা অবহেলা করিবার সামগ্রী নহে স্বীকার করি, কিন্তু তবু পাঠককে বোধ হয় বলা বাহুল্য যে ঠিক যে ঐ পঞ্চদশটি রজত চক্রের প্রলোভনেই কল্পনাদেবীর শরণ লইলাম তাহা নহে!

কয়েক মাইল বাইরে যাইতেই একটি গল্প লিখিবার বিষয় ঠিক করিয়া লইলাম। বুঝিতে পারিলাম গল্পটি বেশ জমাট হইবে, খুব উৎসাহের সহিত পোর্টম্যান্টো হইতে একতাড়া শ্রীরামপুরের কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। লেখা প্রায় শেষ হইলে দেখিলাম সূর্য অস্ত গিয়াছে। ধীরে ধীরে চতুর্দিকে অন্ধকার হইয়া আসিল, আমি কাগজগুলো গুছাইয়া কামিজের পকেটে রাখিয়া গাড়ির জানালায় মুখ করিয়া বসিলাম। সুন্দর সন্ধ্যাকাল, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, দূরে দূরে অন্ধকারে ঘেরা বাঁশবন ও বৃক্ষশ্রেণী, রেলের রাস্তার দুই পার্শ্বে লম্বা লম্বা ঘাসের মৃদু কম্পন; এই সব দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক ভাবে আমার সেই গল্পের কথা চিন্তা করিতে করিতে স্থানকাল সব ভুলিয়া গেলাম; সহসা শত শত লোক সমাগম, চতুর্দিকের বিবিধশব্দ ও উজ্জ্বল আলোকে চেতনা হইল যে শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অবিলম্বে গ্যা-আলোকিত প্ল্যাটফর্মে নামিলাম। আমার সঙ্গে একটি পোর্টম্যান্টো ছাড়া অন্য কোন জিনিসপত্র ছিল না। স্টেশনের এক পরিচিত কর্মচারীর আপিসে পোর্টম্যান্টো রাখিয়া আমি অল্প ভাড়ার একটা গাড়ির সন্ধানে স্টেশনের বাহিরে আসিলাম। ভবানীপুরে আমার একজন আত্মীয় থাকেন। কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহার বাড়িতে গিয়াই উঠি। কিন্তু আজ একটা ভুল

করিয়াছিলাম, কলিকাতায় রওনা হওয়ার পূর্বে তাঁহাকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই মনে মনে একটা খট্‌কা ছিল যে আজ এত রাত্রে তাঁহার বাড়ি গিয়া তাঁহাকে কত অসুবিধায় ফেলিব! এই ভাবিতে ভাবিতে গাড়ির সন্ধানে বাহিরে আসিয়া ওধারে একটা নূতন সাইনবোর্ড দেখিলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে "প্রবাসশ্রম"। ভাবিলাম এটাত তবে একটা হিন্দুহোটেল হইবে, তাহা হইলে আজ রাত্রে এখানে থাকিয়া কাল সকালে আত্মীয়ের বাড়ি যাইলে হয়। আমি ভিতরে প্রবেশ করতেই দারোয়ান আমাকে উপরের পথ দেখাইয়া দিল। হোটেলের সত্বাধিকারী মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি যত্ন করিয়া আমাকে হোটেলের ঘর দ্বার সব দেখাইলেন, দেখিলাম ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং জানিতে পারিলাম আহারাদির খরচ ও বাসাভাড়াও অধিক নহে। কিন্তু আমার সহিত কোন জিনিসপত্র না দেখিয়া বোধ হয় মুখুয্যে মহাশয়ের মনে কেমন একটু সন্দেহের উদয় হইল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নেই?"

আমি বললাম, "আছে, শুধু একটি পোর্টম্যান্টো, সেটা স্টেশনের আপিসে রেখে এসেছি, এখনি আনিয়ে নেব। সে যাক এখন মহাশয় একটু চা খাওয়াতে পারেন কি, সন্ধ্যার সময় আমার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে।" তিনি বললেন "হ্যাঁ সরঞ্জাম সবই আছে, তবে যোগাড় করতে যা দেরী হবে, দেখি আমি ঝিকে চা তোয়ের করতে বলি।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমার মাথায় তখনও সেই গল্পটা জাগিতেছে; যতদূর লিখিয়াছি কি রকম হইয়াছে পড়িয়া দেখিবার জন্য কামিজের পকেট হইতে কাগজগুলো বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মুখুয্যে মহাশয় আবার গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

আমার মাথায় কি রকম খেয়াল চাপিল, আমি একটু হাসিয়া আমার গল্পের নায়কের নাম করিয়া বলিলাম, "ধনঞ্জয় মিশ্র।"

তখন স্বপ্নেও মনে করি নাই, এই নভেলী ছদ্মনাম ধারণ করায় আমাকে কি ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।

চা খাইয়া আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম, ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকদূরে নদীকূলে আসিয়া পড়িলাম, সেখানে শুনিলাম ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর জাহাজ আরোহী লইয়া সপ্তাহে দুইবার উড়িষ্যা পর্যন্ত যায়, আমি এ পর্যন্ত কখন সমুদ্র দেখি নাই, অনেক দিন হইতে সমুদ্র দেখিবার ইচ্ছা ছিল, ভাবিলাম, এই মঙ্গলবারের জাহাজেই চাঁদবালি পর্যন্ত গিয়া সমুদ্র দেখিয়া আসিব। হোটেলের বন্দোবস্তে আমি বেশ প্রীত হইয়া ছিলাম, তাই ভাবিলাম এই ক'দিনের জন্য আর আত্মীয়ের বাসায় নড়চড় না করিয়া এখানেই থাকিব।

ইতিমধ্যে আমার হাতের কাজকর্ম সারিয়া রাখিলাম; গল্পটি পূর্বোক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য কয়েকখানি ডাকের কাগজে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিলাম।

মঙ্গলবার আসিল, আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; কাজকর্ম পূর্বে শেষ করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম প্রায় ৯টার সময় জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নৌকা ছাড়িবে সুতরাং ধীরে ধীরে ইডেন গার্ডেনে চলিয়া গেলাম, সেখানে এক বিদ্যুৎলোক উদ্ভাসিত শ্যামলকুঞ্জে কাষ্ঠাসনে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল হোটেলে মুখুয্যে মহাশয়কে ত যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই, বিশেষ গল্পটা লিখিয়া বাসাতেই ফেলিয়া আসিয়াছি, ঘড়ি খুলিয়া দেখি রাত প্রায় সাড়ে আটটা, তখনি

ট্রাম গাড়িতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কাগজপত্রগুলি বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া পকেটে পুরিলাম, একবার মুখুয্যে মহাশয়ের খোঁজ করিলাম শুনিলাম তিনি বাহিরে গিয়াছেন, আর অপেক্ষা করা ঠিক নহে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলাম, বহির্দ্বারে তাঁহার সহিত দেখা হইল—তাঁহাকে বলিলাম "চাঁদবালি যাচ্ছি, দুইচার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবো, এখন বিদায় হই।" নদীতীরে পৌঁছিয়া দেখি নৌকো ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই, তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম, "সিগল" জাহাজের একটি উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ কক্ষে আমার স্থান হইল; সমস্ত দিন বড় পরিশ্রম হইয়াছিল শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অতি প্রত্যুষে শত শত স্টীমারের বংশীধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঊষার কনককান্তি পূর্বাকাশে ফুটিয়া উঠিবার পূর্বেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল, কৃষ্ণধূম উদগীরণ করিতে করিতে স্টিমার সবেগে সশব্দে ছুটিয়া চলিল, কলিকাতা ক্রমেই দূরবর্তী হইতে লাগিল এবং তাহার উন্নতশীর্ষ প্রাসাদ শিখর ও কলের চিমনিগুলি মুক্ত প্রভাতলোকে চিত্রবৎ চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তাড়াতাড়িতে পূর্বদিন কোন কাজ ভুল করিয়াছি কিনা একটা চেয়ারে বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, মনে পড়িল একটা কাজ বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মুখুয্যে মহাশয়কে যাওয়ার খবরটাত দিলাম কিন্তু তাঁহার প্রাপ্যের মধ্যে ত এক পয়সাও দিয়া আসি নাই। ভদ্রলোক একেই সেদিন আমার প্রতি অবিশ্বাসের ভাব দেখাইতে ছিলেন, এই ব্যাপারের পর কি আর তাঁহার আমার প্রতি বিশ্বাস থাকিবে? কিন্তু এখন ভাবিয়া আর ফল নাই, ঠিক করিলাম ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি মিটাইয়া দিব।

বৃহস্পতির বেলা ১১টার পর আমাদিগকে চাঁদবালি নামাইয়া দিল। এখান হইতে একটা স্টিমার যাত্রী লইয়া কটক বা পুরী যাইবে বলিয়া আসিয়াছে তাহারা কটকস্টিমারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, আমার ত কটক যাইবার দরকার নাই, সুতরাং একটা হোটেলের সন্ধানে বাহির হইলাম। অল্প চেষ্টাতে একটা হোটেলও পাইলাম, সেখানে আড্ডা লওয়া গেল, একটু বেলা পড়িলে ভ্রমণে বাহির হইলাম, দেখিবার বিশেষ কিছু নাই তথাপি অনেক ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। একটি কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় হোটেলের একজন উড়িয়া চাকর আসিয়া আমাকে বলিল, "দুইজন বঙ্গাড়ি আসিয়াছন্তি আপনক সঙ্গে দেখা কড়িবে।" আমি অবশ্য তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলাম, কিন্তু চাকরটায় কথায় আমার একটু আশ্চর্য বোধ হইল, আমি নূতন এখানে আসিয়াছি কাহারো সহিত আলাপ নাই, আমার পরিচিত কোন ব্যক্তিই বা যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি যে আমার এখানে আসার সংবাদ পাইয়াছেন তাহা মনে হইল না, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময় দুইজন গৌরবর্ণ বাঙ্গালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একজনের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার বোধ হয় আপনিই ধনঞ্জয় মিশ্র।"

তাঁহাদিগকে বসিতে বলিব কি আমি নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, কিন্তু সহসা আমার গল্প মনে পড়ায় উত্তর করিলাম "আজ্ঞে হাঁ আমি এই নামেই পরিচিত বটে কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করি আপনাদের সাক্ষাতের কি প্রয়োজন।"

কোনো উত্তর না দিয়া তিনি আমার হাতে একখানি কার্ড দিলেন দেখিলাম তাহাতে ইংরাজিতে ছাপা আছে :

আর. বানার্জি; ডিটেক্টিভ, বালেশ্বর।

আমি আরো আশ্চর্য হইলাম, বলিলাম, "আপনারা কে তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু আপনারা যে এখানে কেন তাহা এখনো বুঝিতে পারিলাম না।" উত্তর পাইলাম "হ্যাঁ আপনি এ রকম বলবেন তা আমরা অনেকক্ষণ জানি, কিন্তু মশায় আমাদের কাছে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া কিছু কঠিন।" স্বর গম্ভীর কিন্তু শ্লেষপূর্ণ।

আমি বলিলাম "ব্যাপার কি খুলিয়া বলিতে বাধা আছে?"

উত্তর। 'কিচ্ছু না, কিন্তু আমি দুই একটি প্রশ্ন আগে জিজ্ঞাসা করিব।"

আমি বলিলাম "স্বচ্ছন্দে।"

প্রশ্ন। "আপনি স্বীকার কচ্ছেন আপনার নাম ধনঞ্জয় মিশ্র।"

উত্তর। "না ঠিক তা নয় তবে কিনা কলিকাতায় আমি একদিন ঐ নামটা ব্যবহার করেছিলাম।"

প্রশ্ন। 'মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আপনি কলিকাতা ছেড়ে এসেছেন।"

উত্তর। "হ্যাঁ"।

প্রশ্ন। "কলিকাতায় আপনি শিবু মুখুয্যের হোটেলে ছিলেন।"

উত্তর। "নিশ্চয়ই"।

প্রশ্ন। "হোটেলের প্রাপ্য আপনি সমস্ত চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "আমি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া গিয়া—"

আমাকে বাধা দিয়ে সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ব্যস্, আমি আর কিছু শুনিতে চাই না, আপনাকেই আমরা খোঁজ করছি। আপনার অপরাধ কি তা বলিবার পূর্বেই আপনাকে সবাধান কচ্চি যে আপনি বুঝে সুজে উত্তর দেবেন কারণ আপনার কথাই আমরা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করবো।"

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ক্রোধ ও ঘৃণাভরে চিৎকার করিয়া বলিলাম, "কেন আপনারা এরকম প্রলাপ বকচেন, আপনাদের একি বিষম ভ্রম? আমার অনুসন্ধান! আমাকে সতর্ক করে দেওয়া! আমার অপরাধ,—এ সমস্ত কি কথা?"

পূর্বোক্ত ভদ্রলোক উত্তর করিলেন "দেখুন মশাই, বেশি গোলমাল করিবেন না, আপনার অপরাধ আপনাকে বলিলে আশা করি আপনি শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে আসিবেন। আপনার অপরাধ এই যে আপনি খুন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহা স্বীকারও করিয়াছেন, এর অধিক আর আপনাকে বলার প্রয়োজন দেখিনা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা আমার কর্তব্য, আমার সঙ্গে এখন থানায় যাইতে হইবে।"

আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে তাঁহারা কোন গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমি হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ অবগত নহি, কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করে কে? যাহা হউক যখন মন একটু স্থির হইল, তখন তাঁহাদের সহিত থানায় যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। অবিলম্বেই একখানি গাড়ি আনান হইল। আমি চলিতে চলিতে আবার চিন্তামগ্ন হইলাম, ভাবিলাম, বুঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু স্বপ্ন কি কখন এ রকম হয়? ব্যাপারটা যে কি তাহাতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে ইহা নিশ্চয় যে ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে, আমার স্বদেশে এমন লোক কেহ আছেন কিনা জানিনা যিনি আমার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না কিন্তু ডিটেক্টিভের কণ্ঠস্বরে শীঘ্র আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল, তিনি বলিলেন আমাদের এখানেই নামিতে হইবে। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে

পাহারাওয়ালা আমাকে একটা ছোটখাট ঘরে লইয়া গেল, এইটিই থানা, এখানে আমার মোটামুটি জবানবন্দী শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষে আমি আবদ্ধ হইলাম, বলা বাহুল্য আমার সমস্ত আপত্তি বৃথা হইল।

সেই গারদঘরে আমাকে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমি তখনো গল্পের কথা ভুলি নাই, পকেট হইতে ধীরে ধীরে কাগজগুলি বাহির করিলাম, ঘর অন্ধকার বলিয়া তাহা পড়িতে পারিলাম না; কাগজগুলি ঠিক আছে কিনা জানিবার জন্য তাহা গুণিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ১৬খানির পরিবর্তে ১৫খানির বেশি কাগজ পাইলাম না, পুনর্বার গুণিলাম তথাপি ১৫খানি হইল, বড়ই বিরক্তি বোধ করিলাম, কলিকাতা ছাড়িবার পূর্বেই তাহা সম্পাদকের কাছে পাঠান উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে তাহা হয় নাই, এখন আবার তাহার একখানি হারাইল কোথায় পড়িয়াছে তাহারো ঠিক নাই।

ইহার পরই আমার মনে হইল গল্পের কোন্ কাগজখানি হারাইয়াছে দেখিতে হইবে, পূর্বেই বলিয়াছি ঘর অন্ধকার সুতরাং সে বিষয়েও কিছু সুবিধা করিতে পারিলাম না।

একবার দুইবার নহে, দশবারোবার পকেটে হাত দিয়া খুঁজিলাম, সে কাগজ আর পাইলাম না, পকেটে থাকিলে ত পাইব। তখন মনে হইল হয়ত সেখানি কলিকাতার হোটেলেই তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি; অনেকক্ষণ পরে একজন চাপরাসি আসিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিল, আমি আর একবার পকেট হইতে কাগজগুলি বাহির করিলাম, বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্ষীণ দীপালোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গল্পের সর্বাপেক্ষা মনোহর অংশ যে কাগজ খানিতে ছিল সেইখানিই হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই কাগজখানিতে দুরাচার ধনঞ্জয় মিশ্রের (আমার গল্পের নায়ক) আত্মদোষ স্বীকারের কথা বর্ণিত হইয়াছিল।

হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, "এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা কতক কতক বুঝিতে পারচি' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "চাপরাসী!"

"এৎনা গোল মাৎ করো" বলিয়া চাপরাসী জানলার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিল; তাহার দীর্ঘ গোঁফশোভিত মুখখানি দেখিলে দুর্গাঠাকুরাণীর চালে অঙ্কিত শুম্ভ নিশুম্ভর চেহারা মনে পড়ে, কিন্তু তখন মনে মনে তাহার চেহারা সমালোচনার সময় ছিল না, সাগ্রহে তাহাকে বলিলাম "দেখ বাপু যে দুইজন ভদ্রলোক আমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার এখনি একবার দেখা করা দরকার।"

অবিলম্বে পূর্বকথিত ডিটেক্টিভদ্বয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহলে তুমি দোষ স্বীকার করচো?"

আমি বলিলাম, "তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ইতিপূর্বে আমার দোষ স্বীকারের কোন লিখিত প্রমাণ এই রকম একটা কাগজে পাইয়াছেন কিনা অনুগ্রহ করে বলুন।" আমি পকেট হইতে কাগজগুলি বাহির করিলাম। পূর্বে যাঁহার সহিত আমার কথা-বার্তা হইয়াছিল, তিনি উত্তর করিলেন, "এ সমস্ত সংবাদ আমরা এখন পর্যন্ত জানিতে পারি নাই, সুদ্ধ খুন অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য টেলিগ্রাম সংবাদ পাইয়াছিলাম।"

অতিকষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিলাম, অল্পক্ষণ পরে সংবাদ পাইলাম টেলিগ্রাম আসিয়াছে কলিকাতা হইতে একজন পুলিশ কর্মচারী আমার বিষয় তদন্তের জন্য আসিতেছেন, আগামী কল্যই চাঁদবালি পৌঁছিবেন।

কি যন্ত্রণায় যে সেদিন ও তৎপর দিবস সমস্ত প্রভাত অতিবাহিত করিলাম তাহা আর বলিয়া

প্রকাশ করা যায় না। বেলা ১২টার সময় কলিকাতার পুলিশ আসিয়া পৌঁছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমি একটি গল্প লিখিতেছিলাম, লিখিত খোলা কাগজগুলি আনিবার সময় ঘটনাক্রমে একখানি কাগজ বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছি, এই বলিয়া সেই ১৫খানি কাগজ তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি সেগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আপনি এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলেন, কলিকাতায় আপনার কথা নিয়ে ভারি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য অনেক জায়গাতেই টেলিগ্রাম হয়েছে, সে কথা যাক্ কিন্তু আপনি আপনার গল্পের নায়কের নাম কেন যে নিজের নাম বলে ব্যবহার কল্লেন তাত বুঝতে পারি নে।"

আমি বলিলাম "আমার নামটি সুদীর্ঘ আর হোটেলের মুখুয্যে মশায় যে সময় আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিক সেই সময় আমি ধনঞ্জয় মিশ্রের কাহিনী লিখছিলাম, সুতরাং নিজের নাম না ব'লে কি কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে বল্লেম "আমার ধনঞ্জয় মিশ্র।" তখন কি আর জানি যে এর জন্যে অত ভুগতে হবে?"

পুলিশ কর্মচারীটি বলিলেন "বুধবারের বেলা দুইপ্রহরের সময় হোটেলের" সেই ব্রাহ্মণ আমাদের আপিসে এসে চুপে চুপে বলে যে একজন খুনী এসে আমার হোটেলে ছিল, এক পয়সাও দিয়ে যায় নি, কাল রাত্রে পালিয়েছে, ব'লে গেল 'চাঁদবালি যাচ্ছি' কোথায় যে গিয়েছে তা জানিনে, সে কাকে একটা পত্র লিখেছিল তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে। এই বলিয়া একখানি ডাকের কাগজে লেখা পত্র আমাদের দিয়ে গেল, আমরা সেই পত্র দেখেই চারিদিকে টেলিগ্রাম করেছি, খবরের কাগজওয়ালারাও খুব লিখছে, এমন ভুল মানুষের হয়, কি বিপদ।"

হাসিতে হাসিতে তিনি আমার সেই সমস্ত বিপদের কারণ গল্পের পাতাখানি আমার হাতে দিলেন, তাহাতে কি লেখা ছিল জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইলেন। পত্র খানিতে যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম এই ঃ

"আমার নাম ধনঞ্জয় মিশ্র নয়, যে লোকের এই নাম ছিল, তাহার বাড়ি এলাহাবাদে, ঢাকায় তাহার একখানি অলঙ্কারের দোকান ছিল, আমি তাহার দোকানের মুহুরী, একদিন লোভে পড়িয়া রাত্রে তাহাকে হত্যা করি ও মাটিতে পুঁতিয়া রাখি, নানা কৌশলে প্রথমে আমি পুলিশকে আমার প্রতি সন্দেহ করিতে দিই নাই, আন্দোলন একটু কমিলে ইতিপূর্বে যে টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া চম্পট দিই। কিন্তু পাপীর মনে শান্তি কোথা, অশান্তভাবে দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সংবাদ পাইলাম পুলিশে আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে সুতরাং আবার পলায়ন করিলাম, কোথায় যাইব জানি না, বাঁচিবার আর আগ্রহ নাই, কিন্তু তুমি আমার আর অন্বেষণ করিও না, এ জগতে বোধ হয় আর দেখা হইবে না, ইতি—"

পাঠ হইলে আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, উপস্থিত কর্মচারী ও অন্যান্য দর্শকগণও হাসিয়া অস্থির। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, কলিকাতায় পৌঁছিয়া থানায় আসিলাম, আমার সঙ্গের কর্মচারী সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, বন্ধুবান্ধবগণও উৎকণ্ঠিত চিত্তে থানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া মুখুয্যে মশায়ের হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। মুখুয্যে মহাশয় তাড়াতাড়ি আমার জন্য জলখাবার আনিতে দিলেন এবং অনুতপ্তস্বরে বলিলেন, "তাই ত আপনার মত ভদ্রলোকের দ্বারা এরকম কাজ হবে না আমি আগেই জানি, তবে কি না পুলিশের লোক বড় খারাপ, একটুতেই তোলপাড় করে তোলে।"

সেই পর্যন্ত আমার গল্প লেখার উৎসাহ অনেকটা শীতল হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি

প্রজাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছদ

শ্রীবিলাসবাবুর বিবাহিত-জীবন সুখের ছিল কি দুঃখের ছিল, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী সরোজবাসিনী যে তাঁহাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন, তাহার পরিচয় শ্রীবিলাস শত সহস্রবার পাইয়াছেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধুররাশির মধ্যে, মাঝে মাঝে মধুমক্ষিকার হুলের দংশনজ্বালা অনুভব করিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। আসল কথাটা এই যে, তাঁহার স্ত্রীটি কিছু মুখরা ছিল। আর শ্রীবিলাসও বোধহয় একটু অযথা পরিমাণে অভিমানী ছিলেন। তাই মাঝে মাঝে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনের ঐক্যতান বাদনের সুর সহসা কাটিয়া গিয়া আগাগোড়া খাপছাড়া হইয়া যাইত।

পূর্ব্বের কথা এই। শ্রীবিলাসের শ্বশুর হরগোপালবাবু—লক্ষ্ণৌয়ের সেই প্রসিদ্ধ হরিগোপালবাবু। ও অঞ্চলের লোক কে না তাঁহার নাম শুনিয়াছে, এবং—ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পরিচিত হউক, অপরিচিত হউক,—কোন্ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী তাঁহার বাড়ীতে অন্ততঃ একটিবারও পাত পাড়ে নাই? তিনি বাসায় রাখিয়া খাওয়াইয়া, পরাইয়া, কত লোকের যে চাকুরি করিয়া দিয়াছেন তাহার কি সংখ্যা আছে? আহা, ওদিককার গরীব লোকে আজিও তাঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়া মরে! সে কথা যাউক,—তাঁহাদের মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা বাঙ্গলাদেশে দুই তিনখানি মাত্র গ্রামে তাঁহাদের "ফেরতা ঘর"—অর্থাৎ যাহাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে—ছিল। পাত্র জুটানই মুশকিল ছিল; কিন্তু যদি পাত্রও বা জুটিল, তবে হয় সে একটি হস্তীমূর্খ, না ত একেবারে নিঃস্ব। একবার তিনি পূজার সময় সপরিবারে কাশীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় পিতৃমাতৃহীন দশ বৎসর বয়স্ক শ্রীবিলাস তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পড়িল। তাহাকে স্বজাতীয় এবং "স্বঘরের" দেখিয়া হরিগোপালবাবু আগ্রহের সহিত কুড়াইয়া লইলেন; এবং লক্ষ্ণৌয়ে লইয়া গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেটির সৎ স্বভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া, তখন হইতেই তাহাকে স্বীয় ভাবী জামাতা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। সেইভাবেই লালনপালন এবং শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। আঠারো বৎসরক বয়সে শ্রীবিলাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তখন কন্যার বয়ঃক্রম বারো বৎসর হইয়াছে দেখিয়া হরিগোপালবাবু দুইজনকে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বাঁধিয়া দিলেন। এই শুভ ঘটনার পর তিনি একবৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন।

শ্রীবিলাস তখন এফ-এ পড়িতেছে। হঠাৎ তাঁহার শ্বশুরমহাশয়ের বসন্তরোগে মৃত্যু হইল।

এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় শ্রীবিলাসের পড়া বন্ধ হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাঁহার শ্বশ্রুঠাকুরাণী বলিলেন, —"চল বাছা, আমরা দেশে গিয়ে থাকি। এই যমপুরি লক্ষ্ণৌ সহরে আমি আর একদিনও টিকিতে পারিব না"।

তাহাই হইল। লক্ষ্ণৌয়ের ত্রিতল বাড়ীটা একপ্রকার সিকি মূল্যেই বিক্রীত হইল। জিনিসপত্র কত বিক্রিত, কতক বিতরিত এবং অবশিষ্ট গোলমালে অপহৃত হইল। দিন পনের কুড়ির মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার। তখন সেই পরিবার চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবিলাসের স্ত্রী, হরিগোপালবাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সরোজবাসিনীর আর দুই ভগ্নী এবং একটি ভ্রাতা ছিল। ভগ্নী দুইটি নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে ছিল। ভ্রাতাটির নাম সতীশ, সাত আট বৎসর বয়স। সুতরাং শ্রীবিলাসই এখন এ পরিবারের অভিভাবক। দেশে বাস করিতে লাগিলেন। বৎসরখানেক ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ একে একে আসিয়া বিগত দুর্ঘটনার জন্য সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। সকলেই গৃহিণীকে কহিলেন,—"জামাইটিকে বসাইয়া রাখা ভাল হইতেছে না। ইহাকে কলিকাতার কলেজে পাঠাইয়া দাও। ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ত কোন বিষয়ের অভাব নাই!" —বিধবা এই পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। শ্রীবিলাস কলিকাতায় গিয়া এফ-এ, বি-এ এবং দুইবার অনুত্তীর্ণ হইবার পর আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপ সাত আট বৎসর অতীত হইল।

শ্রীবিলাসের এখন সাতাশ আঠাশ বৎসর হইয়াছে—কিন্তু এ পর্যন্ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। স্বামীর উপর সরোজবাসিনীর আরও অসন্তোষের কারণ ছিল যে, তাঁহার এতখানি বয়স হইল, তথাপি তিনি সিকি পয়সাও উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সকল কারণে শ্রীবিলাস স্ত্রীর নিকট কিছু অপ্রতিভ হয়ে থাকতেন। এই সময় তাঁহার আইন পরীক্ষার শেষ ফল বাহির হইল। এখন হইতে নিজেকে আর নিতান্ত অপদার্থ জীব বলিয়া মনে হইত না। সরোজবাসিনী তাঁহার অকৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে, আর মৌনভাব সহ্য না করিয়া একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে সরোজবাসিনীর সর্ব্বাঙ্গটা জ্বলিয়া যাইত। এইরূপে আরও কয়েক মাস কাটিল।

বঙ্গদেশের দূষিত জলবায়ুর প্রভাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়রূপ ষ্টিমহ্যামারের সুদীর্ঘ কালব্যাপি ক্রিয়ায় শ্রীবিলাসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া ছিল। তাই তিনি পরামর্শ করিলেন পাটনায় গিয়া ওকালতীর ব্যবসা করিবেন। শ্বশ্রু বলিলেন,—"সেই ভাল, তুমিও সেখানে ওকালতী কর, আর সতীশও স্কুলে পড়ুক।" শুভদিনে দুইজনে পাটনা যাত্রা করিলেন। পাটনার আদালত ইত্যাদি বাঁকীপুরে। সেইখানে বাসা করা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রীবিলাস এখনও ভাল পসার জমাইতে পারে নাই, কোনও মাসের আয়ে বাসা খরচটার সঙ্কুলান হয়—কোনওমাসে তাহাও হয় না। প্রথমে উকিলি পাস করিয়া শ্রীবিলাসের মনে যে আত্মমর্যাদার উন্নত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। সরোজবাসিনী আসিয়াছেন। সতীশ স্কুলে পড়িতেছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ পর্যন্ত

বরাবর শ্রীবিলাসকে টাকা যোগাইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এখন ভারি অসন্তোষের ভাব। তিনি দেশে প্রায়ই আত্মীয় প্রতিবেশীদের কাছে স্বীয় মৃত স্বামীর দোষ দিয়া বলিতেন,—"দেখ দেখি, এমন জামাই করিয়া গেলেন যে তাহার টাকা যোগাইতে যোগাইতে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতে হইল। খতাইয়া দেখ, যে টাকা খরচ হইয়াছে, ইহার অর্ধেক টাকা বিবাহে ব্যয় করিলে একটা রাজা জামাই পাওয়া যাইতে পারিত। এত টাকা খরচ করিলাম, তবুও জামাইটি মানুষের মত হইল না।" ইদানীং শ্রীবিলাসও নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শাশুড়ীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছিলেন, কারণ "গতিরন্যথা" ছিল না।

যখনকার যাহা, ঠিক সেই সময়ে মানুষের যদি তাহা হয়, তবে আর কোনই গোল থাকে না। কিন্তু শতকরা নিরানব্বুই জনের অদৃষ্টে তাহা ঘটে না। একে ত শ্রীবিলাসের ত্রিশ বৎসর বয়স হইলেও সন্তান হইল না;—হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর ঘরে ইহা একটা সামান্য দুর্ভাগ্যের কথা নহে। তাহার উপর উপার্জ্জন আশানুরূপ ত নহেই—প্রয়োজনানুরূপও নহে। এই দুইটি কারণে তাঁহার জীবনটা দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইত। এ সমস্ত বেশ সহ্য হয়, যদি পত্নী অনুকূলা হয়েন। এমন কোন্ সাংসারিক কষ্ট আছে, যাহা দাম্পত্য প্রণয়ের স্নিগ্ধমধুর স্পর্শে নিতান্ত লঘু হইয়া না যায়? কিন্তু শ্রীবিলাসের স্ত্রী প্রণয়বতী হইলেও এই দুইটি ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সে দিন রবিবারের সন্ধ্যা। সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছিল। আমাদের উকীলবাবুর বৈঠকখানা ঘরে একটিও মক্কেলনামক সেই প্রিয়দর্শন জীব উপস্থিত ছিল না। শ্রীবিলাস এই বর্ষা প্রদোষে একাকী বসিয়া সুর করিয়া ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গ পড়িতেছিলেন। ক্রমে সেই স্থানে আসিলেন ঃ

শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে
শয্যাগৃহং গুরুগৃহাং প্রবিশন্তি নার্য্যঃ।

এই স্থানটি পড়িয়া তাঁহার মনে দাম্পত্যভাব অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিল। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উপন্যাসলোকবাসী নবপ্রণয়ীর ন্যায় ধীরমন্থরগতিতে অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে স্ত্রী নাই। দাসী জানাইল, ঠাকুর পলাইয়া গিয়াছে; সেই জন্য 'মা-জী' স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত আছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীবিলাস বাহিরে ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন—এমন সময় সরোজবাসিনী প্রবেশ করিলেন; আজ অকস্মাৎ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের তিরোভাবে সরোজা যে অন্নপূর্ণা-পদাভিষিক্তা হইয়াছেন, এই মর্ম্মে একটা পরিহাস করিলেন, কিন্তু সরোজবাসিনী মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া মুখ ফিরাইলেন। শ্রীবিলাস নাকি এই সরোজার সহিত অনেক দিন হইতে ঘর করিতেছেন—এই কারণে তিনি এরূপ আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তখন কাব্যলব্ধ নায়কভাব বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত সাধারণ সাংসারিকজনোচিত প্রশ্ন করিলেন—"আজ আবার বাবাজীর কী হইল?"

সরোজবাসিনী নিরুত্তর। শ্রীবিলাস দাঁড়াইয়া ছিলেন, পালঙ্কের উপর বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"আর পারাও যায় না। এমন ক'রে তিনদিন অন্তর ঠাকুর পালালে—"

সরোজবাসিনী বাধা দিয়া বলিলেন—"সস্তার ঠাকুর ঐ রকমই হয়ে থাকে। তিন টাকার মাহিনায় কি আর ভাল ঠাকুর হয়?"

শ্রীবিলাস স্ত্রীর এই কয়টি সামান্য কথাতেই নিতান্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনে হইল, স্ত্রী এই উক্তিতে তাঁহার অকৃতিত্বের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। স্মরণ হইল সেই বাল্যকালে সরোজবাসিনীর পিতা কি শোচনীয় অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন—তিনি ত এক

প্রকার পথের ভিক্ষুক হইতেই চলিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী বাল্যকাল হইতে শ্রীবিলাসকে স্বীয় পিতার অন্যদাস বলিয়াই জানিতেন—এখন সংস্কৃত মন্ত্র বলিয়া বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই কি ঘৃণার ভাব তিরোহিত হইবে? তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে স্থির করিলেন, এই উক্তিতে তাঁহার "প্লীবিয়ন্ অরিজিনের" প্রতিও বক্রকটাক্ষপাত আছে—অর্থাৎ তাঁহার নজর ছোট, তাই তিনি তিন টাকায় রসুয়ে বামুন রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিলাস এই কল্পিত অপমান সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন—ইহা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাসের ফল। বলিলেন—"আজ থাক্। বাজার থেকে জলখাবার আনিয়ে নেওয়া যাবে এখন। তুমি বস।"

সরোজবাসিনী যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন। শ্রীবিলাস কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া সাদরে বলিলেন—"চল"। সরোজবাসিনী একটা যন্ত্রণাসূচক উহুহু শব্দ করিয়া হাত টানিয়া লইলেন।

শ্রীবিলাস সভয়ে দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে?"

সরোজবাসিনী বলিলেন—"হয়েছে আমার মাথা ও মুণ্ড" (যেন মাথা ও মুণ্ড দুইটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ)।

শ্রীবিলাস হাত টানিয়া দেখিলেন—অনেকটা স্থান পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে সাদা সাদা ঔষুধ লেপিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল;—বলিলেন "আহাহা, বড় কষ্ট হয়েছে ত! কেন তুমি রান্নাঘরে গেলে? ছিঃ এমন অসাবধান!"

বেশ চলিতেছিল এবং সম্ভবত নিরাপদে গোলমাল চুকিয়া যাইত; কিন্তু এই শেষের কথাটিই সব মাটি করিয়া ফেলিল! "এমন অসাবধান"! —সরোজবাসিনী আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল। সে চিরকাল ধনী পিতামাতার আদরের মেয়ে ছিল;—তাহাকে কখনও কোন গৃহকার্য্য করিতে হয় নাই। রন্ধনাদি সম্বন্ধে তাহার একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং সরোজবাসিনী রন্ধনশালায় অসাবধান, একথা তাহার পক্ষে কোন দোষেরই নয়; তথাপি তাহার সহ্য হইল না যে, স্বামী তাহাকে অসাবধান বলিয়া তিরস্কার করিবেন। সে ক্রোধ ও ক্রন্দনের মিশ্রিত স্বরে শ্রীবিলাসকে কতকগুলি চোখা চোখা বাক্যবাণ হানিয়া দিল। স্বামী মহাশয়ও নিতান্ত নীরব রহিলেন না। ফলকথা সে রাত্রে শ্রীবিলাস বৈঠকখানা গৃহে শয়ন করিলেন। সেই বালক সতীশ অনেক জিদ করিয়া দুইজনকে কিছু খাওয়াইল, নহিলে অভুক্ত অবস্থাতেই উভয়ের রাত্রি কাটিত।

তৃতীয় পরিচ্ছদ

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে শ্রীবিলাস শাশুড়ীঠাকুরাণীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল—"এক নিকট আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, অতএব সরোজবাসিনীকে পাঠাইয়া দিলে ভালো হয়।" শ্রীবিলাসের আর্থিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ইহাও লেখা ছিল যে, "যতদিন ভালরূপ পসার না হয় ততদিন সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া অনর্থক খরচা বাড়াইবার প্রয়োজন কি?" —শ্রীবিলাস নিশ্চয় স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাতেন, যদি এ আর্থিক অসচ্ছলতার কথাটার উল্লেখ না থাকিত। ইহা তীরের মত আসিয়া তাঁহার সম্প্রতি ক্ষতবিক্ষত আত্মাভিমানকে বিদ্ধ করিল। তিনি যথাসময়ে বালক সতীশের হাতে এই পত্রখানি স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন।

সরোজবাসিনী বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি যাইব, সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বল।" শ্রীবিলাস ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন—এখন কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না; তাহার প্রত্যুত্তরে আর সরোজবাসিনী কোন কথা বলিয়া পাঠাইলেন না; পরন্তু জননীর সেই পত্রখানি লইয়া যে অংশে শ্রীবিলাসের অর্থকষ্টের উল্লেখ ছিল, সে অংশটি মোটা পেন কলম দিয়া লাল কালীর দাগ করিয়া ফিরিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীবিলাস অন্যমনস্কভাবে সে পত্র লইয়া পকেটে ফেলিয়া রাখিলেন—তখন আর খুলিয়া দেখিলেন না। আহারাদি করিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। কাছারি হইতে প্রায়ই তাঁহাকে খালি পকেটে ফিরিতে হইত। সে দিন দৈবাৎ পকেট্‌টা কিছু ভারি করিয়া ফিরিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। শুনিলেন তিনটার প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে সতীশকে লইয়া "মা-জী" প্রস্থান করিয়াছেন।

শ্রীবিলাসের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী প্রায়ই তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া তাম্রকূট সেবা করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীবিলাস ও পাড়ার অন্য সকলে ঠাকুরদাদা পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাদার সংস্কৃতটা কিছু পড়া ছিল;—ইংরাজিও অল্প জানিতেন; এ কালের লোক-জন, আচার-ব্যবহার, এ সকলের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ভ্রম ছিল—তিনি বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশের ভুল করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষটাকে কোম্পানীর রাজ্য বলিয়াই উল্লেখ করিতেন। এই ঠাকুদাদা মহাশয়, শ্রীবিলাসের স্ত্রীর পলায়ন সংবাদ পাইবামাত্র, হেলিতে দুলিতে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন বর্তমান সময়ে স্ত্রীলোকগণের এই প্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুই চারিটা শাস্ত্র-বচন আওড়াইয়া প্রমাণ করিলেন, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ প্রবলা ও উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া উঠিলে সমাজের আর ভদ্রস্থতা নাই;—এমন কি কলির শেষ অবস্থা ঘনাইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীবিলাসের এখন এই সমস্ত কথা নিরতিশয় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এমন কিছু জিদ করিয়া লেখেন নাই যে, পাঠাইতে হইবে—এমন কোনও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না;—এই দেখুন না পত্রখানা। বলিয়া পত্রখানা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিলেন। পত্র খুলিবামাত্র লাল কালীর মোটা মোটা দাগ উভয়ের চক্ষে পড়িল।

ঠাকুরদাদা বলিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিলে?"

শ্রীবিলাসের বুঝিতে বাকী রহিল না দাগ কে দিয়াছে। ক্ষোভে, অপমানে তাঁহার সর্ব্বশরীর সর্পদষ্ট মনুষ্যের মত ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। স্বর বন্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

ঠাকুরদাদা এতক্ষণ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পাঠ শেষ হইলে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কালীর দাগ কে দিয়েছে হে?"

শ্রীবিলাস প্রথমবারে কথা কহিতে পারেন নাই বলিয়া ঠাকুরদার প্রশ্নের উত্তর দেন নাই; এবার বলিলেন—"যখন আমি পত্র খুলি, তখন এ দাগ ছিল না। আমার স্ত্রী এ দাগ দিয়াছে; তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখিলে একবার স্ত্রীলোকের স্পর্ধা দেখিলে। স্বামী—যে স্বামী গুরুর গুরু—তাহার এমন করিয়া অপমান। হায়রে কলিকাল! এই বয়সে (ষষ্ঠি বৎসরের কম ত নহে!)

কত দেখিলাম, আরও কত দেখিতে হইবে! এমন শয়তানি স্ত্রীলোকের নরকেও স্থান হইবে না। মনুর আইন—

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে।

অর্থাৎ কিনা যে স্ত্রী আপনাকে ধনিকন্যা বা রূপবতী মনে করিয়া ভর্ত্তারং—নিজ পতিকে লঙ্ঘয়েৎ—অর্থাৎ অপমানিত করে, রাজা তাহাকে বহুসংস্থিতে—কিনা অনেক লোকের সমক্ষে আনিয়া শ্বভিঃ বলতে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াইবেন।—কিন্তু এখন মনুর আইন চলে না—এখন হনুর রাজ্য। কিন্তু শ্রীবিলাস তুমি যদি এই অপমান, এই নারীপদাঘাত সহ্য কর, তবে ধিক্ ধিক্ তোমাকে। তোমায় ধিক, তোমার পুরুষত্বে ধিক। তুমি আবার বিবাহ করিয়া ও স্ত্রীকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও।"

শ্রীবিলাস চুপ করিয়া মনের মধ্যে কথাটা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরদাদার বক্তৃতার স্রোত পুনরায় খুলিয়া গেল। বলিলেন—আজকাল ইংরাজি পড়িয়া লোকে স্ত্রীগুলাকে আদর দিয়া দিয়া—মাথায় চড়াইয়া চড়াইয়াই ত এই সর্ব্বনাশটা করিল। সাহেব বেটাদের মত স্ত্রৈণ জাতি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই—ইস্টেশনে দেখিয়াছি—বেটারা বেটীদের মাথায় ছাতা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়—যেন খানসামা! সেই সাহেবের শিষ্য ত তোমরা। তুমি যদি স্ত্রীর এই অতি গর্হিত আচরণ ক্ষমা কর—প্রশ্রয় দাও—তবে তাহার দেখাদেখি দশটা ভাল প্রকৃতির স্ত্রীলোকও বিগড়াইয়া যাইবে। আর যদি তুমি যথার্থ পুরুষ হও—ইহার উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, তবে ভয় পাইয়া দশটা বজ্জাৎ স্ত্রীও শান্ত হইয়া আসিবে। এটা একটা সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে শ্রীবিলাস! কোম্পানী বাহাদুর যে খুনীর ফাঁসী দেন, সে কেন? খুন হইল, কোম্পানীর একটা প্রজা গেল। আর একটা প্রজার প্রাণ বধ করিয়া রাজস্ব কমাইবার প্রয়োজন কি? না—দশ জনে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিবে—বাপ্‌রে, খুন করলে ত ফাঁসী যেতে হয়! সুতরাং তুমি আর ইতস্ততঃ করিও না। এই ১৭ই দিন আছে, বিবাহ করিয়া ফেল। আরি পাত্রী স্থির করিবার ভার লইলাম।"

অবস্থাবিশেষে পড়িয়া মানুষের মন যে কি ভয়ানক পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উনবিংশতি শতাব্দীর এই শেষ ভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত যুবক শ্রীবিলাস,—মিল্, বেক্‌ন, কার্‌লাইলের ছাত্র শ্রীবিলাস,—মিল্টন—সেক্সপিয়ার—শেলি—মাইকেল—বঙ্কিম—রবীন্দ্রের কাব্যোদ্যানের মধু-রসগ্রাহী শ্রীবিলাস, অম্লান বদনে বলিল,—"আমি বিবাহ করিব!"

পঞ্জিকার মতে শুভদিনে ও শুভক্ষণে, এই পরম অশুভকর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

আশা করি, আমার পাঠকেরা না বলিলেও বুঝিতে পারিবেন যে, কন্যাটি বক্তৃতাকারী ঠাকুরদাদার অতি নিকট-সম্পর্কীয়া।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীবিলাসের একটু পসার বাড়িয়াছে, কিন্তু মনের শান্তি বহুদূরে নির্ব্বাসিত।

সরোজবাসিনী পিত্রালয়ে। তাহার যে কি অবস্থা হইয়াছ, তাহা আর লিখিবার প্রয়োজন কি? সে গর্ব্বিতা মদোদ্ধতা, সরোজবাসিনী এখন "ধরার ধূলির চেয়ে নীচে হইয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনায় তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। বাড়ীর লোক, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক, আত্মীয় কুটুম্বালয়ের লোক, তাহাকে একবাক্যে নিন্দা করিতেছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, গ্রামে যেখানে সেখানে সরোজবাসিনীর কথা উঠিলেই অমনি পাঁচজনে বলে—"ছি ছি ছি—এমন বুদ্ধি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিল! একটা সামান্য জিদের জন্য চির-জীবনটার দুঃখ কিনিল! গলায় দড়ি!"—ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সরোজার মরিবার ইচ্ছা করিত।

এই সময়ে সরোজার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সরোজার হস্ত ধারণ করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন—"মা, আমার এই শেষ অনুরোধ এটি রাখিও। পুরুষ স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর গতি নাই। তুমি স্বয়ং বাঁকীপুরে যাইয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। সতীন হইয়াছে, তার জন্য আর কি করিবে মা? সতীন ত কত লোকের থাকে। আজকালই কমিয়াছে—নাহিলে সে কালে সতীনের জ্বালা ভোগে নাই এমন কয়টা স্ত্রীলোক ছিল? তুমি পূর্ব্বজন্মে কোনও গুরুতর পাপ করিয়াছিলে, তাহার ফলে এই কষ্ট পাইতেছ। এই জন্মে ভাল করিয়া ভক্তি করিয়া পতিসেবা কর, পরজন্মে আবার ভাল হইবে। আমি চলিলাম—তুমি পিতৃহীন ছিলে, মাতৃহীনও হইলে। এখন আর কে তোমার আশ্রয় রহিল মাত্র। আমার এ অনুরোধ না রাখিলে পরলোকে আমি শান্তি পাইব না।"

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মা, অত করিয়া বলিতে হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।"

সরোজার মাতার মৃত্যু হইল। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাসময়ে এক রকম করিয়া সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে বাড়ীঘরের বন্দোবস্ত করিয়া, সতীশকে লইয়া সরোজবাসিনী বাঁকীপুরে যাত্রা করিলেন। পৌঁছিয়া, একেবারে গিয়া শ্রীবিলাসের বাসায় উঠিলেন। শ্রীবিলাস তখন কাছারিতে। চাকর-বাকরেরা, "মা জী" আসিয়াছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল প্রশ্নাদি করিয়া আপ্যায়িত করিলেন। বাড়ি ঘর দুয়ারের আর সে শ্রী নেই—দেখিয়া সরোজার চক্ষে জল আসিল। কোথাকার জিনিষ কোথায় পড়িয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। বিছানাগুলার আচ্ছাদন নাই। আলমারি টেবিল, সিন্দুক, বাক্স ধূলায় বুজিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলায় মাকড়সার জাল। ঘরের কোণে তামাকের গুল, ছাই ছড়ান। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে। একদিকটা ত একেবারে জঙ্গল বলিলেই চলে। দাসদাসীরা আপনা হইতে এ সব করে না,—কেহ তাহাদিগকে করিতে বলেও না। সরোজবাসিনী তাহাদিগকে লইয়া কার্য করিতে লাগিয়া গেলেন সমস্ত ঝাড়িয়া ধুইয়া মুছিয়া সাজাইয়া যথাসম্ভব পারিপাট্যবিধান করিলেন। ঘটী বাটী ইত্যাদি ব্যবহারের জিনিষগুলা মাজাইয়া ঘসাইয়া তক্‌তকে ঝকঝকে করিয়া ফেলিলেন তাহার পর বেলা পড়িলে রসুই-ঘরে গিয়া স্বহস্তে নানাপ্রকার জলখাবার প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মনে হইল, সে সব দিনে মিলনের এইরূপ অনতিপূর্ব্বে কি উৎকণ্ঠা, কি হয় কি চঞ্চলতা আসিয়া বুকের ভিতর দৌরাত্ম্য করিত! আর আজ এ কি ভাব! ভাবিতে ভাবিতে সরোজার মুখখানি যেন মেঘ করিয়া আসিল।

শ্রীবিলাস কাছারি হইতে ফিরিলেন। প্রথমেই বাহিরে সতীশের সাক্ষাৎ পাইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। বাড়িতে প্রবেশ করিবেন—পা যেন উঠে না।

সরোজার সঙ্গে দেখা হইল। উভয়ের তখনকার মনের ভাব কে বর্ণনা করিবে? অনেক পুরাতন কথা মনে আসিয়া উভয়ের চক্ষে জল বহাইল। সেই রাত্রি সে দম্পতির কি ভাবে কাটিল কে বলিতে পারে? দিনের দিন দিন গেল, সংসার চলিতে লাগিল; কাহারও মনে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই; অথচ উভয়ে স্বামী স্ত্রী সাজিয়াই সংসার করিতে লাগিল।

আমার পাঠকেরা না হউন, পাঠিকারা নিশ্চয়ই শ্রীবিলাসের কৃত দুষ্কর্মের প্রতিফলন স্বরূপ তাহার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার চিত্র দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহা হইতে পাইল না। শ্রীবিলাসের নবপরিণীতা বধূটি বঙ্গদেশের এক নিভৃত গ্রামে, জ্বর ও প্লীহায় ভুগিতেছিল। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিল্।

শ্রীবিলাস বিবাহ করিয়া অবধি শুভদৃষ্টির বস্ত্রাবরণ মধ্যে ভিন্ন সে স্ত্রীর সাক্ষাৎ পান নাই। ফুলশয্যার রাত্রে কম্প দিয়া তাহার ত ভারি জ্বর আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে শ্রীবিলাসের কোনও কষ্ট হইবার কথা নহে। আমাদের সরোজবাসিনীও আদর্শ রমণী নহেন; তিনি সপত্নীর মৃত্যু সংবাদে খুশী হইয়া দাস দাসীকে বখ্সিস্ এবং দেবতাকে হরিলুট দেন নাই বটে;—কিন্তু তাহার পর হইতে হাসিতে গল্পের মনের প্রফুল্লতা ও লঘুভারের যথেষ্ট পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীবিলাসেরও অনুতাপক্লিষ্ট মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা দিন দিন দূর হইতে লাগিল।

এখন হইতে এই দম্পতি, প্রত্যেক উপকথার নায়ক নায়িকার মতই, সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভেদ এই যে শ্রীবিলাস এখনও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই; এবং শত পুত্রের একটি মাত্র এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আলোক দর্শন করিতে পাইয়াছে।

ছেলেধরা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দু'টি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নিচে পোঁতা হয়ে গেছে, বাকি শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরি হয়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানির নিযুক্ত ছেলে-ধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তাদের কারও পোশাক ভিখারির, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠিহাতে ডাকাতের মতো—এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লিবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রইল না যে এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে।

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছমছম ভাব। আবার তার ওপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েচে, কাল কড়েয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর! কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছুল। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুজ্যে-দম্পতি। ছেলে-পুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবি করে ঘটি-বাটি তৈজসপত্র; খুড়ি চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন, বলেন হীরু আমাদের মারতে এসেছিল। হীরু বলে, সেই ভাল—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করবো।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলচি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কিনা বল?

খুড়ো বললেন, তোর কিছুই নেই।

নেই?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ি রান্নাঘরের কাজে ছিলেন, বেড়িয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে

আন গে।

হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমাদের বাবাকে ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়তো বেঁচে আছে—তারা এস চুল চিরে আমার বখরা ভাগ করে দেবে।

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। এই তোমাদের বলে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ি বললেন, তোর ভারি ক্ষমতা! যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হ'ল রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরিব মুসলমানদের পল্লি। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মতো লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বললে, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও আরো বক্‌শিশ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

হীরু বললে, এদেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা। লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ—তোমরা মনে করলে পার না কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারেনি?

লতিফ বললে, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ্ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল জোড়া সিদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাবলে হিদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হ'ল। চিনবে কি—কোথায় পালাল তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়িবেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্যন্ত হাত দিতে দেয় না। ওই পাগড়ি, গালপাট্টা, আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে-হুমকি একবার ঝাড়বে তারপর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস।

লতিফ মিঞা হাজির হ'ল। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারা দিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েছেন জগদম্বা। মুখুজ্জ্যেমশাই বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফলমূল ও দুধ। বেতো ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগড়ি, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর-মাখানো।

মুখুজ্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম করে পড়ে গেল—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলেধরা ঢুকেছে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিল—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে, ছুট দিলে—ওগো ছেলেধরা এসেচে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল—সে চাপা গলায় বললে,—আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা শহরের আর কিছু না শুনে থাক, ছেলেধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পৌঁছেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি? পথ অচেনা, আলো এসেছে কমে—চতুর্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল, ধরে ফ্যাল! মেরে ফ্যাল ব্যাটাদের! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালাল ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তারপর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার ওঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইঁট খেয়ে আধমরা হয়ে পড়ল। সে যতই হাতজোড় করে বলতে চায় সে ছেলেধরা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন? ওর পাগড়ি কিসের জন্য? ওর মুখময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে? পাগড়ি তার খুলে গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেচে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকেদের বলেই বা কখন, শোনেই বা কে!

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্চে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা—তারা ছেলেধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলেধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগড়িতে সিঁদুরে-রক্তে মাখামাখি—শুধু হাত-জোড় করছে আর কাঁদচে।

জিজ্ঞেস করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে? কে নালিশ করেচে? তারা বললে, তা কে জানে?

ছেলে কৈ?

তাই বা কে জানে?

তবে এমন করে মারচো কেন?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধহয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে

যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায়?

তারা বলল, মরা হবে কেন, জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হ'ল। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি!

বললুম, ছাড় ওকে! লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে। মুখুজ্জ্যে দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হল।

বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এ-সব কাজে এসো না।

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশায় আর এ-সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায়?

বললুম ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচল এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।

অনেক রাত্রে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা-দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো, কে কোথা আছ,—ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত যতই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত-পেরেত নই, আমি মানুষ।

চীৎকারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে উপস্থিত—আগের ঘটনা গাঁয়ের সাবই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভায়ের ভাগ্যে বড় ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রং-টং ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ এক শ'সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।

স্বয়ম্বরা

রাজশেখর বসু

চাটুজ্যেমশায় পাঁজি দেখিয়া বলিলেন, 'রাত্রি ন-টা সাতান্ন মিনিটে গতে অম্বুবাচী নিবৃত্তি। তার আগে এই বৃষ্টি থামবে না। এতো সবে সন্ধে।'

বিনোদ উকিল বলিলেন, 'তাই তো, বাসায় ফেরা যায় কি ক'রে।'

গৃহস্বামী বংশলোচনবাবু বলিলেন, 'বৃষ্টি থামলে সে চিন্তা ক'রো। আপাতত এখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হোক। উদো, ব'লে আয় তো বাড়ির ভেতর।'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'মসুরডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।'

বিনোদবাবু তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'তা তো হ'ল কিন্তু ততক্ষণ সময় কাটে কিসে। চাটুজ্যেমশায় একটা গল্প বলুন।' চাটুজ্যে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আর-বছর মুঙ্গেরে থাকতে আমি এক বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

বিনোদবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'দোহাই চাটুজ্যেমশায়, বাঘের গল্প আর নয়।'

চাটুজ্যে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'তবে কিসের কথা বলব, ভূতের না সাপের?'

'এই বর্ষায় বাঘ ভূত সাপ সমস্ত অচল, একটি মোলায়েম দেখে প্রেমের গল্প বলুন।'

'গল্প আমি বলি না। যা বলি সমস্ত নিছক সত্য কথা।'

'বেশ তো একটি নিছক সত্য প্রেমের কথাই বলুন।'

নগেন বলিল, 'তবেই হয়েছে, চাটুজ্যেমশায় প্রেমের কথা বলবেন! বয়স কত হ'ল চাটুজ্যেমশায়? আর কটা দাঁত বাকী আছে?'

'প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস? ওরে গর্দভ দাঁতে প্রেম হয় না, প্রেম হয় মনে।'

নগেন বলিল, 'মন তো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রেমের আপনি জানেন কি? সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। প্রেমের কথা বলবে তরুণরা। কি বলিস উদো?'

'তরুণ কি রে বাপু? সোজা বাংলায় বল্ চ্যাংড়া। তিন কুড়ি বয়স হ'ল, কেদার চাটুজ্যে প্রেমের কথা জানে না, জানে যত হ্যাংলা চ্যাংড়ার দল!'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'আঃ হা, কেন ব্রাহ্মণকে চটাও, শোনই না ব্যাপারটা।'

চাটুজ্যে বলিলেন—'বর্ণের শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ। দর্শন বল, কাব্য বল, প্রেমতত্ত্ব বল, সমস্ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণের মাথা থেকে। আবার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ হলেন চাটুজ্যে। যথা বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে।'

'আর?'

'আর এই ক্যাদার চাটুজ্যে। কেন বলব না? তোমাদের ভয় করব নাকি?'

'যাক যাক, আপনি আরম্ভ করুন।'

চাটুজ্যেমশায় আরম্ভ করিলেন, 'আর বছরের ঘটনা। আমি এক অপরূপ সুন্দরীর পাল্লায় পড়েছিলুম।'

নগেন বলিল, 'এই যে বলছিলেন বাঘিনীর পাল্লায়?'

বিনোদ বলিলেন, 'একই কথা।'

চাটুজ্যে বলিলেন, 'ওরে মুখখু, বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিলুম মুঙ্গেরে, আর এই নারীর ব্যাপার ঘটেছিল পঞ্জাব মেলে, টুণ্ডুলার এদিকে। যাক, ঘটনাটা শোন—'

'গেল বছর মাঘ মাসে চরণ ঘোষ বললে তার ছোটমেয়েটিকে টুণ্ডুলায় রেখে আসতে, জামাই সেখানে কর্ম করে কিনা। সুবিধেই হ'ল পরের পয়সায় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ, আবার ফেরবার পথে একদিন কাশীবাসও হবে। মেয়েটাকে তো নির্বিবাদে পৌঁছিয়ে দিলুম। ফেরবার সময় টুণ্ডুলা স্টেশনে দেখি গাড়িতে তিলার্ধ জায়গা নেই, আগ্রার ফেরত এক পাল মার্কিন ভবঘুরে সমস্ত ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের বেঞ্চি দখল ক'রে আছে। ভাগ্যিস জামাই রেলের ডাক্তার, তাই গার্ডকে ব'লে ক'য়ে আমায় একটা ফার্স্ট ক্লাসে তুলে দিলে। গাড়িও তখনই ছাড়ল।

তখন সকাল সাতটা হবে, কিন্তু কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন, গাড়ির মধ্যে সমস্ত ঝাপসা। কিছুক্ষণ ধাঁ ধাঁ লেগে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর ক্রমে ক্রমে কামরার ভেতরটা ফুটে উঠল।

দেখেই চক্ষু স্থির। ওধারের বেঞ্চিতে একটা অসুরের মতন আখাম্বা ঢ্যাঙা সায়েব চিতপাত হ'য়ে চোখ বুজে হাঁ করে শুয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে কি বলছে। দু-বেঞ্চির মাঝে মেঝের ওপর আর একটা বেঁটে মোটা সায়েব মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে, তার মাথার কাছে একটা খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে। এধারের বেঞ্চিতে কেউ নেই, কিন্তু তাতে দামী বিছানা পাতা, তার ওপর একটা অদ্ভুত পোশাক—বোধহয় ভাল্লুকের চামড়ার, আর নানা রকম জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। গাড়ি চলছে, পালাবার উপায় নেই। বেঞ্চির শেষদিকে একটা চেয়ারের মতন জায়গা ছিল, তাইতে বসে দুর্গানাম জপতে লাগলুম। কোনও গতিকে সময় কাটতে লাগল, সায়েব দুটো শুয়েই রইল, আমারও একটু একটু করে মনে সাহস এল।

হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক অপরূপ মূর্তি। দূর থেকে বিস্তর মেমসায়েব দেখেছি, কিন্তু এমন সামনা-সামনি দেখবার সুযোগ কখনও ঘটে নি। মুখখানি চীনে করমচা, ঠোঁট দুটি পাকা লঙ্কা, মারবেলে কোঁদা আজানুলম্বিত দুই বাহু। চোস্ত ঘাড়-ছাঁটা, কেবল কানের কাছে শণের মতন দু'গাছি চুল কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। পরনে একটি দেড়হাতি গামছা—'

বিনোদবাবু বলিলেন, 'গামছা নয় চাটুজ্যেমশায়, ওকে বলে স্কার্ট।'

'কাঠ-ফাট জানি নে বাবা। পষ্ট দেখলুম বাঁদিপোতার গামছা খাটো ক'রে পরা, তার নীচে নেমে এসেছে গোলাপী কলাগাছের মতন দুই পা, মোজা আছে কি নেই বুঝতে পারলুম না। দেহযষ্টি কথাটা এতদিন ছাপার হরফেই পড়েছি, এখন স্বচক্ষে দেখলুম,—হাঁ, যষ্টি বটে, মাথা থেকে বুক-কোমর অবধি একদম চাঁচাছোলা, কোথাও একটু উঁচুনীচু টক্কর নেই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব নয়, একেবারে জ্বলন্ত হাউই এর কাঠি। দেখে বড়ই ভক্তি হ'ল। কপালে হাত ঠেকিয়ে বললুম, 'সেলাম মেমসাহেব।'

ফিক ক'রে হাসলেন। পাকা লঙ্কার ফাঁক দিয়ে গুটিকতক কাঁচা ভুট্টার দানা দেখা গেল। ঘাড়

নেড়ে বললেন—ঘুৎ মর্নিং।

মেম নৃত্যপরা অপ্সরার মতন চঞ্চল ভঙ্গীতে এসে বেঞ্চে বসলেন। আমি কাঁচুমাচু হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম। মেম বললেন—সিট ডাউন বাবু, ডরো মৎ।

দেবীর একহাতে বরাভয়, অপর হাতে সিগারেট। বুঝলুম প্রসন্ন হয়েছেন, আর আমায় মারে কে। ইংরাজী ভাল জানি না, হিন্দী ইংরাজী মিশিয়ে নিবেদন করলুম—নিতান্ত স্থান না পেয়েই এই অনধিকার প্রবেশ করেছি, অবশ্য গার্ডের হুকুম নিয়ে; মেমসায়েব যেন কসুর মাফ করেন। মেম আবার অভয় দিলেন, আমিও ফের ব'সে পড়লুম।

কিন্তু নিস্তার নেই। মেমসায়েব আমার পাশে ব'সে একটু দাঁত বার ক'রে আমাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এই কেদার চাটুজ্যেকে সাপে তাড়া করেছে বাঘে পেছু নিয়েছে ভূতে ভয় দেখিয়েছে, হনুমানে দাঁত খিঁচিয়েছে, পুলিস কোর্টের উকিল জেরা করেছে, কিন্তু এমন দুরবস্থা কখনও ঘটে নি। ষাট বছর বয়সে, রংটি উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে না, পাঁচ দিন ক্ষৌরি হয় নি, মুখ যেন কদম্ব ফুল,—কিন্তু এই সমস্ত বাধা ভেদ ক'রে লজ্জা এসে আমার আকর্ণ বেগনী ক'রে দিলে। থাকতে না পেরে বললুম— মেম সাব, কেয়া দেখতা?

মেম হু-হু ক'রে হেসে বললেন—কুছ নেহি, নো অফেন্স। তুম কোন্ হ্যায় বাবু?

আমার আত্মমর্যাদায় ঘা পড়ল। আমি কি'সঙ না চিড়িয়াখানার জন্তু? বুক চিতিয়ে মাথা খাড়া ক'রে বললুম—আই কেদার চাটুজ্যে, নো জু-গার্ডেন।

মেম আবার হু-হু ক'রে হেসে বললেন—বেঙ্গলী?

আমি সগর্বে উত্তর দিলুম—ইয়েস সার, হাই কাস্ট বেঙ্গলী ব্রাহ্মিণ। পইতেটা টেনে বার ক'রে বললুম—সী? আপ কোন্ হ্যায় ম্যাডাম?

বিনোদবাবু বললেন—ছি চাটুজ্যেমশায়, মেমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন! ওটা যে এটিকেটে বারণ।

কেন করব না? মেম যখন আমার পরিচয় নিলে তখন আমিই বা ছাড়ব কেন? মেম মোটেই রাগ করলেন না, জানালেন তাঁর নাম জোন জিল্‌টার, নিবাস আমেরিকা, এদেশে এর পূর্বেও ক'-বার এসেছিলেন, ইণ্ডিয়া বড় আশ্চর্য জায়গা।

আমি সাহস পেয়ে সায়েব দুটোকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা কারা?

মেমটি বড়ই সরলা। বেঞ্চির উপরের ঢ্যাঙা সায়েবের দিকে কড়ে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—দ্যাট চ্যাপি হচ্ছেন টিমথি টোপার, নিবাস কালির্ফোনিয়া, আমাকে বিবাহ করতে চান। ইনি দশ কোটির মালিক। আর যিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন, উনি হচ্চেন ক্রিস্টফার কলম্বস ব্লটো, ইনিও আমাকে বিবাহ করতে চান, এঁরও দশ কোটি ডলার আছে।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম—কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

মেম বললেন—সে অন্য লোক। এঁরা আমেরিকায় থেকেও কিছু আবিষ্কার করতে পারে নি। দেশটা একদম শুকিয়ে গেছে, মেথিলেটেড স্পিরিট ছাড়া আর কিছুই মেলে না। তাই এঁরা দেশত্যাগী হ'য়ে খাঁটি জিনিসের সন্ধানে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—এঁরা বুঝি মস্ত স্পিরিচুয়ালিস্ট?

মেম বললেন—ভেরি।

এমন সময় ঢ্যাঙা সায়েবটা চোখ মেলে কটমট ক'রে চেয়ে আমার দিকে ঘুষি তুলে বললে—ইউ ইউ গেট আউট কুইক। বেঁটেটাও হঠাৎ হাত-পা ছুড়তে শুরু করলে।

আমি আমার লাঠিটা বাগিয়ে ধ'রে ঠক ঠক ক'রে ঠুকতে লাগলুম। মেমসায়েব বিছানা থেকে তাঁর পালকমোড়া চটিজুতো তুলে নিয়ে ঢ্যাঙার দুই গালে পিটিয়ে আদর ক'রে বললেন—ইউ পিগ্, ইউ পিগ্। বেঁটেটাকে লাথি মেরে বললেন—ইউ পিগ, ইউ পিগ। দুটোই তখনই আবার হাঁ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। মেম তাদের বুকের ওপর এক এক পাটি চটি রেখে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে এসে বললেন ভয় নেই বাবু।

ভরসাই বা কই? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম একটা দৈত্য এক রাজকন্যাকে সিন্দুকে পুরে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াত। দৈত্যটা ঘুমুলে রাজকন্যা তার বুকের ওপর একটা ঢিল রেখে দিয়ে যত রাজ্যের রাজপুত্তর জুটিয়ে আংটি আদায় করতেন। ভাবলুম এইবার সেরেছে রে! এই মেমসাহেব দু-দুটো দৈত্যের ঘাড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে, এখনই নিরানব্বই আংটির মালা বার করবে।

যা ভয় করছিলুম ঠিক তাই! আমার হাতে একটা রুপো আর তামার তারে জড়ানো পলা-বসানো আংটি ছিল। মেম হঠাৎ সেটাকে দেখে বললেন—হাউ লাভ্‌লি! দেখি বাবু কি রকম আংটি?

আমি ভয়ে ভয়ে হাতটি এগিয়ে দিলুম, যেন আঙুলহাড়া অস্তর করাচ্ছি। মেম ফস করে আংটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরিয়ে বললেন—বিউটিফুঃ!

হরে রাম! এ যে আমার ত্রিসন্ধ্যা জপ করার আংটি,—হায় হায়, এই ম্লেচ্ছ মাগি সেটাকে অপবিত্র ক'রে দিলে! আমার চোখ ছলছল করে উঠল, কিন্তু কৌতূহলও খুব হ'ল। বললুম—মেমসায়েব আপ কা আর কয়ঠো অ্যাংটি হ্যায়? নাইন্টিনাইন?

মেম বেঞ্চির তলা থেকে তোরঙ্গ টেনে এনে তা থেকে একটি অদ্ভুত বাক্স খুলে আমাকে দেখালেন। চোখ ঝলসে গেল। দেরাজের পর দেরাজ, কোনওটায় গলার হার, কোনওটায় কানের দুল, কোনওটায় আরও কিছু। একটা আংটির ট্রে—তাতে কুড়ি পঁচিশটা হবে—আমার সামনে ধরে বললেন যেটা খুশি নাও বাবু!

আমি বললুম—সে কি কথা। আমার আংটির দাম মোট ন-সিকে। আমি ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলুম, সাবধানে রাখবেন, ভেরি হোলি আংটি।

মেম বললেন—ইউ ওল্ড ডিয়ার! কিন্তু তোমার উপহার যদি আমি নিই, আমার উপহারও তোমার ফেরত দেওয়া উচিত নয়। এই বলে একটা চুনির আংটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন। বললুম—থ্যাংক ইউ মেমসায়েব, আমি আপনার গোলাম, ফরগেট মি নট। মনে মনে বললুম—ভয় নেই ব্রাহ্মণী, এ আংটি তোমার জন্যেই রইল।

ট্রেন এটাওআয় এসে পৌঁছল। কেলনারের খানসামা চা রুটি মাখন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—টি হুজুর? মেম ট্রে রাখলেন। তারপর আমার লাঠিটা নিয়ে ঢ্যাঙা আর বেঁটেকে একটু গুঁতো দিয়ে বললেন—গেট আপ টিমি, গেট আপ ব্লটো। তারা বুনো শুয়োরের মতন ঘোঁত ঘোঁত ক'রে কি বললেন শুনতে পেলুম না। আন্দাজে বুঝলুম তাদের ওঠবার অবস্থা হয় নি। মেম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যাটার্জি তুমি খাবে? আপত্তি নেই তো?

মহা ফাঁপরে পড়া গেল। ম্লেচ্ছ নারীর স্বহস্তে মিশ্রিত, কিন্তু ভুরভুরে খোশবায়, শীতটা খুব পড়েছে। শাস্ত্রে চা খেতে বারণ কোথাও নেই। তা ছাড়া রেলগাড়ির মতন বৃহৎ কাষ্ঠে ব'সে শীত

নিবারণের জন্যে ঔষধার্থে যদি চা পান করা যায় তবে নিশ্চয় দোষ নাস্তি। বললুম—ম্যাডাম লক্ষ্মী তুমি যখন নিজ হাতে চা দিচ্ছ, তখন কেন খাব না। তবে রুটিটা থাক।

চায়ে মনের কপাট খুলে যায়, খেতে খেতে অনেক বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। অশ্বত্থামা যেমন দুধের অভাবে পিটুলিগোলা খেয়ে আহ্লাদে নৃত্য করতেন, নিরীহ বাঙালি তেমনি চায়েতেই মদের নেশা জমায়। বঙ্কিম চাটুজ্যে তারিফ করে চা খেতে শেখেন নি, সর্দি-টর্দি হলে আদা নুন দিয়ে খেতেন—তাতেই লিখতে পেরেছেন—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর। আজকাল চায়ের কল্যাণে বাংলা দেশের ভাবের বন্যা এসেছে,— ঘরে ঘরে চা, ঘরে ঘরে প্রেম। সেকালের কবিদের বিস্তর বায়নাক্কা ছিল,—উপবনে রে, চাঁদ রে, মলয় রে, কোকিল রে, তবে পঞ্চশর ছুটবে। এখন কোনও ঝঞ্ঝাট নেই,—চাই শুধু দুটো হাতল-ভাঙা বাটি, একটু ছেঁড়া অয়েল ক্লথ, একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল, দু-ধারে দুই তরুণ-তরুণী, আর মধ্যিখানে ধূমায়মান কেতলি। ভাগ্যিস বয়েসটা যাট, তাই বেঁচে গিয়েছিলুম।

মেমকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা মেমসায়েব, এই যে দুই হুজুর গড়াগড়ি যাচ্ছেন, এঁরা দুজনেই তো আপনার পাণিপ্রার্থী। আপনি কোন ভাগ্যবান্‌টিকে বরণ করবেন?

মেম বললেন—সে একটি সমস্যা। আমি এখনও মনস্থির করতে পারি নি। কখনও মনে হয় টিমিই উপযুক্ত পাত্র, বেশ লম্বা সুপুরুষ, আমাকে ভালোওবাসে খুব। কিন্তু মদ খেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর ঐ ব্লটো, যদিও বেঁটে মোটা, আর একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু বাধ্য আর বড় নরম মন। একটু মদ খেলেই কেঁদে ফেলে। বড় মুশকিলে পড়েছি, দুজনেই নাছোড়বান্দা। যা হক এখনও ক'ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, হাওড়া পৌঁছবার আগেই স্থির ক'রে ফেলব। আচ্ছা চ্যাটার্জি, তুমিই বল না—এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করা উচিত?

বললুম—মেমসায়েব, আপনি এঁদের স্বভাবচরিত্র যে প্রকার বর্ণনা করলেন তাতে বোধহয় দুটিই অতি সুপাত্র। তবে কিনা এঁরা যেরকম বেহুঁশ হয়ে আছেন...।

মেম বললেন—ও কিছু নয়। একটু পরেই দুজনে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

আমি বললুম—আপনার নিজের যদি কোনটিরও ওপর বেশি ঝোঁক না থাকে, তবে আপনার বাপ-মার ওপর স্থির করার ভার দিন না?

মেম বললেন—আমার বাপ-মা নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। দেখ চ্যাটার্জি, তোমার ওপরেই ভার দিলুম। তুমি বেশ করে দুটোকে ঠাউরে দেখ। মোগলসরাই-এ নেমে যাবার আগেই তোমার মত আমাকে জানাবে। ভেবেছিলুম একটা টাকা ছুড়ে চিত-উবুড় দেখে মনস্থির করব, কিন্তু তুমি যখন রয়েছে তখন আর দরকার নেই।

ব্যবস্থা মন্দ নয়। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্যে এ পর্যন্ত বিস্তর বর-কনে ঠিক ক'রে দিয়েছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত পাত্র দেখার ভার কখনও পাই নি। দুজনেই ক্রোরপতি, দুটোই পাঁড়মাতাল। একটা লম্বায় বড়, আর একটা ওজনে পুষিয়ে নিয়েছে। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় এ যাবৎ যা পেয়েছি তা শুধু ঘোঁত ঘোঁত। চুলোয় যাক, মেমের যখন আপত্তি নেই তখন যেটার হয় নাম বলব। আর যদি বুঝি যে মেম আমার কথা রাখবে, তবে বলব—মা লক্ষ্মী, মাথা যখন আগেই মুড়িয়েছ তখন বাকী কাজটুকুও সেরে ফেল। —এই দু-ব্যাটা ভাবী স্বামীকে ঝেঁটিয়ে নরকস্থ কর।

গল্প করতে করতে বেলা প্রায় সাড়ে নটা হয়ে এল। এর পরেই একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থামবে, সেই অবসরে সায়েব-মেমরা হাজরি খেতে খানা-কামরায় যাবে। এতক্ষণ ঠাওর হয় নি,

এখন দেখতে পেলুম চা খেয়ে মেমের ঠোঁট ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলুম রংটি কাঁচা। মেম একটি সোনার কৌটো খুললেন, তা থেকে বেরুল একটি ছোট আরশি, একটি লাল বাতি, একটি পাউডারের পুঁটুলি। লালবাতি ঠোঁটে ঘসে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত ক'রে নিলেন।

গাড়ি থামল। মেম বললেন—চ্যাটার্জি, আমি ব্রেকফাস্ট খেতে চললুম। টিমি আর ব্লটো রইল, এদের দিকে একটু নজর রেখো, যেন জেগে উঠে মারামারি না করে। যদি সামলাতে না পার তবে শেকল টেনো।

আহা, কি সোজা কাজই দিয়ে গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে কানপুরে গাড়ি থামবে, তখন মেম আবার এই কামরায় ফিরে আসবেন! ততক্ষণ মরি আর কি! লাঠিটা বাগিয়ে নিয়ে ফের দুর্গানাম জপ করতে লাগলুম।

ঢ্যাঙা সায়েবটা উঠে বসেছে। হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আঙুল মটকাল। আমার দিকে একবার কটমট ক'রে চাইলে, কিন্তু কিছু বললে না। টলতে টলতে বাথরুমে গেল।

তখন বেঁটেটা তড়াং করে উঠে কোলা ব্যাঙের মতন থপ ক'রে আমার পাশে এসে বসল। আমি ভয়ে চেঁচাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই সে আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার, আমি হচ্ছি ক্রিস্টফার কলম্বাস ব্লটো।

আমি সাহস পেয়ে বললুম—সেলাম হুজুর।

—আমার দশ কোটি ডলার আছে। প্রতি মিনিটে আমার আয়...

—হুজুর দুনিয়ার মালিক তা আমি জানি।

ব্লটো আমার বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বললে—লুক হিয়ার বাবু, আমি তোমাকে পাঁচ টাকা বকশিশ দেবো।

—কেন হুজুর?

—মিস জিল্‌টারকে তোমার রাজী করাতেই হবে। আমি তোমাদের সমস্ত কথা শুনেছি। তোমারই ওপর সমস্ত ভার, তুমিই কন্যাকর্তা। ঐ টিমথি টোপার—ও অতি পাজী লোক, ওর সমস্ত সম্পত্তি আমার কাছে বাঁধা আছে। ও একটা পাঁড়মাতাল, পপার, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে মিস জিল্‌টার মনের দুঃখে মারা যাবেন।

এই ব'লে ব্লটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। একটা বোতলে একটু তলানি পড়ে ছিল, সেটুকু খেয়ে ফেলে বললে—বাবু তুমি জন্মান্তর মান?

—মানি বইকি।

—আমি আর জন্মে ছিলাম একটি তৃষিত চাতক পক্ষী, আর এই মেম ছিল একটি রূপসী পানকৌড়ি। আমরা দুটিতে...।

এমন সময় বাথরুমের দরজা ন'ড়ে উঠল। ব্লটো তাড়াতাড়ি আমাকে পাঁচ আঙুল দেখিয়ে ইশারা ক'রেই ফের নিজের জায়গায় শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল।

ঢ্যাঙা সায়েব—মেম যাকে টিমি বলে—ফিরে এসে নিজের বেঞ্চে গ্যাঁট হ'য়ে বসল। তখন ব্লটো জেগে ওঠার ভান করে হাই তুললে, চোখ রগড়ালে, আমার দিকে একবার করুণ নয়নে চেয়ে বাথরুমে ঢুকল।

এবার টিমির পালা। ব্লটো স'রে যেতেই সে কাছে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলে। আমি

আগে থাকতেই বললুম, গুড মর্নিং সার।

টিমি আমার হাতটায় ভীষণ মোচড় দিলে।

বললুম—উঃ!

টিমি বললে—তোমার হাড় গুঁড়ো করে দেব।

ভয়ে ভয়ে বললুম—ইয়েস সার।

—তোমায় থেঁতলে জেলি বানাব।

—ইয়েস সার।

—মিস জোন জিল্‌টারকে আমি বিয়ে করবই। আমি সমস্ত শুনেছি। যদি আমার হ'য়ে তাকে না বল তবে তোমাকে বাঁচতে হবে না।

—ইয়েস সার।

—আমার অগাধ সম্পত্তি। পাঁচটা হোটেল, দশটা জাহাজ কোম্পানি, পঁচিশটা শুঁটকি শুওরের কারখানা। ব্লটোর কি আছে? একটা মদের চোরা ভাঁটি, তাও আমার টাকায়। ব্লটো একটা হতভাগা মাতাল বেঁটে বজ্জাত...।

ব্লটো বোধহয় আড়ি পেতে সমস্ত শুনছিল। হঠাৎ কামরায় ছুটে ফিরে এসে ঘুষি তুলে বললে—কে হতভাগা, কে মাতাল, কে বেঁটে বজ্জাত?

সকলেরই বিশ্বাস যে গান আর গালাগালি হিন্দীতে ভাল রকম জমে। হিন্দী গালাগালের প্রসাদগুণ খুব বেশি তা স্বীকার করি। কিন্তু যদি নিছক আওয়াজ আর দাপট চাও তবে বিলিতী গাল শুনো—বিশেষ ক'রে মার্কিনী গাল। এক একটি যেন লব্‌জ যেন তোপ, কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশে। ইংরিজী আমি ভাল জানি না, সব গালাগালের অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু তাতে রস গ্রহণের কিছু মাত্রা বাধা হয় নি।

দেখলুম এক বিষয়ে সায়েবরা আমাদের চেয়ে দুর্বল। তারা বাগ্‌-যুদ্ধ বেশিক্ষণ চালাতে পারে না। দু-মিনিট যেতে না যেতেই হাতাহাতি হল। আমি হতভম্ব হ'য়ে দেখতে লাগলুম, গাড়ি কখন কানপুরে এসে থামল, তা টের পাই নি।

হনহন ক'রে মেমসায়েব এসে পড়ল। এই গজ-কচ্ছপের লড়াই থামানো কি তার কাজ? বললে—টিমি ডিয়ার, ডোণ্ট্—ব্লটো ডারলিং—ডোণ্ট্—প্লিজ প্লিজ ডোণ্ট্। কিছুই ফল হল না। আমি বেগতিক দেখে গাড়ি থেকে নেমে ছুটলুম।

ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস সমস্ত খালি। ডাইনিং কারে সকলে তখনও খানা খাচ্ছে। কাকে বলি? ওই যে—একটা সাদা ফ্লানেলের পেণ্টুলুন পরা সায়েব প্লাটফর্মে পাইচারি ক'রে শিস দিচ্ছে। হন্তদন্ত হ'য়ে তাকে বললুম—কাম্ সার, লেডির মহা বিপদ। সায়েব হুশ ক'রে একটি জোরে শিস দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটল।

মেম তখন আমার লাঠিটা নিয়ে অপক্ষপাতে দু-ব্যাটাকেই পিটছিলেন। কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, সমানে ঝুটোপাটি করছে। আগন্তুক সায়েবটি মেমকে জিজ্ঞাসা করলে—হেলো জোন, ব্যাপার কি? মেম তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিলেন। সাহেব টিমি আর ব্লটোকে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু তারা তাকেই মারতে এল। নতুন সায়েবের তখন হাত ছুটল।

বাপ কি ঘুষির বহর! টিমি ঠিকরে গিয়ে দরজায় মাথা ঠুকে প'ড়ে চতুর্দশ ভুবন অন্ধকার দেখতে লাগল। ব্লটো কোঁক ক'রে বেঞ্চের তলায় চিতপাত হয়ে পড়ল। বিলকুল ঠাণ্ডা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মেম আমার সঙ্গে নতুন সায়েবটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বিখ্যাত মিস্টার বিল বাউণ্ডার, খুব ভাল ঘুষি লড়তে পারেন। আর ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি, ভেরি ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড।

সায়েব আমার মুখখানা দেখে বললে—সাম্ বিয়ার্ড!

মেম বললে—থাকুক দাড়ি। ইনি অতি জ্ঞানী লোক।

সায়েব আমার হাতটা খুব ক'রে নেড়ে দিয়ে বললে—হা-ডু-ডু? বেশ শীত পড়ছে নয়?

ধাঁ ক'রে আমার মাথায় একটা মতলব এল। মেমসায়েবকে চুপি চুপি বললুম—দেখুন মিস জোন অত গোলমালে কাজ কি? টিমি আর ব্লটো দুজনেই তো কাবু হ'য়ে পড়েছে। আমি বলি কি?—আপনি এই বিল সায়েবকে বিয়ে করুন। খাসা লোক।

মেম বললেন—রাইটো। আমার একথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। আই সে বিল, আমায় বিয়ে করবে?

বিল বললে—রাদার। কে বলে আমি করব না?

রাধামাধব! সায়েব জাতটা ভারী বেহায়া। বিলকে বাধা দিয়ে বললুম—রোসো সায়েব, এক্ষুণি ও সব কেন। আমি হচ্ছি ব্রাইডমাস্টার—কন্যাকর্তা। তোমার কুলশীল আগে জেনে নি, তারপর আমি মত দেব।

বিল বললে—আমার ঠাকুরদা ছিলেন মুচি। আমার বাপও ছেলেবেলায় জুতো সেলাই করতেন।

আমি বললুম—তাতে কুলমর্যাদা কমে না। তোমার আয় কত?

বিল একটু হিসাব করে বললে—মিনিটে দশ হাজার, ঘণ্টায় ছ লাখ। কিন্তু চিন্তা করবেন না, আমার মাসী মারা গেলে আয় আর একটু বাড়বে। তার পঁচিশটা বড় বড় পুকুর আছে, নোনা জলে ভরতি, তাতে তিমি মাছ কিলবিল করছে।

বললুম—থাক্ আর বলতে হবে না। আমি মত দিলুম। এগিয়ে এস, আমি আশীর্বাদ করব, রিয়াল হিন্দু স্টাইল।

কিন্তু ধান-দুব্বো কই? জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললুম—এই কুলী, জলদি থোড়া ঘাস ছিঁড়কে লাও, পয়সা মিলেগা।

ইংরেজী আশীর্বাদ তো জানি না। বললুম—যদি আপত্তি না থাকে তবে বাংলাতেই বলি না।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়।

সাহেবের মাথায় এক মুঠো ঘাস দিয়ে বললুম—বেঁচে থাক। ধন তো যথেষ্ট আছে, পুত্রও হবে, লক্ষ্মী এই সঁপে দিলুম। কিন্তু খবরদার ব্যাটা, বেশি মদ-টদ খেয়ো না, তা হ'লে ব্রহ্মশাপ লাগবে। সায়েব আর একবার আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে নড়া ছিঁড়ে দিলে।

মেমকে বললুম মা লক্ষ্মী তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হ'ক। বীরপ্রসবিনী হ'য়ে কাজ নেই মা—ও আশীর্বাদটা আমাদের অবলাদের জন্যই তোলা থাক। তুমি আবার গরিব কালা-আদমীদের দুঃখের নিমিত্ত হয়ো না,—গুটিকতক শান্তশিষ্ট কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘরকন্না কর।

মেম হঠাৎ তার মুখখানা উঁচু ক'রে আমার সেই পাঁচ দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ির ওপর...।

বিনোদবাবু বলিলেন—আ ছি ছি ছি।

চাটুজ্যেমশায় বলিলেন—হুঁ, দেবী চৌধুরানীতে ঐ রকম লিখেছে বটে।

আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, পাকা লঙ্কার আস্বাদটা কি রকম লাগল?

তাতে ঝাল নেই। আরে, ঐ হ'ল ওদের রেওয়াজ, ঐ রকম ক'রেই ভক্তিশ্রদ্ধা জানায়, তাতে লজ্জা পাবার কি আছে।

চাটুজ্যেমশায় বলিতে লাগিলেন—তারপর দেখি ঢ্যাঙা আর বেঁটে মুখ চুন ক'রে নেমে যাচ্ছে, জন-দুই কুলী তাদের মালপত্র নামাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়ল। বিল আর জোন হাত ধরাধরি ক'রে নাচ শুরু ক'রে দিলে। আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখতে লাগলুম।

জোন বললে—চ্যাটার্জী, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গুম হ'য়ে ব'সে থেকো না। আমাদের নাচে যোগ দাও।

বললুম—মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবিরাজের বারণ আছে।

—তবে তুমি গান গাও, আমরাই নাচি।

কি আর করা যায়, পড়েছি যবনের হাতে। একটা রামপ্রসাদী ধরলুম।

সমস্ত পথটা এই রকমে চলল, অবশেষে মোগলসরাই এল। মেম বললে কলকাতায় গিয়েই তাদের বিয়ে হবে, আমি যেন তিন দিন পরে গ্র্যান্ড হোটেলে অতি অবশ্য তাদের দেখা করি। বিস্তর শেকহ্যান্ড, বিস্তর অনুরোধ তারপর নেমে কাশীর গাড়ি ধরলুম।...পরদিন আবার কলকাতা যাত্রা।

বিনোদবাবু বলিলেন—আচ্ছা চাটুজ্যেমশায়, গিন্নী সব কথা শুনেছেন?

কেন শুনবেন না। সতীলক্ষ্মী, তায় পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের নবীনাদের মতন অবুঝ নন অভিমানে চৌচির হবেন। আমি বাড়ি ফিরে এসেই তাঁকে সমস্ত বলেছি।

চাটুজ্যেগিন্নী শুনে তখন কি বললেন?

তক্ষুনি একটা উড়ে নাপিত ডেকে বললেন—দে তো রে, বুড়োর মুখখানা আচ্ছা ক'রে চেঁচে, ম্লেচ্ছ মাগী উচ্ছিষ্টি ক'রে দিয়েছে! তারপর সেই চুনির আংটিটা কেড়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের আঙুলে পরলেন। বউভাতের ভোজটা কি রকম খেলেন?

সে দুঃখের কথা আর না-ই শুনলে। গ্রান্ড হোটেলে গিয়ে জানলুম ওরা কেউ নেই। একটা খানসামা বললে—বিয়ের পরদিনই বেটী পালিয়েছে। সায়েব তাকে খুঁজতে গেছে।

চার পয়সায় এক আনা

জগদীশ গুপ্ত

রোজ আনে রোজ খায়, এ-কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে; কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয় এবং রোজ যাহা খায় তাহা পুরোপুরি নহে।

দুই ভাই—কাশী আর শশী। শশী ছোটো এবং খঞ্জ, সন্তান সংখ্যা তারই বেশি। কাশীর একটি কন্যা, দুটি পুত্র; শশীর দুটি পুত্র, দুটি কন্যা। এই একটি বেশির দরুন শশীর আন্তরিক লজ্জা কুণ্ঠা কিছু নাই; তার মনে-মনে সে ষষ্ঠীর কৃপা আর চায় না। অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে ইহাদের, সংসার-সম্ভোগের আনন্দ আর পরিবেশোৎসব নষ্ট হইয়া গেছে। বউয়েরা তো আছেই—ভগিনীটি বিধবা হইয়া একটি পুত্রসহ ভাইয়েদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহারাও খায় এবং পরে—সুতরাং তাহাদের বাবদ খরচ আছে। এই দরিদ্র পরিবারের কর্তা কাশী; সংসার প্রতিপালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব তাহারই। প্রতিপাল্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার দিকে চাহিয়া বুক শুকাইয়া ওঠে—অনাহারে ফেলিয়া রাখিবার উহারা কেহই নহে।

একটি গোরু ইহাদের ছিলো—বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী অবস্থায় ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিতো কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড়কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে—গৃহ-পালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে—বঞ্চিত করিতে যতোটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।

শাকপাতা কুড়াইয়া তাহাদের আংশিক উদরপূর্তি চলে, ইহা মিথ্যা নহে, বিস্ময়ের বিষয়ও নহে। দু-ভাইয়ের যা উপার্জন—ধন এবং ধান্য—তাহা সামান্য—পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য, প্রয়োজনের হিসাবেও সামান্য। অনন্ত পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ ধান্য তাহারা ঘরে তোলে তাহা অত্যন্ত কঠিন কৃপণের মতো বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াও বড়ো জোর পাঁচ মাস চলে; একটি ধান দৈবাৎ উঠানে পড়িয়া থাকিলে সেই অপচয়ে কাশী আর শশী রাগিয়া আগুন হইয়া যায়; চোখ-বাড়াইয়া গাল দেয় 'লক্ষ্মীছাড়ার দল।'

ধন উপার্জন করিতে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। বলিতে কি, খঞ্জ শশী দূরবর্তী পল্লি অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়তে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা—কাশী ছাড়া আর কেহ তা জানে না। কিন্তু এই চাল বিক্রয়ের ব্যাপারটা বড়োই লোকসানের—আড়তের কয়েল রজনী হাজরা হৃদয়হীন অতি-হিশাবি চতুর লোক—ন্যায্য ভাবে ওজন করিয়া সঠিক মূল্যের পুরা প্রাপ্তির জন্যই শশীকে হাত জুড়িতে হয় অনেকবার—অন্নাভাবের অজুহাতে স্বয়ং রজনী কয়েলের এবং তার পরোলোকগত বাপ-মায়ের দোহাই

পাড়িয়া অনেক কাতরোক্তি তোশামোদ করিতে হয়—কিন্তু ফল হয় না; প্রবঞ্চক আর প্রভুভক্ত রজনী হাজরা যেন পণ করিয়া আছে, খঞ্জ ভিখারী শশীকে সে দামে ওজনে ঠকাইবেই। যথোচিত প্রাপ্য না পাইয়া আর রজনীর নিলর্জ্জতায় শশীর রক্ত বৃথাই উত্তপ্ত হইয়া উঠে—রজনীর তুমুল কর্মতৎপরতায়, অর্থাৎ চিৎকারে তার পাগল-পাগল ঠেকে।

লোক-খাটাইবার লোক অনেক আছে, এবং লোক-খাটাইবার লোক খুঁজিবার পথও অনেক আছে—তবু হঠাৎ এমন হয় যে, খাটিবার লোক খাটাইবার লোককে খুঁজিয়া পায় না। এমন বেকার অবস্থা মাঝে-মাঝে আসে বলিয়া কাশীদের আয়-আমদানি তেমন ভাবে একটানা আর প্রচুর নহে যাহাতে সম্পূর্ণ মিটিয়া মনে হয় দিন ভালোই যাইতেছে।

পাঁঠা কিনিয়া তাহার মাংসের ভাগ এবং চামড়া বিক্রয় দু-একবার করা হইয়াছিল, কিছু লাভ দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু তাদের এ-ব্যবসা শুভক্ষণেই শুরু হয় নাই—বাধা পড়িলো। তাহাদের বড়ো আদরের আর মমতার পাত্রী বিধবা ভগিনীটি এই নৃশংসতায় হঠাৎ একদিন আতঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠায় এবং প্রবোধ না মানায় তাহারা ঐ লাভজনক জীবহত্যার পথটা ছাড়িয়া দিয়াছে।

এমনই করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দিফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।

তাহাদের জীবনে ঘটনা নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য কি দিক-পরিবর্তন নাই; কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটিলো—তাহা বর নয়, অভয় নয়, অভিসম্পাত নয়, নির্জীব স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বুদ্বুদ যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেলো—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ তাহা নহে।

কাশীর ছেলে বিশু বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—বয়স দশ হইবে; তার দু-ভায়ের ছেলে-মেয়ে জন্মিয়াছে একবার এর একবার ওর, যেন পালা করিয়া।

ছেলে-মেয়েরা দরিদ্রদের সন্তান, তাহাদের খেলাধুলাও দরিদ্রোচিত—একটা কাঠির মাথায় খানিক ন্যাকড়া বাঁধিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই তাহাদের খেলা চমৎকার জমিয়া ওঠে। খানিক খানিক ধুলা হাতে করিয়া ছিটাইয়া-ছিটাইয়া পরস্পরের গায়ে দিতে পারিলেই তাহাদের মনে হয়, এ খেলাও ভালোই। ধুলা যদি ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া অন্যদিকে যায় তবে তো আরো আনন্দ।

কাশীদের বাড়িতে কঞ্চির ফটক খুলিয়া বাহির হইলেই একটু স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া যায়—স্থানটি দূর্বামণ্ডিত কিন্তু সব সঙ্কীর্ণ। তার পরেই কাঁচা পা-পথ—মানুষ চলে; এবং পাড়ার ভিতর বহু সংখ্যক গোরু-বাছুর ঐ পথে মাঠে চরিতে যায়, এবং চরিয়া ঘরে ফেরে। সুতরাং তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে শুকনো মাটি গুঁড়া হইয়া পথের ধুলা বিস্তর—দেড় আঙুল পুরু হইয়া ধুলা আগাগোড়া জমিয়া থাকে।

কাজেই কাশীর এবং শশীর ছেলে-মেয়েদের সুলভে খেলার বেশ সুবিধা আছে। তাহারা পথের ঐ ধুলার উপরেই খেলিতে বসিয়া যায়—ধুলা জড়ো করে, ধুলা উড়ায়, অঞ্জলি ভরিয়া ধুলা তুলিয়া আঙুলের ফাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয়—নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হাতের ধুলা শক্ত মাটিতে পড়িতে থাকে। এক একবার ধুলা জড়ো করিয়া তার উপর হাত চাপড়াইয়া শক্ত করে· তারপর আঙুল ঢুকাইয়া টিপির গায়ে করে অসংখ্য ছিদ্র, চারিদিকে ধুলার বাঁধ দিয়া একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লয় আর সবাই মিলিয়া সেখানে করতলের ছাপ বসায়, বাঁধের ধুলায় বটের পাতা

গুঁজিয়া-গুঁজিয়া দেয়, এবং নিজেরাই সেই কৃতিত্ব আর শোভা অবাক হইয়া দেখে; পথিকের ধমক খায়; গোরুর পাল আসিতে থাকিলে পলায়ন করে.....

কিন্তু একদিন বড়ো লাভ হইয়া গেলো।

কাশীর ছেলে এবং মেয়ে, যথাক্রমে বিশু ও নারানী যথারীতি পথের ধুলায় উপস্থিত; শশীর ছেলে এবং মেয়েরা যথাক্রমে রসো এবং দাসী ও হাসিও আসিয়াছে।

আজ খেলা হইতেছে ধুলা ছাঁকার।

হাসি পথের উপর আড় হইয়া পড়িয়া খেলার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল; অধিনায়ক বিশু তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টানিয়া লইয়া তফাতে দূর্বার উপর বসাইয়া দিয়াছে; সেখানে বসিয়া সে অ্যাঁ অ্যাঁ করিয়া থামিয়া আর টানিয়া টানিয়া কাঁদিতেছে।

উহাদের খেলা এখন নির্বিঘ্নে চলিতেছে। ধুলা আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া দুই করতলের সংযাগস্থলটি একটুখানি ফাঁক করিয়া ধুলা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—ধুলা সমস্তটা মাটিতে পড়িয়া সকলের পরে নিঃশেষ কাহার হয় প্রতিযোগিতা চলিতেছে তারই.....

বিশুই দু-বার জিতিয়াছে, প্রধান বলিয়া কতকটা গায়ের জোরেই।

শশীর পুত্র রসো বলিলো, 'এখানকার ধুলা ভালো নয়, ভাই।' বলিয়া সে খানিক সরিয়া বসিলো। এবারে সে যেন একটু নির্লিপ্ত—পাল্লা দিবার উৎসাহ তেমন নাই। আপন মনেই ধুলা ছাঁকিতে ছাঁকিতে তৃতীয়বার ধুলা ঝাড়িয়া ফুরাইবার পরই সে হঠাৎ ডান হাতটা মুঠা বাঁধিয়া ঝাঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—বাড়ির ভিতর গেলো না, গেলো অন্যদিকে।

—কীরে?—বলিয়াও বিশু যখন লাফাইয়া উঠিলো, তখন রসো বহু দূরে চলিয়া গেছে, কিংবা কাছেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে আর দেখা গেলো না।

সূর্যাস্তের তখন বেশি বিলম্ব নেই। ছোটো বোন দুটিকে বাড়ির ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বিশু রসোর সন্ধানে গেলো; কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইলো ঢের সাত-আটটা বাড়ির চারিদিকে এবং অভ্যন্তর—কিন্তু বৃথা; রসো কাহারো বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। পাড়ারই মথুর এবং তোষিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো; তাহারা বলিলো যে, রসোকে তাহারা দেখে নাই।

বিশু বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া 'রসো' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলো—রসোর সাড়া পাওয়া গেলো না। কিন্তু রসো তো আকাশে উড়িয়া যায় নাই, ডোবার জলে ডুবিয়াও লুকাইয়া নাই। এদিক-ওদিক তাকাইতে-তাকাইতে হঠাৎ বিশুর নজরে পড়লো সন্ধ্যামণি বোষ্টমির বাড়ির লাগাও তালগাছটার আড়ালে কে যেন রহিয়াছে—একখানা কালো হাত দেখা যাইতেছে.....

বিশু পা টিপিয়া-টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলো। তালগাছের নিকটবর্তী হইয়াই সে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভীতিপ্রদ শব্দ করিয়া রসোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলো—যেন দৈত্য রসোকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সেই শব্দে এবং আবির্ভাবে রসো চমকিয়া উঠিয়াই ডান হাতটা তাড়াতাড়ি পিছন দিকে লইলো যেন পিছন দিকে হাত লইলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে—সে হাত সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিবার সাধ্য বা বুদ্ধি কাহারও নাই!

বিশু বলিলো—দেখি তোর হাতে কী।

বিশুর পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল, কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার বটে।

রসো বলিলো,—কিছু না। ঘাঁটিও না বলছি।

বিশু বলিলো,—বাড়ি আয়। বাবা তোকে ডাকছে।

—আমি এখন যাবো না।

—তবে দেখা, তোর হাতে কী রয়েছে।

—তোর মাথা.....

—মার খাবি বলছি। বলিয়া বিশু তার লুকানো হাতের দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে যাইতেই রসো ঘুরিয়া দাঁড়াইল; এবং তারপর ক্রমাগত সেই ডান হাতখানাকে সম্মুখে আনা আর পশ্চাতে লওয়ার আবর্তন শুরু হইয়া গেলো। কিন্তু বিশুর বুদ্ধি তখন সজাগ বেশি। সে একবার কায়দা করিয়া রসোর ডান হাতের উপর ডানা চাপিয়া ধরিতেই তাহা শরীরের উপর আক্রমণে দাঁড়াইয়া গেলো; রসো শরীর মুচড়াইয়া-দুমড়াইয়া এমন করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলো যে, সন্ধ্যামণি বোষ্টমি, মথুর গাড়োয়ান, বিরিঞ্চি গরাই প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যক্তিগণ তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিলো, ব্যাপারটা কী! সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে না যাইয়া ওরা করিতেছে কী!

কিন্তু ঐ মানুষগুলি কাহারো সুহৃদ নহে—তাহারা সান্ত্বনা দিতে জানে না, বিচারের ধার ধারে না, কেবল 'কে রে?' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ছেলেমানুষের পেটের প্লীহা চমকাইয়া দিতে পারে। তাহারা করিলোও তাই—বিবদমান ছেলে দুটিকে তাহারা ধমকাইয়া কাবু করিয়া দিলো এবং অভাবনীয় প্রহারের ভয় দেখাইয়া অবস্থা এমন গুরুতর করিয়া তুলিলো যে, নিজের কর্তৃত্ব তুলিয়া অভিভাবকগণের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া ছাড়া বিশুর গত্যন্তর রহিলো না।

রসোর হাত ধরিয়া বিশু অভিভাবকগণের উদ্দেশেই যাত্রা করিলো—চলিতে-চলিতে পথে মাত্র একটি কথা হইলো; বিশু বলিলো,—বল না ভাই, তোর হাতে কী?

বিশুর প্রশ্ন রসো গ্রাহ্যই করিলো না।

রসো ক্রোধভরে ঘাড় গুঁজিয়া এবং দুঃখ-ভরে কান্নার একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে-করিতে দাদা বিশুর আকর্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করিলো। এখানে তার অভিভাবক ঢের, এবং তাদেরও শক্তি ঢের—রসোর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিলো....এখানে আত্মসমর্পণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

শশী দাওয়ায় বসিয়া এবং ঠেশ দিয়া হুঁকা টানিতেছিল বাতাসের তখন গতি ছিলো না—কাজেই মুহুর্মুহু আকর্ষণে ধূম নির্গত হইয়া শশীর সামনেই জড়ো হইয়াছিল, আর শশী মনে-মনে গাল দিতেছিল কয়েল রজনী হাজরাকে—আজও রজনী পৌনে দু-সের চালকে ওজনে এক সের ন-ছটাক দাঁড় করাইয়া হিশাব অনুসারে দাম দিয়াছে—তার আকুল প্রতিবাদ ফলপ্রদ হয় নাই।

আসামী রসোকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বিশু বলিলো—'কাকা রসো কী যেন পেয়েছে ধুলোর ভিতর—কিছুতেই দেখাবে না! ঐ দ্যাখো, ওর মুঠোর ভেতর রয়েছে....

এই সংবাদে শশী ফুৎকার দিয়া সম্মুখের ধোঁয়া দিগ্‌বিদিক উড়াইয়া দিলো তারপর বলিলো, তোর হাতে কী দেখা।' রসো সেই যে মুষ্টি বাঁধিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও আর খোলে না—হাত ঘামিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে, আঙুলে দারুণ যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে, তবু খোলে নাই।

বলিলো, 'না, আমি দেখাবো না। এ আমার।'

শশী অভয় দিলো 'তোরই থাকবে—দেখা।'

কিন্তু, আর কারো নয়, পিতৃদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াও রসোর ভরসা হইলো না—মুষ্টি খুলিয়া সে দেখাইল না।

তখন শশী ছেলের অবাধ্যতায়, আর তার দুঃসাহস দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেলো; হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া আসিলো—রসোর একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইল, অর্থাৎ রসোকে সম্মুখে করিয়া

সে দাঁড়াইয়া গেলো; ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি পূর্বক গর্জন করিয়া বলিলো 'দেখা।....দেখাবিনে? তবে দেখ মজা।' বলিয়া রসোর যে-হাতে সেই সামগ্রী রহিয়াছে সেই ডান হাতখানা ধরিয়া শশী মুচড়াইয়া দিলো।

তাহাতেও রসোর মুষ্টি খুলিলো না।

তখন শশী তাহার মুষ্টিটাই তুলিয়া লইয়া তাহার উপব ঠক্ ঠক্ করিয়া দু-বার গাঁট্টা মারিলো; এইবার ফল দর্শিলো—ক্ষুদ্র রসোর শক্তিতে এবং জিদে আর কুলাইল না—মুষ্টি খুলিয়া হাতের সামগ্রী ছাড়া পাইয়া মাটিতে পড়িলো এবং ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াইয়া পড়িলো মাটিতেই। তখন স্পষ্ট দেখা গেলো জিনিষটা কী! রসো প্রাণপ্রণ করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া যাহাকে ত্যাগ করা নয়, খালি দেখাইতে রাজি হয় নাই সে-জিনিষটা কী তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেলো—শশীও দেখিলো, বিশুও দেখিলো, তাহা সোনা নয়, রূপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি....

কারখানার নূতন আনি—একটুও ময়লা হয় নাই; জাল জিনিষ নয়; ক্ষয় হয় নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিষ—অত্যন্ত নগদ জিনিষ, মূল্য চার পয়সা; ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এতো যে, তার হিশাব করিতে বসাই ভুল।

মাটিতে সেই মহামূল্য জিনিষটা পড়িয়া থাকিবার অবসর পাইলো মাত্র দুটি মুহূর্ত—তার বেশি নয়; কিন্তু সেই দুই মুহূর্তের মধ্যেই ভাবের যে-বন্যাটি বহিয়া গেলো তাহা অত্যন্ত তীব্র....

সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল—কাশীর স্ত্রী, কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি—সবাই; কী করিয়া যে দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিলো তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য! সবারই ইচ্ছা হইলো যে, আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয়—একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের—অন্যের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য হইবে, কিংবা অন্যে দাবি করিতে ভুলিয়া যাইবে, কিংবা দাবি করিতে সাহসই পাইবে না; আজ সবাইকার নাগালের বাহিরে যাইয়া চিরকালের জন্য তাহা আপনার হইবে....

প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিলো—হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিলো....

কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইলো তাই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইলো তাই, ভগিনী কুমারীর হইলো তাই; বিশু প্রভৃতির কী হইলো তাহা বলাই যায় না। লোভ হইলো না কেবল রসোর—সে তখন মৃত্তিকায় শায়িত এবং শোকে অভিভূত।

কিন্তু ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করিলো শশী; তৃতীয় মুহূর্তেই আনিটা নির্বিবাদে কুড়াইয়া লইয়া সে খুঁড়াইতে-খুঁড়াইতে যাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিলো; আনিটা রহিলো তার হাতের ভিতর—তাহার পর সে নির্বিকারের মতো হুঁকা টানিতে লাগিলো। বলা বাহুল্য মনঃক্ষুণ্ণ হইলো সবাই।

কিন্তু যে-জিনিষ কাহারও নয়, কাহারও পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে যাহা ঘরে আসে নাই, তাহার উপর দাবি করিয়া শশীর এই হস্তর্পণে প্রতিবাদ কেহ করিলো না; কাঞ্চন আর মোক্ষদা সরিয়া গেলো—

কুমারী বলিলো, 'দাদা, প'ড়ে-পাওয়া পয়সায় হরির লুঠ দিতে হয়।'

শশী বলিলো, 'তুই হ'লে দিতিস্?'

কুমারী সে-কথার জবাব দিলো না; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইলো, সে অপ্রতিভ হইয়াছে।

শশী পুনরায় বলিলো, 'হরির লুঠের নাম আর করিসনে! আমরাই কোন্ হরির লুঠের তার ঠিক নাই।'

কুমারী এবার হসিলো; বলিলো, 'ও-কথা বলতে নাই। হরি আবার দশ-বিশটা আছে কিনা?'

শশী কথা কহিলো না। এই আনিটা কী-প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিলো চাল-ডালের প্রয়োজনে নহে—নিত্যব্যবহার্য এবং স্থায়ী একটি জিনিষ ক্রয় করিয়া তাহার মারফৎ প্রচুর আনন্দ পাইতে হইবে এবং এই প্রাপ্তির সৌভাগ্যটা যাহাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাই অর্থাৎ একটি হুঁকা। কিন্তু সে-ইচ্ছা সার্থক হইবার পক্ষে বিঘ্ন ইহাই যে, একটা আনি যতো মুল্যবান হোক, তাহাতে পছন্দসই হুঁকা একটি হয় না।

বড়ো বউয়ের পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভ আছে, সে ওদিক হইতে বলিলো, 'বামুনকে দাও, পুণ্যি হবে।'

শশী বলিলো, 'আর বামুন ডাকতে হবে না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাদের তো বেরুতে হয় না—পয়সার কষ্ট তোমরা বুঝবে কি! কেউ বলছেন হরির লুঠ দাও, কেউ বলছেন বামুনকে দাও, পুণ্যি করো—যেন আমাদের আর-কিছু দিয়ে দরকারই নাই। আমি বলছি, এ তোলা থাক; সবারই পারের কড়ি এতে হবে।'

তামাক-সেবনের বিলাস থাকা সত্ত্বেও শশী নিজের জীবন দুর্বহ মনে করে—সে বৈতরণীর দিকে তাকাইয়া আছে।

ছোটো বউ বলিলে, 'তোলা থাকবে কেন? মুড়ি-বাতাসা আনা হোক্, ছেলেরা ফুর্তি ক'রে খাক। ওরাই তো পেয়েছে আনিটা। ওতে আর-কারো দাবি নাই।'

শুনিয়া রসো মাটির উপর পাশ ফিরিলো।

শশী ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলো, 'উনি এলেন দাবি দেখাতে। আরে, দাবিই যদি আজকাল দেখানো যেতো, তবে রজনী হাজরার কাছে আমার ঢের পাওনা হয়।'

কুমারী জিজ্ঞাসা করিলো, 'সে কে?'

শশী বলিতে লাগিলো, 'কই, তখন তো হরির লুঠের হরিও আসেন না, পুণ্যির জাহাজ বামুনও আসেন না বিচার করতে। আমাকে সে ফাঁকিই দেয়!'—তারপর রাগের মাথায় শশী বলিয়াই ফেলিলো—'এ পয়সা আমারই হ'লো। আর একটা আনি পেলেই আমি হুঁকা কিনবো।'

এটা শশীর অসম্ভব উচ্চকাঙ্ক্ষা মনে করিয়া কুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলো, 'তবে যে বলেছিলে, পারের কড়ি হবে?'

শশী বলিলো, 'হুঁকোও খানিক দূর সঙ্গে যায়।'

শশীর মনের আদৎ ইচ্ছা হুঁকা কেনাই, কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা যেমন তাহাতে একটা হুঁকা থাকিতেই আর-একটি হুঁকা কিনিয়া নিদারুণ অপব্যয় করিবে এরূপ প্রস্তাব করা ভালো হয় নাই—ইহাই মনে করিয়া শশী একটু ছলনা করিলো; বলিলো, হুঁকোর কথা আমি মিছে ক'রে বলেছি। দাদা আসুক, সে কী বলে শুনে তবে ব্যবস্থা হবে।'

কিন্তু একটা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিয়া এখনই করা হইতেছে না দেখিয়া ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিতে বিশু অগ্রসর হইয়া গেলো; বলিলো, 'আমাকে দাও কাকা....

—'তা হ'লেই গোল মেটে—না? কী করবি তুই?'

—'কাজ আছে।'—যেন কাজটা এমনই ব্যাপক আর গুরুত্বপূর্ণ যে, বিস্তৃত করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়।

কিন্তু শশী তার কথার মর্ম বুঝিল না; করিলো বিদ্রূপ; বলিলো, 'উঃ, কী কাজের লোক রে!'

ঐ বুঝি পাইয়া যায়! অত্যন্ত আতঙ্কিত আর ব্যগ্র হইয়া আর-আর ছেলে-মেয়েরা সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে দৌড়াইয়া আসিলো—প্রাণপণে চিৎকার করিয়া আর হাত পাতিয়া বলিতে লাগিলো—'ওকে দিও না, আমায় দাও।'

শশী তাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে চিৎকার করিতেছে, কুমারী তারস্বরে হাসিতেছে, এবং সর্বসমেত গোলমাল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন প্রবেশ করিলো কাশী।—কাশী অপর কোনো কাজ না পাইয়া রাজমিস্ত্রির জোগানদারের কাজ লইয়াছে—শুরকি মাখাইতে হয়, ইট টানিতে হয়—মালমশলা সাজ-সরঞ্জাম মিস্ত্রির হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

সে যাহাই হউক, সেখানে এতো কলরব নেই। কাশীকে দেখিয়াই এখানকার কলরব দ্বিগুণ হইয়া উঠিলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার আদ্যোপান্ত কাশীর জানা হইয়া গেলো। সবাই মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিলো যে রসো খেলিতে-খেলিতে রাস্তার ধুলার ভিতর একটা আনি পাইয়া গেছে; আনিটাকে রসোর হস্তচ্যুত করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; তাহা এখন শশীর জিম্মায় রহিয়াছে; কী-ভাবে তাহাকে ব্যবহারে লাগানো যায় তাহাই বর্তমানে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া আছে—বিভিন্ন ব্যক্তির মতে বিভিন্ন উপায়ে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছে হরির লুঠ, ব্রাহ্মণকে দান, মুড়িভক্ষণ ইত্যাদি।

বড়ো বউ কাঞ্চন সবাইকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিলো—তাহার মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা সে দৃঢ় কণ্ঠেই বলিলো বলিলো যে, পয়সা সচল পদার্থ; যাইতেই সে আসে; কিন্তু যাইবার সময় সে যদি মানুষের দেহে কিছু পুণ্য রাখিয়া যায় তার তাহাই ভবিষ্যতে কাজে লাগে—আর কিছু নয়।

স্ত্রী মুখে এই পুণ্যপিপাসু কথা শুনিয়া কাশী চটিয়া গেলো এবং দেখা গেলো, শশীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাহার মতের মিল আছে। বলিলো, 'বাহাদুরি রাখো। শশী, তুই রেখেছিস তো আনিটা? রাখ্ তুলে।'

কুমারী বলিলো, 'হ্যাঁ, রেখেছে। আর একটা আনি পেলেই হুঁকো কিনবে।'

অপরাধী শশী প্রতিবাদ করিলো না; কিন্তু বড়ো বউ স্বামীর কাছেও বাধা পাইয়া সেই রাগে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলো। আনিটা তাহার হইলো না, আর কাহারও নিজস্ব তা কেন হইবে, এই রাগও তার যথেষ্ট ছিলো...

কলহের ভঙ্গিতে সে বলিলো, 'হুঁকো কিনতে কাউকে আমি দেবো না। খেতে পাইনে পেট ভ'রে ছেলেপিলে নিয়ে, এদিকে বাবুয়ানি ক'রে তামাক খাওয়ার শখ তো আছে।'

বড়োবউয়ের ঝাঁঝ দেখিয়া শশী ভারী নিস্তেজ বোধ করিলো; বলিলো, 'হুঁকো কেনার কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু তামাশা ক'রে বলেছি। পেটে আমাদের ভাত নাই তা তোমার মত আমিও জানি বড়োবউ!'

সন্ধ্যা তখন লাগিয়া আসিয়াছে—

ছোট বউ একটা কুপি জ্বালিয়া শোবার ঘরে দুখানাতে সন্ধ্যা দেখাইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল; দাঁড়াইয়া পড়িল; বলিলো, 'ঝগড়ার দরকার কি? ফেলে দিলেই তো হয় অলুক্ষণে আনি!'

—'পয়সা হ'লো অলুক্ষণে! এই ভরসন্ধ্যে বাতি হাতে ক'রে অমন কথা ব'লো না, ছোটোবউ!' —বলিয়া কুমারী শশীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শশীও দেখিলো, গতিক খারাপ; আনি মায়া ত্যাগ করিয়া স্থানত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; আনিটা মাটিয়ে নামাইয়া রাখিয়া সে-ও ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া দুর্বার উপর বসিয়া গা

ছাড়িয়া দিলো....

ছেলেরা দেখিলো, আনির দাবিদার, আপাতত কেহ নাহ—বেওয়ারিশভাবে তা দাওয়ায় মাটিতে পড়িয়া আছে; অভিভাবকগণ নির্লিপ্ত যেন। এ-সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ, ত্যাগ করিবার মতো নয়। রসো সবার আগে ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে অধিকার করিয়াই পলায়ন করিতে উদ্যত হইলো....

কিন্তু দাবিদার কেহ নাই ভাবিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া রসোর ভুল হইয়াছিল, কারণ বড়োবউ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলো; ধমক দিয়া বলিলো, 'দে পয়সা শিগগির—নইলে ভাল হবে না।'

ছোটবউ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু ভাসুরের সামনে চেঁচায়—তাহাতে লজ্জা নাই। চোঁচাইয়া বলিলো, 'তোমাকে ও দেবে কেন? আমাকে দেবে না কেন? আমাকে দেবে না কেন? ও-ই তো পেয়েছে!'

বড়োবউ বলিল, 'এ যে শরিকের মতো তোমার-আমার আলাদা ক'রে ভাগ হ'লো!

'তুমিও তো নিজের কথাই ভাবছো। ওটা তোমার নিজের হোক এ-ই তো তোমার মতলব?'

'অতো মতলববাজ মেয়ে আমি নই।' বলিতে-বলিতে রসোর হাত হইতে আনিটা ছিনাইয়া লইয়া বড়োবউ পার হয় দেখিয়া রাগে-দুঃখে ছোটবউ কাঁদিয়া ফেলিলো, স্বামীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিলো—'ওগো, একটা বিহিত করো এসো! আমরা যদি কেউ না হই তবে তেমনি ব্যবস্থা আজ থেকে হোক।'

'কিছুই আপত্তি নাই।' বলিয়া বড়োবউ সদম্ভে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তার অতি নিকটেই সহসা গর্জন করিয়া উঠিল কাশী। বলিলো, 'খবদ্দার। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তোমাদের বাড় কদ্দুর। ও-আনি আর কারো নয়, আমার। এ-বাড়ির সকলের বড়ো আমি—আমি যাকে দেবো এ তারই হবে। আমি খেটে-খুটে এসেছি—আমার মেজাজ ভালো নেই। এখুনি ও-আনি আমার হাতে না দিলে ভারি মুশকিল হবে।'

মুশকিলের কথায় বড়োবউ ভয় পাইল না; কিন্তু অপরিমেয় ঘৃণার সহিত আনিটা সম্মুখে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেলো।

ছোটবউ ছোট্ট করিয়া বলিলো—'ও একই কথা হ'লো।'

কিন্তু সে-কথা কাশীর কানে গেলো কিনা সন্দেহ। বলিলো, 'এ আনি চারজনের একবেলার খোরাক—সেদিকে কারো হুঁশ নাই; কেবল পুঁজি করার লোভ। আচ্ছা।' —বলিয়া কাহাকে যেন শাসাইয়া কাশী রান্নাঘরে গেলো; শিল পাতিয়া আনিটা তাহার উপর রাখিলো, এরপর নোড়া তুলিয়া দিলো সেই আনির উপরে প্রাণপণে তিন ঘা।

ছেলেমেয়েদের চোখ ছলছল করিতে লাগিলো, বড়োবউ আর ছোটবউয়ের চোখে স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া এবং নির্নিমেষ হইয়া, জ্বালা করিতে লাগিলো।

নিজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়োবউ দানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলো এবং ঐ কারণেই ছোটবউ চাহিয়াছিল বারোয়ারিভাবে মুড়ি-মিষ্টি খাওয়াইতে। কিন্তু প্রপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াও দৈবদত্ত সুদর্শন আনিটার এই দুর্গতি কেহ কামনা করে নাই।

কাশী আনিটাকে থেঁতলাইয়া বিকৃত আর অকর্মণ্য করিয়া সেটাকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া শূন্যে-শূন্যে কোন্ গহনে পাঠাইয়া দিলো তাহার কিছুমাত্র উদ্দেশ রহিলো না।

হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি

সুকুমার রায়

(প্রফেসর হুঁশিয়ার আমাদের উপর ভারি রাগ করেছেন। আমরা সন্দেশে সেকালের জীবজন্তু সম্বন্ধে নানা কথা ছাপিয়েছি; কিন্তু কোথাও তাঁর অদ্ভুত শিকার কাহিনীর কোনও উল্লেখ করিনি। সত্যি, এ আমাদের ভারি অন্যায়। আমরা সে সব কাহিনী কিছুই জানতাম না, কিন্তু প্রফেসর হুঁশিয়ার তাঁর শিকারের ডায়েরি থেকে কিছু উদ্ধার করে আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা তারই কিছু ছাপিয়ে দিলাম। এসব সত্যি কি মিথ্যা তা তোমরা বিচার করে নিও।)

২৬শে জুন ১৯২২—কারাকোরাম্, বুন্দাকুশ পাহাড়ের দশ মাইল উত্তর। আমরা এখন সবসুদ্ধ দশজন—আমি, আমার ভাগ্নে চন্দ্রখাই, দুজন শিকারী (ছক্কড় সিং আর লক্কড় সিং) আর ছয়জন কুলি। আমার কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে জিনিসপত্র সব কুলিদের জিম্মায় দিয়ে, আমি চন্দ্রখাই আর শিকারী দুজন সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে বন্দুক, ম্যাপ, আর একটা মস্ত বাক্স, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি আর খাবার জিনিস। দুঘণ্টা পথ চলে আমরা এক জায়গায় এলাম; সেখানকার সবই কেমন অদ্ভুত রকম। বড় বড় গাছ, তার একটারও নাম আমরা জানি না। একটা গাছে প্রকাণ্ড বেলের মতো মস্ত মস্ত লাল রঙের ফল ঝুলছে; একটা ফুলের গাছ দেখলাম—তাতে হলদে সাদা ফুল হয়েছে—এক-একটা দেড় হাত লম্বা। আর-একটা গাছে ঝিঙের মতো কী-সব ঝুলছে, পঁচিশ হাত দূর থেকে তার ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় হঠাৎ হুপ্‌হাপ্ গুব্‌গাপ্ শব্দে পাহাড়ের উপর থেকে ভয়ানক একটা কোলাহল শোনা গেল।

আমি আর শিকারী দুজন তৎক্ষণাৎ বন্দুক নিয়ে খাড়া; কিন্তু চন্দ্রখাই বাক্স থেকে দুই টিন জ্যাম বের করে নিশ্চিন্তে বসে খেতে লাগল। ওইটে তার মস্ত দোষ; খাওয়া পেলে তার আর বিপদ-আপদ কিছুই জ্ঞান থাকে না। এইভাবে প্রায় মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকবার পর লক্কড় সিং হঠাৎ দেখতে পেল হাতির চাইতেও বড় কী একটা জন্তু গাছের উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। প্রথম দেখে মনে হল একটা প্রকাণ্ড মানুষ, তারপর মনে হল মানুষ নয় বাঁদর, তারপর দেখি মানুষও নয়, বাঁদরও নয়, —একেবারে নতুন রকমের জন্তু। সে লাল লাল ফলগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে আর আমাদের দিকে ফিরে ফিরে ঠিক মানুষের মতো করে হাসছে। দেখতে দেখতে পঁচিশ-ত্রিশটা ফল সে টপাটপ খেয়ে শেষ করল। আমরা এই সুযোগে তার কয়েকখানা ছবি তুলে ফেললাম। তারপর চন্দ্রখাই ভরসা করে এগিয়ে তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসল। জন্তুটা মহা খুশী হয়ে একগ্রাসে আস্ত একখানা পাঁড়রুটি আর প্রায় আধসের গুড়

শেষ করে, তারপর পাঁচ সাতটা সিদ্ধ ডিম খোলাসুদ্ধ কড়মড়িয়ে খেয়ে ফেলল। একটা টিনে করে গুড় দেওয়া হয়েছিল, সেই টিন্‌টাও সে খাবার মতলব করেছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ চিবিয়ে হঠাৎ বিশ্রী মুখ করে সে কান্নার সুরে গাঁও গাঁও শব্দে বিকট চিৎকার করে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। আমি জন্তুটার নাম দিয়েছি হ্যাংলাথেরিয়াম।

২৪শে জুলাই, ১৯২২—বন্দাকুশ পাহাড়ের একুশ মাইল উত্তর। এখানে এত দেখবার জিনিস আছে, নতুন নতুন এত সব গাছপালা জীবজন্তু যে তারই সন্ধান করতে আর নমুনা সংগ্রহ করতে আমাদের সময় কেটে যাচ্ছে। দুশো রকম পোকা আর প্রজাপতি, আর পাঁচশো রকম গাছপালা ফুলফল সংগ্রহ করেছি; আর ছবি যে কত তুলেছি তার সংখ্যাই হয় না। একটা কোন জ্যান্ত জানোয়ার ধরে সঙ্গে নেবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক কতদূর কী হয়। সেবার যখন কটক্ টোডন্ আমায় তাড়া করেছিল, তখন সে কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। এবার তাই জলজ্যান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নিচ্ছি।

আমরা যখন বন্দাকুশ পাহাড়ে উঠেছিলাম, তখন পাহাড়টা কত উঁচু তা মাপা হয়নি। সেদিন জরিপের যন্ত্র নিয়ে আমি আর চন্দ্রখাই পাহাড়টাকে মেপে দেখলাম। আমার হিসাবে হল ষোল হাজার ফুট কিন্তু চন্দ্রখাই হিসাব করল বেয়াল্লিশ হাজার। তাই আজ আবার সাবধানে দুজনে মিলে মেপে দেখলাম, এবার হল মোটে দু'হাজার সাতশো ফুট। বোধহয় আমাদের যন্ত্রে কোনও দোষ হয়ে থাকবে। যা হোক, এটা নিশ্চয়ই যে এ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চুড়োয় আর কেউ ওঠেনি। এ এক সম্পূর্ণ অজানা দেশ, কোথাও জনমানুষের চিহ্নমাত্র নাই, নিজেদের ম্যাপ নিজেরা তৈরী করে পথ চলতে হয়।

আজ সকালে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। লক্কড় সিং একটা গাছে হলদে রঙের ফল ফলেছে দেখে তারই একটুখানি খেতে গিয়েছিল। এক কামড় খেতেই হঠাৎ হাত-পা খিঁচিয়ে সে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল। তাই দেখে ছক্কড় সিং 'ভাইয়া রে, ভাইয়া' বলে কেঁদে অস্থির। যা হোক, মিনিট দশেক ঐ রকম হাত-পা ছুঁড়ে লক্কড় সিং একটু ঠাণ্ডা হয়ে উঠে বসল। তখন আমাদের চোখে পড়ল যে একটা জন্তু কাছেই ঝোপের আড়াল থেকে অত্যন্ত বিরক্ত মতন মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখলে মনে হয় যে, সংসারে তার কোন সুখ নেই, এসব গোলমাল কান্নাকাটি কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না, আমি তার নাম দিয়েছি গোম্‌রাথেরিয়াম। এমন খিট্‌খিটে খুঁতখুঁতে গোমরা মেজাজের জন্তু আমরা দ্বিতীয় দেখিনি। আমরা তাকে তোয়াজটোয়াজ করে খাবার দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম। সে অত্যন্ত বিশ্রীমতো মুখ করে, ফোঁস ফোঁস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অনেক আপত্তি জানিয়ে, আধখানা পাঁউরুটি আর দুটো কলা খেয়ে তারপর একটুখানি পেয়ারার জেলি মুখে দিতেই এমন চটে গেল যে রেগে সারা গায়ে জেলি আর মাখন মাখিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।
১৪ই আগস্ট বন্দাকুশ পাহাড়ের পঁচিশ মাইল উত্তর।—

ট্যাপ্ ট্যাপ্ থ্যাপ্ থ্যাপ্ ঝুপ্‌ঝাপ্। —সকালবেলায় খেতে বসেছি,এমন সময় এইরকম একটা শব্দ শোনা গেল। একটু খানি উঁকি মেরে দেখি আমাদের তাঁবুর কাছে প্রায় উটপাখির মতন বড় একটা অদ্ভুতরকম পাখি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে কোন্ দিকে চলবে তার কিছুই যে ঠিক-ঠিকানা নেই। ডান পা এদিকে যায় তো বাঁ পা ওদিকে; সামনে চলবে তো পিছনবাগে চায়, দশ পা না যেতেই পায়ে পায়ে জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তার বোধহয় ইচ্ছা ছিল তাঁবুটা ভালো

করে দেখে। কিন্তু হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে সে এমন ভড়্‌কে গেল যে হুমাড় খেয়ে হুড়্‌মুড়্‌ করে পড়ে গেল। তারপর এক ঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে প্রায় হাত দশেক গিয়ে আবার হেলেদুলে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে লাগল। চন্দ্রখাই বলল, "ঠিক হয়েছে, এইটাকে ধরে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।" তখন সকলের উৎসাহ দেখে কে। আমি ছক্কড় সিংকে বললাম, "তুমি বন্দুকের আওয়াজ কর, তাহলে পাখিটা নিশ্চয়ই চমকে পড়ে যাবে আর সেই সুযোগে আমরা চার পাঁচজন তাকে চেপে ধরব।" ছক্কড় সিং বন্দুক নিয়ে আওয়াজ করতেই পাখিটা ঠ্যাং মুড়ে মাটির উপর বসে পড়ল, আর আমাদের দিকে ক্যাট্‌ ক্যাট্‌ শব্দ করে ভয়ানক জোরে ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগল। তাই দেখে আমাদের আর এগুতো সাহস হল না। কিন্তু লক্কড় সিং হাজার হোক তেজী লোক, সে দৌড়ে গিয়ে পাখিটার বুকে ধাঁই করে এক ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল। ছাতার বাড়ি খেয়ে পাখিটা তৎক্ষণাৎ দুই পা ফাঁক করে উঠে দাঁড়াল। তারপর লক্কড় সিংয়ের দাড়িতে কামড়ে ধরে তার ঘাড়ের উপর দুই পা দিয়ে ঝুলে পড়ল। ভাইয়ের বিপদ দেখে ছক্কড় সিং বন্দুকের বাঁট দিয়ে পাখিটার মাথাটা থেঁৎলে দেবার আয়োজন করছিল। কিন্তু সে আঘাতটা পাখিটার মাথায় লাগল না, লাগল গিয়ে লক্কড় সিঙের বুকে। তাতে পাখিটা ভয় পেয়ে লক্কড় সিংকে ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু দু ভাইয়ে এমন মারামারি বেধে উঠল যে আমরা ভাবলাম দুটোই এবার মরে বুঝি। দুজনের তেজ কি তখন! আমি আর দুজন কুলি ছক্কড় সিঙের জামা ধরে টেনে রাখছি; সে আমাদের সুদ্ধ হিঁচড়ে নিয়ে ভাইয়ের নাকে ঘুঁষি চালাচ্ছে। চন্দ্রখাই রীতিমত ভারিক্কে মানুষ; সে ছক্কড় সিঙের কোমর ধরে লট্‌কে আছে, ছক্কড় সিং তাই সুদ্ধ মাটি থেকে তিন হাত লাফিয়ে উঠে বন্‌বন্‌ করে বন্দুক ঘোরাচ্ছে। হাজার হোক পাঞ্জাবের লোক কিনা। মারামারি থামাতে গিয়ে সেই ফাঁকে পাখিটা যে কখন পালাল তা আমরা টেরই পেলাম না। যা হোক্‌ এই ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ পাখি বা ল্যাগ্‌ব্যাগর্নিসের কতগুলো পালক আর কয়েকটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ হয়েছিল। তাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হবে।

১লা সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে—আমাদের খাবার ইত্যাদি ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। টাটকা জিনিসের মধ্যে সঙ্গে কতগুলো হাঁস মুরগী আছে, তারা রোজ কয়েকটা করে ডিম দেয়, তাছাড়া খালি বিস্কুট, জ্যাম, টিনের দুধ আর ফল, টিনের মাছ আর মাংস, এইসব কয়েক সপ্তাহের মতো আছে, সুতরাং এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে। আমরা এইসব জিনিস গুনছি আর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছি, এমন সময় ছক্কড় সিং বলল যে লক্কড় সিং ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। আমরা বললাম, "ব্যস্ত কেন, সে আসবে এখন। যাবে আবার কোথায়?" কিন্তু তার পরেও দুই-তিন ঘণ্টা কেটে গেল অথচ লক্কড় সিঙের দেখা পাওয়া গেল না। আমরা তাকে খুঁজতে বেরোবার পরামর্শ করছি এমন সময় হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জানোয়ারের মাথা দেখা গেল। মাথাটা উঠছে নামছে আর মাতালের মতো টলছে। দেখেই আমরা সুড়্‌সুড়্‌ করে তাঁবুর আড়ালে পালাতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম লক্কড় সিং চেঁচিয়ে বলছে, "পালিও না, পালিও না, ও কিছু বলবে না" তার পরের মুহূর্তেই দেখি লক্কড় সিং বুক ফুলিয়ে সেই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে ঐ অতবড় জানোয়ারটাকে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লক্কড় সিং বলল যে, সে সকালবেলা কুঁজো নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ফেরবার সময় এই জন্তুটার সঙ্গে তার দেখা। তাকে দেখেই

জন্তুটা মাটিতে শুয়ে 'কোঁ কোঁ' শব্দ করতে লাগল। সে দেখল জন্তুটার পায়ে কাঁটা ফুটেছে আর তাই দিয়ে দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে। লক্কড় সিং খুব সাহস করে তার পায়ের কাঁটাটি তুলে বেশ করে ধুয়ে নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর জানোয়ারটা তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে দেখে তাকে পাগড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই বললাম, "তাহলে ওটা ওইরকম বাঁধাই থাক, দেখি ওটাকে সঙ্গে করে দেশে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।" জন্তুটার নাম রাখা গেল ল্যাংড়াথেরিয়াম।

সকালে তো এই কাণ্ড হল; বিকেলবেলা আর এক ফ্যাসাদ উপস্থিত। তখন আমরা সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরেছি। হঠাৎ আমাদের তাঁবুর বেশ কাছেই একটা বিকট চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। অনেকগুলো চিল আর প্যাঁচা একসঙ্গে চেঁচালে যে রকম আওয়াজ হয়, কতকটা সেইরকম। ল্যাংড়াথেরিয়ামটা ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে একটা গাছের লম্বা পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছিল; চিৎকার শুনবামাত্র সে, ঠিক শেয়াল যেমন করে ফেউ ডাকে সেইরকম ধরনের একটা বিকট শব্দ করে, বাঁধন-টাধন ছিঁড়ে, কতক লাফিয়ে, কতক দৌড়িয়ে, এক মুহূর্তের মধ্যে গভীর জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। আমরা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড জন্তু—সেটা কুমিরও নয়, সাপও নয়, মাছও নয়, অথচ তিনটেরই কিছু কিছু আদল আছে। সে এক হাত মস্ত হাঁ করে প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে; আর একটা নিরীহগোছের কী যেন জানোয়ার হাত-পা এলিয়ে ঠিক তার মুখের সামনে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমরা মনে করলাম যে এইবার বেচারাকে খাবে বুঝি, কিন্তু পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, কেবল চিৎকারই চলতে লাগল; খাবার কোন চেষ্টাই দেখা গেল না। লক্কড় সিং বলল, "আমি ওটাকে গুলি করি"। আমি বললাম, কাজ নেই, গুলি যদি ঠিকমত না লাগে, তাহলে জন্তুটা খেপে গিয়ে কী জানি করে বসবে, তা কে জানে?" এই বলতে বলতেই ধেড়ে জন্তুটা চিৎকার থামিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নদীর দিকে চলে গেল। চন্দ্রখাই বলল, "জন্তুটার নাম দেওয়া যাক চিল্লানোসোরাস।" ছক্কড় সিং বলল, "উ বাচ্চাকো নাম দেও বেচারাথেরিয়াম।"

৭ই সেপ্টেম্বর, কাঁকড়ামতী নদীর ধারে। —নদীর বাঁক ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের একেবারে শেষ কিনারায় এসে পৌঁছেছি। আর কোনদিকে এগোবার জো নেই। দেওয়ালের মতো খাড়া পাহাড়; সোজা দুশো-তিনশো হাত নীচে যে সমতল জমি সে একেবারে মরুভূমির মতো; কোথাও গাছপালা, জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। আমরা একেবারে পাহাড়ের কিনারায় ঝুঁকে এইসব দেখছি, এমন সময় আমাদের ঠিক হাত পঞ্চাশেক নীচেই কী যেন একটা ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল। দেখলাম, বেশ একটা মাঝারি গোছের মতো মস্ত কী একটা জন্তু পাহাড়ের গায়ে আঁকড়ে ধরে বাদুড়ের মতো মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছে। তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে এইরকম আরো পাঁচ সাতটা জন্তু দেখতে পেলাম। কোনটা ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে, কোনটা লম্বা গলা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে, আর অনেক দূরে একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে কী যেন খুঁটে খুঁটে বের করে খাচ্ছে। এইরকম দেখছি, এমন সময় হঠাৎ কট্‌কটাৎ-কট শব্দ করে প্রথম জন্তুটা হুড়ুৎ করে ডানা মেলে একেবারে সোজা আমাদের দিকে উড়ে আসতে লাগল। ভয়ে আমাদের হাত-পাগুলো গুটিয়ে আসতে লাগল। এমন বিপদের সময় যে পালানো দরকার, তা পর্যন্ত আমরা ভুলে গেলাম। জন্তুটা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে আমাদের মাথার উপরে এসে পড়ল। তারপর যে কী হল আমার ভাল করে মনে নাই—খালি একটু মনে পড়ে, একটা অসম্ভব

বিট্‌কেল গন্ধের সঙ্গে ঝড়ের মতো ডানা ঝাপটান আর জন্তুটার ভয়ানক কটকটাং আওয়াজ। একটুখানি ডানার ঝাপটা আমার গায়ে লেগেছিল, তাতেই আমার দম বেরিয়ে প্রাণ বের হবার যোগাড় করেছিল। অন্য সকলের অবস্থাও সেইরকম অথবা তার চাইতেও খারাপ। যখন আমার হুঁশ হল তখন দেখি সকলেরই গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ছক্কড় সিঙের একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে। লক্কড় সিঙের বাঁ হাতটা এমন মচ্‌কে গিয়েছে যে সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে; আমারও সমস্ত বুকে পিঠে বেদনা ধরে গিয়েছে; কেবল চন্দ্রখাই এক হাতে রুমাল দিয়ে কপালের আর ঘাড়ের রক্ত মুছছে, আর এক হাতে এক মুঠো বিস্কুট নিয়ে খুব মন দিয়ে খাচ্ছে। আমরা তখনই আর বেশি আলোচনা না করে জিনিসপত্র গুটিয়ে বন্দাকুশ পাহাড়ের দিকে ফিরে চললাম।

(প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরী এইখানেই শেষ। কিন্তু আমরা আরও খবর জানাবার জন্য তাঁকে চিঠি লিখেছিলাম। তার উত্তরে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন, 'এর কাছেই সব খবর পাবে।' চন্দ্রখাইয়ের সঙ্গে আমাদের যে কথাবার্তা হয় খুব সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই—

আমরা। আপনারা যে-সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন সে-সব কোথায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়?

চন্দ্র। সে সব হারিয়ে গেছে।

আমরা। বলেন কি! হারিয়ে গেল? এমন এমন জিনিস সব হারিয়ে ফেললেন?

চন্দ্র। হ্যাঁ, প্রাণটুকু যে হারায়নি তাই যথেষ্ট। সে দেশের ঝড় ত আপনারা দেখেননি। তার এক-এক ঝাপটায় আমাদের যন্ত্রপাতি, বড় বড় তাঁবু আর নমুনার বাক্স, সব কাগজের মতো হুশ্ করে উড়িয়ে নেয়। আমাকেই ত পাঁচ-সাতবার উড়িয়ে নিয়েছিল। একবার তো ভাবলাম মরেই গেছি। কুকুরটাকে যে কোথায় উড়িয়ে নিল সে ত আর খুঁজেই পেলাম না। সে যা বিপদ! কাঁটা-কম্পাস, প্ল্যান, ম্যাপ, খাতাপত্র—কিছুই আর বাকী রাখেনি। কী করে যে ফিরলাম তা শুনলে আপনার ওই চুলদাড়ি সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠবে। আধপেটা খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, আন্দাজে পথ চলে, দুই সপ্তাহের রাস্তা পার হতে আমাদের পুরো তিনমাস লেগেছিল।

আমরা। তাহলে আপনার প্রমাণ-টমাণ যা-কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে?

চন্দ্র। এই তো আমি রয়েছি, মামা রয়েছেন, আবার কী প্রমাণ চাই? আর এই আপনাদের সন্দেশে'র জন্য কতকগুলো ছবি এনেছি; এতেও অনেকটা প্রমাণ হবে।

আমাদের ছাপাখানার একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলল, "আপনি কোন্ থোরিয়াম?" আর-একজন বলল, 'উনি হচ্ছেন গল্প-থোরিয়াম, বসে বসে গল্প মারছেন।' শুনে চন্দ্রখাই ভীষণ রেগে আমাদের টেবিল থেকে একমুঠো চিনেবাদাম আর গোটা আষ্টেক পান উঠিয়ে নিয়ে গজ্‌গজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ব্যাপার ত এই। এখন তোমরা যদি আরো জানতে চাও, তাহলে আমাদের ঠিকানায় প্রফেসার হুঁশিয়ারকে চিঠি লিখলে আমরা তার জবাব জানিয়ে দিতে পারি।)

কেলো কামড়ায়

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কিছুক্ষণ থেকে রাস্তায় একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলুম, কিন্তু তেমন কান দিইনি। পাড়ার অনেকের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সবার আওয়াজ ছাপিয়ে আশুদার গলা উঠছিল। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে দেরি হ'ল না। আশুদার সঙ্গে কোনদিনই পাড়ার কারুর সদ্ভাব নেই, কারুর না কারুর সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই আছে—আজকাল হাঙ্গামাটা যেন একটু ঘন ঘন হচ্ছে। কাজেই ওদিকে মন না দিয়ে নিজের চরকায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে চেঁচামেচি যেন বেড়েই চলল। পাড়ার অনুকূল, গজেন, সতু, জিতু, মিতু সবার গলা শুনতে পাওয়া যেতে লাগল, আর সবার ওপরে আশুদার ক্যানক্যানে গলা সবাইকে ছাপিয়ে উঠতে লাগল।

ব্যাপার কি! মুখ বাড়িয়ে দেখি আশুদার বাড়ির সামনে বেশ বড় রকমের একটি ভিড় জমা হয়েছে। কাজটাজ ফেলে ছুটলুম সেখানে। হাঙ্গামা মেটানোর চাইতে কৌতূহল মেটানোর ইচ্ছাই যে প্রবলতর ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। গিয়ে দেখি, যা ভেবেছিলুম তাই, আশুদার পেয়ারের কুকুর কেলোকে নিয়ে হাঙ্গামা বেধেছে।

কেলোর একটু ইতিহাস আছে। বছর দুয়েক আগে আশুদা তাকে বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে এসেছিলেন। তার বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে আশুদা বলতেন—আপিসের এক সায়েব দিয়েছে।

চাকরি থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আজীবন বিশ্বস্ততার পুরস্কাররূপে বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতীকস্বরূপ এই সারমেয় শিশুটিকে কোলে নিয়ে আশুদা যেদিন বাড়ি ফিরলেন সেদিন সে বাড়ির শিশুমহলে খুবই সোরগোল পড়েছিল।

ভাল জাতের বিলিতি কুকুর ব'লে দিন কয়েক তার আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি। কালো রঙ বলে তখুনি তার নামকরণ হয়ে গিয়েছিল কেলো। কিছুদিন কোলে কোলেই কেলোর দিন কাটতে লাগল। বাড়ির বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হ'ত না। তার পরে জিনিষ পুরনো হ'তে থাকলে যা হয় অর্থাৎ কেলো সম্বন্ধে সবাই উদাসীন হ'য়ে পড়ল। কেলোও সবার অলক্ষ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

বড় ঘরের ছেলে, তার ওপর আদরে মানুষ। দেখতে দেখতে কেলোর দেহ হ'য়ে পড়ল বিরাট, সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটিও সেই অনুপাতে হ'তে লাগল ক'ড়া। কেলো দিনরাত ঘেউ ঘেউ করে, পাড়ার ছেলেরা পেয়ে গেল মজা, তারা কেলোকে দেখতে পেলেই দূর থেকে ইঁট মারা শুরু করলে। কেলো তার অদ্ভুত স্বপ্রতিভায় আততায়ীকে চিনে রেখে দেয় এবং সুবিধা পেলেই আঘাতের তারতম্য অনুসারে তাকে দংশন করে। ফলে, পাড়ার প্রায় সব ছেলেকেই কেলো দংশন

করেছে। তাদের অঙ্গে যেমন কেলোর দংশন চিহ্ন বর্তমান, তেমনি কেলোও শতাধিক লোষ্ট্রনিক্ষেপচিহ্ন সর্বদাই অঙ্গে ধারণ করে থাকে। ত'ার অঙ্গের ঘা আর শুকোয় না। অবশ্য তাতে তার তেজোবৃদ্ধিই হয়ে চলেছে দিনে দিনে।

শুধু পাড়ায় নয়, বে-পাড়ার ছেলে-মেয়েরাও কেলোকে চেনে। তারা স্কুলে যাবার-আসবার পথে সাবধান হ'য়ে চলে। আশুদার বাড়ির কাছাকাছি এলে তাদের গতি মন্থর হয়। মেয়েরা বলে—ও, ভাই, কেলো আছে কিনা দেখ।

কেলোকে সকলেই চেনে। কেলোর অত্যাচারে পাড়ার ফেরিওয়ালা, বাঁদর-নাচানে, ভালুক নাচানেওয়ালা, এমন কি বিয়ের শোভাযাত্রার পর্যন্ত যাবার জো নেই। কেলো দিনের বেলায় বাড়িতে থাকে না। বাড়ির সামনেই রাস্তার ঠিক মাঝখানে সটান পড়ে থাকে। ঠেলাগাড়ির চিৎকার, মোটরের ভোঁক-ভোঁক কিছুতেই তার গ্রাহ্য নেই, শেষকালে তারাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। একবার এক রিক্সাওয়ালা কেলোর একটা পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দিয়েছিল, তাতে কেলো পাড়া ফাটিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ধরে এমন আর্তনাদ করছিল যে, তার অতি বড় দুষমনের মনও তার প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল।

দিন দুই সে পেছনকার একটা পা লেংড়ে চলল বটে, কিন্তু তার পরেই তার বিক্রম হ'য়ে উঠল তিনগুণ, কারণ পা-টা একটু সারামাত্র সে পাড়ার মধ্যে রিক্সাওয়ালা দেখলেই তাকে কামড়াতে আরম্ভ করে দিলে। শুধু পাড়ার মধ্যেই নয়, এমন কি বড় রাস্তায় রিক্সার ঠুংঠাং আওয়াজ শুনতে পেলেও সেখানে পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকত।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক কেলোর বিরুদ্ধে হ'লেও একা আশুদা ছিলেন তার স্বপক্ষে। সন্ধেবেলা আশুদা যখন নিজের হাতে বাড়ির রকটি মুছে তাতে মাদুর পেতে বসতেন, কেলো সে সময়টা আর কোথাও থাকতে পারত না। সে-ও এসে আশুদার গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ত। আর আশুদা তার ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতেন ও আস্তে আস্তে ছেলে ঘুম পাড়ানো ছড়া গাইতেন আর কেলো চোখ বুজে এই আদর উপভোগ করত।

কেলোর সঙ্গে অন্যের যে রকম সম্পর্কই থাক না কেন, আমাকে সে কখনো কিছু বলত না, বরং আমার একটু অনুগতই ছিল সে। এক সময় আমার নিজের অনেকগুলি কুকুর ছিল এবং কৃষ্ণের এই জীবটির প্রতি আমার মমতাও ছিল অনন্যসাধারণ। একদিন কি একটা কাজে সন্ধ্যেবেলায় আশুদার বাড়ি গিয়েছিলুম। কেলো যে সদর দরজার কাছে শুয়েছিল অতটা লক্ষ্য করিনি। আশুদা ব'লে ডাকতেই কেলো গর্জে উঠল—গ র্ র্ র্—কামড়ায় আর কি!

আমি ভড়কে না গিয়ে বললুম—এই যে কালোবাবু, আশুদা বাড়ি আছেন?

বলা মাত্র কেলো চেনা লোকের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে একেবারে পাশে ঘেঁসে দাঁড়ালো। সেই থেকে কেলো আমাকে দেখলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে। আমিও মাঝে মাঝে তাকে এক আধ পয়সার জিলিপি ঘুষ দিয়ে তার মেজাজটা ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন যে, সময় বিশেষে অনেক কুকুরকেই আজকাল 'বাবু' বলতে হয় এবং বদমাইসকে ঘুষ না দিলে সংসারযাত্রা সুগম হয় না। যাক এখন কেলোর কাহিনীই হোক।

হঠাৎ দেখা গেল কেলো বাড়িতে আহার ত্যাগ ক'রে রাস্তায় আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খেতে আরম্ভ করেছে। শুধু তাই নয়, পাড়ায় এমন কি বেপাড়ায় পর্যন্ত উৎসব বাড়ির দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে আছে—মাঝে মাঝে দু-তিন দিন পর্যন্ত সে জায়গা ছাড়বার নাম করে না। নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট

মৎস, মাংস ও দরবেশ মেরে মেরে দেহের পরিধি তার যে রকম বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে বেপাড়ার লেড়ি কুত্তাদের সঙ্গে যুদ্ধে দন্তাঘাত ও ছেলেদেরে লোষ্ট্রাঘাতের চিহ্নেও সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। কেলোকে এইভাবে আস্তাকুঁড় ঘাঁটতে দেখে একদিন আশুদাকে বললুম—অমন ভালো কুকুরটা অযত্নে খারাপ হয়ে গেল।

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—আরে ভাই অযত্নে নয়, ভদ্রলোকের ছেলে ছোটলোক মেরে যাওয়াইতো order of the day।

বললুম—তা ব'লে রাস্তার আস্তাকুঁড় ঘেঁটে খেয়ে বেড়াবে বাড়ি থাকতে।

আশুদা বললেন—কি করবে বল, ওতো মানুষ নয়! রেশানে যে চাল দেয় তার ভাত কুকুরেরও অখাদ্য। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ, রসের কথা ছেড়েই দাও। আমরা পয়সা খরচ করে ও আস্তাকুঁড় খাই, ও বিনি পয়সায় তার চেয়ে ভাল আস্তাকুঁড় পেয়েছে বলেই বাড়িতে খায় না। তাতে মনিবেরও দুপয়সা বাঁচে।

সেদিন সকালে আশুদার বাড়ির সামনে চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলুম—হৈ হৈ ব্যাপার বেধেছে। অশোকস্তম্ভ গুহরায়, স্বাধীনতা সেনচৌধুরি, আজাদহিন্দ বক্সী, দামোদর ভ্যালি সরখেল, জহরলাল মিত্রমজুমদার প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিরা খুব উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন। দেখলুম ভারতী সেনগুপ্তা, অমৃতপাক চক্রবর্তী প্রভৃতি পাড়ার মুরুব্বিনীরাও সেখানে উপস্থিত আছেন।

আমি যেতেই আশুদা চীৎকার ক'রে উঠলেন—এই যে নিরঙ্কুশ, দেখত' ভাই সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এরা কি হঙ্গামা লাগিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি, হ'ল কি?

দুপক্ষই হৈ হৈ ক'রে উঠল। পাড়ার অধিকাংশ লোকই কেলোর অর্থাৎ আশুদার বিরুদ্ধে। তাদের নালিস হচ্চে, কেলোর অত্যাচারে টেকা মুস্কিল হয়ে পড়েছে এবং আশুদার আস্কারা না পেলে সে কখনই এতটা বাড় বাড়তে পারত না। কিন্তু এতদিন যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর তারা সহ্য করবে না। এবার যা হয় একটা এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাবে।

আশুদাও কম যান না। তিনি একাই একশ'। হাত পা ছুঁড়ে গলাবাজি ক'রে তিনি জাহির করতে লাগলেন, কেলো অত্যন্ত শান্ত নিরীহ জীব, সকলে উত্ত্যক্ত করায় স্রেফ আত্মরক্ষার্থে তাকে মাঝে মাঝে একটু অসভ্য ব্যবহার করতে হয়। তার মতো অবস্থায় পড়লে পাড়ার যে কোন লোক তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ ব্যবহার করত এবং বিনা কারণে অথবা সামান্য কারণে হামেশা করে থাকে।

দুপক্ষের কথা শুনে সেদিনকার ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমার যেটুকু ধারণা হ'ল তা এই—বিঠলভাই গুপ্তভায়া, পাড়ার সবাই তাঁকে বিটকেল ভাই ব'লে ডাকে। তাঁর দুই খলিফা ছেলে প্যান্তা আর খ্যাঁচাকে চেনে না এ মহল্লায় ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই। কেলোকে তারা বড় ভালবাসে। যেতে আসতে ঢেলাটা খোঁচাটা দিয়ে প্রায়ই তাকে আপ্যায়িত ক'রে থাকে। মাস কয়েক আগে কেলোর দংশনে খ্যাঁচাকে প্রায় দিন পনেরোর জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল। এর পর কিছুদিন তারা কেলো সম্বন্ধে উদাসীনই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন থেকে আবার এদের ইঁটের জ্বালায় কেলোকে দিবা-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ করতে হয়েছে, বেচারির সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়েছে দগদগে।

আজ সকাল বেলা প্যান্তা বাজার করে বাড়ি ফিরছিল। দু'হাত জোড়া, একহাতে রেশনের

ঝুলি, অন্য হাতে বাজারের—মনের সাধে "লারে লাপ্পা" গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে চলেছে এমন সময় কেলো কোথা থেকে নিঃশব্দে এসে তার পায়ের ডিমের খানিকটা মাংস তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে। আশুদা আবিশ্যি বলছেন—ও কিছু না, একটু বড়ির মত মাংস কেটে নিয়েছে, তাতে আর হ'য়েছে কি!

বিঠলভাই চীৎকার করতে লাগলেন—নিরঙ্কুশ, তুমি ভাই একটু বিচার কর। নিত্যি এই কুকুরের অত্যাচার সহ্য ক'রে তো আর বাঁচা যায় না।

হঠাৎ কেলো বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে 'ঘেউ' শব্দে একটা বিরাট হুঙ্কার ছাড়ল। অর্থাৎ—খবরদার কুকুর কুকুর ক'রনা বলছি। 'সারমেয়' বলেত পার না!

এই রকম দুপক্ষেই চোঁচামেচি চলছে, এমন সময় শ্রীমতি ভারতী দেবী এক প্রস্তাব করলেন। তিনি বললেন—দেখুন, এ রকম চেঁচামেচি করলে কিছু হবে না। এখন বেলা প্রায় দশটা বাজে, সকলেরই কাজকর্ম আছে। তার চেয়ে সন্ধ্যেবেলা নিরঙ্কুশ বাবুর বৈঠকখানায় সব আসুন, দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে নিরঙ্কুশ বাবু বিচার ক'রে যা বলবেন তাই হবে।

বিঠলভাই-এর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এতে রাজী আছেন?

বিঠলভাই বললেন—তা আছি। নিরঙ্কুশ ভাই ন্যায় বিচার করতে হবে।

ঠিক হ'ল সেদিন সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় পঞ্চায়েৎ বসবে। পাড়ার সব মুরুব্বিরাই আসবেন। আশুদাও ঠিক সময়ে কেলোকে নিয়ে সেখানে হাজিরা দেবেন। দশজনে পরামর্শ করে দেখা যাক কি করতে পারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে থাকতেই আমার বৈঠকখানায় পাড়ার মুরুব্বিরা এসে জমতে লাগলেন। এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনেও চোরাবাজার থেকে কিছু চিনি কিনে এনে রেখেছিলুম। এতগুলো লোক আসবে আমার বাড়িতে, এক কাপ করে চা অন্তত না দিলে কি চলে। যথাসময়ে আশুদাও এলেন, সঙ্গে কেলো। আশুদা আসরে এসে বসতেই কেলোও তাঁর পাশে এসে বসে পড়ল। লোকজন আসবে বলে সেদিন গদির ময়লা চাদর তুলে পরিষ্কার চাদর পেতেছিলুম, কেলোর পদচিহ্নে বেশ খানিকটা জায়গা ময়লা হয়ে গেল। কেলোর আসাটা অনেকে পছন্দ না করে আপত্তি করলেন। কিন্তু আশুদা বললেন—এ বিষয়ে আমি বিচারকের অনুমতি চাইছি। বিচারালয়ে আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজনীয়।

আর কেউ কিছু বললেন না। আমি আশুদাকে বললুম—

তাহলে কেলোকে আপনি ধরে থাকবেন। এখানে যদি সে কামড়ায় তাহলে তাকে আদালত অবমাননার অপরাধে অপরাধী করা হবে।

সকলেই উপস্থিত, পাড়ার কয়েকজন মহিলাও এসেছেন। কয়েকটী কৌতূহলী ছেলেও জানলায় উঁকি ঝুঁকি মারছে। পরিস্থিতি প্রায় আদালতের মতনই হয়ে উঠেছে, এমন সময় মহিলাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করলেন—এবারে আমাদের কাজ আরম্ভ করলেই তো হয়, আর দেরী কিসের? কদিন থেকে আমার রাঁধবার লোকটাও আসছে না—

প্রথমে বিঠলভাই আরম্ভ করলেন—এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং আশুবাবুর কুকুর দ্বারা দংশিত হয়েছেন এমন অনেকে যাঁরা উপস্থিত নাই তাঁরা সকলে আমাকে তাদের মুখপাত্র ক'রে এই সভায় পাঠিয়েছেন। অবিশ্যি মহিলাদের তরফ থেকে আমার কাছে এ সম্বন্ধে কোন অনুরোধ আসেনি। তবুও—

শ্রীমতি চক্রবর্তী বললেন—যদি কিছু বলবার থাকে তো আমরা নিজেরাই বলব।

বিঠলভাই বললেন—বেশ! আমাদের অভিযোগ হচ্ছে যে, আশুবাবুর কুকুরের অত্যাচারে আমরা জর্জরিত হয়েছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কোনো ব্যবস্থা তো করেনই না, বরং তাঁর হালচাল দেখে মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁর প্রশ্রয় পেয়েই যেন তাঁর কুকুর দিনে দিনে অত্যাচার বাড়িয়েই চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বিষয়ে আশুবাবুর কিছু বলবার আছে?

আশুদা বললেন—আমার কুকুর আপানাদের প্রতি কি রকম অত্যাচার ক'রে থাকে এবং আমি কি রকমে তাকে প্রশ্রয় দিই তা প্রকাশ না করলে আমি কিছুই বলতে পারি না।

স্বদেশজীবনবাবু উত্তেজিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—দেখুন, ন্যাকা সাজবেন না। কি রকম অত্যাচার করে আপনি জানেন না যেন! মশাই পাড়াশুদ্ধ ছেলেবুড়ো সবাইকে কামড়ে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়লে, আর উনি জিজ্ঞেস করছেন—কি রকম অত্যাচার করেছে!

স্বদেশজীবনকে সাবধান করে দিতে হল—দেখুন ও রকম ভাষা ব্যবহার করলে প্রতিপক্ষও আপনার প্রতি অনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে পারে। অতএব সকলের প্রতিই আমার অনুরোধ যে, ভাষা সম্বন্ধে একটু সংযত হবেন।

আশুবাবু বললেন—আমার কুকুর কখনো যাকে-তাকে কামড়ায় না। যে তাকে বিনা কারণে মারে তাকেই সে কামড়ায়। আঘাত না পেলে কখনো সে অন্যকে দংশন করে না। পাড়ার ছেলেবুড়ো যাকে যাকে সে কিমা করেছে, তাদের প্রত্যেকেই পূর্বে কখনো-না-কখনো আঘাত করেছে।

অধমতারণ ঘোষ দস্তিদার বললেন—আপনি ইচ্ছা করলেই তাকে সামলাতে পারেন। আশুদা জোর করে বললেন—না, সামলাতে পারি না। আজকালকার দিনে লোকে নিজের ছেলেকেই সামলাতে পারে না তো কুকুর! এই, আপনার ছেলে শ্রীমান পতিতপাবন আপনার খায়, আপনার পরে, থাকে আপনার আশ্রয়ে, কিন্তু সে কি আপনার বাধ্য? সেদিন যে সে বৌবাজারে বোমা মেরে ধরা পড়ল—আমি কি বলব সে কার্য আপনার প্রশ্রয় পেয়ে করেছে?

স্বদেশজীবনবাবু বললেন—দেখুন নিরঙ্কুশবাবু, আমি একটা উপায় বাতলে দিতে পারি। আশুবাবু যদি তা পারেন তা'হলে দু'পক্ষই রক্ষা পায়। আমি বলি কি, কেলোর মুখে একটা Muzzle অর্থাৎ মুখবন্ধ পরিয়ে দিলে ও আর কারুকে কামড়াতে পারবে না। Muzzle টার দাম না হয় পাড়ার সবাই চাঁদা তুলে দেওয়া যাবে। টাকা চার পাঁচের মধ্যেই লোহার তারের Muzzle পাওয়া যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম—আশুবাবু কি বলেন?

আশুদা ঘোরতর আপত্তি করে বললেন—না তা হতে পারে না। প্রথমত কালুর (আশুদা আবার আদর ক'রে কেলোকে কালু বলেন) প্রতি অত্যাচার না করলে ও কখনো কামড়ায় না, দ্বিতীয়ত—Muzzle লাগিয়ে রাখা মানে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া—এ কুকুর যাকে তাকে বিনা কারণে কামড়ায়। কালু মোটেই সে রকম নয়। যদিও বা তর্কের খাতিরে তাকে সেই জাতের কুকুর ব'লেই ধরা যায় তবুও Muzzle লাগানোটা ভদ্র উপায় নয়। কালু কুকুর ব'লেই স্বদেশীজীবনবাবু তাকে Muzzle লাগাতে বলতে পারলেন। তাঁর ভাই যে গেল বছর বাসে পকেট মেরে ধরা প'ড়ে দু'মাস জেল খেটে এল—পাড়ার লোকেরা তো বলতে পারে, রাস্তায়

বেরুবার সময় এবার থেকে যেন তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার সেই অবস্থা দেখলেই সকলে পকেট সামলাবে কিংবা তাকে পকেটমার ব'লে চিনতে পারবে। Muzzle লাগাতে আপত্তির কারণ হচ্ছে যে, কালু রাস্তার খেয়ে উদরপূর্ত্তি ক'রে থাকে। সে পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। তাতে কালুর ও আবার দু'জনেরই অসুবিধা। রেশনের চাল ওর মুখে রোচেনা, রুচলেও সরকার কুকুরের জন্য রেশন দেয় না, দিলেও উনি দুটি লোকের আহার একাই ক'রে থাকেন।

শ্রীমতী অমৃতপাক বললেন—আশুবাবুর কথা সকলকেই মানতে হবে। আমাদের একটা নতুন চাকর এসেছে, সে তিনজনের ভাত একা খায়, তাতেও তার পেট ভরে না। তার জন্য আজ একমাস বাড়িশুদ্ধ সকলে আধপেটা খেয়ে আছি। এর একটা কিছু ব্যবস্থা হয় না। গভর্ণমেন্টের অত্যাচার।

শ্রীমতী অমৃতপাককে স্মরণ করিয়ে দিতে হ'ল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে—কেলোর অত্যাচার! আপনারা ইচ্ছা করেন তো গভর্ণমেন্টের অত্যাচারের বিষয়ও এখানে আলোচিত হ'তে পারে। কিন্তু এখন নয়।

আজাদহিন্দ্‌বাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ঠিক কথা। আচ্ছা কেলোর আরেকটি অত্যাচারের কথা আমি এই সভায় উপস্থিত করছি। এ সম্বন্ধে আশুবাবু কি বলেন শুনতে চাই। কেলো রোজ সকালবেলা আমার বাড়ির দরজার সামনেই ময়লা ত্যাগ ক'রে প্রাতর্ভ্রমণে যায়। এর একটা বিহিত করতে অনুরোধ করি আশুবাবুকে।

আশুবাবু বললেন—এর বিহিত করতে অনুরোধ করুন সহর পরিষ্কার করবার ভার যাঁদের ওপর আছে তাঁদের। কেলোকে শেখানো হ'য়েছে ঐ কর্মগুলি রাস্তাতেই সারবার জন্য।

স্বদেশজীবনবাবু শ্লেষ করে বললেন—কি শিক্ষাই দিয়েছেন!

আশুদা হাসতে হাসতে বললেন—দেখুন স্বদেশজীবনবাবু, কেলোকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—খবরদার বাড়িতে ওসব কর্ম করবে না। সেই শিক্ষার জন্য কেলো ভুলেও কখনো বাড়িতে ও কাজ করে না। আর আপনাকে জন্মাবধি শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে বাড়িতেই ওসব কাজগুলো সারতে কিন্তু তথাপি আপনি প্রতিদিন বাড়িতে ঢোকবার সময় আমার বাড়ির গায়ে সেটী সেরে তবে বাড়ি ঢোকেন। এ বিষয়ে কালু আপনার চাইতে অনেক উন্নত। তার ওপরে সহররক্ষক কোম্পানি এই জন্য বৎসরান্তে তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা খাজনা আদায় ক'রে থাকে। আপনি কত খাজনা দেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

আশুদার কথা শুনে ঘরে একটা উচ্চ হাসির রোল উঠল।

অনেকক্ষণ থেকেই দূরে একটা ঠুনঠুন আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হ'তেই কেলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হুমকি ছাড়লে—গ-র্-র্-র্।

হঠাৎ কেলোর এই ভাবান্তর দেখে সভাস্থ প্রায় সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। একজন মহিলা ব'লেই ফেলেন—আশুবাবু, ওকে সামলান। আমাদের কামড়াবে নাতো?

আশুবাবু কেলোর ঘেয়ো গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—কালু, চুপ ক'রে ব'সো।

ওদিকে ঠুনঠুন্ আওয়াজ ক্রমে স্পষ্টতর হ'তে হ'তে ঘুঙুরের আওয়াজে পরিণত হ'ল। কেলো আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। কেলোর বিরোধী পক্ষ তার এই ভাব দেখে পাশ কাটাবার বন্দোবস্ত করছে এমন সময় রাস্তায় সুরের প্রস্রবণ ছুটল—

"হরিদাসের গুল্‌গুল্‌ ভাজা,
খেতে বাবু বড়ই মজা—।
টাট্‌কা ভাজা 'গরম ভাজা'—

ব্যস, আর কথা নয়। কেলো একটি হুঙ্কার ছেড়ে এক লাফে সভাস্থল পেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সভা হ'ল নিস্তব্ধ!

মিনিট দুয়েক যেতে না যেতেই বাইরে বিকট আর্তনাদ উঠল—ওরে বাবা, গেছি রে! মেরে ফেললে রে! ওরে হরিদাসের গুলগুল্‌ ভাজা রে!

সবাই মিলে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম দূরে তিনকড়িদের বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে। তিনকড়ির গলা শুনতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড—কেলো এক ঘুগ্‌নি-দানাওয়ালাকে কামড়ে পালিয়েছে। লোকটার মাথায় স্ট্র-হ্যাট, চোখে কালো চশমা, একটা লাল কম্ফর্টরকে স্কার্ফ ক'রে পরা হ'য়েছে। হাত-কাঁটা খাঁকি সার্ট, ধুতি পরা, দু-পায়ে মোটা করে ঘুঙুর বাঁধা। কেলো তাকে কামড়ে রক্তারক্তি ক'রে দিয়েছে।

তিনকড়ি সন্ধেবেলায় তার বৈঠকখানার চারদিক বন্ধ ক'রে নিরিবিলি ব'সে খাঁটি খাচ্ছিল এমন সময় তার শান্তিভঙ্গ ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালার বিরাট আর্তনাদ!!!

সেখানে পৌঁছে দেখি ঘুগ্‌নিওয়ালা ও তিনকড়ি সমানে চেঁচাচ্ছে। তিনকড়ি ঘুগ্‌নিওয়ালাকে ধ'রে বলছে—ঘুগ্‌নি বিক্রি করিস্‌ তো এমন অদ্ভুত সেজেছিস কেন?

ঘুগ্‌নিওয়ালা বললে—তা'বলে কুকুরে কামড়াবে?

—আলবৎ কামড়াবে। তোর এই সাজ দেখে আমারই কামড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

ঘুগ্‌নিওয়ালা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনকড়ি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তাকে বলল—যাও বলছি, নইলে—

এই ব'লে সে বিরাট মুখব্যাদান ক'রে ঘুগ্‌নিওয়ালাকে তাড়া করতেই—ওরে, বাপরে ব'লে তল্পি তুলে সে মারলে টেনে দৌড়।

সেদিনকার বিচারসভা এইখানেই শেষ হ'ল।

বাক্স-বদল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সব স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পূজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটরবাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্বাস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না।

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। সুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশির ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে। একখানা বেঞ্চি ওঁরা জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তাদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের উপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁরা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পরস্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু একবার অল্পক্ষণের জন্যে চেয়ে দেখছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক

নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি!

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি? ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু'একটা চাষা-গাঁ।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কি না।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স' ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পৌঁছল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি, বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব-চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি! কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটির? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি! হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে!

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পানের কৌটটা কোথায়? দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে; ব'স্ না চুপ করে, গাড়ি দেখবি তো ইস্টিশন আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ির ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লালা সুটকেশটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেশ আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজে সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পৌঁছল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ায় নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ওকাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবানাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে দেখে, প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ি গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসতো।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো; তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সেই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে।

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু দিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

সুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে সে বিস্ময়ে কণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ি কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজনো রঙ-বেরঙের শাড়ি, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি; ছাড়া পাউডারের কৌটো ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউনটেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না, চিরুনি, আরও কত কি। সর্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হল, তার বোন কমলার সুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ি ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন যায়গার যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স; কমলা বাড়ি বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি; নতুনওঠা কাঁচের চুড়িও দু গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মানিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলি সুটকেস। পুরুষের নাম গন্ধ নেই সুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। সুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না; পার্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের কামরায় যে উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল; তাদের মধ্যে এ সুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের সুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীসাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের সুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তাছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিচ্ছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানেও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই। কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা কাপড় পাওয়া যায় না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলিক্ষুরে প্রতুল কখনও কামাবে না, দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মতো হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। এখন সে কি করে?

নাঃ উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই সুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ি আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়।

শাড়ি বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ি যা আছে সব জরিপাড়; আর তাঁতের দামী শাড়ি শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ি যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ি আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে, কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড় শান্তিপুরী শাড়ি? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ি পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমান গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার সাহেবকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হল না। রঙিন শাড়ি পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাঁটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্‌ট বি হিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ? ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে, —সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার সুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মানিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালো। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্য বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে—না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তায় রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে সুটকেস বদল হল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওঁর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়া পোয়েট্‌স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয় তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে সুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতে বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C\0 সি. আর. পাল, ২২/৬ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ি নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই সুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো সুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্ছা যাবে। দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই সুটকেসের মধ্যে! তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়ের কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সে একই চিন্তা—সেই বালুরঘাটের মেয়ে, তার সুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। সুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটি তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অনন্ত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের সুটেকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিশে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্যবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয় শ্রীমতী অমিয়ার সুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার সুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিস-পত্রাদির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয় যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনসিওর্ড আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার সুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথমে তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি, তা বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্তী এসে জুটল মাঝখানে। তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে সুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের সুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌছাল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা জাগে বই কি। বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ি রওনা হল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালোবাসে। কমলার বিবাহের কথা চলছে, সামনের বৈশাখে বোধহয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ি যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌছাল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে সুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে সুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা সুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কণ্ডাকটারকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ি থেকে কোনও লোক আসেনি?

কণ্ডাকটর বললে—ডেপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা।

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে, অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ এখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর সুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে সেই মুহূর্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে।

যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জন বাংলাতে—এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীজের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্বে মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরণ ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুসকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ-বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়িতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠলে প্রায়। বললে,—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌঁছে দেব বাড়ি, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেলে। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাটে নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়িতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্য কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল।

যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।....অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার সুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি। ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবার বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন—না?

প্রতুল হেসে বললে—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হয়ে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ি যাবেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ি ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ি করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ি করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেচে চাইলে—সে কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ির মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলাম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে

ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরম আত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ির মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলেছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন?

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি তুই এখানে বস্ একটু, ওকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস। আসছি আমি আধঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই। অনেক দিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করেছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ির মধ্যে বলছে এ বেলা যাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও বেলা ধীরে সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম.বি পাশ করেছে আর বছর, চা বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়র্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, বলো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট। মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়িতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার ঠিক নেই। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স বদল হল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে। বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে গুড়, পুরানো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো।

প্রতুল বললে—হায়, হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

হাজারিবাগ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক যে বাঙালী সেটা আগে বুঝতে পারিনি, পরে টের পেলাম তাঁর হিন্দি শুনে। সকাল আটটার স্টেট বাসে রাঁচি থেকে বাড়ি ফিরছি। সুবিধা হল না; প্রায় মাস দুয়েক কাটিয়ে মাত্র ছয় পাউণ্ড সঞ্চয়। খানিকটা নিরাশ হয়েই পূর্বের সেই মেদবিরল শরীর নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, এই সময় ভদ্রলোককে দেখলাম।

রাঁচির পর রামগড়, তারপর হাজারিবাগ। বাসে ঘণ্টা দুয়েকের চড়াই-উৎরাইয়ে দেহটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, নেমে একটু পায়চারি করে উঠে গিয়ে দেখি যাত্রীর একটু রদবদল হয়েছে। আমি সামনে ডানদিকের যে তিন সিটের বেঞ্চে বসেছিলাম সেটি দুজন মহিলা আর চৌদ্দ পনের বৎসরের একটি মেয়ের দখলে। তার আগে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চ দুটির মধ্যে একটি ভরা, অপরটিতে একজন বিহারী ভদ্রমহিলা তাঁর দুটি শিশু নিয়ে বসে আছেন। আমি পেছনের একটা খালি সিট লক্ষ্য করে এগুলাম। বাসে তেমন ভিড় নেই।

খানিকটা এগিয়েছি, হঠাৎ একটি অপ্রীতিকর মন্তব্য কানে গেল এবং তাইতেই ভদ্রলোকের ওপর দৃষ্টি পড়ল আমার। মন্তব্যটুকু মাত্র দুইটি কথার কিন্তু বেশ রুক্ষ এবং উদাত্ত কণ্ঠে 'অন্ধ্যা হ্যায়?'

ঘুরে দেখি বাঁদিকের দু সিটওলা বেঞ্চের ভদ্রলোক কটমটিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। অপরাধ, আসবার সময় তাঁর গায়ে একটু গা ঘষে গেছে। অপরাধটা কিন্তু ঠিক আমার নয়। ভদ্রলোকের দেহের যা আয়তন তাতে দু সিটের বেঞ্চে তাঁর একলা থাকলেই ভালো, অভাবে শরীরের খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই সংঘর্ষটুকু হয়েছে। খারাপই লাগল, তবে কথা না বাড়িয়ে চেপেই দিলাম ব্যাপার, বললাম—"মাফ কিজিয়েগা!"

দৃষ্টির উগ্রতায় মনে হল তাতেও সন্তুষ্ট নন। কিন্তু এই সময় ওঁর পাশের যুবকটি নিজের শরীরটা একটু গুটিয়ে নিয়ে বলল—"আপহি হট আইয়ে থোড়া।"

ভদ্রলোক সরে গেলেন, তবে আমার দিকে একটা কটাক্ষ বর্ষণ করে। কনডাক্টার হুইসিল দিয়েছে, আমি এগিয়ে গিয়ে বসে পড়লাম।

স্বাভাবিক কৌতূহলে ঘাড়টা চকিতে অল্প ঘুরিয়ে এক নজর দেখে নিলাম। খুব হৃষ্টপুষ্ট ঘাড়ে-গর্দানে এক, যার জন্য আরও গাঁট্টা গোট্টা দেখাচ্ছে; রংটা তামাটে; খোঁচাখোঁচা দাড়িগোঁফ ভরা মুখটা থমথম করছে; সামনে এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন, রাগটা যেন পড়েনি।

ঘরে আকৃতি আর প্রকৃতি নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছি, বাসও ছেড়ে দিয়েছে, হঠাৎ আর এক বম্‌শেল—"উহাঁ কাহে বোস্‌নে গিয়া?"

তাহলে বাঙালিই। চকিতে ঘাড় ফেরাতেই বোঝা গেল এবার কিন্তু আমায় নয়। একটি বিহারী ভদ্রলোক মহিলাদের প্রথম বেঞ্চের খালি জায়গাটিতে বসতে যাচ্ছিলেন, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে।

আগন্তুক পাক্ খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলেন—"তবে কাঁহা বৈঠেগা, অওর সীট কাঁহা?"

—উগ্রভাবে।

সেইভাবেই উত্তর হল—"ঐ বোলকে মেয়ে লোককা সিটমে বৈঠেগা?"

—এবার দাঁড়িয়েও উঠেছেন।

"মরদলোককা সিট মেয়েলোক দখল করনেসে কাঁহা যায়গাঁ?"—ব্যঙ্গের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভদ্রলোক।

"মেয়েলোক আজকাল প্যাংটালুন পরতা হ্যায়, তবে আপ ঢাকাই শাড়ি পরো।"

গাড়ির লোকেরা সব হকচকিয়ে গেছে। বাঙালী দেখে আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি, উত্তর হ'ল—"শাড়ি আপ্‌হি পেন্‌হিয়ে, লেডীকাসা কোঁচা লটক্‌হি রহা হ্যায়।"

"কোচা এক বাতমে মালকোঁচা হো শোক্‌তা হ্যায়।"

—এবার চোখ পাকিয়ে এক পা এগিয়েও গেলেন। পাশের যুবকটি ধরে ফেলতে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বললেন—"পরকিয়া না হোনেসে সুখ ক্যায়সে হোগা?"

উৎকট ভয়ে আমিও দাঁড়িয়ে উঠেছি, বাধল বুঝি কাণ্ড এবার। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর দৌলতে 'পরকিয়া' কথাটা বাঙালীর মধ্যে যতটা পরিচিত বিহারীর মধ্যে তার কিছুই নয়। তাইতেই সামলে গেল। ভদ্রলোকটি অজ্ঞাত কথাটায় একটু ধাঁ ধাঁ খেয়ে গিয়ে বললেন—"পরকিয়া কেয়া হ্যায়? সাফ বোলিয়ে বোলনা হ্যায় তো।"

"ন্যাকা সাজতা হ্যায়। পরকিয়া দোসরা কা পরিবার—ইস্তিরী। সাফ বোল্লেগা তো ডর কেয়া?"

—বুকটা চিতিয়ে দিলেন; ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। আমার কানে যেন সপাং করে বাজল, বললাম—"কী বলছেন আবোল তাবোল মশাই!" এরপরেই কিন্তু হঠাৎ জুড়িয়েও গেল ব্যাপারটা। বিহারী ভদ্রলোক মার্জিত রুচিরই অযথা আঘাত পেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। একটু যেন কি ভেবে নিয়ে চোখের নীচেই বাঙালী মহিলা দুটির দিকে চেয়ে গলা সম্ভবত সহজ করে এনে বললেন—"দুস্‌রেকে স্ত্রীকে সাথ জানোয়ারহি বৈঠ শকতা...শায়দ্ আপসে সম্ভব হো।"

বাচ্চা দুটি তাদের মায়ের সঙ্গে কাঠ মেরে গেছে, আগেরটিকে টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

ভাবছি আবার বুঝি ফুঁড়ে ওঠে, বলতো তো কিছু ছাড়লেন না বিহারী ভদ্রলোক। কিন্তু ঘুরিয়ে বলায় উনি বোধ হয় ঠিক ধরতে পারেন নি; বাক্যটাও লম্বা। তবু যেন খুঁজছিলেন অর্থটা; পাশের যুবাটি হাত ধরে টেনেই নামিয়ে দিল, বলল—"আপ বৈঠিয়ে। উন্‌কি আপনি ওয়াইফ হ্যায়, দেখতে নেহি?"

সেই কি হয়, কি হয় ভাবটা কেটে গিয়ে বসে পড়েছি, আমার সামনের সিটে হঠাৎ চাপা কণ্ঠে মন্তব্য হল—"দেখলেন তো দিদি মনিষ্যিটার কাণ্ড।" বসে পড়লেও কৌতূহলবশে ঘাড়টা আবার ফেরাতেই যাচ্ছিলাম, কানে যেতে এই দিকেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম; এবার অথারিটির কাছ থেকে তাহলে আসল কাহিনীটা শোনা যাবে।

বাঙালীর মেয়ে একটা অবস্থায় এসে তার স্বামীকে মনিষ্যি বলতে আরম্ভ করে অপরের কাছে পরিচয় দিতে। এটা হয় সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাটুকু একটু তরল করে নেওয়ার জন্য বিশেষ করে সমবয়সী কারুর কাছে অবহেলার ভান করতে হলে। এক ধরনের ভাষার পর্দা বলা যায়। প্রায়

ত্রিশ বত্রিশ থেকে শুরু হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মিনসেতে গিয়ে দাঁড়াল। বিশেষ করে বিশ্রম্ভালাপেই।

এ ক্ষেত্রে ভুল আন্দাজও করিনি। মন্তব্যটি বেরিয়েছে আমার সামনের বেঞ্চের প্রথমা মহিলাটির মুখ থেকে; দ্বিতীয়া সেই রকম চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন—"আপনারাই....সোয়ামী বুঝি?"

—প্রশ্নটার মধ্যে যে অল্প একটু কুণ্ঠার স্খলন তার কারণ ভদ্রমহিলার বয়স যদি ত্রিশ বত্রিশ হয় তো ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি; হয়তা স্বাস্থ্যের জন্যও খানিকটা বড় দেখায়।

সঙ্গিনীর প্রশ্নে প্রথমা বললেন—"কার আর—এমন কপাল পুড়েছে বলুন?"

—অভিজ্ঞ মাত্রেই বুঝে নিতে পারবেন এটাও ঐ ধরনের একটা পদার্থ। আমি বেশ ঘন হয়ে বসলাম। দুদিকের আরণ্যক দৃশ্যে অভিনিবিষ্ট হওয়ার একটা বেশ সুবিধাও রয়েছে। বাসটা খানিকটা গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আবার চলতে শুরু করায় ভদ্রমহিলার চাপা কুণ্ঠাকে খানিকটা মুক্তি দেওয়ারও সুযোগ মিলে গেল। আরম্ভ করে দিলেন তাঁর কাহিনী—

"অথচ এমনটি ছিল না ভাই, না শরীরে, না মেজাজে, বিশ্বাস করুন আপনি বলবেন গুরুজন, খুঁড়তে নেই। বুঝি না কি? বুঝি, কিন্তু শরীরের জন্যেইতো এই মেজাজ, এমন এই মেজাজ নিয়ে এইভাবে যদি দাঙ্গাফ্যাসাদ বাধাতে বাধাতে যায় তো কি করে এ মানুষকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ফেলি বলুন তো? আমার তো ত্রাসে হাত-পা আসছে না দিদি। আমাদের আবার একটু ঘুরে যেতে হচ্ছে তো? অথচ এই মানুষকে—বেশি নয়, সংক্রান্তিতে এক মাস, আর এই পনেরটা দিন—মাত্র দেড় মাস আগে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেছি একটা সাড়াশব্দ নেই মুখে.....

"তাহলে এখন এমনটা....."

—একটু ঘাড়টা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন সঙ্গিনী।

"ঐ তো বললাম দিদি—আপনি বলবেন খুঁড়ছে নিজের মানুষকে—সে মানুষ আর এ মানুষ কি এক? এই লিকলিক করছে (ডান হাতের তর্জনীটা নেড়ে)—ঐ তো গায়ে পড়ে ঝগড়ার ঘটাটা চোখেই দেখলেন—আসার সময় একেবারে অন্য মানুষ। এই দিকেই কোথায় একটু চা খাওয়ার জন্য নেমেছি ফিরে এসে দেখি ওর সিটটা বেদখল। তা একটা কথা বললে?—পুরুষ মানুষ তো তুমি? আমি মেয়েছেলে হয়ে বলতে গেলে, বলে, ছেড়ে দাও, এইটুকু না হয় দাঁড়িয়েই গেলাম—ওগো ঐ শরীরে এই ঝাঁকুনির মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতে গেলে যে, ভির্মি খাবে! ....মুখে রা নেই, গলা চিঁ-চিঁ করছে শেষে আমিই পাঁচজনকে বলতে তারা তাকে উঠিয়ে দিতে বলল—তাও যেন কত অপরাধীর মতন কাঁচুমাচু হয়ে। এই মানুষই দিদি, বিশ্বাস করবেন না হয়তো। তা আমি মেয়েছেলে, দরকার পড়লে কাকুতি মিনতিই করতে পারি লোককে, ওর সঙ্গে লাঠি নিয়ে তো দাঙ্গা করতে পারি না। না হয় আজকালকার মেয়ে প্যাল্টালুনই পড়ছি—শুনলেন তো ঠাট্টাটা?"

পেছনে ঘাড়টা একটু ফেরাতে আমার ঘাড়টাও যেন আপনা হয়েই ঘুরে গেল। দেখি ভদ্রলোক মুখ তেমনি থমথমে করে সামনে দৃষ্টি ফেলে বসে আছেন। ভদ্রমহিলা—

"মরিঃ"—বলে ছোট্ট একটি মন্তব্য করে আবার ঘুরে সঙ্গিনীকে বললেন—"দেখুন না ঘুরে এখনও রাগ যায়নি পুরুষেরা সবাই মিলে চেপে ধরলে যে কী করবেন।

সঙ্গিনী চকিতে একবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখে নিলেন। তারপর হয়তো পৌরুষের ভাবটা ভালোই লেগে থাকবে—একটু যেন হেসেই বললেন—"তা যদি বলবেন তো সে মিনমিনেপনার চেয়ে বেটা-ছেলেকে এই যেন মানায় দিদি, সত্যি কথা বলতে কি।"

একটু চুপচাপ গেল। কারণটা পরে বুঝলাম, অবশ্য আন্দাজেই! মনে হল নিজের মুখে নাই বলুন অপরের মুখে অভিমতটুকু রুচিকরই হয়ে থাকবে। একটু পরে ঘাড় নীচু করে যেভাবে হাসির সঙ্গে বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন, তাতে তারই যেন একটা আভাস ফুটে উঠল। তারপর মৃদু অনুযোগের মধ্যে ও—

"আপনি তো বলবেনই দিদি ভুগতে তো হচ্ছে না। আমার এদিকে ভাবনা কি করে সু ভালাভালি ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি বীরপুরুষকে।.....তাই কি এ রকম জ্বালা ভাই..."

—আবার একটু বিরতি, হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে। সঙ্গিনী একটু প্রতীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন—"আবার কি?"

ভদ্রমহিলা মাথাটা নীচু করে ঘাড়টা অল্প ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাইলেন, এবার মনে হল যেন একটু লজ্জিত হাসি নিয়ে, যেন কি বলতে চান অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। আরও কৌতূহল উদ্রিক্ত করেছেন, সঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন—"কই বললেন না তো?"

"বলবার কথা নয় তো দিদি, হাজার হোক, ইয়েই তো"—এবার মুখটা অন্যদিকে অল্প ঘুরিয়ে নিলেন—"জ্বালা বলছি—শুধু এই তো নয়—যখন নিয়ে আসি, হোক রোগা, রংটা ধপধপ করছে, বলতে নেই, টানা ভাসাভাসা চোখ, দিব্যি খাড়া নাক; তা এখন দেখতেই পাচ্ছেন, চারিদিক থেকে গালের মাংস চেপে এসে সে-নাক আর সে-চোখ সে কোথায় তলিয়ে গেছে—আর সে রং...

সঙ্গিনীর ঘাড়টা আবার যেন অবাধ্যভাবেই একটু ঘুরে গেল তখনই সোজা করে নিতে ঠিক বোঝা গেল না, তবে মনে হল যেন একটু হাসিও ফুটে থাকবে। সামনে গিয়ে বললেন—"এখানকার জল—একটু গায়ে লাগলে আর কি—এই রকমটা হয়ে যায়।"

"শুনেছি আমিও। তাই বলে এই রকম উদ্ভুটে কাণ্ড হতে হবে দিদি। শরীর হয়ে যাবে লোহার মতন, আর রংটাও তার সঙ্গে হয়ে যাবে..."

"কি হয়েছে জানেন? বৌদিদির ভয়, সেখানে সবাই ঠাট্টা করবে—কি মানুষ নিয়ে এসেছিলেন, কি মানুষ নিয়ে ফিরছেন।"

—এবার পাশের সেই চোদ্দ-পনের বছরের মেয়েটি। জানালার ধারে বাইরের দিকে মুখ করে বসেছিল, ঘুরে হাসির সঙ্গে মন্তব্যটুকু করে আবার পূর্ববৎ ঘুরিয়ে নিল মুখটা।

ভদ্রমহিলা নিজের অসমাপ্ত বক্তব্যের টিকাটুকুতে যেন স্বস্তি অনুভব করলেন মনে হল। বললেন—"শুনেছেন তো দিদি? ঠাট্টা এখান থেকেই ব্লাউসের পকেটে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। ননদ কিনা।...তুই গিয়ে দাদাকে চিনিয়ে দিস, ভাগ্যিস এসেছিলি?"

"আমার দাদার তো..."

—না ঘুরেই কি বলতে যাচ্ছিল মেয়েটি, থামিয়ে দিলেন—"আচ্ছা, চুপ করুন আপনি ভাই সোহাগী।"

বাসটা এসে পরের স্টপ বরহতে দাঁড়াল। ওঠানামার-পালা, ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন, ওঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"তোমরা নামতে যেও না বড় বেয়ারা লোক এরা সব, কজনের সঙ্গে ঝগড়া করব? আমি বাসেই চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কারুর দিক থেকে কোন প্রতিবাদ ওঠে কিনা একবার উগ্র দৃষ্টিতে দেখে নিলেন।

ভদ্রমহিলা মাথাটা নামিয়ে সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললেন—"সবগুলো এক দিকে হলেও তুমি পেছপা নও।"

তখনই আবার সোজা হয়ে ওঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"তিন কাপ পাঠিয়ে দেবে।"

"সে বুদ্ধি আছে।"—ভিড় ঠেলে এগুতে এগুতে না ঘুরেই উত্তর করলেন ভদ্রলোক।

আমিও নেমে গিয়েছিলাম, এসে দেখি সিটে আবার একটু রদবদল হয়েছে। আমার বেঞ্চের দ্বিতীয় যাত্রীটি তাঁর কিট-ব্যাগ নিয়ে নেমে গেছেন, কোনও লোকও আসেনি তবে আমি জানালার ধারে আমার সিটের ওপর সুটকেসটা রেখে নেমে গিয়েছিলাম, সেটি নামিয়ে রেখে সামনের মেয়েটি এসে বসেছে। আমি আসতে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলল—"দিদিমণি—ঐ উনি (দ্বিতীয়া ভদ্রমহিলাটিকে দেখিয়ে) পান খান, পিক ফেলতে অসুবিধে হচ্ছিল দাদু তাই...

"বোস এখানেই তুমি!"—বলে আমি পাশেই বসে পড়লাম। প্রশ্ন করলাম—"কি নাম তোমার?"

"কুমারী শুভ্রা পাল।"

"কি পড়?"

"টেনথ্ ক্লাসে...উঠলাম এবার।"

"বাড়ি তোমাদের?"

"বেহালায়।"

"তা বেলাহায় তোমার দাদা..."

—হঠাৎ খেয়াল হল, বসে বসে সব শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি বলে সন্দেহ হবে ওদিকে। ছেড়ে দিয়ে বললাম—"যাক তুমি দ্যাখো এবার তিলাইয়ার বাঁধ আসবে।"

বোধ হয় ঐ সন্দেহেই ভদ্রমহিলা চুপ করেছিলেন, মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে নিতে ফের শুরু করতে যাবেন সেই কর্কশ কণ্ঠে—"কেয়া 'প্যাঁড়া প্যাঁড়া' করকে কান ঝালাপালা কর দেতা হ্যায়!" এক থালা প্যাঁড়া নিয়ে একটা লোক বাসেব প্যাসেজটায় হেঁকে হেঁকে ফেরি করছিল, ভদ্রলোক উঠে চোখ-মুখ কুঁচকে খানিকটা সহ্য করলেন, তারপরেই ঐ হুঙ্কার। হকার মিনতির স্বরে বলল—তার তো বিক্রি হলেই লাভ—বাবুরা কিনছেনও...

চটে উঠলেন আরও—"কেত্তা খায়গা বাবুলোক? এক একঠো রাবণরাজাকা ভাই কুম্ভকর্ণ রাক্ষস হ্যায় যে ছ'মাস প্যাঁড়া খায়গা ছ'মাস ঘুমায় গা? যাও, উতর যাও ভেজাল নেই বাড়ায়কে!" লোকটা একবার চেহারাখানার ওপর চোখ বুলিয়ে নেমে যেতে পাশের বেহারীটি ওঁকেই একটু কুণ্ঠিতভাবে বললেন—"ইহাকা পেঁড়া মহ্শূর হোতা হ্যায়।"

কুণ্ঠিত ভাবটা দেখে মনে হল যেন নেওয়ারই ইচ্ছা ছিল, কুম্ভকর্ণ অপবাদের জন্য আত্মসংবরণ করেছেন। ভদ্রলোক কিছু না বলে চুপ করেই রইলেন গোঁজ হয়ে। অশোভন হলেও ঐ দিকেই নজরটা গিয়ে পড়ছে। দেখি হঠাৎ যেন চেহারাটা নরম হয়ে আসছে।

তারপর উঠে এসে আমার পাশে খালি সিটটায় বসলেন, প্রথমার ঠিক পেছনে। দুবার একটু কাশলেন, তারপর—'বলছি, শুনলে কি বলছিল লোকটি?'

—কোন উত্তর নেই।

"বলেছিল এখানকার প্যাঁড়া নাকি খুব মশুর।"

—কোন উত্তর নেই।

এবার আরও মগ্ন কণ্ঠে—"মশুর মানে নাকি নামী।"

—এবারও কোনো উত্তর নেই।

"বলেছিলাম নিয়ে নিলে হত না কিছু বাড়ির জন্যে?"

"না হতো না। তুমি বোস গিয়ে নিজের জায়গায়।"

দৃষ্টিটা জানালার দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। কান দুটো দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে যেতে বুঝলাম নিঃশব্দে উঠে গেছেন।

'খুক্ খুক্' করে নীচের দিক থেকে একটু হাসি উঠল। প্রথমা প্রশ্ন করলেন—"হাসছেন যে দিদি?"

চাপা কণ্ঠেই চলছে। হর্ন দিয়ে বাসটা ছেড়ে দিল। দ্বিতীয়া পিঠটা ঝুঁকিয়ে নিয়েছিলেন, উঠে বললেন—অবশ্য, চাপা গলাতেই—"হাজারীবাগকে কিন্তু একটা জায়গায় মানতেই হল হার।"

একটু মাথা ঝুঁকিয়ে উত্তর হল—"আপনার শুধু ঠাট্টা!"

ঠাট্টাটুকু রুচিকর বলেই বোধ হয় একটু বিরতি এসে পড়েছে, সঙ্গিনী আর একটু জুড়েই দিলেন "হাতেই হবে কিনা।"

সেই চটুল হাসি, তবে এবার নিঃশব্দ।

বিস্মিত প্রশ্ন হল—"তার মানে?"

একটু দ্বিধা তারপর উত্তর হল—"দ্বিতীয় সংসারই তো।"

"দ্যুৎ, দ্বিতীয় কেন হতে যাবে?"—প্রথমা একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করলেন, বললেন—"এই আর এক জ্বালা দেখুন। দেড় মাস আগে পর্যন্ত ঐ মানুষকে মনে হয়েছে—বয়েস মাত্র সাঁইত্রিশই তো—তা, দেখলে মনে করতেন তেত্রিশ-চৌত্রিশের একদিন বেশি নয়—এখন সেই মানুষকে মনে হচ্ছে না যেন পঞ্চাশ বছরের মরদ এক!" দুজনেই মাথা নীচু করে নিয়েছেন, দ্বিতীয়বার আর একটি চটুল প্রশ্ন—"তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে?"

"তার মানে?"

"ওনার বয়সটা তো যেখানকার সেখানেই রয়েছে।"

"আবার সেই ঠাট্টা। তবে থাক দিদি, কাজ নেই শুনে।"

"না না, বলুন।...তারপর কি করলে সেই বিষুণ পাঁড়ে?"

মনে হল, খানিকটা যে বাইরে ছিলাম তারমধ্যে গল্পও এদিকে কিছুটা বাদ পড়ে গিয়ে থাকবে। প্রথমা বললেন—"কি কুক্ষণেই সে এসেছিল দেখা করতে! যত যাই করি—স্বপ্নাদ্য ওষুধ, পর সাহেবের হালুয়া, মাদুলি তাবিজে তো হাত ভরে গেল, কিছুতেই অম্বলের ব্যামো আর যায় না, দিন দিন প্যাঁকাটি হয়ে যাচ্ছে, এই সময় একদিন বিষুণ পাঁড়ে এসে হাজির। বললাম না?—শ্বশুরের অফিসের দারোয়ান, তিনি বেঁচে থাকতে আসত মাঝে মাঝে, রিটায়ার করে বাড়ি যাচ্ছে, দেখা করতে এসেছে।"

কোন দিকেই কুল পাচ্ছি না...কী দুর্মতি হল তাকেও বললাম, পাঁড়েজী তোমাদের খোকাবাবুর অবস্থাটা দেখছই...সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছে, খোকাবাবু বলেই জানে...একটা কিছু হদিশ বাৎলে দাও...

'খুব তাগড়া বুঝি?' দ্বিতীয়া প্রশ্ন করলেন।

'দুৎ, নিজের ভারে নড়তে পারে না, পা দুটো ধনুকের মতো বেঁকে গেছে, চলে ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে দুলতে একটা পেতল বাঁধানো লাঠিতে ভর দিয়ে। তবে শরীরে কম করে ধরলেও মণ আড়াইয়েক মাংস বয়ে বেড়াচ্ছে।.....ডুবন্ত মানুষ কুটোটাও আকড়ে ধরে না? আমার যে হয়েছে তাই দিদি। অনেকদিন পরে দেখে কি রকম মতিচ্ছন্ন ধরল, বললাম পুরনো লোক, একটা হদিশ বাৎলে দাও। বাঙালী হিন্দী মিলিয়ে কথা বলে, বললে—"পানি বদল করতে হোবে।"

কলকাতার পানিকে আমরা পানি বোলে না। বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে যেমন বলে...মুয়ে আগুন!

কথাটা কিন্তু খুব লাগল মনে দিদি, ঠিকই বলেছে তো। খেয়ালই যায়নি ওদিকে।

বললাম—"তাই করি তাহলে। নৈনিতালে আমার পিসেমশাই আছেন, লিখে দিই।"

হো-হো করে এমন হেসে উঠল দিদি—বিশ্বাস করবেন না যেন সমস্ত নৈনিতাল পাহাড়টাকে উড়িয়ে দিলে, বলল—"আরে নৈনিতাল! কি করবে? ঐ নামে তাকত কোথায়?—নৈনিতাল!—নৈনিতাল! আরে ফুঃ!"

তাহলে মুসৌরি? সেখানে আমার পিসতুতো ভাই ফরেস্ট অফিসে কাজ করে। আবার সেই ছাদ ফাটানো হাসি!—নিজের নামেই তাকৎ নেই যার সে দুসরাকে কি তাকত দেবে?

ছেড়ে দিয়ে আমি রাঁচীর কথা বললাম। বললে—

—ওতো আপনি চিঁ চিঁ করছে, খাট্টাকে বেমারি সারাবে কি? খোকাবাবুকে হামার মুলুক হাজারিবাগে নিয়ে যান—হাজারিবাগ!—হাজারিবাগ!—হাজারিবাগ!...

ডান হাতের চেটোটা নাচিয়ে নাচিয়ে বলবার সে কী ভঙ্গি দিদি, যেন কত ওজনের কী একটা তৌল করে দেখছে; আশ আর....কী কুক্ষণেই যে জিজ্ঞেস করতে.....পোড়ামানুষকে।

প্রথম হপ্তাখানেক কিছুই হয় না, সেই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অম্বল ঢেঁকুর, সেই সব কিছু। ভাবলাম, তাহলে রাঁচীটা একবার দেখে যাই, সেখানে জ্যেঠতুতো জা রয়েছেন, একটা বাসা ঠিক করে আসি। হাজারিবাগ আরও সব এসেছিল বেড়াতে, আমার বড় জা, ভাসুরপো, তাদের কাছে রেখে আমার রাঁচি গিয়ে দিন অ্যাষ্টক দেরী হয়ে গেল। ফিরে এসে সুবুকে—ঐ যে আমার ছোট ননদ পেছনে বসে আছে—সুবুকে জিজ্ঞেস করলাম—"হাঁরে, তোর দাদা কোথায়? বললে—"কেন ঐ তো তার পাশ দিয়েই উঠে এলে"...ইজিচেয়ারে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। বলিস কিরে! তোর দাদা! আর তার ঐ নাকডাকা।

আর আমি কে না কে ভেবে মাথার কাপড় আড়াল দিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম!

"জলটা লেগে গেল বুঝি?"—সঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন।

"একে লেগে যাওয়া বলবে দিদি! তারপর থেকেই এব্‌লা এক রকম ওঁব্‌লা এক রকম, মানুষটা যেন চোখের সামনে চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে! তার সঙ্গে খোরাক। নিজের—কি যে বলে ইয়ে খুঁড়তে নেই—যা খাচ্ছে—মুর্গি, ডিম, মাংস, লুচি, পরোটা, পিঁয়াজী, চিনেবাদাম—যা খাচ্ছে, কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে। লোকের কথায় একটা পলার আংটি পরানো হয়েছিল—ও আঙুল থেকে কড়ে আঙুল তার পরেই দ্যাখ্ কোথায় স্যাকরা আছে—হাজারিবাগের ওপর আর পলার আংটি চাপিয়ে কাজ নেই!...

"তাহলে নিয়েই যাচ্ছেন?"—কি ভেবে সঙ্গিনী প্রশ্ন করলেন।

"কি করি দিদি? এদিকটা না হয় সামলে সুমলে রাখতাম খোরাক কমিয়ে দিয়ে, কিন্তু মেজাজ কি রকম তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে দেখছেন তো? সেই মিনমিনে মানুষ এখন প্রতিদিন লোকদের সঙ্গে ঝগড়া একটা না একটা কিছু নিয়ে। এখানে কথায় কথায় তীরধনুক, তায় শহরের বাইরের দিকেই বাসাটা ছিল আমাদের। সর্বদাই যেন কাঁটা হয়ে থাকা ভয়ে। শেষে ভাবলাম, কোনদিন কি ঘটাবে, তার চেয়ে আস্ত মানুষটাকে তো ফেলি বাড়ি নিয়ে গিয়ে...

কাহিনীটা এইখানেই শেষ হতে পারত, অন্তত আমার পক্ষে কেননা আমি সামনের স্টপ তিলাইয়ায় একটা দরকারে নেমে পরের বাসটা ধরব। কিন্তু উপসংহারটা আর একটু এগিয়েই গেল এবং আমিও তাতে একটু না জড়িয়ে গিয়ে পারলাম না!

তিলাইয়ার আবার সেই প্যাঁড়া; কয়েকটা হকারই বাসটা ঘিরে ফেলেছে। ভেতরও উঠেছে। ক-বার আপনিই চোখ গিয়ে পড়তে দেখি, ভদ্রলোক চনমন করছেন; শধু যেন সাহসের অভাবেই এবার আর উঠলেন না। তবে এটাও স্পষ্ট যে, ক্রমেই ধৈর্য ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠছে। শেষে এক সময় মেয়েটিকে ডাক দিলেন—"সুবু,—এদিকে আয় ত একবার।" গেলে, ফিসফিস করে কি বলতে শুভ্রা নিজের মনেই গরগর করতে করতে ফিরে এল—'আমি তোমাদের কর্তা গিন্নীর মাঝখানে দাঁড়াতে পারব না। প্যাঁড়া খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তো নিজেই বলো না।"

তারপর খুব গলা নামিয়ে আমায় বলল—"টাকাকড়ি সব বৌদির হাতেই যে দাদু। যা দেখবেন তাই কিনবেন কি বলুন?"

ওদিকে সঙ্গিনী প্রথমাকে খুব আস্তে আস্তে বলছেন—"নিনই না কিছু কিনে পুরুষ, ইচ্ছে হয়েছে—"

"রক্ষে করুন দিদি! এখনও হাজারিবাগের জল পেটে রয়েছে। খাওয়ামাত্রই সেই লোহাগোলা রক্ত মাথায় ঠেলে উঠুক। তারপর...

আমি উঠে পড়ে এগিয়েছি, এই পর্যন্ত কানে গেল, তারপরেই আবার সেই হুঙ্কার—"সত্যিই কানা নাকি মশাই, না হওয়ার সাধ হয়েছে!!"

আমাকেই, এবার একটু লেগেছে কি না লেগেছে। দাঁড়িয়েও উঠেছেন বুক চিতিয়ে, চোখ দুটো জ্বলছে।

যত অল্পই হোক, আমারও রাঁচী থেকে হয়েছে কিছু সদ্য সঞ্চয়, চড়াৎ করে রক্তটা মাথায় উঠে পড়ল, মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালাম ও চোখে চোখ রেখে। দুটো সেকেন্ড তারপর নরম হয়েই বললাম—"মাপ করবেন, আমি তো নেমেই যাচ্ছি।

নেমে ভিড় থেকে সরে এসে মনটা সুস্থির করে দিলাম। এখনই এইটুকু যা হল তা তো আর কিছুই নয়, প্যাঁড়ার বিরহ! ভদ্রমহিলা একটা দিকই দেখেছেন, কিন্তু হাজারিবাগের জল পেটে যে বাড়বানল জ্বেলে দিয়েছে তাকে একটু করে মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা করে না দিলে সে প্রলয় ঘটাবে। এ চাপা আগুন পড়বেই বেরিয়ে আরও উগ্র হয়েই। তবু যাই হোক একজন বাঙালী ছিলাম, ভদ্রমহিলা একা সামলাবেন কি করে? এদিকে মেয়েছেলে, নিঃসম্পর্ক কিছু বলাও যায় না।

কিছুই মাথায় আসছে না।

তারপর বাসের পেছন দিয়ে একটা প্যাঁড়াওলাকে দেখে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

সের দেড়েক প্যাঁড়া কিনলাম। একটা বড় ঠোঙায় করে দিল। দামটা চুকিয়ে বাসের পেছন থেকে ঘাড়টা একটু বাড়িয়ে শুভ্রা মেয়েটিকে দেখিয়ে বললাম—'মেয়েটির হাতে ঠোঙাটা দিয়ে বলবে, তোমার দাদু—যিনি পাশে বসে ছিলেন, কিনে পাঠিয়েছেন।"

শেষ দৃশটা শান্তিপর্বেরই।

আমার রিকশটা ঐ পথ ধরে সামনেই যাচ্ছিল, একটু পরে বাসটা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি ভদ্রলোক চোখ দুটি বুজে পরম পরিতোষের সঙ্গে প্যাঁড়া চিবোচ্ছেন, হাতে সমস্ত ঠোঙাটাই কিনা সেটা দেখা গেল না।

আর, এঁরা দুজনেই একটু ঘাড় নীচু করে দুলে দুলে হেসে যাচ্ছেন, বাসের ভিড়ে লজ্জা বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছে যেন।

—এক দাবড়ানিতে এক ঠোঙা প্যাঁড়া আদায়, না, একটা মানুষ নির্বিকার নির্লিপ্ততার ভান করে আগাগোড়া সব বিশ্রম্ভালাপই গেল শুনে?—ভালো মন্দ কিছুই তো বাদ যায় না।

রূপান্তর

পরিমল গোস্বামী

বিজ্ঞান এসে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত অনেক জিনিসই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে অলৌকিক ব'লে মনে হয়। এই রকম একটি অলৌকিক কাহিনীর কথাই বলছি।

বেশিদিনের ঘটনা নয়।

রেভারেন্ড কিং আমাদের পাড়ায় থাকেন। একেবারে খাঁটি ইংরেজ এবং খাঁটি খ্রীষ্টান। সেবাধর্মে, অহঙ্কারহীনতায়, বিনয়ে, আদর্শ পুরুষ। তাঁকে ভাল না বাসে এমন লোক আমাদের গড়িয়াহাটা অঞ্চলে নেই।

একটি দোতলা বাড়িতে তিনি থাকেন, কিন্তু নীচের তলাটি একটি গরিব পরিবারকে অতি শস্তায় ভাড়া দিয়েছেন—তত শস্তায় কলকাতায় এ রকম একতলা পাওয়া যায় না।

তিনি বিশেষ ক'রে গরিবদের বন্ধু। তাঁর চোখে ছোটবড় ধনীদরিদ্রে ভেদ নেই; ভারতবাসী ব'লে কাউকে তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন না; সবাইকে বুকে টেনে নেন। রোগীর সেবা করেন নিজহাতে। বস্তী অঞ্চলে সবাই তাঁকে দেবতা ব'লে জানে।

প্রথম প্রথম আমরা ক'জন বন্ধু তাঁকে সন্দেহ করেছি; সেবাধর্মের আবরণে আসলে তিনি খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার করতে চান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সে ভুল আমাদের ভেঙেছে।

তাঁর সরল মনে কোনো কু-অভিপ্রায় থাকতে পারে না; আমরাও তাঁর কাছে আমাদের মনের কথা খোলাখুলি ভাবেই বলতাম। তিনি যে আসলে সেবাপ্রাপ্ত লোকেদের খ্রীষ্টান করতেই চান, আমাদের মনের এই সন্দেহের কথাও একদিন তাঁকে বললাম।—

আপনি আমাদের এত উপকার করছেন, গরিব রোগীকে ওষুধ দিচ্ছেন, সহায়হীনকে আর্তকে নিজহাতে সেবা করছেন—এ পর্যন্ত বেশ ভালই, এ জন্যে আমরা আপনার কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কিন্তু শেষে যদি দেখি আমাদেরই কোনো বন্ধুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন, তা হ'লে আপনার উপর আমাদের সবার শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যাবে।

রেভারেন্ড কিং এ কথার উত্তরে হেসে বললেন, সে ভয় আপনাদের নেই, আমি খ্রাইস্টের বাণী আমার কাজের ভিতর দিয়ে প্রচার করি—জনসেবার ভিতর দিয়ে আমি তাঁরই সেবা করি, তার বেশি তা আমি কিছুই চাই না। আমার ধর্মে দীক্ষিত ক'রে অকারণ খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমি গৌরবের মনে করি না।

তিনি আরও বললেন, ধর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্তরের জিনিস। বাইরে একটা নাম তার থাকে বটে কিন্তু পৃথকভাবে তার কোনো দামই নেই। কোটি কোটি খ্রীষ্টান আজ হিংসায় মত্ত, তারা খ্রীষ্টান হয়ে পৃথিবীর কি লাভ হল?

রেভারেন্ড কিং-এর কাছে আমাদের মাথা নত হ'ল। এ রকম কথা একজন খ্রীষ্টানের মুখে

এই প্রথম শুনলাম। আমরা তাঁর ভক্ত মাত্র ছিলাম, এবারে তাঁর অনুগত হয়ে পড়লাম।

আমাদের মধ্যে প্রীতি এবং অন্তরঙ্গতা এত বেড়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে রীতিমতো সেবার কাজ আরম্ভ করলাম।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা পারব কেন?

তাঁর শাদা চুলের নিচে যে শুভ বুদ্ধি এবং শাদা দাড়ির নিচে যে সহৃদয়তা ছিল, তা আমাদের প্রতিপদে লজ্জা দিতে লাগল। তাঁর ষাট বছর বয়সেও যে উদ্যম এবং কর্মপটুতা ছিল তাও আমাদের মতো যুবকদের মধ্যে কারো ছিল না।

তবু আমরা যতদূর সম্ভব তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে লাগলাম। আমাদেরই প্রতিবেশীরা কি রকম দুঃস্থ অবস্থায় দিন কাটায় তা আমরা এতদিন দেখেও দেখিনি। অসুস্থ হ'লে তারা বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে মারা পড়ে—তা আমরা এতদিন এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইনি।

আমরা তাঁর জনসেবার রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে তাঁর কাছে কত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। বলেছি, আপনি এদের জীবন দান করেছেন।

কিন্তু তার উত্তরে তিনি বলতেন, একজনকে দু'জনকে বাঁচিয়ে আপনাদের বিরাট ভারতবর্ষের দুঃখ ঘোচাব কি ক'রে? আমি যে সেবা করছি, এ সেবার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ গৌরব অনুভব করেতে পারি না।

কেন?—আমরা প্রশ্ন করি।

এদের যেমন সেবা করছি, তেমনি সেই সঙ্গে আপনাদের সবাইকে যদি এদের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে পারতাম তা হ'লেই আমার সেবা সার্থক হ'ত।

তারপর একটু থেমে আমাদের দিকে চেয়ে রইলেন। বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করলেন—আমরা তাঁর কথাটির মর্ম ঠিক মতো গ্রহণ করতে পেরেছি কি না। আমাদের দিকে চেয়ে তিনি কি বুঝলেন জানি না, তবে তিনি বলতে লাগলেন, আপনাদের দেশের লোককে আপনারা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছেন, অথচ এ দেশের লোক তারা। আপনাদের কাছে তারা কিছুই পায় না। আমরা দূরদেশ থেকে এসে আপনাদের অপরিচিত আদিবাসীদের মধ্যে গিয়ে মিশি, তাদের সেবা করি, তাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করি, তারপর যখন আপনারা দেখেন ওরা আমাদের ভালোবাসতে শুরু করেছে, তখন আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লাগেন। কিন্তু বলুন তো আমাদের দোষ কি? আপনারা কোনো দিন যাদের স্পর্শ করেন না, চেনেন না, তারা যে আমাদের দেশের লোক, একথা বলতে আপনাদের মতো শিক্ষিত লোকের লজ্জা পাওয়া উচিত নয় কি?

লজ্জা যে পাওয়া উচিত এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রেভারেন্ড কিং শুধু সেবকই নন, তিনি মানুষ হিসাবে সব দিক দিয়েই মহৎ। তাঁর সঙ্গে কাজ ক'রে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করেছি। মানুষের সেবা করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, এ কাজটি সহজ নয়। পদে পদে অসুবিধা আছে। যাদের সেবা করতে যাওয়া যায়, তারা সন্দেহ করে, তারাই অনেক সময় বাধা দিতে চায়। চারিদিকে সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের সামনে। উৎসাহ কমে যায়, মনে হয় কি দায় পড়েছে এ সব করবার!

কিন্তু যখনই উৎসাহ নিবে যায় রেভারেন্ড কিং-এর কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মাথাটি সর্বদা তুলে ধ'রে আছেন। শিশুর মতো সরল হাসি তাঁর মুখে লেগে

আছে। সে হাসি তাঁর অন্তরের পরম আনন্দের প্রতিফলন। সেই ছবিটি মনে জাগে। তখন আমরা আবার উৎসাহ পাই।

একটি বিশেষ কেন্দ্রে আমরা জনসেবা আরম্ভ করেছিলাম, আমাদেরই বালিগঞ্জ অঞ্চলের এক বস্তীতে, কিন্তু আমাদের কর্মক্ষেত্র অল্পদিনের মধ্যেই বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল।

তার কারণ জাপানী বোমা পড়তে শুরু করল কলকাতাবাসীদের মাথায়। দলে দলে লোক পালাতে লাগল শহর ছেড়ে। মানুষ ভয়ে যে কি পরিমাণ দিশাহারা হয়ে পড়ে, তার ব্যাপক ছবি দেখলাম এই প্রথম; যার যা কিছু ছিল—তাই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু ট্রেনে চাপার পর দেখছে, সম্পত্তির বারো আনাই নেই। ঘোড়ার গাড়ি, ট্যাক্সি, রিকশা সবাই দশগুণ বেশি ভাড়া নিয়েছে, তারপর টিকিট করার ব্যাপারে যার যা সাধ্য ঘুস দিয়েছে: ট্রেনে একটু জায়গা পাওয়ার জন্যেও প্রচুর টাকা দিতে হয়েছে, উপরন্তু কুলিরা মালপত্র নিয়ে স'রে পড়েছে। ট্রেনে ছেলেমেয়ে সবাই মিলে পদদলিত এবং নিষ্পিষ্ট হয়ে দেশে গিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট রইল, তাও গেল সেখানে চোরের হাতে।

রেভারেন্ড কিং একবার মাত্র বলেছিলেন, অসহায় লোকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এদেশের ভদ্র অভদ্র সবাই একসঙ্গে চোর হ'য়ে ওঠে—পৃথিবীতে আর কোনো দেশে এ রকম নেই।

তাঁকে এবারে অত্যন্ত বিচলিত দেখা গেল। আমাদের ক'জনের সাধ্যে যতদূর কুলোয় ঝগড়া মারামারি করেও পলায়মান যাত্রীদের ট্রেনে ওঠায় সাহায্য করতে লাগলাম।

সেদিন রাত নটা আন্দাজ সময় আমরা হাওড়া থেকে ফিরছি। আমরা ডালহৌসী স্কয়ারের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি আমরা যে যেখানে পারলাম গর্তে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোমা পড়তে শুরু হ'ল। মনে হ'তে লাগল বোমা সব আমাদের কাছেই পড়ছে—মৃত্যু অনিবার্য। ভাবতে ভাবতেই আমাদের গর্তের খুব কাছেই ভীষণ এক আওয়াজ!

রেভারেন্ড কিং আশ্রয়ে ঢোকার আগেই বিপদের কথা ভেবে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন। কত লোক হয়তো মরবে, অথচ সে সময়ে বেরিয়ে কিছু করবার উপায় নেই।

সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা পরে অল ক্লিয়ার বাজল। তখন বেরিয়েই নিজেদের কে কোথায় আছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, সর্বনাশ হয়েছে। রেভারেন্ড কিং অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন। এ-আর-পীর তৎপরতায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হ'ল, ডাক্তার বললেন, 'শক্' পেয়েছেন, অবস্থা অনিশ্চিত।

উপায় কি? আমরা ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলাম।

ডাক্তার বললেন, দেখা যাক। বলেই চিকিৎসা শুরু করলেন।

রেভারেন্ডের সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে বেশ কিছুদিন লাগল। হাসপাতাল থেকে তাঁকে বাড়িতে এনে আমরা দীর্ঘদিন তাঁর শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সবল ক'রে তুললাম এবং তিনি সবল হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আরও দু'এক মাস বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলাম। তিনিও সহজেই রাজি হলেন এবং বললেন, কিছুদিন শুয়ে থাকতেই চাই, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর ইচ্ছে করছে না।

এ কথার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে পেরেছি। তখন ভেবেছিলাম এত বড় একটা দৈহিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে তাঁর মনে অবসাদ এসেছে। তাই মনে হ'ল তাঁকে নিয়ে রোজ একটু একটু বেড়ানো দরকার। তিনি এতে সহজেই রাজি হলেন।

রেভারেন্ড কিংকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেদিন ট্রামে উঠলাম। একটা খালি সীট পেয়ে আমরা দু'জনে একসঙ্গে তাতে বসলাম। রেভারেন্ড কিং বসলেন জানালার ধারে, আমি তাঁর পাশে। ইতিপূর্বে ট্রামের মধ্যে কখনও তাঁকে বিশেষ বসতে দেখিনি, কেননা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে তিনি আসন ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে দিন ট্রামে লোক বেশি ছিল না, শহরের লোক প্রায় খালি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ চলতেই হঠাৎ অনুভব করলাম, রেভারেন্ড কিং তাঁর দুটি হাঁটু জাপানী পাখার মতো ছড়িয়ে আমাকে ঠেলে রাখলেন। তাঁর পাশে আমার আসন এমন সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এলো যে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক না হ'লে আসন থেকে নিচে পড়ে যেতাম।

আমাকে তিনি এমন ঠেলে রাখলেন যে, হঠাৎ আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জেগে উঠল। কেননা এমন স্বার্থপর ব্যবহার তাঁর কাছ থেকে যে কখনও আশা করা যায় না। তবে কি তাঁর চরিত্রে কোনো গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেল? আর এই কি সেই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ?

আমি মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং চালচলন লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলাম। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মত বদলে গেল। তাঁর ব্যবহারে ক্রমেই মর্মাহত হ'তে লাগলাম।

তিনি সেবাধর্মের নামও আর করেন না। ট্রামে উঠলে তাঁর মতো স্বার্থপর আর দেখা যায় না। ভিড়ের মধ্যে সীট থেকে উঠে গেলে সেই সীটের কাছের লোকের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে তাদের ঠেলে বিদ্যুৎ গতিতে গিয়ে সেই খালি আসন দখল করেন। শুধু তাই নয়, যার পাশে বসেছেন তাকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করেন। তখন দু'জনে রীতিমতো ঝগড়া লেগে যায়।

ক'দিন পরে আরও একটি খবর শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমাদেরই সেবকদলের একজন এসে বলল, রেভারেন্ড কিং বস্তীতে গিয়ে, সেখানকার লোকদের কাছে এতদিন যে ওষুধ এবং পথ্য দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে নাকি কিছু টাকা আদায় করেছেন। বস্তীর লোকেরা প্রায় ক্ষেপে গেছে। বলছে, আগে জানলে তারা ওষুধপত্র কিছুই নিত না।

আমাদের এক বন্ধু এসে বললেন, এ সব কি শুনছি?

কি?

রেভারেন্ড কিং-এর নামে নানা রকম কুৎসা রটাচ্ছে সবাই।

তুমি কি শুনেছ?

শুনেছি যা, তা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

এখন আর পৃথিবীতে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই, তুমি নির্ভয়ে বল।

বন্ধু বলতে লাগলেন, রেভারেন্ড কিং-এর নিচের তলার ভাড়াটের সঙ্গে তাঁর ভয়ানক ঝগড়া চলছে। তিনি তাদের উঠে যাবার জন্যে নোটিস্ দিয়েছেন।

কেন?

কেন বুঝলে না? পনেরো টাকা ভাড়া পাচ্ছিলেন, কিন্তু ও বাড়ির ভাড়া এখন আশি টাকা সহজেই পাওয়া যাবে। যারা আছে তাদের কাছ থেকে তো আর বেশি ভাড়া নিতে পাচ্ছেন না, চক্ষুলজ্জাতেও আটকায়। তাই ওদের তুলে দিতে পারলে নতুন ভাড়াটে পাওয়া যাবে বেশি টাকায়।

যারা আছে তারা যদি না ওঠে?

উনি নিজের জন্যেই নিচের তলাটা চান, এইভাবে নোটিস্ দিয়েছেন।

কিন্তু যারা আছে তারা নতুন বাড়ি না পেলে উঠে যেতে পারছে না। রেভারেন্ড কিং তাদের

নানাভাবে অসুবিধায় ফেলেছেন সে জন্যে। উপর থেকে জঞ্জাল ফেলছেন, সব উড়ে গিয়ে লাগছে তাদের গায়ে।

বল কি?

আমিও তো অবাক হচ্ছি এসব শুনে। আচ্ছা, এর মানে কি বলতে পার? ভদ্রলোক হঠাৎ এমন ডিগবাজি খেলেন কেন?

কেন, সেই কথাই তো ভাবছি।

একথা শুনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। রেভারেন্ডের কাছে গিয়ে বললাম, এ সব কি শুনছি?

তিনি বললেন, এতদিন ভবিষ্যতের কথা ভাবিনি, এখন ভাবতে হচ্ছে। ছোটলোকেরা বিনা পয়সায় সব পেয়ে মাথায় চড়ে বসেছে। বেটারা এতদিন ওষুধ আর ভাল ভাল পথ্য খেয়েছে বিনা পয়সায়, এখন তার কিছু দাম দিক। ভিখারীর জাত বেটারা, ওদের আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

এর উত্তরে একটি কথাও আর বলতে প্রবৃত্ত হ'ল না। তাঁর আশা একেবারে ছেড়ে দিলাম। আমাদের সেবাসঙ্ঘও ভেঙে গেল। কিন্তু মনে যে আঘাত লাগল তা থেকে মুক্তি পেলাম না।

মাসখানেকের মধ্যেই দেখি রেভারেন্ড কিং চালের ব্যবসা শুরু করেছেন এবং চোরা বাজারের পথে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু টাকা ক'রে ফেলেছেন। চোরা বাজারের চাঁইরা রেভারেন্ড কিং-এর নামে চমকে ওঠে; বলে, বাপ্! এর মতো ঘুঘু লোক আর দেখা যায় না। লোকটা এ বছরে কোটিপতি হবে।

আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগতে লাগল, এর মানে কি? রেভারেন্ড কি এতদিন ভণ্ডামি করেছেন? সেবাধর্মের ছলে নিজের ব্যবসার পথ পরিষ্কার করেছেন এতদিন—না তাঁর হঠাৎ মাথা খারাপ হয়েছে?

যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে তা হ'লে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা চলে না।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের কাছে যাতায়াত করতে লাগলাম। কেউ বললেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; কেউ বললেন, বোমার 'শক্' পেয়ে ওর দ্বিতীয় আর একটি ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে। এবং এরকম হওয়া যে অসম্ভব নয়, তা তাঁরা বহু নজির দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আমার বন্ধুরা এই কথা সহজেই মেনে নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তবুও আমার মনে কিছু সন্দেহ থেকেই গেল। এমন মহৎ লোকের 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' এমন ছোটলোক হয় কি ক'রে—এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেলাম না। সবটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার ব'লে বোধ হতে লাগল।

এমন সময় শোনা গেল, বিলেত থেকে ডক্টর স্টীন্ নামক এক প্রসিদ্ধ প্যাথলজিস্ট বিশেষ কাজে বোম্বাইতে আসেন।

অবশেষে মানসিক অশান্তি দূর করার জন্যে আমাকে বোম্বাই পর্যন্তই যেতে হ'ল। এতখানি উৎসাহের জন্যে, এবং আমি 'দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' থিওরিটি কেন মানতে পারছি না, এ জন্যে বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে লাগল।

বোম্বাইতে গিয়ে ডক্টর স্টীনের সঙ্গে দেখা করলাম। ডক্টর স্টীন সদাশয় লোক, তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কাহিনী শুনলেন। শুনতে শুনতে তিনি বহু প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তাঁকে বললাম। তা ছাড়া বাঙালীর চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি অনেক তথ্য আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

তিনি আগাগোড়া সব শুনে হেসে বললেন, এ রকম কেস আমার একেবারে অজানা নয়।

বিলেতেও এ রকম একটা ঘটনা আমি দেখেছি। 'শক'-চিকিৎসার সময় যে সিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঙালীর রক্তের সিরাম। সেই ইনজেকশনের পর থেকেই রেভারেন্ড কিং-এর চরিত্রে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তার প্রথম লক্ষণ আপনি বলছেন, ট্রামে ব'সে পাশের যাত্রীকে হাঁটু দিয়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা। তা নয়। একটা একটা প্রধান লক্ষণ হ'লেও ওর আগেই লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম লক্ষণ ফুটেছে রেভারেন্ডের কথায়। তিনি বলেছেন, "ঘরের খেয়ে আর বনের মোষ তাড়াতে ইচ্ছে করে না।"

ভেবে দেখলাম ডক্টর স্টীনের কথাই ঠিক। এ ছাড়া একটা মহৎ লোকের পরিবর্তন আর কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়।

রেভারেন্ডের উপর মনে মনে যে ঘৃণা জেগেছিল, তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল, তাঁর জন্য বড় দুঃখ হ'তে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

না, কোনো প্রতিকারই নেই।

সিরামের জাতিভেদ কি সবারই এই রকম হয়?

না। লাখে একজনের হয় কিনা সন্দেহ। বিলেতেও মাত্র একটি কেসের রেকর্ড আছে, এবং কালক্রমে কৌতুকগল্পে পরিণত হয়েছে।

ডক্টর বলতে লাগলেন, একবার এক ইংরেজের দেহে রক্ত ইনজেক্ট করার দরকার হয়েছিল, সেজন্য রক্তদাতাকে তিনি উপযুক্ত ফী দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহে রক্ত প্রবেশ করানোর পর তিনি ফী দিতে অস্বীকার করলেন, দিলেন শুধু ধন্যবাদ। কারণ রক্তদাতা ছিলেন কৃপণতায় প্রসিদ্ধ স্কটল্যান্ডবাসী, তাই কৃপণের রক্ত ইংরেজদের দেহে গিয়ে ইংরেজকে কৃপণ ক'রে তুলল, তাঁর কাছ থেকে আর টাকা আদায় করা গেল না। রেভারেন্ড কিংও এইভাবে বাঙালীর চরিত্র লাভ করেছেন।

বিষণ্ণ মনে বোম্বাই থেকে ফিরে এসে রেভারেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে দেখি চালের বাজার নিয়ে কয়েকজন মক্কেলের সঙ্গে তিনি গোপন আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই চুপ ক'রে গেলেন, কোনো কথাই বললেন না।

ফিরে এলাম। ভাবলাম, ভবিষ্যৎ শুধু রেভারেন্ডেরই নেই, আমারও আছে।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই বুঝতে পারলাম, আমি অত্যন্ত নির্বোধের কাজ করেছি, অর্থাৎ আমার ভবিষ্যৎ হারাতে বসেছি। রেভারেন্ডের মতো টাকা এবং প্রতিষ্ঠাওয়ালা লোকের সঙ্গে করছি বিবাদ! এতে আমার লাভ কি! ছাত্রজীবনের একটা মূল্যহীন আদর্শ আমাকে কি দিতে পারে? আমি নির্বুদ্ধিতাবশত তাঁর মতো একজন সহায়ককে পরিত্যাগ ক'রে একা ঘরে ব'সে জ্বলেপুড়ে মরছি!

পরম অনুতপ্ত হ'য়ে বিনীতভাবে তাঁর কাছে গিয়ে একদিন আমার নিবেদন পেশ করলাম।

রেভারেন্ড কিং আমার প্রস্তাব শুনে আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ তো উত্তম কথা, আপনাকে আমি অংশীদার ক'রে নেব।

* * * *

এর পর দু'বছর কেটে গেছে, আমি আজও তাঁর অংশীদার হতে পারিনি। তিনি এই দু'বছর ধ'রে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ঘোরাচ্ছেন। বলছেন, এই র‍্যাশন পদ্ধতিটি উঠে গেলেই তিনি আমাকে নিয়ে নেবেন, কেননা এখন নাকি কিছুই লাভ হচ্ছে না।

পণ্ডিতমশাই

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো লম্বা মানুষটি—ঘোর কালো। গলায় পৈতা আছে বলিয়া বোঝা যায় ব্রাহ্মণ। নাম, যতীন চাটুজ্জে। পাঠশালার পণ্ডিত। লোকে, বলে, কাক-পণ্ডিত।

শুধু কালো বলিয়াই নয়। আরও কথা আছে ইহার মধ্যে। ছোট্ট একখানি চাষীর গ্রামের পাঠশালা। ওই যতীনই আসিয়া স্থাপন করিয়াছে। মূল জীবিকা ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রাম-দেবতার পূজা করা, ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মীপূজা করা। যতীনকে এইজন্য লোকে প্রকাশ্যে বলে,—যতীন ঠাকুর।

বুদ্ধিমান যতীন অতঃপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিল। জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা বসে। কয়েক বৎসরই পাঠশালা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও পাঠশালার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। সেটা যতীনের অক্ষমতা নয়। সে ভাল ছেলে তৈয়ারি করিলেই পাশের গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতেরা জামা-কাপড়, বই-টাকার লোভ দেখাইয়া ছেলেটিকে ভাঙাইয়া লইয়া যায়। এমন কয়েকটি ছেলেই অন্য পাঠশালা হইতে বৃত্তি পাইয়াছে। তাই তার কালো চেহারার সঙ্গে মানাইয়া লোকে গোপনে তাহাকে বলে,—কাক-পণ্ডিত। অর্থাৎ কাকের মতই সে কোকিলের ছানা মানুষ করে, একদা সে ছানা বড় হইয়া অন্যত্র গিয়া কুহু-কুহু করিয়া গান গাহিয়া চারিদিক মাতাইয়া দেয়। লোকে তারিফ করে।

পূজো এবং পড়ানো একই সঙ্গে চলে যতীন চাটুজ্জের। সকালে পূজা না হইলে দেবসেবার ত্রুটি হয়, আবার পাঠশালা—সেও সকালে না বসাইলে নয়। যতীন অতি সুকৌশলে দুই কাজ সারিয়া যায়। পাঠশালা বসাইয়া সে অপেক্ষা করিয়া থাকে।

"পাখী সব করে রব"-এর পরেই বসে তাহার পাঠশালা, এবং যেই দেখে "শিশুগণ দেয় মন নিজ পাঠে"—অমনি যতীন তেলের বাটি লইয়া বসে। পাঠশালাতে বসিয়া তেল মাখাও চলে, আর ছেলে-পড়ানোও চলে। তারপর বলে—গ্রহণ কর, সব শেলেট গ্রহণ কর এইবার।

যতীন সাধু-ভাষায় কথা বলে।

ছেলেরা 'শেলেট' গ্রহণ করিলে বলে—আপন আপন পাঠগুলি যত্ন সহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে লিখে রাখ। আমি অবগাহন ক'রে আসি। আচ্ছা, ভোলা, অবগাহন শব্দের অর্থ কি বল্ তো?

আজ্ঞে, এমনি ক'রে ডুব দেওয়া।

ভোলা কান দুইটি আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া বায়ু-সরোবরেই ডুব দেয়।

যতীন ধাঁ করিয়া স্নান সারিয়া আসে। জমিদারের কাছারিতেই পাঠশালা বসে, কাছারির প্রাঙ্গণে কয়েকটি জবা, আকন্দ ও কল্কে-ফুলের গাছ, গোটা-দুই বেলের গাছও আছে। কাপড় ছাড়িয়া যতীন কয়েকটা ফুল তুলিয়া লয়, অতঃপর বিল্বপত্র চয়ন করিবার পূর্বে কপালে হাত ঠেকাইয়া অদৃশ্য বৃক্ষবিহারীকে প্রণাম করিয়া তবে বিল্বপত্র চয়ন করে।

তারপরই হয় টিফিনের ছুটি।

সে বিল্ববাসিনীর ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই ভাঙা কাঁসরটা ঢন্-ঢন্ শব্দে বাজইয়া দেয়। ছেলেরাও অমনি ছুটি পাইয়া কলরব করিতে করিতে বাড়ি ছুটে।

যতীন পণ্ডিতের উপদেশ দেওয়া আছে, গুড়সহযোগে মুড়ি অথবা যার পিতামাতা যা দেবেন, সন্তুষ্টচিত্তে প্রসন্নমনে তাই ভক্ষণ করবে। তারপর পিতার গাভী দোহনের সময় গো-বৎসটিকে ধৃত ক'রে পিতাকে সাহায্য করবে। গাভী দোহনের পর আবার পাঠশালায় আগমন করবে। বুঝেছ?

ছাত্রদের পিতার গাভী দোহন হইতে হইতে পণ্ডিতের পূজা শেষ হইয়া যায়। শুধু ঐ পূজাই শেষ হয় না, যতীনের উদরপূজাও শেষ হইয়া যায়। কাছারির বারান্দায় ছেঁড়া মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করে।

মণি মণ্ডলের ভগ্নী 'ফুরি' বিল্ববাসিনীর পূজার প্রদীপ ও ধূপ দেয়। এটি জমিদারের বন্দোবস্ত, মণি মণ্ডল ইহার জন্য জমি ভোগ করে। ফুরি বলে ঠাকুর 'আস্তা' থেকে মন্তর বলতে বলতে আসে। পাঠশালায় কাঁসর শুনেই আমি প্রদীপ সাজিয়ে ধূপের আগুন নিয়ে আসতে আসতে দেখি, ঠাকুরের পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফুরি একদিন যতীনকে একথা বলিয়াছিল।

যতীন গম্ভীরভাবে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—ঈদৃশবাক্য আর কখনও তুমি উচ্চারণ ক'রো না, বুঝেছ?

ফুরি হাসিয়া সারা হইয়াছিল,—'ঈদৃশ বাক্য' কি গো? ঈদৃশ বাক্য! হি-হি-হি! ঈদৃশ বাক্য কথাটি তাহার বড়ই কৌতুককর মনে হইল। ফুরি আড়ালে যতীনের নাম দিয়াছে—'ঈদৃশ বাক্য'।

যাক সে কথা।

টিফিনের পর যতীন পাঠশালা লইয়া বসে, একেবারে পুরা তিনটি ঘণ্টা পড়াইয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দেয়। পাঠশালায় বড় ছেলেরা এই সময়টার নাম দিয়াছে, 'কালবৈশাখী'! বলে—'কালবৈশাখীর ঝড় আসছে'। যতীন নিজেও সে সময় ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। আপশোস করিয়া বলে—খাদ্যেতে কখনও গগনগাত্রে আরোহন করতে পারে না। বৃথা চেষ্টা আমার।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙে হীরার ধার।

বলিয়াই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গবেষণায় নিযুক্ত হয়, ঐ 'ভেড়া' শব্দটি অত্যন্ত দুষ্টপ্রয়োগ হইয়াছে। মেষ বলিলে ক্ষতি কি ছিল? গুরু-চণ্ডালী দোষ অমার্জনীয়। তারপর হইতে সে ভেড়ার শৃঙ্গে না বলিয়া, মেষের শৃঙ্গেই বলে।

সেদিন বিল্ববাসিনীর পূজা শেষ করিয়া মুড়ি এবং গুড় ভোজনান্তে হুঁকাটি হাতে পাঠশালাতে আসিয়া যতীন দেখিল, জমিদারের গমস্তা ও নন্দী বসিয়া আছে।

সে তাড়াতাড়ি গমস্তাকে আহ্বান করিয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন। আপনাদের সব

মঙ্গল? শুভ সংবাদ ত' সব?

যেন কাছারিটি তাহার নিজের বাড়ি।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সব মঙ্গল। তারপর, আপনার যে কাজ এসেছে, সেইজন্যেই এসেছি।

কল্কেটি গমস্তার নিকট নামাইয়া দিয়া বলিলে—কি কর্ম, ব্যক্ত করুন!

পোঁটলা হইতে ছোটো হুঁকাটি বাহির করিতে করিতে গমস্তা বলিল—বাবু আসছেন মহালে।

যতীন বলিল—অহো ভাগ্য! সুসংবাদ, সুপ্রভাত হয়েছে অদ্য। গ্রামের সৌভাগ্যের বিষয়! জমিদার, ভূস্বামী, রাজা—

গমস্তা বাধা দিল, নতুবা জমিদারের আরও অনেক নাম সে বলিতে পারিত। গমস্তা বাধা দিয়া বলিল—বিল্ববাসিনীর পূজো যখন নেন, তখনকার কথা মনে আছে ত—বাবু এলে পাক-শাক এখানে আপনাকে করতে হবে। অবশ্য বাবু নিশ্চয় বকশিশ দেবেন।

যতীন বলিল—অবশ্য অবশ্য। কর্তব্য কর্ম অবশ্য করণীয়, অবশ্যই আমি চালিত করে দেব।

এইটুকুর একটু ইতিহাস আছে। যতীন এ-গ্রামের বাসিন্দা নয়। এ-গ্রাম পূর্বে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাই বিল্ববাসিনীর পূজা করিত এবং তাহার জন্য জমিদার প্রদত্ত জমি ভোগ করিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সে ব্রাহ্মণবংশটি নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। যতীন এ-গ্রামে পাঠশালা করিত, সে এই পূজারী-পদের প্রার্থী হইল। তখনই কথা হয়, তাহাকে এই গ্রামে বাস করিতে হইবে, গ্রামের সকলের পৌরহিত্যও করিতে হইবে এবং জমিদার অথবা তাহার কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিলে পাচকের কাজও করিতে হইবে।

যতীন তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে জমিদার প্রদত্ত নিষ্কর আট বিঘা জমি সে পাইয়াছে। কাজ লইয়া পাঠশালা করিতে প্রায়ই বড় অসুবিধা হয়, গ্রামে কোন ক্রিয়া-কর্ম থাকিলে সেদিন আর পাঠশালা করা হয় না, অথবা পাঠশালা সারিয়া সে কর্ম সারিতে গেলে বেলা তিনটা পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয় এবং গৃহস্থের তিরস্কার সহ্য করিতে হয় বিস্তর। কিন্তু তবু যতীন পাঠশালাটি ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে সুবিধা-অসুবিধার একটা সমন্বয় সে করিয়া ফেলিয়াছে।

গমস্তা বলিল—হ্যাঁ, সেই জন্যই বাবু রাঁধুনী-বামুন সঙ্গে আনবেন না। যতীন একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল—দেখুন, একটি অসুবিধা হবে ব'লে অনুমান করছি। হুজুর হলেন, শহর-নিবাসী, দশ ঘটিকার সময় আহার করা অভ্যাস। কিন্তু আবার বিবেচনা করুন, বিল্ববাসিনীর পূজাঅর্চনা, তৎপর পাঠশালা কর্ম—

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল—পাঠশালা এখন বন্ধ ক'রে দেন। আর বাবু এলে পাঠশালা করবেনই বা কোথায়? কাছারিতে ত' এখন পাঠশালা করা যাবে না!

যতীন বলিল—কিন্তু, মায়ের পূজা ত'—

গমস্তা বলিল—সে ত' ন-টার মধ্যেই হয়ে যাবে। ন-টায় রান্না চড়ালে বারোটায় শেষ হবে। বাবু আমাদের বারোটার এদিকে খান না।

যতীন খুশী হইয়া বলিল—অবশ্য অবশ্য; দ্বাদশ ঘটিকা হ'ল ঠিক মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্নভোজন মধ্যাহ্নেই কর্তব্য। হুজুর আমাদের মহদ্বংশোদ্ভূত মহৎ ব্যক্তি।

—হ্যাঁ, কাল হতে পাঠশালা আপনি ছুটি দিয়ে দেন। কাছারিতে কলি ফেরাতে হবে, পরিষ্কার

করতে হবে। তারপর নন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—কাঠ কেটে চে'লা করে রাখ। একটা বড় দেখে ডাল কারও গাছের কেটে নে।

যতীন বলিল—হ্যাঁ বৎস! শাখাটি যেন বেশ শুষ্ক হয়। ভিজা কাষ্ঠ হ'লে ধূম্রে ধূম্রে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। তিন্তিড়ীশাখা হলে উত্তম হবে। এরূপ দাহ্য-কাষ্ঠ আর হয় না।

নন্দী বলিল—কার গাছের ডাল নেব?

বিরক্ত হইয়া গমস্তা বলিল—যার পাবি তারই নিবি। তাই তেঁতুল ডালই একটা যার গাছ থেকে হোক কেটে নে।

যতীন জোড় হাত করিয়া বলিল—এইসঙ্গে কয়েকটি বংশখণ্ড ছেদনের আদেশও ওকে দিতে হবে।

গমস্তা বলিল—আপনার মশাই কোন্ সময়ে কোন্ তান। কেন, বংশ খণ্ড নিয়ে কি করবেন? ঘর ত' আপনার ছাওয়া হ'য়ে গিয়েছে।

যতীন বলিল—আজ্ঞে তোরণ নির্মাণ করব; হুজুর যেদিন পদার্পণ করবেন, সেদিন পত্রপুষ্প দিয়ে সুসজ্জিত করব।

গমস্তা বলিল—তাই দিস রে, গোটা-আষ্টেক বাঁশ কেটে ঠাকুরকে দিস। ছাত্ররা তখন সব আসিয়া গিয়াছে, তাহারা শুনিতে শুনিতে খুশি হইয়া উঠিল—ছুটি—ছুটি। 'কালবৈশাখী' হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

যতীন এইবার ছেঁড়া মোড়াটিতে বসিয়া আরম্ভ করিল—ছকু, তুমি ভূস্বামী বানান করতো।

ছকু নির্ভুল উত্তর দিল।

—হরিচরণ ভূস্বামী শব্দের অর্থ কি?

হরিচরণ বলিতে পারিল না। হরিচরণের পর একে একে সকল ছাত্রকেই প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না। তখন যতীন বলিল—মরিরাম, তুমি এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পার?

শীর্ণকায় টলমলে মুখে মরিরাম গলায় এক বোঝা মাদুলি লইয়া উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে ভূস্বামী মানে—রাজা, জমিদার।

যতীন খুশি হইয়া বলিল—আমার নিকটে আগমন কর।

মরিরাম তাহার নিকটে আসিল, যতীন তাহার শীর্ণ দেহে হাত বুলাইয়া বলিল—উত্তম, যথার্থ উত্তর প্রদান করেছ। তারপর সে ছেলেদের—জমিদার কে এবং কি, বুঝাইতে আরম্ভ করিল। ছেলেরা কালবৈশাখীর হাত এড়াইয়া জমিদারের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছিল। বক্তৃতা শেষে যতীন বলিল—আগামী কল্য হতে বিল্ববাসিনী মায়ের প্রাঙ্গণে ঐ বৃক্ষচ্ছায়াতে পাঠশালা চালিত হবে, এবং প্রাতঃকালের পরিবর্তে অপরাহ্ন দুই ঘটিকা হইতে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত হবে।

ছেলেরা পাংশুমুখে এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীন আবার বলিল—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সব?

সকলে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, হইয়াছে। মরিরাম ছেলেটি মৃদুস্বরে বলিল—আমাকে তা হ'লে কখন পড়াবেন?

মরিরামকে যতীন পৃথকভাবে পড়াইয়া থাকে, সে সময়টা ঐ দুই ঘটিকা হইতে চার ঘটিকা

পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে।

যতীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তুমি বৎস, অতি প্রত্যুষে আমার গৃহে আগমন করবে। ছয় ঘটিকা আট ঘটিকা পর্যন্ত তোমার পাঠাভ্যাস করিয়ে দোব।

ছেলেটিও খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

জমিদারবাবুটি এ-যুগের মানুষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। তবুও তোরণ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনিও ঈষৎ পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। আবার কাছারিতে গিয়া একখানি টিনের চেয়ারে বসিতেই কতকগুলি ছেলে আসিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কাছারির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আরম্ভ করিল—

বারংবার প্রণিপাত চরণে তোমার।
হে মহতোমহীয়ান করুণা অপার।।
প্রজার পালনে তুমি রামের সমান।
বিদ্যার সাগর তুমি জ্ঞানী গুণবান।

এবার জমিদারবাবুটি হাসিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ। কে শেখালে এসব তোমাদের?

যতীন আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আজ্ঞে, অধম হুজুরের আশ্রিত ব্যক্তি। বিশাল মহীরুহে কত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করে; বৃক্ষ সকলকে জ্ঞাত হয় না। অধীনও তদনুরূপ একটি কীট-পতঙ্গ।

গমস্তা মুচকি হাসিয়া বলিল—উনি হলেন, যতীন ঠাকুর, বিল্ববাসিনী মায়ের পূজা করেন আর পাঠশালায় পণ্ডিতী করেন।

জমিদারবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—বেশ, বেশ, আপনি তা হ'লে পণ্ডিতমশায়! বাঃ, আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার। সুন্দর শুদ্ধ। বাঃ, বেশ!

'পণ্ডিত' সম্বোধনে এবং এমন অজস্র প্রশংসাবাদে যতীন যাহাকে বলে পরম পুলকিত, তাই হইয়া উঠিল; পুলকের আতিশয্যে তাহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর মহৎ, অধীন ক্ষুদ্র। কিন্তু হুজুর, আমি যদি অশুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন করি, কিংবা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ করি, তবে আমার ছাত্রেরা কিরূপে শুদ্ধ এবং সাধু ভাষায় জ্ঞান লাভ করিবে? যদি কেউ স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে অহরহ পিত্তলের অলঙ্কারই ব্যবহার করে, তবে পিত্তলকেই সে স্বর্ণ ব'লে জ্ঞান করে।

গমস্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল—যান গো এইবার যান, রান্না চড়িয়ে দেন গিয়ে।

যতীন বলিল—হ্যাঁ, এই যে আমি প্রস্তুত। অবিলম্বেই রন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে! কোন চিন্তা নাই।

জমিদার বলিলেন—আপনিই রান্না করবেন নাকি?

—হ্যাঁ, হুজুর! হুজুরের আশ্রিত আমি, তদুপরি মহাভাগ্য আমার, নতুবা আমার হস্তের রন্ধনে হুজুরের সেবা হবে কেন? বলিয়া সে একখানি দরখাস্ত হুজুরের হাতে দিল। দরখাস্তখানি পড়িবার পূর্বেই সেখানির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া জমিদার মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হাতের লেখাটি অতি সুন্দর, প্রথম দৃষ্টিতে ছাপা-লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—আপনার লেখা? বাঃ এ অতি সুন্দর লেখা, এত সুন্দর লেখা আমি কখনও দেখি নি।

যতীন আবার আরম্ভ করিল—হুজুর হস্তলিপি সুন্দর না হ'লে শিক্ষকতা করা চলে না। কারণ ছাত্রগণ গুরুর হস্তলিপিকেই আদর্শ জ্ঞান ক'রে সেইরূপ শিখবারই চেষ্টা করে। তদ্ব্যতীত, চিন্তা ক'রে দেখুন হুজুর, অগ্রে লেখা, তৎপরে পড়া। সেই জন্যেই লেখাপড়া শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

দরখাস্তখানি হুজুর পড়িতেছিলেন, প্রথমেই যতীন আরম্ভ করিয়াছে—'মহামহিম মহিমার্ণব জ্ঞান-গুণ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণ সমলঙ্কৃত প্রজাপলক ভূস্বামীপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত...মহোদয় অশেষ প্রবলপ্রতাপেষু।" তাহার পর দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া গ্রামের পাঠশালাটির দুরাবস্থা বর্ণনা করিয়া হুজুরের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

জমিদার প্রশ্ন করিলেন—সরকারী সাহায্য কত ক'রে পান?

—এক কপর্দকও নয় হুজুর।

—কেন?

—আমি যে 'জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী' পাস নই হুজুর।

—জমিদার বিস্মিত হইলেন। যতীন সবিনয়ে বলিল—ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন অধীনের, রহস্য ক'রে ও-বাক্যটি আমি প্রয়োগ করেছি। গুরুট্রেনিংকে বলা হয়, জি ও টি। রহস্য ক'রে আমরা বলি—জেঠি, জ্যেষ্ঠতাত পত্নী।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন—বুঝেছি। আচ্ছা, আমি বরং সেজন্যে চেষ্টা করব।

যতীন বলিল—হুজুর, আক্ষেপের বিষয় আর কত নিবেদন করব! আমার পাঠশালার ছাত্রকে বৃত্তি-পরীক্ষা দিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না! আমার শিক্ষকতার কৃতিত্ব দেখাতে পেলাম না। নতুবা আমি অহঙ্কার সহকারে বলতে পারি, আমার ছাত্র প্রত্যেকবারই বৃত্তি পরীক্ষাতে কৃতকার্য হ'ত; এবং সেইজন্যই আমি যাদের শিক্ষিত ক'রে তুলি, তাদেরই গ্রহণ ক'রে অবশেষে লোকপাড়ার বিদ্যালয় বৃত্তি-পরীক্ষায় সুনাম অর্জন করে। বর্তমান বৎসরে মরিরাম নামক একটি বালক আছে হুজুর, তাকে হীরকখন্ড বলা যায়, যদি কোনরূপে অনুমতি পাই হুজুর—

নন্দীটা উনানে আগুন দিয়াছিল, সে বাধা দিয়া ডাকিল—কাঠগুলো পুড়ে যে "হুদ্দর" হয়ে গেল মশায়।

যতিন ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যে আমিও আগমন করছি। তুমি হরিদ্রা লঙ্কা আদ্রক প্রভৃতি মসল্লাগুলি বন্টনের ব্যবস্থা কর দেখি।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে, গমস্তা বলিল—বন্টনের ব্যবস্থা হয়েছে, এখন আপনি আগমন করুন দেখি। হুজুর তো এখন রইলেন, পরে ওসবের ব্যবস্থা হবে।

যতীন রান্নাশালে আসিতেই নন্দীটা বলিল—তুমি কিন্তুক্ আচ্ছা বকতে পার মশায়। ব'কে-ব'কে মানুষের কানের পোকা মেরে ফেলাও। আঃ সেই কাল থেকে লেগেছে বাপু!

যতীন চোখ মুছিয়া বলিল—তুমি কি বুঝবে বৎস! কথিত আছে, 'মহতের ধর্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে।' তোমার অবশ্য অপরাধ কি?

জমিদারটিকে যতীনের বড় ভাল লাগিয়াছে। গমস্তা, নন্দী, বাবুর চাপরাসী—সকলেই যতীনকে শাসন করে, কিন্তু বাবুর ব্যবহার বড় মিষ্ট, কখনও কটু কথা বলেন না। গমস্তা, নন্দী, চাপরাসীর ব্যবহারে যতীন দুঃখিত নয়, সে মনে মনে তাহাদের করুণা করে, একান্ত নির্জনে সে আপন মনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—অজ্ঞতার মতো দুষ্টব্যাধি আর সংসারে নাই।

প্রত্যহ প্রভাতে সে একটি করিয়া সমস্যা আনিয়া জমিদারবাবুর নিকট উপস্থিত করে। করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলে—হুজুর, অভয় দিলে অধীন একটি নিবেদন পায়।

বাবুর হাসির মধ্যেই অভয় ফুটিয়া উঠে। যতীন বলে—একটি সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে হুজুরকে। হুজুর, এই সংসারের মধ্যে একদা অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। অদৃষ্ট বলে,—আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বলবান; পুরুষকার বলে,—ভুল, আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই বলবান। এইটুকুই অবগত হয়েছি, মীমাংসার সংবাদ আমি জানি না। মীমাংসা হুজুরকে করে দিতে হবে।

বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি বলিলেন—মীমাংসা এখনও হয়নি পণ্ডিতমশাই। বিবাদ এখনও চলছে, কাজেই মীমাংসার খবর কেমন করে দেব আপনাকে।

বাবুর উত্তরে যতীনের চমক লাগিয়া যায় সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া আসিয়া কথাটি ভাবিতে বসে। কিন্তু ভাবিয়াও বুঝিতে পারে না। তবুও তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। সে মনে মনে কথাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া "খবর" শব্দটির পরিবর্তে "সংবাদ" শব্দটি বসাইয়া শুদ্ধ করিয়াও লয়।

সেদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল—হুজুর জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, অথবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ?

বাবু বলিলেন—ও দু'টোর হ'ল আম আর আঁটির মতো সম্বন্ধ পণ্ডিতমশাই। আম খেলেই যেমন আঁটি পাওয়া যায়, জ্ঞান এলেই তেমনি ভক্তি আসে। অবশ্য ভুয়ো আঁটিওয়ালা আমও আছে। সেটা ঐ আমের শাঁস শুকিয়ে যায় বলেই। সে আপনার অখাদ্য।

পণ্ডিতের তাক লাগিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ রান্নাশালা হইতে গমস্তার তীব্র কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গমস্তা তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল—বলি ব্যাপার কি আপনার বলুন ত?

পণ্ডিত সভয়ে বলিল—কি আজ্ঞে?

—এই পরশু দোকান থেকে সাতদিনের জিনিষপত্র আনিয়ে দিয়েছি। একসের ঘি এসেছে। এর মধ্যে আজ ঘি নাই, জিনিসপত্রও সব ফুরিয়ে গেল, ও-বেলায় আর চলবে না—এর মানে কি?

যতীন হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে আমি বেশ অনুধাবন করতে অপরাগ হচ্ছি কিরূপে অর্থ ব্যক্ত করব বলুন!

গমস্তা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওসব 'ব্যক্ত-মেক্ত' ছাড়ুন মশাই নিয়ে সাদা কথায় বলুন।

ওদিকে কাছারী হইতে বাবু ডাকিলেন—রাধাচরণ!

গমস্তা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন—বকাবকি কিসের হ'চ্ছে? কি হ'ল?

—আজ্ঞে, মহা বিপদ হয়েছে। জিনিসপত্র সব চুরি যাচ্ছে।

—চুরি যাচ্ছে? কি চুরি গেল?

—আজ্ঞে, পরশু দোকান থেকে হিসেব ক'রে সাতদিনের মত জিনিসপত্র আনিয়েছি। ঘি আনিয়েছি পাকীয়ে একসের। আজ আর জিনিসপত্র কিছুই নাই। ঘি ছটাখানেক মাত্র পড়ে আছে। ও-বেলায় সব আসবে তবে রান্না চড়বে।

যতীনও পিছন পিছন আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্মুখে আসিয়া বলিল—হুজুর, তস্কর যে কে, অনুসন্ধান করে দেখা হোক। আমি অদ্য হ'তে কাছারী ত্যাগের সময় বস্ত্র-অঙ্গ

উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়ে যাব হুজুর।

বাবু বলিলেন—না-না-না। যান আপনি কাজ করুনগে যান।

ধমক দিয়ে গমস্তা বলিল—যান না মশাই, বাবু বললেন যেতে, আর আপনি আবার আরম্ভ করলেন?

যতীন চলিয়া গেল।

গমস্তা বলিল—হয় ও, নয় ঐ নন্দী বেটার কাজ।

বাবু বলিলেন—বেশ'ত, জিনিসপত্র একটু সবাধান ক'রে রেখে তুমিও একটু নজর রাখ, তাহলেই আর চুরি যাবে না। আর ও নিয়ে কি কেলেঙ্কারী করে? ছিঃ।

গমস্তা আপন মনেই বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যতীন ম্লানমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। কত গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন। তিনি বুঝিলেন, কথাটা বেচারাকে বড়ই বাজিয়াছে। তাঁহারও মনটা বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই বলিলেন—পণ্ডিতমশাই, একদিন আপনার পাঠশালা দেখব আমি।

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সে সৌভাগ্য কি আর অধীনের অদৃষ্টে আছে?

বাবু বলিলেন—ওকথা কেন বলছেন? নিশ্চয় যাব আমি।

একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া যতীন বলিল—হুজুর সেদিন ব্যক্ত করলেন, অদৃষ্ট আর পুরুষকারের দ্বন্দ্বের আজও অবসান হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, হয়েছে। অদৃষ্টই শ্রেষ্ঠ, সেই বলবান।

বাবু যতীনের এই আকস্মিক উক্তির হেতু বুঝিয়াছিলেন, তাই একান্ত আন্তরিকপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন—না-না-না, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওসব লোকের বিষয় ঘেঁটে-ঘেঁটে মনে ঘাঁটা পড়ে গেছে, সংসারে আর পাপ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না ওদের। আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি।

যতীনের চোখ দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িয়া গেল।

বাবুও আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। পাছে যতীনের উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠে সেই ভয়ে তিনিও ঘরে আসিয়া বসিলেন। মিনিট-দশেক পরেই কিন্তু যতীন আসিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল—হুজুর।

—বলুন!

যতীন জোড়হাত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু দেখিলেন তাহার ঠোঁট দুটি থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি গভীর সহৃদয়তার সহিত বলিলেন—কি বলছেন, বলুন।

যতীন ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—হুজুর আমিই অপরাধী। আমিই তস্কর! ঘৃত মসল্লা আমিই অপহরণ করেছি হুজুর।

বাবু নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। যতীন ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল। বাবু সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—আপনার বড় অভাব, নয়?

যতীন বলিল—হুজুরের আশীর্বাদে অধীনের অভাব নাই হুজুর। তবে এই বালকটির জন্য। দরজার বাহির হইতে শীর্ণকায় মরিরামকে সম্মুখে আনিয়া বলিল—হুজুর, বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি।

কিন্তু সংসারে বড়ই অভাব। আমাকে কিছু-কিছু ক'রে সাহায্য করতে হয়। নতুবা উদরের দায়ে বালকটিকে পড়া পরিত্যাগ ক'রে কারও গো-চারণ চাকুরি গ্রহণ করতে হবে!

বাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। যতীনের আবেগ তখনও নিঃশেষিত হয় নাই, সে বলিল—তাই হুজুর আপনার দরবার হ'তে কিছু মসল্লা একে প্রদান করেছি। আর ঘৃতটুকু হুজুর, ঐ ওকেই সেবন করতে দিয়েছি,—মেধাবী ছাত্র, ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। হুজুর, ওকে এবার আমি বৃত্তি পরীক্ষা যেমন ক'রে হোক দেওয়াবো। আমার ছাত্র নিয়ে লোকপাড়ার শিক্ষকেরা সুনাম অর্জন করে, আর আমায় বলে, 'কাক-পণ্ডিত'। হুজুর আমি শিক্ষিত করি, আর তারা অবশেষে তাকেই গ্রহণ করে তাই....

আবার সে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটিও ইতিমধ্যে প্রণাম সারিয়া বড় বড় চোখ দুটি মেলিয়া করজোড়ে বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

বহুক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—আচ্ছা পণ্ডিত আমি এখন থেকে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করব। বুঝলেন?

যতীন করযোড়ে প্রশ্ন করিল—আমার পাঠশালা কবে পরিদর্শন করবেন হুজুর? আমি পত্রপুষ্প দিয়ে সমস্ত সুসজ্জিত করব। হুজুর আপানি যে ভূস্বামী, রাজা, দেবতার অংশ—

যতীনের উচ্ছ্বাস থামিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু নন্দীটা চীৎকার করিয়া ডাকিল, এ্যাই-যা ডালাটা পুড়ে গেল যে! ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই?

সত্যই পোড়া-গন্ধ উঠিয়াছিল, যতীন ত্রস্তপদে রান্নাশালার দিকে চলিয়া গেল।

ঐরাবত

বনফুল

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়, বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক—প্রচণ্ড সংযম—অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন—তিনবার দন্তধাবন করিতেন—দুইবেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মতো স্বাস্থ্য। লেখাপড়াও জানিতেন—শোনা যায় তিনি বি.এ পাশ। দরিদ্র নন—খাইবার পরিবার সঙ্গতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈত্রিক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার মৌলিকতা, এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপত এই—তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই তিনি কার্বলিক লোশনে ভিজান নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম। মুদগর, ডাম্বেল, ডেভলাপার। অর্ধঘণ্টাকাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে নিকটবর্তী নদীতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ি ফিরিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম নদীতে প্রাতঃকালে অবগাহন তাঁহার করা চাই। বাড়ি ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়তো ভাবিতেছেন চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরীপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। স্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। স্টোভের নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়মও করিতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক, স্নান, আহার সমস্ত সমাধা হইয়া যাইত। কম্‌প্লিট।

তিনি বলিতেন যখন খাইতে হইবে—অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত—তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত!

সমস্তদিন সময় পাওয়া যায় কত!

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একজোড়া মিলিটারি বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারি বুট পরিলে আরও যে সব আনুষাঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে—ব্যস নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পর—খোল আর পর। সময় নষ্ট হয় কত!

তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসরের কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল—ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন তেমন লাঠি নয়। বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড় ব্যাগ—পোস্টাফিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়—সেই জাতীয় একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক—শুক্‌নো খেজুর—টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত। যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাঁড়ি-গোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া—তাঁহার মুখ তো বটেই—বুক পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভ্রূর-অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন—"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?"

সকলেই স্বীকার করিত—বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটি ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারি বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী নগ্নগাত্র বলিষ্ঠ বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মতো দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণামও করিত—

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতি-নিন্দা তাঁহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী?—তিনি বহুপূর্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহারা মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছে। তাহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর—আর একজনের রায় সাহেব।

বলিয়াছিলেন—"রায়বাহাদুর আর রায়সাহেব হবার জন্যে পরে হয়ত ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাক্‌তে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভালো।"

দুই

অতি প্রত্যুষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের—বিশেষ করিয়া বালকদের লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহার জন্য তাঁহাকে চারক্রোশ দূরে যাইতে হয় কেন? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না—একথা সুবিদিতি।

চারক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলি লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটু সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণাবাবু বখেড়া-বিরোধী। সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকাঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

তিন

কিন্তু অকস্মাৎ—এ কি!

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন ব্রহ্মচর্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসিয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবুকে দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইা উঠিল। মাসিক পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর ঢেউখেলান রঙীন অক্ষরে লেখা—"মরমী" তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্তি!

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরই একটি গল্প—

একটি রোগা গোছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মোহড়া লইতেছে।

এ ত ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন—সব সরিয়া পড়িয়াছে।

একটি ছাত্রও নাই।

চার

সেই দিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দিন দুই পরে যে সংবাদটি চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই।

"মরমী" কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাতপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁর মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাঙ্ঘাতিক।

গল্পলেখক সুজিত সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহার জীবন-সংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ "মরমী" অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

পাঁচ

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছেন না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেন বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিস্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই—খালাসির বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল—ওসব বাজে কথা—তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশি দিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল।

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিশও।

ছয়

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছে—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবত বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই—এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম খবরের কাগজের মারফৎ আশা করি অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম সেভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা শুদ্ধ লোককে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত স্টলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল—রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে হয়—কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি এবং চিন্তা করি কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয়, তাহা হইলে সে প্রগতির শেষ ফল দেখিবার জন্য শেষ পর্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি? থাকিবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন পন্থা অবলম্বন করা সঙ্গত তাহাই একদা রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল মানস-পটে সিনেমা-দৃষ্ট এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। মুখখানি যেন আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বলা বাহুল্য—একটু বিব্রত হইলাম।

কিন্তু য়াক্। ঈশ্বরেচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে মুখ মন হইতে সরিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুমাইবার পরই বোঝা গেল বখেড়া মেটে নাই—কারণ সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল তাহা লিখিতে পারিব না। এটুকু শুধু জানিয়া রাখ, সে স্বপ্ন অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম জাগিয়াও

নিস্তার নাই—মুখ ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিল।

এ রূপ প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী—একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলিব কি ভায়া, শেষটা উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম—এ অবস্থায় প্রতিকার কি! মাঝে মাঝে রাগও হইত—কিন্তু স্বপ্নের মাথায় ত লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কথাটা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমশ এই সত্যটি আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই। ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন সহসা পৌরাণিক গল্প একটা মনে পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।

আশা করি তুমি গল্পটা জানো।

.....সুতরাং, কাল বিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছু অর্থব্যয় করাতে পুলিশের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশ্ব গ্রামে পৌছাব। তুমি আমার বাড়িটা পরিষ্কার করিয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগুলিতে চুনকাম করাইয়া দিও। মোট কথা চতুর্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইতি ত্রিগুণানন্দ।

সাত

ঐরাবত আসিতেছেন।

স্টেশনে গেলাম।

যথা সময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন শেভড'—গোঁফদাড়ি একেবারে নাই।

মাথায় দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্প্‌সু! হাতে সোনার রিস্ট ওয়াচ।

সর্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙিল যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন—"হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি! বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।"

হেঁট হইয়া বৌদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

ঝি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশে সাত পুরুষে কেহ চাকরি করে নাই, তাই প্রথম চাকরি পাইয়া ভয় হইয়াছিল, না জানি কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই ভাগ্যে আছে।

মার্চেন্ট আপিসে কেরানির চাকরি। যাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে চাকরি পাইয়াছিলাম তিনি আপিসের বড়বাবু, আমার পিতৃবন্ধু—নাম গণপতি সরকার। ভেলকি-টেলকি দেখাইতে পারিতেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় সহজেই চাকরি জুটিয়াছিল। এমনকি আমাকে কর্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিতে হয় নাই।

গণপতিবাবুর চেহারাটা ছিল তাঁহার পাকানো উড়ানি চাদরের মতই ধোপদুরস্ত এবং শীর্ণ নমনীয়তায় বঙ্কিম; তাঁহাকে নিংড়াইলে এক বিন্দু রস বাহির হইবে এমন সন্দেহ কাহারও হইত না। ক্রমশ জানিতে পারিয়াছিলাম তিনি বিলক্ষণ রসিক লোক, কিন্তু তাঁহার সরসতা ছিঁচকে চোরের মত এমন অলক্ষ্যে যাতায়াত করিত যে সহসা ধরা পড়িত না।

তাঁহার একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিবার পর তিনি মাঝে মাঝে মুখের বামভাগে একপ্রকার ভঙ্গি করতেন; তাঁহাতে তাঁহার অধরোষ্ঠের প্রান্ত হইতে চোখের কোণ পর্যন্ত গালের উপর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি খাঁজ পড়িয়া যাইত। এই ভঙ্গিটাকে হাসিও বলা যায় না, মুখ-বিকৃতি বলিলেও ঠিক হয় না—

যেদিন প্রথম আপিস করিতে গেলাম, গণপতিবাবু আমার সাজ-পোশাক পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'আর সব ঠিক আছে, কিন্তু লপেটা চলবে না; কাল থেকে শু পরে আসবে। চলো, তোমাকে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। সাহেবের সামনে বেশি কথা কইবে না; তিনি যদি রসিকতা করেন, বিনীতভাবে মুচকি হাসবে।'

বলিয়া তিনি গালের ভঙ্গী করিলেন।

বেশ ভয়ে ভয়েই সাহেবের সম্মুখীন হইলাম। তাঁহার খাস কামরায় প্রবেশ করিয়া কিন্তু একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। সাহেব মোটেই নয়—ঘোরতর কালা আদমি। চণ্ডীর মহিষাসুরকে জলজ্যান্ত নারীমূর্তি কল্পনা করিলে ইহার চেহারাখানা অনেকটা আন্দাজ করা যায়; বেঁটে, মোটা, গজস্কন্ধ, চক্ষু দুটি কুঁচের মতো লাল, তাহার উপর বিলাতী পোশাক পরিয়া অপূর্ব খোলতাই হইয়াছে! বয়স অনুমান করা কঠিন, তবে চল্লিশের নীচেই। প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসিয়া একমুখ পান চিবাইতেছেন এবং দেশলায়ের কাঠি দিয়া দাঁত খুঁটিতেছেন।

পরে জানতে পারিয়াছিলাম মিস্টার ঘনশ্যাম ঘোষ একজন অতি তুখড় ও কর্মনিপুণ ব্যবসায়ী, বছরে বার দুই বিলাত যান; সেখানে কোম্পানির বিলাতী কর্তৃপক্ষ তাঁহার কথায় ওঠে

বসে। বস্তুত, বিলাতী সওদাগরী আপিসে একজন বাঙালীর এমন অখণ্ড প্রতাপ আর আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই এমন ব্যবহার করিলেন যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভয় তো দূরে হইলই, ইনি যে একজন অত্যন্ত কদাকার ব্যক্তি একথাও আর মনে রহিল না! কথার অমায়িকতায় মুহূর্ত মধ্যে আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন।

'এই যে বড়বাবু, এটি বুঝি আপনার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট? বেশ বেশ।...দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে?—ব'সো।...বড়বাবু, আপনি আপনার কাজে যান না...বিয়ে করেছ? বেশ বেশ, আরে, তোমাদেরই তো বয়েস। এখন চাকরি হল, আর কি! মন লাগিয়ে কাজ করবে—ব্যস, দেখতে দেখতে উন্নতি; আমার আপিসে কাজের লোক পড়ে থাকে না...নাও, পান খাও...আরে, লজ্জা কিসের? তোমরা হলে ইয়ং ব্লাড, নতুন বিয়ে করেছ, পান খাও তা কি আর আমি জানি না? আমার আপিসে ডিসিপ্লিনের অত কড়াকড়ি নেই...নাও নাও—হে হে হে...'

তারপর সুখস্বপ্নের মত দিনগুলি কাটতে লাগিল। চাকরি যে এত মধুর তাহা কোন দিন কল্পনা করি নাই। কাজকর্ম এমন কিছু নয়, একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক দু'ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দিনের কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে পারে। তারপর অখণ্ড অবসর, সমবয়স্ক সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প-গুজব, বারান্দায় গিয়া সিগারেট টানা। কর্তা প্রায়ই ডাকিয়া পাঠান, তাঁহার সামনে চেয়ারে গিয়া বসি, তিনি পান দেন, খাই, কখনও বাড়ি হইতে ভাল পান সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিই। তিনি খুশী হইয়া খুব রঙ্গতামাশা করেন; কখনও বা রাত্রির কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার হাসি-তামাশা একটু আদিরস-ঘেঁষা হইলেও ভারি উপাদেয়। বস্তুত, তিনি যে অত্যন্ত নিরহংকার অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ রহিল না।

গণপতিবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে সতর্ক করিয়া দিতেন, 'ওহে বাবাজী, একটু সামলে চলো। কর্তা তোমাকে ভাল নজরে দেখেছেন খুবই আনন্দের কথা, কিন্তু যতটা রয়-সয় ততটাই ভাল। আস্কারা পেয়ে যেন বাড়াবাড়ি করে ফেলো না—নিজের পোজিশন বুঝে চলো। কর্তা লোক খারাপ নয়, কিন্তু কথায় বলে—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...

লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি কর্তার সহিত প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ একেবারে খাঁটি রাখিয়াছিলেন! কর্তা তাঁহার সহিতও হাস্য-পরিহাস করিতেন, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে মুচকি মুচকি হাসি ছাড়া কোন উত্তরই দিতেন না।

মাস তিনেক কাটিবার পর একদিন দুপুরবেলা অবকাশের সময় কর্তার ঘরে গিয়াছি; ঘরে পা দিয়াই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিলাম। কর্তা নিজের চেয়ারে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া ছিলেন, আমার সাড়া পাইয়া চোখ তুলিলেন। তাঁহার চোখ দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। জবাফুলের মত লাল চোখে আমাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি চাও? এ ঘরে তোমার কি দরকার?'

তাঁহার এ-রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনি নাই, থতমত খাইয়া গেলাম, 'আজ্ঞে—আমি...'

তিনি লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিলেন, 'পান চিবুতে চিবুতে পাঞ্জাবি উড়িয়ে আপিস করতে এসেছ ছোকরা? এটা তোমার শ্বশুরবাড়ি পেয়েছ বটে! গায়ে ফুঁ দিয়ে ইয়ার্কি মেরে বেড়াবার জন্যে আমি তোমাকে মাইনে দিই? যাও টুলে বসে কাজ করোগে। তোমার মত পুঁচকে কেরানি খবর না দিয়ে আমাকে ঘরে ঢোকে কোন্ সাহসে? ফের যদি এ-রকম বেচাল দেখি, দূর করে দেব...'

হোঁচট খাইতে খাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।—এ কি হইল?

নিঃসাড়ে নিজের জায়গায় গিয়া বসিলাম। অভিভূতের মতো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

আমি নূতন লোক, তাই বড়বাবুর পাশেই আমার আসন। চোখ তুলিয়া দেখিলাম তিনি গভীর মনঃসংযোগে খস্‌খস্‌ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, আর সকলে নিজ নিজ কাজে মগ্ন, কেহ মাথা তুলিতেছে না। আমি কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'কি হয়েছে, কাকাবাবু?'

তিনি লেখা হইতে চোখ না তুলিয়াই চাপা গলায় বলিলেন, 'কাজ করো—কাজ করো...

সেদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর বাসায় গেলাম। তক্তপোশের উপর বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, সদয়কণ্ঠে বলিলেন, 'এসো বাবাজী'।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম; লজ্জায় ধিক্কারে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। শেষে অতি কষ্টে বলিলাম, 'কি হয়েছে আমায় বলুন। আমার কি কোন দোষ হয়েছে?'

তিনি বলিলেন, 'না—তোমার আর দোষ কি? তবে বলেছিলুম, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ...'

'এর মধ্যে কোনও কথা আছে। আপনি আমাকে সব খুলে বলুন, কাকাবাবু।'

তিনি কিছুক্ষণ একমনে ধূমপান করিলেন।

'খুলে বলবার মতো কথা নয়, বাবাজী।'

'না, আপনাকে বলতে হবে। কেন উনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন?'

তিনি দীর্ঘকাল নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল তাঁহার গালে মাঝে মাঝে খাঁজ পড়িতে লাগিল।

'বলুন কাকাবাবু!'

'তুমি ছেলের মতো, তোমার কাছে বলতে সংকোচ হয়। আসল কথা—ঝি।' বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন; তাঁহার গালে একটা বড় রকমের খাঁজ পড়িল।

কিন্তু—ঝি! কথাটা ঠিক শুনিয়াছি কি না বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বললেন—ঝি?'

গণপতিবাবু ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, ক'দিন থেকে বড় সাহেবের মন ভাল যাচ্ছে না...আয়া জানো—আয়া? যে-সব ঝি সাহেবদের ছেলে মানুষ করে? আমাদের বড় সাহেবের ছেলের আয়া হপ্তাখানেক হল চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।'

মাথা গুলাইয়া গেল; গণপতিবাবু এসব আবোল-তাবোল কি বলিতেছেন? বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো বলিলাম, 'কিন্তু—কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

গণপতিবাবু তখন বুঝাইয়া দিলেন। স্পষ্ট কথায় অবশ্য কিছুই বলিলেন না, কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে, অর্থপূর্ণ ভ্রূ-বিলাসে, সময়োচিত নীরবতায় এবং গালের বিচিত্র ভঙ্গী-দ্বারা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া দিলেন। সংক্ষেপে ব্যাপার এই—আমাদের বড় সাহেব বছর তিনেক আগে বিপত্নীক হন; তাঁহার পত্নী একটি পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই মারা যান। তারপর হইতে শিশুকে লালনপালন করিবার জন্য ঝি—অর্থাৎ আয়া রাখা হয়। সেই ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ঘনশ্যামবাবু অত্যন্ত যত্নসহকারে ঝি নির্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কারণে ঝি মনের মত না হইলে, কিংবা ছাড়িয়া গেলে সাহেবের মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়, এমন কি তাঁহার স্বভাবই একেবারে বদলাইয়া যায়। গত কয়েক মাস একটি ক্রিশ্চান যুবতী কাজ

করিতেছিল, কিন্তু সে হঠাৎ বিবাহ করিবার অজুহাতে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; অথচ মনের মতো নূতন ঝি পাওয়া যাইতেছে না। তাই এই অনর্থ।

থ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এও কি সম্ভব! এই কারণে মানুষের চরিত্রে এমন পরিবর্তন ঘটিতে পারে? কিন্তু গণপতিবাবু তো গুল মারিবার লোক নহেন। তবু এক সংশয় মনে জাগিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিন্তু উনি আবার বিয়ে করেন না কেন?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর গণপতিবাবু দিলেন।—ঘনশ্যামবাবুর শ্বশুর অদ্যাপি জীবিত; তিনি পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রকাণ্ড জমিদার। তাঁহার সন্তানসন্ততি কেহ জীবিত নাই, এই দৌহিত্রই—অর্থাৎ ঘনশ্যামবাবুর পুত্রই—তাঁহার উত্তরাধিকারী। কিন্তু শ্বশুরমহাশয় জানাইয়া দিয়াছেন যে, জামাতা বাবাজী যদি পুনরায় বিবাহ করেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া এক দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়কে সেবায়েত নিযুক্ত করিবেন।

সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল। তবু একটা গোলচোখো রুদ্ধশ্বাস বিস্ময় মনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিল। এমন সব ব্যাপার যে দুনিয়ায় ঘটিয়া থাকে তাহার অভিজ্ঞতা তখন একেবারেই ছিল না।

তারপর পাঁচ ছয় দিন কাটিল। আপিসে যতক্ষণ থকি, কাঁটা হইয়া থাকি; কি জানি কখন আবার মাথার উপর হুড়মুড় শব্দে আকাশ ভাঙিয়া পড়িবে! ইতিমধ্যে দু'তিন জন সহকর্মীর সামান্য ত্রুটির জন্য অশেষ লাঞ্ছনা হইয়া গিয়াছে। চাকরি যে কী বস্তু তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেদিন আপিসে গিয়া সবেমাত্র নিজের আসনে বসিয়াছি, আর্দালি আসিয়া খবর দিল বড় সাহেব তলব করিয়াছেন। প্লীহা চমকাইয়া উঠিল। এই রে, না জানি কোথায় কি ভুল করিয়া বসিয়াছি, আজ আর রক্ষা নাই!

ফাঁসির আসামীর মতো কর্তার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া হেঁটমুখে দেরাজ হইতে কি একটা বাহির করিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে শৈলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে ভাল জর্দা আনিয়াছি—দেখ দেখি খেয়ে; মুক্তো-ভস্ম মেশানো জর্দা হে—বড় গরম জিনিস!—হে হে হে...'

দেড় ঘণ্টা ধরিয়া এইভাবে চলিল—যেন এ মানুষ সে মানুষ নয়। ইনি যে কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করিতে পারেন তাহা কল্পনা করাও কঠিন। কোথায় সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো হিংস্র দৃষ্টি, কোথায় সে কর্কশ দুঃসহ গলার আওয়াজ! তিনি আবার আমাকে তাঁহার সহৃদয়তার প্রবল প্লাবনে ভাসাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি মন্দ লোক একথা আর কিছুতেই ভাবিতে পারিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের আসনে বসিতে বসিতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিলাম, 'কাকাবাবু, ব্যাপার কি?'

গণপতিবাবুর কলমে একগাছি চুল জড়াইয়া গিয়াছিল; সেটিকে নিব্ হইতে সন্তর্পণে মুক্ত করিয়া তিনি অবিচলিতভাবে আবার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, আমার দিকে মুখ না ফিরাইয়া ঘষা গলায় বলিলেন, 'ঝি পাওয়া গেছে।'

বলিয়া গালের ভঙ্গী করিলেন।

ললিতা পাঠাগার

সজনীকান্ত দাস

গোলগাল আতাটির মতো দেখিতে হইলে কি হইবে, লোকটার ভিতরে কাব্য ছিল। গোপালদা বলিতেন, চম্পূকাব্য। এই কথাটি বলিয়াই গোপালদা তাঁহার সেই বহু ব্যবহৃত গল্পটির পুনরাবৃত্তি করিতেন। শুনিয়াছি বলিবার জো ছিল না। একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি একেবারে হাঁড়িপনা মুখ করিয়া সাত দিনের বাসি খবরের কাগজ লইয়া বসিতেন, কোন দিকে দৃক্‌পাত করিতেন না; দেখিতে সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হইত। গোপালদা বলিতেন, চম্পূকাব্য কি রকম বুঝলে? তবে শোন, অধর বক্সীর মোটরে চেপে আমি আর নেত্য একদিন গড়ের মাঠে গেছি হাওয়া খেতে রাত বারোটার পরে। অসহ্য গরম। গঙ্গার ধারে এক চক্কর দিয়ে এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের পথটায় মোটর থামিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি, দেখি, তিন ব্যাটা নেপালী সাইকেলে চেপে কার্জনের স্ট্যাচুর চারদিকে পাক খাচ্ছে আর হো-হো হি হি ক'রে হাসছে। ব্যাটাদের ওই হ'ল রসিকতা। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধ'রে গেল, অধরকে বললাম, চল ভায়া, এদের মতলব ভাল না। অধর ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, ধীরে, গোপালদা, ধীরে। দেখবার বস্তুর অভাব কি?

বাহাদুরি আছে ছোকরার! বলতে না বলতে একটা মোটরকার হুশ ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, সুখে আছে সাদা চামড়ার এই লোকগুলো! ফুর্তি তো করছে ওরাই! আর করবেই বা না কেন? কলুর ব্যাটা গাইবে না তো কি বলদে গান গাইবে? ওদেরই একজন চলেছে কোলে কাঁখে তিনটি স্বজাতীয়া অপ্সরীকে নিয়ে হা-রা-রা-রা করতে করতে। ড্রাইভার বেচারার প্রাণ-সংশয়। আর বলব কি ভাই, আমারই ঘৃণধরা মনটা চাঙা হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উড়তি মোটরটার পেছনের লাল আলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। গিন্নিকে মনে পড়ল। অধরকে ফিরতে বলব ভাবছি, দেখি, আর দুটো মোটর পাশাপাশি প্রায় পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। সামনেরটাতে কোনও সাহেবের খানসামা আর আয়া হবে। মনিবের অনুপস্থিতিতে ড্রাইভারের সঙ্গে চাঁদা ক'রে একটু ফুর্তি লুটছে; আর পেছনেরটাতে এক টেকো সাহেব একটি মোমের মতো মেমের অঙ্গে হেলান দিয়ে চলেছে। ব্যাটার মাথায় একগাছি চুল নেই। অধর ব'লে উঠল, দেখেছ গোপালদা, ডিমের মতন মাথাটি হ'লে কি হবে, ওর প্রাণের ভেতর টেরিকাটা। আমাদের দক্ষিণারও তাই। বাইরেটা টাক-টাক মতো ঠেকলেও ওর প্রাণের ভেতর টেরি ছিল।

এই প্রাণের ভিতর টেরির গল্প শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তবু

দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে এমন লাগসই বর্ণনা আর হয় না। বাইরেটা টাক নয় তো কি? নাম—শ্রীদক্ষিণাচরণ হাজরা; ধাম—কলিকাতা চাঁপাতলা; পেশা—দালালি, পাট আর ঝোলাগুড়ের; বয়স সাড়ে উনচল্লিশ; বিপত্নীক।

বেশ ছিল বেচারা। সকালে উঠিয়াই রাত্রির বাসি লুচি আর গুড়ের সঙ্গে কলাই-করা বাটিতে এক কাপ চা খাইয়া বাহির হইয়া নারিকেলডাঙ্গা ব্রিজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাগবাজার পর্যন্ত সমস্ত খালধারটা একবার টহল দিয়া ফিরিত। কোন নৌকায় গুড়, কোন নৌকায় পাট—দক্ষিণা নমুনা আর দর যাচাই করিত। সে ছিল দক্ষিণার উত্তুরে হাওয়ার দিক।

তারপর হঠাৎ একদিন জানিতে পারি, দাক্ষিণার প্রাণে দখিনা হাওয়াও বহিয়া থাকে। আমরা কয়জন তখন সবে কলেজ ছাড়িয়া পাড়ার উন্নতিকল্পে একটি লাইব্রেরি ও রীতিমত সাহিত্য-চর্চার জন্য একটি ক্লাব-ঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। চাঁদা নেহাৎ মন্দ উঠিতেছিল না। বাড়ির মেয়েরা নিয়মিত উপন্যাস পড়িতে পাইবার লোভে বাজারের পয়সা চুরি করিয়া চাঁদা পাঠাইতে লাগিলেন। আমরা রীতিমত মাতিয়া উঠিলাম।

পাটের দালালের কাছে যাইতে আমাদের বাসনা ছিল না। দালাল জাতটার উপর সদ্য-কলেজ-ফেরত আমাদের কিঞ্চিৎ ঘৃণা ছিল। তবু নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, দেখিব দালাল দক্ষিণাচরণ আটহাতি ধুতি পরিয়া খোলা বুকে থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছে, লাইব্রেরির কথা পাড়িতেই বলিবে, কি হবে ছাই ওসব ক'রে? দেখছেন তো আমাকে? নিশ্বাস ফেলাবর অবকাশ নেই—তার চাইতে বরং গণেশ অধিকারীর....।

অবাক হইয়া গেলাম। একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! দক্ষিণাচরণ দক্ষিণের জানলার সামনে টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালাইয়া রবীন্দ্রনাথের টালি-এডিশন কাব্য-গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছে; ঘরটায় আলমারি পাঁচেক বই—ইংরাজী বাংলা; টেবিলের উপর পাটের চিহ্নমাত্র নাই, ঘরের কোণে ঝোলাগুড়ের হাঁড়িও দেখিতে পাইলাম না।

প্রস্তাব শুনিয়া দক্ষিণাচরণ মহাখুশি। বলিল, এই তো চাই! মানুষের প্রাণটাকে বাঁচিয়া রাখার চেষ্টাই তো এখন করতে হবে। তা, আমি আর কি করতে পারি? এই ঘরখানা আর বইগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, এখেনেই লাইব্রেরি আর ক্লাব-ঘর।

আমরা স্তম্ভিত হইলাম, মনে মনে লজ্জাও কম হইল না। বলিলাম, এতটা....।

এত আর কি ভায়া? গিন্নী যাওয়া ইস্তক বইগুলো আর নাড়চে চাড়তেও পারি না। তিনিই এসব দেখাশোনা করতেন কিনা। পড়া-শোনার ভারি শখ ছিল তাঁর। তাঁর নামেই—আর একটা ছেলেপিলেও তো নেই যে, তার জন্যে....

শেষে তাহাই স্থির হইল। দক্ষিণাদার স্বর্গগত পত্নীর নামানুযায়ী লাইব্রেরির নাম হইল—'ইন্দুমতী-পাঠাগার'। ক্লাবের নাম—'দক্ষিণাচরণ ক্লাব'।

ক্রমশ পাটের দালালের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিলাম, পাট আর ঝোলাগুড় তাহার জীবনের অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণাচরণ কবিতা লিখিত। তাহার সব চাইতে বড় দুর্বলতা ছিল, আধুনিক ফ্যাশান-দুরস্ত স্কুল-কলেজের মেয়ে। সাড়ে নটা দশটার সময় স্কুলের গাড়ি দেখিতে সে প্রত্যহ খালধার হইতে সার্কুলার রোড পর্যন্ত একবার হাজিরা দিত।

এই দুর্বলতাটুকুর জন্য আমরা তাহাকে নানাভাবে উত্যক্ত করিতাম। একদিন ফোরেলের 'সেক্সুয়াল কোশ্চেন'খানা তাহার সামনে ধরিয়া বলিলাম, দেখেছ দাদা, কি লিখেছে?—সাধারণত

আঠারো-বিশ বছরের মেয়েরা প্রৌঢ় লোকদের প্রতিই বেশি আকর্ষণ অনুভব করে; সমবয়সী যুবকদের প্রতি নয়। ললিতাও তা হ'লে...।

দক্ষিণাদা একগাল হাসিয়া বলিল, যাঃ ও এদেশের মেয়েদের কথা নয়।

ললিতা আমাদের পাড়ার লেডি ডাক্তার মিসেস সরকারের মেয়ে বেথুনে ফার্স্ট আর্টস পড়ে। লেডি ডাক্তার আমাদের লাইব্রেরির মেম্বর হইয়া ছিলেন। দক্ষিণাচরণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার খোঁজ লইত, সেদিন মিসেস সরকারের বাড়িতে কোনও বই গিয়াছে কি না। এইরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে যদি তাহার দেওয়া কোন বই সে বাড়িতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে ললিতা অন্তত তাহার নামটাও একবার দেখিতে পাইবে। দক্ষিণাদার ওইটুকুতেই সুখ।

দক্ষিণাদাকে সবচাইতে নাকাল করিতেন গোপালদা। একদিন তাহার সহিত দেখা হইতেই গোপালদা বলিলেন, কি হে ভায়া, বিশ্বভারতীর মেম্বর হ'লে? ললিতার যে এখন বিশ্বভারতী-বাই হয়েছে।

দক্ষিণাচরণ প্রথমটা চটিয়া উঠিলেও পরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, তাই নাকি? পরদিনই বিশ্বভারতীর একজন মেম্বর বাড়িল।

যৌবনে সে একবার কখন কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়াছিল। পুরাতন খাতাগুলিই আবার টানিয়া বাহির করিল, নিজের লেখা পড়িতে নেহাৎ মন্দ লাগে না। তিন অক্ষরে যতগুলি প্রেয়সীর নাম ছিল, সব কাটিয়া মিল বজায় রাখিয়া 'ললিতা' করা হইল। পুরাতন ছেঁড়া খাতার বদলে নূতন বাঁধানো খাতায় ঝোলাগুড়ের দালাল দক্ষিণাচরণ প্রেমের কবিতা লিখিতে লাগিল।

বোম্বাইয়ে মাল পাঠাইয়া রেল-রসিদের উল্টা পিঠেই একদিন সে লিখিয়া ফেলিল—প্রথম লাইনটা রবীন্দ্রনাথ হইতে চুরি—তা হোক....!

চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে,
ওগো ললিতে!
সন্ধ্যা না দুপহর পড়ে না মনে,
লোকের ভিড়ে? না না, নিরজনে—
গড়ের মাঠে? বুঝি রেল-স্টেশনে;
স্ট্রীটে, রোড, অ্যাভিনিউ, কোন্ গলিতে?
ওগো ললিতে!
সেই হতে আছ মোরে পায়ে দলিতে,
ওগো ললিতে!
'বাস' আসে 'বাস' যায় চমক হেনে,
তুমি কি জানিবে পাশে পান কে কেনে?
সবাই পথিক সখি, কে কারে চেনে?
তুমি শুধু পথ চল মোরে ছলিতে—
ওগো ললিতে!

বাবুকে রসিদ হাতে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে দেখিয়া রেলের কুলি অবাক।

সন্ধ্যায় ক্লাবে দক্ষিণাদা আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, দেখ, হে, একটা কবিতা লিখেছি। তুমি তো আবার বড় সাহিত্যিক।

বলিলাম, চমৎকার হয়েছে দক্ষিণাদা! আমার হিংসে হচ্ছে।

ছাই! আমড়াগাছি করতে হবে না, ভাই। সত্যি, মেয়েটা বুড়ো বয়সে...।

বালাই। বুড়ো! ছ্যাঃ। কবিতাটা আমাকে দাও, ললিতার হাতে পৌঁছে দেবার ভার আমার। —বলিয়াই রসিদখানায় টান মারিলাম।

আরে আরে, কর কি? কেলেঙ্কারি হবে, মুখ দেখাবার পথ থাকবে না।

কিন্তু কে কথা শোনে? তখন আরও পাঁচজনে আসিয়া জুটিয়াছে। গোটা পাঁচেক নকল সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। রসিদখানা ভি.পি. করিয়া বোম্বাই পাঠাইতে হইবে বলিয়া ললিতার জন্য আসল পাণ্ডুলিপি রাখা হইল না।

ললিতার কাছে পৌঁছাইয়া দিব তো বলিলাম, কিন্তু কি উপায়ে? মেয়ের সম্বন্ধে মিসেস সরকার একেবারে বাঘ। তিনি নিজে চিরকাল ভদ্র জীবন যাপন করিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি আমরা তাঁহাকে পাড়ার একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা বলিয়াই জানি। কাহারও সহিত তাঁহার হৃদ্যতার অভাব নাই। বিপদে-আপদে তিনি সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।

শেষে এক উপায় ঠাওরাইলাম। যতীন ভাল গান গাহিতে পারিত। সে নিজেই সুর দিয়া গানটা প্র্যাক্‌টিস করিল এবং হঠাৎ একদিন ক্লাবে রৈ-রৈ পড়িয়া গেল। দক্ষিণাদার গান! আগেই দেখিয়া লইয়াছিলাম, মিসেস সরকার বাড়ি আছেন কি না। তিনি 'কলে' বাহিরে গিয়াছেন।

ক্লাব-ঘর হইতে ললিতাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। ক্লাবে হঠাৎ গান শুনিয়া সে জানলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দক্ষিণদাও ঠিক এই সময়ে ক্লাবে হাজির হইল। ইঙ্গিতে তাহাকে ললিতার ঘরটা দেখাইলাম। দাদা একেবারে জিভ কাটিয়া ছুটিয়া গিয়া যতীনের মুখ চাপিয়া ধরিল। তখন দুই লাইন গাওয়া হইয়াছে।

ললিতার মূর্তি জানালা হইতে সরিয়া গেল।

দক্ষিণাদার এই দুর্বলতাটুকুর সুবিধা লইয়া আমরা দাদাকে দিয়া নিত্য নূতন বই কিনাইতে লাগিলাম। বইয়ের দরকার হইলেই বলিতাম, দাদা, মিসেস সরকার বলছিলেন, ক্লাবের বই তো প্রায় পড়া হয়ে গেল। নতুন ভাল বই আপনারা তো কিছুই আনান না। তাই ভাবছি, চন্দন লাইব্রেরির মেম্বার হব।

দাদা বলিত, সে কি কথা! নতুন কি কি বই বেরিয়েছে তার একটা লিস্টি কর। এ যে ইন্দুমতীর অপমান!

দক্ষিণাদার আর কিছু না থাক্, পয়সা ছিল। এখন ললিতার মহিমায় দিল বাড়িয়েছে। ক্লাবের পুস্তক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

দক্ষিণাদাকে একদিন বলিলাম, দেখ দক্ষিণাদা, এক কাজ কর। নতুন বইগুলোর উপহার-পৃষ্ঠায় একটা ক'রে কবিতা লিখে দাও। স্পষ্ট ক'রে লেখবার দরকার নেই, উদ্দেশে লেখ, তা হ'লেই কাজ হবে। ও বাড়িতে যত বই যায় তার পাঠক তো ললিতা। মিসেস সরকারের সময় নেই—

কিন্তু ধরা পড়লে?

ধরবে কে? ললিতা যদি বুঝতেও পারে তা হ'লে সে কি—

আচ্ছা, দিও বইগুলো ওপরে পাঠিয়ে।

সচিত্র ওমর খায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় দক্ষিণাদা সযত্নে লিখিলেন—

ললিত মধুর রুবাই যাহার কোথা সে আজি,
লিপি কে পাঠাল ভবিষ্যতের করিবে স্মরি?
তাহার স্মরণে চিত্ত আমার উঠিল বাজি,
লহ এ অর্ঘ্য, দূর হতে তোমা বরণ করি।
লিখন তোমার অক্ষয় হ'ল কালের বুকে,
তাহারই পরশ লাগিল আমার লেখনীমুখে।

—দক্ষিণাচরণ

বুলবুলের উপহার-পৃষ্ঠায় লিখিত হইল—

তোমারে দেখবে ব'লে আকাশ কোলে মেঘের ভিড় এ,
ছুঁতে ও আঁচলখানি কানাকানি ধীর সমীরে।
বনের ও মাথায় মাথায় হাত-ইশারায় তোমায় ডাকে,
তটিনী কলতানে তোমায় টানে চরের বাঁকে।
আজি এ তিমির-রাতি পেলে সাথী নদীনীরে
ডুবিয়া মরব সুখে, আমার বুকে মেঘের ভিড় এ।

—অভাগা দক্ষিণা

এইভাবে নূতন বইয়ের প্রায় সবগুলিতেই কয়েকছত্র করিয়া লেখা যোগ করা হইল।

আসলে মিসেস সরকার কালেভদ্রে এক-আধখানা বই লইতেন। মেয়ের মনে হালকা উপন্যাসের ছোঁয়াচ লাগিতে দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। নেহাত আমাদের উপরোধে পড়িয়াই তিনি মেম্বারশিপ বজায় রাখিয়াছিলেন।

মিসেস সরকারের এক ভাগনে—বসন্ত, তাঁহার বাড়িতে থাকিয়াই 'ল' পড়িত। সে আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য হইল। অল্পদিনেই দক্ষিণাদার দুর্বলতার খবর সে পাইল। সেও আমাদের সহিত যোগ দিয়া দক্ষিণাদাকে নাচাইতে লাগিল। আমাদের মহা সুবিধা হইল।

বসন্ত হঠাৎ একদিন দক্ষিণাদকে ধরিয়া বসিল, দক্ষিণাদা আপনার উপহার-পৃষ্ঠার কবিতাগুলো ললিতা সব পড়েছে, বলে, চমৎকার লেখেন। আপনার সঙ্গে একদিন আলাপ করতে চায়।

দক্ষিণাদাদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলে, না না, ভাই, সে আমি পারব না। ওগুলো কি আবার কবিতা! হ্যাঁ, কবিতা লিখেছিলাম, যখন যৌবন ছিল—

আমরা তারস্বরে বলিয়া উঠিলাম, ছিল কি দক্ষিণাদা? তোমার সম্বন্ধেই তো রবিবাবু লিখেছেন—

আমাদের পাকবে না চুল গো,
আমাদের পাকবে না চুল!

যতীন অমনি গান ধরিয়া দেয়।

দক্ষিণাদা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে, তোরা থাম্, বাপু। হ্যাঁ ভাই বসন্ত, ললিতা আর কি বললেন?

বসন্ত একটু লজ্জার ভান করিয়া বলিল, সেসব কথা কি আমার বলা শোভা পায় দক্ষিণাদাদা? সে হ'ল আমার বোন। হ্যাঁ, আপনার যৌবনের কবিতার কথা কি বলছিলেন?

দু-একটা কবিতা তখন সত্যিই লিখেছিলুম ভায়া।

সকলেই আবদার ধরিলাম, পড়ুন না, দক্ষিণাদা!

দক্ষিণাদা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় আলমারি খুলিয়া একটা খাতা বাহির করিল এবং মাদুরের-কাটি-মার্কা দেওয়া একটা পাতা খুলিয়া বলিল, কত স্মৃতিই না এই কবিতার সঙ্গে জড়িত আছে ভাই। ইন্দুমতী এই কবিতাটি বড্ড পছন্দ করতেন।

তবে তো শুনতেই হবে, পড়ুন দক্ষিণাদাদা।

দক্ষিণাদাদা চশমাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল—

বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি জ্যোছনা জোয়ারে
ভাসিতেছে ত্রিভুবন বনের আঁধারে
কাঁদিল সহসা হিয়া কোকিল-বধূর।
সে ক্রন্দন ভেসে গেল দূর হতে দূর
অনন্ত আকাশপানে, শুনিল শ্রবণে
বিরহ-বিধুরা বালা কুটীর প্রাঙ্গণে;
সহসা খসিল তার ঘোমটা মাথার,
থমকি চমকি শূন্যে চাহে বারম্বার,
কে ডাকিল তারে?—ভাবে বালা ভ্রান্ত মন?
কাঁকন বাজিল বৃথা, খসিল গুণ্ঠন।
মিছা আজ জ্যোৎস্নাধারা—

বসন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, দক্ষিণাদা, দিন দিন কবিতাটা ললিতাকে শুনিয়ে আসি।

দক্ষিণাদা বলিল, সবটা শোন, তারপর—

সে হবে না। একেবারে টাটকা—

বাধ্য হইয়া দক্ষিণাদাদা খাতাখানি দিল। সেদিন ক্লাবের সভ্যদের বাড়ি ফিরিয়া আর খাইতে হইল না।

পরদিন বসন্ত আসিয়া বলিল, দক্ষিণাদা, কাজটা ভাল করেন নি। মাসীমা ভারি চটেছেন।

দক্ষিণাদা এতটুকু হইয়া বলিল, ব্যাপার কি ভায়া?

আর ব্যাপার কি! ওমর খায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় কি কবিতা লিখেছেন, মাসীমা বুঝতে পেরেছেন।

দক্ষিণাদা প্রমাদ গনিল। কই, তেমন কিছু তো—

প্রথম অক্ষরগুলো প'ড়ে গেলে নাকি 'ললিতা ললিতা' এই দুটো কথা হয়?

আমরা সকলেই কবিতাটা দেখেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে দাদার নিজের কেরামতি এতটা ফলাইয়াছে, তাহা জানিতাম না। বসন্তকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা সত্য কি না। বসন্ত বলিল, খানিকটা সত্য। মাসীমা দেখেন নাই বটে, কিন্তু ললিতা দেখিয়াছে।

সর্বনাশ!

বসন্ত বলিল, এতে মাসীমা, ললিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও অপমান করা হইয়াছে। মাসীমা লাইব্রেরির মেম্বর তো থাকিবেনই না, অন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তাহাও ভাবিতেছেন।

দক্ষিণাদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, এই যত সব ছোকরাদের পাল্লায় প'ড়ে বুড়ো বয়সে—

যতীন বলিল, বুড়ো বয়েস কি দক্ষিণাদা!

দক্ষিণাদা হতাশার স্বরে বলিল, থাম বাপু! আর ইয়ার্কি ভাল লাগে না। ছি ছি ছি! কি কেলেঙ্কারিটাই হ'ল! আমি কালই এ-বাড়িটা ভাড়া দিয়ে অন্য পাড়ায় যাব।

আমি বলিলাম, কিন্তু আমাদের ক্লাব, লাইব্রেরি?

চুলোয় যাক। আপনি বাঁচলে—

কিন্তু দক্ষিণাদা, বউদির স্মৃতি—

দক্ষিণাদার ধৈর্যচ্যুতি হইল।—দুত্তোর স্মৃতি! বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

আসলে ব্যাপারটা এত দূর গড়ায় নাই। কবিতা দেখিয়া ললিতা নিরীহ পাগল দক্ষিণাচরণের দূরবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইল। তাহা ছাড়া, এই পাড়ায় জন্মাবধি বাস করিয়া দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে অনেক খবরই সে জানিত। ঝিয়েরা বলিত, মাটির মানুষ, গিন্নী যাওয়া-ইস্তক উঁচু নজরে কারও দিকে চায় না পর্যন্ত। সেই দক্ষিণাচরণকে যে পাড়ার বখাটে ছোকরারা মিলিয়া এভাবে নাচাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ললিতার অনুকম্পা হইল। বেচারা!

বসন্ত একদিন আমাদের পরামর্শে ললিতাকে বলিল, একটা মজা করবি, নলি?

মজাটা যে দক্ষিণাচরণকে লইয়া ললিতা চট করিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, কি মজা?

একদিন দক্ষিণাদার সঙ্গে দেখা করবি? কিন্তু মাসীমাকে না জানিয়ে।

বসন্ত মাসীমাকে যমের মতো ভয় করিত।

অনেক বোঝাপড়ার পর ললিতা রাজি হইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দক্ষিণাচরণের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল। সে বসন্তকে বলিয়া রাখিল যে, দক্ষিণাবাবুকে বেশি নাকাল করিবার চেষ্টা হইলে সে সমস্তটা ফাঁস করিয়া দিবে।

এদিকে দক্ষিণাদাকে তাহার কৃত কার্যের জন্য ললিতার কাছে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত হইতে বলা হইল। দক্ষিণাদা নিতান্ত মনোদুঃখে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিতে লাগিল।

মিসেস সরকার একদিন দূরের ডাকে বাহিরে গেলে বসন্ত বেশ চুপি-চুপি আসিয়া দক্ষিণাদাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। যে ঘরে দক্ষিণাদার সহিত ললিতার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারই পাশের ঘরে আমরা ক্লাবের দশ-পনেরো জন পূর্ব হইতেই জমায়েৎ হইয়াছিলাম। ললিতা তাহা জানিত না।

দক্ষিণাদা একটা চেয়ারে বসিয়া অধোবদনে রহিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিবার সাহস তাহার ছিল না। ললিতা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু দক্ষিণাদা চুপ। বসন্ত হাঁকিল, দাক্ষিণাদা, ললিতা—

দক্ষিণাদা শসব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ললিতা শান্তকণ্ঠে বলিল, ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন।

দক্ষিণাদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বসিয়া পড়িয়া ভাঙা গলায় বলিল, দেখুন, পাগলামির খেয়ালে একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমার জ্ঞান ছিল না।

ললিতা বলিল, না না, কিছু অন্যায় করেন নি আপনি।

বসন্ত হাসি চাপিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। দুই ঘরের মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক হইল।

দক্ষিণাদা হাত দুইটি জোড় করিয়া আর একবার বলিল, আমি পাগল হয়েছিলাম—

দরজাটা দড়াম করিয়া খুলিয়া গেল। দক্ষিণাদা ও ললিতা দুজনেই চমকিয়া উঠিল। ললিতা শুধু গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চাহিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সে হঠাৎ দৃঢ়পদে দক্ষিণাদার কাছে গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, পাগল আপনি হন নি, ভুল করেছেন বটে, কিন্তু সে ভুল আমি শোধরাব। আপনি বাড়ি যান।

দক্ষিণাদা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আমরাও কম অবাক হই নাই। বসন্ত হতাশ হইয়া উঠিল, সর্বনাশ হয়ে গেল, ললিকে আমি চিনি। দক্ষিণাদাই শেষে জিতল।

মায়ের আপত্তি টিঁকিল না, তাঁহার চোখের জল নিষ্ফল হইল। ললিতা নাছোড়বান্দা। দক্ষিণাদা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ললিতার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভদিনে শুভক্ষণে দক্ষিণাদার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সেদিন ভরপেট খাইলাম।

রসিকতা করিতে গিয়া কিন্তু আমরা প্যাঁচে পড়িলাম। ললিতা বিবাহের দিনকয়েক পরেই দক্ষিণাদার শূন্য সংসারে জমজমাট হইয়া বসিল। ভোজপুরী ভঙ্গীতে আমাদিগকে প্রথমেই 'নিকালো' বলিল না বটে, কিন্তু ভাবটা যাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহাতে অবিলম্বে ক্লাব অচল হইবে মনে হইল।

দক্ষিণাদা নিয়মিত পাট আর ঝোলাগুড়ের দর যাচাই করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু পূর্বেকার মতো সন্ধ্যায় ক্লাবে আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিল না। কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু নূতন বই কেনা হইবে না বলিয়া উপহার-পৃষ্ঠার কবিতা আর দেখা গেল না। দক্ষিণাদা আমাদিগকে ছিন্ন কাঁথার মতো পরিত্যাগ করিল।

লাইব্রেরির অবস্থা কাহিল, ক্লাব চুলোয় যাক। দাদাকে একদিন বলিলাম, তোমার প্রথমা পত্নীর স্মৃতি এভাবে--

অন্তরাল হইতে ললিতা শুনিয়া থাকিবে। পরদিন সে হুকুম দিল, ক্লাব ও লাইব্রেরি অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বসন্তের ওকালতিতে কাজ হইল না; কেন বলিতে পারি না, ইন্দুমতীর উপর ললিতার ভয়ানক রাগ ছিল, সম্ভবত আমাদের জন্যই।

ইন্দুমতী-পাঠাগারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল, কিন্তু পরম্পরায় খবর পাইলাম দক্ষিণাদার বই কেনা বন্ধ হয় নাই। ললিতা পড়িতে ভালবাসিত। মায়ের বাঁধাবাঁধিতে যে ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রৌঢ় স্বামীর দৌলতে তাহা ভাল করিয়া পূর্ণ হইতে লাগিল। ইন্দুমতী পাঠাগার উঠিয়া যায়-যায় হইল, দক্ষিণাদার বাড়িতে ইন্দুমতী-পাঠাগারের একখানিও বই যাইবার উপায় রহিল না।

শেষে আমরা একদিন বিশেষ বৈঠক ডাকিয়া স্থির করিলাম লাইব্রেরি বজায় রাখিতে হইলে ললিতাকে বশে আনিতেই হইবে। নূতন বই না হইলে মেম্বার থাকে না, চাঁদার টাকা এত সামান্য যে তাহা বই কিনিয়া পাঠিকাদের পড়ার ক্ষুধা মেটানো বা পেট ভরানো যায় না। সুতরাং দক্ষিণাদার দালালির টাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু সিন্দুকের চাবি এখন ললিতার হাতে। অনেক বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, ললিতার এই বিরাগের মূলে সপত্নী-বিদ্বেষ। সে সপত্নীকে দেখে নাই বটে, কিন্তু আমরাই যেন সেই মৃতার স্মৃতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলাম। আমরা ইন্দুমতীর নাম খারিজ করিয়া সে স্থলে ললিতার নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম। লাইব্রেরির চিঠির কাগজ, বই-ইসুর টিকিট, খাতা-পত্র সর্বত্রই ইন্দুমতীর নাম কাটিয়া ললিতার নাম লেখা হইল এবং একদা দক্ষিণাদাকে সস্ত্রীক ললিতা-পাঠাগার পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম।

ঔষধ ঠিক ধরিল। শাশুড়ী-স্ত্রীসমভিব্যাহারে দক্ষিণাদা হাজির হইল। তাহার শরীরের সেই চোয়াড়ে ভাব আর নাই। অনেকখানি চিক্কন হইয়াছে। আমরা সসম্ভ্রমে সকলকে অভিবাদন করিলাম। ললিতা স্বয়ং পুস্তকের তালিকা দেখিতে চাহিল, তালিকার উপর ইন্দুমতীর নাম এমনভাবে কাটা হইয়াছিল যে পড়িবার উপায় ছিল না। ললিতা খুশি হইয়া বলিল, দেখছি, নতুন অনেক বই আপনাদের এখানে নেই, আমি পাঠিয়ে দেব কালই। সেগুলো ছাড়া আর যদি কোনও ভাল বই বেরিয়ে থাকে, তার একটা লিস্টি—

আমরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। আমি সেক্রেটারি হিসাবে ললিতা-পাঠাগার ও দক্ষিণাচরণ-ক্লাবের বার্ষিক-বিবরণী পাঠ করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহাতে ইন্দুমতীর নাম কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় স্থলেও ললিতার নাম দেওয়া হইয়াছিল।

ললিতা খুশি হইয়া ক্লাবের ফরমাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য নগদ এক শত টাকা মঞ্জুর করিল। দক্ষিণাদার মনের ভিতরে টেরি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।

সভা ভঙ্গ হইবার পর দক্ষিণাদা গোপনে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া বলিল, ভায়া হে, আমার আর কিছু নেই, আমার সর্বশেষ কবিতাটি তোমাদের দিলাম, ইন্দুমতীর নামে সভা ডেকে একদিন সবাই প'ড়ো। আমার আসবার উপায় নেই, তবু—

দক্ষিণাদার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

একটা শুভদিন দেখিয়া ইন্দুমতীর চরম বিদায়-গীতি পাঠ করিলাম।

শ্মশানের চিতাবহ্নি তোমার করে নি ভস্মসাৎ,
মহাকাল পারে নি ভুলাতে,
এ কি বিপর্যয়, প্রিয়া জীবনে ঘটিল অকস্মাৎ
তুমি হ'লে বিলীন ধূলাতে!
তোমা লাগি অশ্রু মোর অন্ধকারে উঠিচে উথলি,
কেহ তা পায় নি দেখিবারে,
ঝরে পড়া ফুলটিরে আজ আমি রূঢ় পায়ে দলি,
তুমি শুধু ক্ষমিও আমারে!
'তুমি ছিলে'—এই সত্য চিরদিন থাকি যেন ভুলে,
'তুমি গেছ' তাও যেন ভুলি,
যে ঢেউ ভাঙিয়া গেছে তারে খুঁজি সাগরের কূলে
ফিরিব না দীর্ঘশ্বাস তুলি—

বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম থাম এ অসহ্য!

তাহার চোখে জল।

শেষ কবিতা শেষ করা হইল না।

ললিতা-পাঠাগার ও দক্ষিণা-ক্লাব জোর চলিতেছে। মেম্বরদের বই পড়ার দুঃখ ঘুচিয়াছে। নূতন বই কিনিতে একদিনও দেরী হয় না।

কিন্তু বসন্তের দুঃখের অবধি নাই। ইন্দুমতীর প্রতি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সে আজিও মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শেখর আমার বন্ধু। বন্ধু মানে একসঙ্গে কিছুদিন পড়েছিলাম কলেজে। জানি সে থাকে বাগবাজারে। কোথায়, কোন্ রাস্তায়, কত নম্বরের বাড়ি, কিছুই জানতাম না।

বি.এ. পাশ করে আমি একদিন একটা চাকরির সন্ধানে ডালহৌসি স্কোয়ারে গিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি, চক্‌চকে একখানা নতুন গাড়ি থেকে নামলো শেখর। প্রথমে তাকে আমি চিনতে পারিনি। পরনে দামি সুট্, মাথায় টুপি, হাতে সিগারেট।

—শেখর, না?

ফিরে দাঁড়িয়েছিল শেখর। জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি এখানে?

বলেছিলাম, একটা চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। টাকা পয়সার অভাবে আর পড়তে পারলাম না।

শেখর বলেছিল, শ-দেড়েক টাকার একটা চাকরি তোমার আমি করে দিতে পারি। তুমি পরশু তারিখে বেলা দুটোর সময় জেনারেল পোস্টাপিসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেদিন যখন জেনারেল পোস্টাপিসের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালাম, বড় ঘড়িটায় তখন একটা বাজছে।

দুটো বাজলো, আড়াইটে বাজলো, তিনটে বাজলো। কোথায় শেখর? চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে এলাম। শেখর এলো না।

দেখা হল আরও পাঁচ বছর পরে। মস্ত এক বড়লোকের মেয়ের বিয়ে। নিমন্ত্রণ করেছিলেন। যেতে হয়েছিল। গিয়ে দেখি, শেখরও গেছে নিমন্ত্রিত হয়ে। চেহারাটা একটু ভারিক্কি ভারিক্কি হয়েছে। আজ আর কোট প্যান্ট নয়, পরনে দিশি ধুতি, গায়ে ঢিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী, তার ওপরে একটা সাদা ধপধপে চাদর। চোখাচোখি দেখা হয়ে গেল।

জেনারেল পোস্টাপিসের সামনে অপেক্ষা করার কথাটা আমার যেন আবার নতুন করে মনে পড়লো। কিন্তু মনেই পড়লো শুধু। বলতে কিছু পারলাম না। ভাবলাম—শেখর নিজে যদি বলে তো বলুক।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, একটিবারের জন্য সেদিনের সে কথাটা সে উচ্চরণ করলে না। উল্টে জিজ্ঞাসা করলে, কি করছো আজকাল?

বললাম, লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের দালালি।

—ভাল ভাল, মোটা টাকার ইনসিওর করতে পারলে রোজগার মন্দ হয় না।

এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় বসালে। বললে, তা'হলে

এমন-সব লোকের কাছে তোমাকে যাওয়া-আসা করতে হয়—যাদের টাকা-পয়সা আছে—

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বল তো?

—শোনো, টাকা-পয়সাওলা লোক যদি তুমি আমার কাছে ধরে আনতে পারো তাহ'লে তোমাকে আমি বেশ ভাল কমিশন দিতে পারি।

—তাদের নিয়ে তুমি কি করবে?

শেখর বললে, খুব একটা ভাল বিজ্‌নেসে টাকা ইন্‌ভেস্ট করবো—যেখানে টাকায় টাকা লাভ মানে সেন্ট পারসেন্ট তো দূরের কথা, এক হাজার টাকা ইন্‌ভেস্ট করলে পাঁচ হাজার টাকা ফিরে পাবে ছ'মাসের ভেতর।

অবাক হয়ে গেলাম শেখরের কথা শুনে। বললাম, সেরকম ব্যবসা আছে নাকি পৃথিবীতে?

গম্ভীর মুখে শেখর বললে, আছে।

বুঝলাম, টাকার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে শেখর।

কিন্তু এক হাজার টাকা ছ'মাসের ভেতর পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে আসবে—এমন ধারা অদ্ভুত কথা কারও কাছ থেকে কোথাও শুনিনি। বললাম, বেশ, তাহ'লে টাকা-পয়সাওয়ালা লোক আমি তোমার কাছে ধরে আনবো—তুমি জেনারেল পোস্টাপিসের সামনে কাল দাঁড়িয়ে থেকো।

সুযোগ বুঝে আমি যে তার সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো কথাটা তুলবো—শেখর তা' ভাবতে পারেনি।

হো হো করে হেসে উঠলো শেখর।

—আরে সেদিনের সেই এপয়েন্ট্‌মেন্টের কথা এখনও তোমার মনে আছে দেখছি! আমি গিয়েছিলাম। তবে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

বললাম না যে, আমি চারটে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিলাম।

খাবার ডাক পড়লো। পকেট থেকে ছাপা ভিজিটিং কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, এইটে রেখে দাও তোমার পকেটে। ওতে আমার কোম্পানির নাম, আপিসের ঠিকানা সব-কিছু আছে। পার্টি ধরে নিয়ে এসো আমার কাছে, তারপর দেখো তোমার কিরকম রোজগার হয়।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিজ্‌নেস্‌টা কিসের?

শেখর বলেছিল, সিনেমার ছবি-টবি দেখা অভ্যেস আছে তোমার?

—দেখি মাঝে-মাঝে।

—'ঝরা পাতা মরা ফুল' ছবিটা দেখেছো?

—না। শুনেছিলাম ভাল হয়নি।

শেখর বলে উঠেছিল, ওই তো তোমাদের দোষ! শোনা কথায় বিশ্বাস করতে আছে? ছবিটা আমার। ষাট হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

শুনেছিলাম ছবিটা চলেনি। শেখর বলেছিল, চলা না-চলা আর লাভ-লোকসানের রহস্য তুমি বুঝবে না। সিনেমা-ছবির জগৎ এ এক বিচিত্র জগৎ। যে-ব্যবসাতে লোকসান হয় সে-ব্যবসা উঠে যায়। সিনেমার ব্যবসা উঠে যাবার কোনও লক্ষণ দেখেছো?

কথাটার জবাব দিতে পারিনি। শেখর বলেছিল, এর গোপন রহস্য যদি তুমি বুঝতে চাও

তো আমার কাছে ভাল ভাল পার্টি নিয়ে এসো—আমি তোমাকে বুঝিয়ে দেবো।

বুঝতে আমি চাইনি। তার আপিসেও কোনদিন যাইনি। তার দেওয়া সেই কার্ডখানি কোথায় যে হারিয়ে ফেলেছিলাম জানি না। শেখর যে আমার বাড়িতে আসবে তারও কোনও উপায় ছিল না। আমার বাড়ির ঠিকানা সে জানতো না।

এতদিন পরে এই সেদিন—মানে তারও প্রায় দশ বছর পরে হঠাৎ একদিন কলকাতার একটা গলি-রাস্তায় শেখরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। দেখা অবশ্য হতো না—যদি-না আমি তাকে ডেকে বসতাম। আমাকে দেখেই সে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শেখর-শেখর মনে হতেই আমিই তাকে ডাকলাম,—শেখর না?

ফিরে দাঁড়ালো মানুষটি। এত পরিবর্তন যে হয় মানুষের—চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সুমুখের একটি দাঁত ভেঙেছে, চুলে পাক ধরেছে, গায়ের সে ফর্সা রং যেন কাল্‌চে মেরে গেছে, মুখের চামড়া গেছে কুঁচ্‌কে।

আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, এসো। এই কাছেই একটা বাড়িতে আমি থাকি।

এঁদো পচা গলির ভেতর জরাজীর্ণ একখানা বাড়ির নীচের তলায় দু'খানা ঘর। তারই মধ্যে একটুখানি গুছিয়ে-গাছিয়ে বাস করছে আমার বন্ধু সেই 'সিনে ইন্‌ভেস্ট্‌মেন্ট কর্পোরেশনে'র শেখর সান্যাল, সে-কথা বিশ্বাস করি কেমন করে?

কিন্তু বিশ্বাস আমাকে করতে হল যখন সে আমাকে টিনের একটা চেয়ারে বসিয়ে বললো, বসো। আমি চা নিয়ে আসি।

চা আনতে ভেতরে চলে গেল শেখর। ভেতর মানে পাশের একখানি ঘর আর তারও পরে মনে হল যেন ছোট একটুখানি বারান্দা।

সবই শুনতে পেলাম। একটি মেয়ে যেন বললে, আমার নামে বন্ধুকে ভাল করে লাগিয়েছ তো সব?

শেখর জবাব দিলে না। মেয়েটি বললে, সরো, তোমাকে আর স্টোভ জ্বেলে দিয়ে আমার উপকার করতে হবে না। আমি চা দিচ্ছি, তুমি বসোগে যাও।

আর কোনও কথা না বলে শেখর চলে এলো আমার কাছে। এসে মুখ ভার করে গুম্ হয়ে বসে রইলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি বিয়ে করেছ শেখর?

শেখর বললে, করেছি।

—আমাকে দেখে তুমি এমন মুখ লুকিয়ে চলে যাচ্ছিলে কেন?

লজ্জায়। শেখর বললে, চেনা মানুষের সঙ্গে আজকাল আর দেখা করতে চাই না।

ভেতর থেকে তার স্ত্রী বলে উঠলো, বল—আমার জন্যে।

শেখর বললে, ওই শোনো!

—দূর থেকে শুনতে হবে না, আমি কাছে যাচ্ছি।

এই বলে হাসতে হাসতে এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে যে মেয়েটি আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো, তাকিয়ে দেখলাম—অপরূপ সুন্দরী। চায়ের পেয়ালাটি আমার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, নমস্কার। ওর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও ভারি মিছে কথা বলে।

শেখর বললে, বেশ, তবে ওকে সব সত্যি কথাই বলছি। শোনো। চা খাও।

ইনি আমার সহধর্মিনী—শ্রীমতী করুণাময়ী। কিন্তু করুণার বিন্দুমাত্রও নেই ওঁর শরীরে। উনি আমাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন।

—কিন্তু কিজন্যে পাঠিয়েছিলাম সে কথাটা বল।

শেখর বললে, বলছি। উনি বলেনা—আমি যে পাপ করেছিলাম তার প্রায়শ্চিত্ত করাতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী পাপ করেছিলে তুমি?

করুণাময়ী এগিয়ে এলো। বললে, নিজের পাপের কথা নিজের মুখে বলতে পারবে না। আমি বলছি শুনুন। উনি সিনেমার ছবি তৈরি করতেন। অথচ ছবি তৈরি করতে উনি জানতেন না, জানতেন শুধু ছবির নাম করে মানুষের টাকা মেরে দিতে। মানুষের লোভ তো প্রচণ্ড। কোম্পানি করেছিলেন সিনে ইন্‌ভেস্ট্‌মেন্ট কর্পোরেশন। তার দালাল ঘুরতো বাজারে। বলতো, ছবির ব্যবসায় পাঁচ হাজার টাকা দিন, পঁচিশ হাজার টাকা পাবেন ছ'মাসের ভেতর। পাঁচ হাজার, দশ হাজার—যার কাছ থেকে যা পেতেন তার অর্ধেকের বেশি যেতো নিজের পকেটে আর ঝড়তি-পড়তি যা থাকতো তাই দিয়ে ছবি তৈরি হতো। ছবিও হতো তেমনি—'ঝরা পাতা মরা ফুল'। ঝরেও যেতো, মরেও যেতো। আচ্ছা বলুন তো, এটা পাপ নয়?

বলেই সে একটি অদ্ভুত হাসি হেসে বোধকরি শেখরের জন্যে চা আনবার জন্য ঘরের ভেতরে পালিয়ে গেল।

শেখর বললে, ঠিক অমনি হাসি হেসে ওই সর্বনাশা রূপ নিয়ে হতভাগী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, ছবিতে আমি অভিনয় করবো। সঙ্গে একটা দালাল ছিল। বললে, মেয়েটার হাতে আছে ষাট-সত্তোর হাজার টাকা। দেখুন যদি পারেন তো—

সিঁথিতে ছিল সিঁদুর। বললুম, স্বামী আছে যে!

লোকটা বললে, সে না-থাকার মধ্যে। স্বামীর মাথার একটু গোলমাল ছিল। বিয়ের পরেই ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। নিরুদ্দেশ।

শেখর বললে, লেগে গেলাম করুণাময়ীর পেছনে। ওর বাড়ি গেলাম। দেখলাম, দোতলায় চমৎকার সাজানো ঘর। ওর এক দিদি রয়েছে, আর কেউ নেই। দিদিটা বিধবা। বললে, করুণাকে দিলাম আপনার হাতে। ওকে মানুষ করে দিন।

—তাই তো দিলে মানুষ করে। বলতে বলতে চা হাতে নিয়ে করুণাময়ী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

—মানুষ হতে তুমি চাইলে কোথায়? তুমি চাইলে আমার টাকা।

শেখর যেই বললে, আর অম্‌নি করুণাময়ী চেঁচিয়ে উঠলো, থামো থামো, মিছে কথা বোলো না বলছি। আমি চাইলাম, না তুমি চাইলে?

শেখর বললে, ছিল তোমার টাকা? বল—সত্যি কথা বল।

—ছিল না-ছিল সে-কথা তো তুমি জানলে অনেক পরে। দ্যাখো, তুমি চুপটি করে বসে বসে চা খাও তো, আমি বলছি ওঁকে।

এই বলে করুণাময়ী আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। বললে, শুনুন তাহলে। আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে আমাকে নিয়ে গিয়ে রাখলেন। আমি তাই চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে বাড়ির বৌ-এর মতো নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে লাগলাম ওঁকে। আর উনি ধরে বসলেন,

তোমার টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার দাও, আমি রেখে দিই আমার ব্যাঙ্কে। আমার আছে পঞ্চাশ হাজার। এই দুটো টাকা মিলিয়ে এক লাখ টাকায় এমন একখানা ছবি করি, যে-ছবি হবে দেশের সেরা ছবি আর তুমি হবে সেরা হিরোইন।

শেখর মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

করুণাময়ী বললে, হাসছো যে? বলনি এই কথা?

—বলেছিলাম। বলেছিলাম। বলবো না? তুমি তখন ধরে বসলে—ছবি তোমাকে করতে হবে না। তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও আমাকে, আমি রেখে দিই আমার ব্যাঙ্কে। বল বলেছিলে কি না?

করুণাময়ী বললে, বলবো না? তোমার ঝরা পাতা মরা ফুল ছবিখানা দেখেছিলাম তো! ওটা কি ছবি হয়েছিল নাকি? ছবি করতে তুমি জানো? তুমি জান শুধু পরের টাকা মেরে দিতে। তাই আমি বলেছিলাম, ও পাপ তুমি আর কোরো না।

শেখর বললে, এইবার তুমি থামো। আসল মজাটা বলি আমি ওকে।

—আসল মজা কিরকম?

শেখর বললে, আসল মজা হচ্ছে—দু'জনে দু'জনের পিছু লেগেছিলাম টাকার জন্যে—লাখ-পঞ্চাশের স্বপ্ন দেখছিলাম, অথচ উনিও যেমন ভাঁওতা মেরে এসেছিলেন আমার কাছে ষাট-সত্তর হাজার টাকা আছে বলে, আমিও তেমনি গিয়েছিলাম আমার পঞ্চাশ হাজার আছে বলে। আমার হাতে তখন শ-পাঁচেক আর ওঁর হাতে ঢুঁ-ঢুঁ।

করুণাময়ী বললে, তুমি যখন সেকথা জানতে পারলে—জানতে পারলে যে আমার হাতে কিচ্ছু নেই তখন কি করলে সেই কথা বল।

—কি আবার করবো? তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

—শুধু তাড়িয়ে দেওয়া? বলতে লজ্জা হচ্ছে বুঝি? শুনুন তাহ'লে। কথায় কথায় ঝগড়া করে আমার এই পিঠের ওপর মারলে এক লাথি। বললে, দূর হয়ে যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে।

শেখর বললে, দূর হয়ে গিয়ে তুমি কি করলে? সেকথাও বলি তাহ'লে!

—বল না। বলতে আমি বারণ করছি নাকি?

চায়ের কাপদুটো তুলে নিয়ে করুণাময়ী চলে গেল।

শেখর বললে, দিনকতক পরেই দেখি আদালতের এক শমন। উনি আমার নামে নালিশ করেছেন ছবির হিরোইন্ করবো বলে আমার দিদির কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার সর্বনাশ করেছে ওই শয়তান।

ঘরের ভেতর থেকে করুণাময়ীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মিছে কথা বোলো না। শয়তান বলিনি।

—বলেছিলে বই-কি! শয়তান ছাড়া অমন কাজ কে করতে পারে?

আবার করুণাময়ী ঘর থেকে বেরিয়ে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, তুমিও তো আদালতে গিয়ে আমার মুখের দিকে বারকতক তাকিয়ে জলজ্যান্ত মিছে কথাটা ফট্ করে বলে বসলে হাকিমের মুখের ওপর। দিব্যি বলে দিলে—ও যা বলছে সব সত্যি। ওর সর্বনাশ আমি করেছি। সাক্ষীসাবুদ তো ছিল না কেউ, বললেই পারতে মেয়েটার সব মিছে কথা। তাহ'লে আর

তিনমাস জেল খাটতে হতো না।

শেখর বললে, তাহ'লে করুণাময়ীর কি হতো শুনি? উনি তখন ওঁর ডগ্‌ডগে সিঁথির সিঁদুর বেমালুম মুছে ফেলে দিয়ে কুমারী সেজে বসেছেন।

—আজ্ঞে না, সেজে বসিনি। তখন আমি কুমারীই ছিলাম। করুণাময়ী বললে, সিঁথিতে মিছেমিছি সিঁদুর নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম তোমার মতো শয়তানদের ভয়ে।

—আবার শয়তান বলছো?

—বেশ করছি। বলেই সুট্ করে সরে গেল করুণাময়ী।

শেখর বললে, দাঁড়াও এখনও শেষ হয়নি। জেল থেকে যেদিন খালাস পেলাম, জেলের ফটকের বাইরে এসে দেখি একটা ট্যাক্সি নিয়ে করুণাময়ী দাঁড়িয়ে। মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মুখখানি শুকনো, দুচোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে। মুখে কিছু বলতে পারছে না। আমিও কিছু না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

বললাম, তার পরেই বুঝি বিয়ে করলে?

শেখর কিন্তু সেকথায় কান দিলে না। বললে, আমাকে কিন্তু এখনও ও বিশ্বাস করে না। সেই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার আছে বলেছিলাম, এখনও ওর ধারণা—

আবার তার কথার মাঝখানেই চেঁচিয়ে উঠলো করুণাময়ী।—দ্যাখো, মুখ সামলে কথা বল বলছি। একটি দিনের জন্যেও সেকথা আমি বলেছি কোনোদিন?

শেখর এইবার হেসে উঠলো। চট্ করে হাত বাড়িয়ে একটা ডাইরি বই টেনে এনে তারই একটা পাতা উল্‌টে দেখালে—এই দেখো, সাধে আমি এইখানে লিখে রেখেছি—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!'

করুণাময়ী বললে, খুব হয়েছে, আর কবিত্ব করতে হবে না। যাও দেখি, বাজার থেকে কিছু মাংস নিয়ে এসো। বন্ধুকে আজ এইখানে খাইয়ে দাও।

শেখর বললে, ঠিক বলেছ। তবে একটা প্রশংসার কথা শোনো। মেয়েটা রাঁধে ভাল।

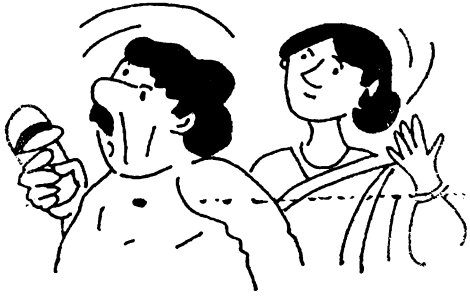

একদা নিশীথ কালে

মনোজ বসু

টং—

দেওয়ালঘড়িতে সাড়ে নটা। এখনও অন্তত আড়াই ঘণ্টা। ঘণ্টা-আড়াই পরে বাবার আলো নিববে, নীলাদ্রির হাতের পেনাল-কোড বইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠবে তাকের উপর। তারপর আঁধারে আঁধারে বাবার বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পা টিপে টিপে...। কিন্তু থাক এখন সে-সব, সে তো বারোটার আগে কোনক্রমেই নয়—পৃথিবী লয় হয়ে গেলেও নয়।

রোয়াকের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কুয়াশামগ্ন ম্লান জ্যোৎস্না। নীলাদ্রি বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড় অবধি বার-দুই পায়চারি করল। লোক চলাচল নেই। আর আশ্চর্য, এ কি অভাবিত কাণ্ড—বাবার উপরের ঘরে আলো তো জ্বলছে না! ব্যাপারটা কি তা হলে? রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে অশোক-কাকাদের বাড়ির গান ও খোলের আওয়াজ আসছে। সংকীর্তন এখনও উত্তাল বেগে চলেছে। মা গেছেন, ইদানীং প্রায় রোজই গিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নামামৃত পান করে আসো কিন্তু বাড়ির মধ্যে বয়স যাঁর সবচেয়ে বেশি, ভগবৎ-পদে অচলা মতি থাকা একান্তভাবে যাঁর আবশ্যক, তিনি কিছুতেই এক-পা নড়বেন না, গান শুনলে তাঁর মাথা ধরে—তা সে যে গানই হোক। বরদা তাই ঘরে বসে এই সময়টা মক্কেলের কাগজ-পত্র দেখেন। কিন্তু আজ যে হল কি? অশোককাকা সন্ধ্যার সময় একবার এসেছিলেন, তিনিই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এই অঘটন ঘটালেন নাকি? বলা যায় না, সংসারে তো কত আশ্চর্য ব্যাপারই নিয়ত ঘটছে।

অতএব নীলাদ্রি নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। তাই-ই বটে। বাবার ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো।...আচ্ছা, হঠাৎ যদি দরজা খুলে যায়—এবং ছ-ফুট সুদীর্ঘ সেই দেহছায়া চোখের সামনে উদয় হয়—

নীলে।

আজ্ঞে বই আনতে যাচ্ছি।

তা বুঝেছি। বইয়ের পাখনা বেরিয়েছে—যখন-তখন উপরে উড়ে আসে। বলি এগজামিনের তারিখটা মনে আছে তো? গেল-একজামিনে নিজের পাখা বেরিয়েছিল, হস্টেল খুঁজে শ্রীমানের পাত্তা মেলে না। হস্টেল ছাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম তো এবার বই উড়তে আরম্ভ করেছে।

বাদাম গাছের ফাঁক দিয়ে দরদালানে টুকরো টুকরো অনেক জ্যোৎস্না পড়ছে। এই জ্যোৎস্নারাত্রে লোকে পেনাল-কোড মুখস্থ করে কাটায়! গভীর নিশ্বাস ফেলে নীলাদ্রি শোবার ঘরে ঢুকল। সেখানে আরও মহা মারাত্মক ব্যাপার...দেখ, দেখ, জ্যোৎস্না-রাত্রে কোনো কোনো

লোক নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাটায়!

উমা ঘুমুচ্ছে। নীলাদ্রির পড়া শেষ না হওয়া অবধি শাশুড়ি এই ঘরে বউ আগলে থাকেন, আজ তিনি নেই, কেউ নেই—চারিদিকে চুপচাপ,—পাতলা সবুজ লেপ মুড়ি দিয়ে চোখের দু-জোড়া পাপড়ি মুদ্রিত করে উমারানি ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ভান নয়—সত্যিকারের ঘুম! শিয়রে খানিকটা দূরে একটা অনুজ্জ্বল দীপ। নীলাদ্রি ফিসফিস করে ডাকল, উমা—উমারানি!

ঘুম পেলে উমা আর এক মানুষ। সে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটা টেনে আরও আঁটসাঁট হয়ে শুল। হাতের সোনার চুড়ি ঝিনমিন করে বেজে উঠল। নীলাদ্রি একটানে লেপ সরিয়ে মুখের কাপড় টেনে ফেলতেই—

কে? কে? কে রে?

এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই অন্ধকার ঘর থেকে এল, কি হয়েছে বউমা?

সর্বনাশ, স্বয়ং বরদাকান্ত। বরদা ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতে লাগলেন, আমি আসছি। কোন ভয় নেই বউমা, আমি আসছি।...দুত্তোর, আমার খড়ম গেল কোথায়?

উমা উঠে বসল। ঘুম উড়ে গেছে। পাংশুমুখে নীলাদ্রি পালাবার পথ খোঁজে। পথ একটি মাত্র, দালানের ভিতর দিয়ে। সেই পথেই খট-খট করে খড়ম দ্রুতবেগে আসছে। নীলাদ্রি ব্যাকুল হয়ে বলল, উমা বল যে স্বপ্ন দেখছিলে—কিছু নয়। ঐ এসে পড়লেন যে। শিগগির বল যে একটা বেড়াল—এখানে ওঁর আসতে হবে না—

উমা বলত গেল, কিন্তু গলা কাঠ হয়ে গেছে, শব্দ বেরোয় না। চৌকাঠের কাছাকাছি খড়মের আওয়াজ প্রত্যাসন্ন। বিছানার ওধারে পড়ে আছে পাশবালিশ—এক মুহূর্ত মাত্র—নীলাদ্রি চক্ষের পলকে সেই বালিশের পাশে গুটিসুটি হয়ে পড়ল, গায়ের উপর আগাগোড়া লেপ চাপিয়ে দিল।

বরদা ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

উমা ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। আর, শ্বশুরের সামনে তার একটুও ভয় করে না। বলল, স্বপ্নে দেখলাম, চোর এসেছে—

বরদা রাগে ফেটে পড়লেন।

সব দোষ তোমার শাশুড়ির। এখনও তিনি কীর্তন শুনছেন, পুণ্যির বস্তা বয়ে আনবেন। ঘরে এক ফোঁটা বউ, একলাটি...দরজা খোলা—চোর তো আসবেই—

মৃদু হেসে উমা বলল, সত্যি সত্যি আসে নি বাবা। স্বপ্ন দেখলাম। তার পর জেগে উঠে দেখি, চোর নয়—বেড়াল।

কিন্তু বরদার রাগ পড়ে না। বললেন, আসেনি, আসতে পারত। গিন্নির আক্কেলটা কি, বল দেখি।

উমা বলল, এবারে দরজা দিয়ে শোব। মা ফিরে এলে তখন খুলে দেব। আমার ভয় করবে না—আপনি যান বাবা। ঘুমুচ্ছিলেন—মিছিমিছি জাগিয়ে দিলাম।

কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয়?

দেয়ালের ধারে একটা জলচৌকি ছিল; সেটা টেনে নিয়ে বরদা বেশ এঁটেসেটে বসলেন।

বলতে লাগলেন, ঘুম না হাতি। শরীরটা খারাপ লাগছিল, তাই আলো নিবিয়ে একটু চোখ বুজেছি—সাক্ষীর জবানবন্দিগুলো অমনি কিলবিল করে যেন মাথার মধ্যে হাঁটতে শুরু করল।

আজকের শেষ-কাছারিতে যে মামলাটা হল, যাচ্ছে-তাই ব্যাপার। বস—চুরুট নিয়ে আসি, তার পরে বসে গল্প করব।

বরদা বেরিয়ে যেতে নীলাদ্রি এক টানে লেপ ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, তোমার দোষ!

বিস্ময়ে চোখ বড় করে উমা বলল, আমার?

এক-শ বার। তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

উমা বলল, বা রে! আমি কি জানি যে তুমি? আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম।

অধীর কণ্ঠে নীলাদ্রি বলল, কেন ঘুমোও? সে-ই তো দোষ।

আর নিজে চোরের মতো এসে মুখের কাপড় টানবেন, সে কিছু দোষ হয় না।

দোষই বটে, উমারানি। নীলাদ্রির স্বর ভারি হয়ে উঠল, তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, এই তার শাস্তি হচ্ছে।

রাগে রাগে সে ঘর থেকে বেরুল। আবার তখনই ফিরে আসতে হল। উপায় নেই, পালাবার পথ নেই। এবারে বরদার ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, সামনের দিকে মুখ করে তিনি মোজা পরছেন। এমন সময় মাছি উড়ে গেলেও তাঁর নজর এড়ায় না।

নিশ্বাস ফেলে করুণ কণ্ঠে নীলাদ্রি বলতে লাগল, তোমার কোনো ক্ষতি হত না উমা। আমি শুধু একটা বার শুধু চোখের দেখা দেখে চলে যেতাম। বাবাকে ডেকে এ দুর্ভোগ কেন ঘটালে?

কিন্তু উমারানির অনুতাপ নেই। বরঞ্চ মনে হয়, অবস্থাটা সে উপভোগ করছে, যেন সে টিপিটিপি হাসছে। ঘাড় নেড়ে অপরূপ ভঙ্গিমা করে বলল, ঘুমুই, আর মরে থাকি—চোরের দেখা দেখতে কিসে আটকায় শুনি? দুর্ভোগ তো ভারি! নিজে লেপের তলে দিব্যি আরাম করে আছেন, আমি এদিকে শীতে হি-হি করে মরি—

নীলাদ্রি বলল, এ বাড়িতে আর লেপ নেই কিনা—লেপ মুড়ি দিতে তাই এ ঘরে এসেছি!

অধিক বলবার অবকাশ হল না, ঝনাৎ করে ওদিকে শিকল পড়ল। অর্থাৎ ভাল রকম প্রস্তুত হয়ে দরজা দিয়ে বরদা গল্প করতে আসছেন।

কাতর অনুনয়ের দৃষ্টিতে নীলাদ্রি বলল, সংক্ষেপে সেরো, দোহাই তোমার। নইলে লেপ চাপা পড়ে দম আটকে ওর নীচে ঠিক মরে থাকব।

বরদা এসে কৈফিয়তের ভাবে বললেন, চুরুট পেলাম, কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর শীত-শীত করতে লাগল, তাই জামা-টামা এঁটে এলাম। একটু দেরি হয়ে গেছে, ভয় করছিল না তো?

উমা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলল, নাঃ—ভয় কিসের? আপনি শুয়ে পড়ুন গে বাবা, আমার ভয় করবে না।

বরদা কথা কানে তুললেন না, নিশ্চিন্তে চৌকির উপর বসলেন। উমা গুটিগুটি হয়ে খাটে বসেছে। বরদা বললেন, হ্যাঁ মা, লেপটা গায়ে তুলে বোসো। পাশ বালিশের উপর চাপিয়ে রেখেছ কেন?

উমা বলল, বড্ড গরম।

বল কি? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমার শীত যাচ্ছে না—আর তোমার গরম? তার পর তাকিয়ে লক্ষ্য করে বললেন, উঁহু, ঐ যে কাঁপছ। শীত লাগছে, বুঝতে পারছ না।

বরদা উঠবার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই তড়িৎবেগে উমা এসে তাঁর কাছে মেঝের উপর বসে পড়ল। যে ব্যস্তবাগীশ মানুষ—কিন্তু বিশ্বাস নেই—হয়তো নিজেই লেপ তুলতে যাবেন। উমা বলল, শীত নয় বাবা, ভয় ভয় করছে—তারই কাঁপুনি। চোখ বুজলেই দেখছি, সেই বেড়াল—বাঘের মতো বড় বড় চোখ। আমি আর শোব না, আপনার সঙ্গে বসে গল্প করব।...আচ্ছা, আজকে কাছারিতে কি মামলা করে এলেন, সে তো বললেন না কিছু!

এ কৌশল, কেবল উমা নয়, বাড়ির ছোট ছেলেটা অবধি জানে। মামলার গল্প বরদাকান্তকে একবার ধরিয়ে দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। বরদা আরম্ভ করলেন, সে কি বলবার মতো কিছু! বাজে একটা চুরির কেস—আমি একরকম উপযাচক হয়ে বিনি পয়সায় আসামীর তরফে দাঁড়ালাম। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আইনে যা-ই থাক—আমি বলব, এ কিছুতে অন্যায় নয়। রসগোল্লার হাঁড়ি ছিল কাচের আলমারিতে, দোকানে কেউ ছিল না—লোকটা তিন দিন খেতে পায়নি, কাচ ভেঙে একটি মিষ্টি গালে দিতে যাচ্ছে, অমনি তাকে ধরে পুলিস চালান দিল।

উমা বলল, যাই হোক, চুরি তো বটে!

বরদা বলতে লাগলেন, হোক চুরি। পেটে আগুন জ্বলছে, সামনে খাবার সাজানো। বলি, মুনি-ঋষি তো কেউ নয়। আমি তাই হাকিমকে বললাম, আমি হলে—

উমা প্রশ্ন করল, আপনি হলে কি করতেন বাবা?

বরদা বললেন, আমি হলে পুলিস না ডেকে রসগোল্লার হাঁড়ি তার হাতে তুলে দিতাম। আহা বেচারা, যত খুশি খেয়ে নিক। দোকানদার বেটাদের দয়ামায়া নেই।

উমা মৃদু হেসে বলল, আপনার মতো হত যদি সবাই!

লেপের নীচে অনন্তশয্যা থেকে নীলাদ্রির ইচ্ছা করতে লাগল বেরিয়ে এসে উমার মুখ চেপে ধরে এবং বাবার মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে, আজ্ঞে না, আপনিও কম নন। আপনি হলে চোরকে জগদ্দল-পাথর চাপা দিয়ে দিতেন।

গল্পে বাধা পড়ে গেল। সৌদামিনী এলেন। পিছনে চাকরের হাতে হেরিকেন।

বরদা এসে বললেন, ও গিন্নি, পুণ্যির বোঝা বয়ে আনতে পারলে? না—হারানচন্দোর আছে বুঝি সঙ্গে! গান শেষ হয়েছে?

সৌদামিনী বললেন, কেন, আমার জন্যে কি কাজ আটকে আছে শুনি?

কি কাজ? উমাকে দেখিয়ে বরদা বলতে লাগলেন, এই যে বউমা, পরের বাড়ির এক ফোঁটা মেয়ে, একা-একা পড়ে আছে—কে পাহারা দেয়!

সৌদামিনী হাসিমুখে একবার উমার দিকে চাইলেন। বরদার কাছে এসে নীচু গলায় বললেন, তোমার ব্যবস্থা ভাল। বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, পাহারা দেবে পাড়ার লোকে!

বরদা ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললেন, ছেলের বয়ে গেছে! তার বলে এগজামিন...কত পড়াশুনো। সে আমার ছেলে...অকর্মা আড্ডাবাজ তো নয়।

সৌদামিনী হেসে ফেললেন।

ছেলে না পারে, বাপ তো পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ! তুমি এখন যাও দিকি। নীলুর উপরে আসবার এখনও দেরি আছে, ততক্ষণ আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই।

বরদা চলে গেলে বিছানার দিকে সৌদামিনীর নজর পড়ল। আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কি

বউমা, এ ঠিক হারানের কাণ্ড। দিগ্‌গজ এক বালিশ এনে ঘাট জুড়ে রেখেছে—শুবি কোথায়?

উমা তাড়াতাড়ি বলল, শুয়েই তো ছিলাম। পাশ-বালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস। কিছু অসুবিধে হবে না—

সৌদামিনী শুনলেন না।

না, হবে না বই কি! আর একটা ছোট বালিশ দেব এখন...দাঁড়া, এটা আলমারির মাথায় তুলে দিই—

বলতে বলতে দেখা গেল, পাশ-বালিশ স্বয়ংই উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন, নীলু!

নীলাদ্রির চোখে জল আসবার মতো। কিন্তু সে-জল একমুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল, সে বজ্রাহতের মতো দাঁড়াল। হায় রে, বিপদের কি শেষ নেই! রবদা চুরুটের কৌটো ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা নিতে মন্থর পায়ে আবার এসে ঢুকলেন। ছেলেকে দেখে দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে এল। বললেন, এরই মধ্যে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিয়ে এলে? ক'টা বেজেছে?

নীলাদ্রি জড়িত কণ্ঠে বলল, বারোটা—

কক্ষনো নয়। এগারোটা সাত—তার সিকি মিনিট বেশি নয়। পড়তে গেলেই ঘড়ি তোমার ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে। যাও—নীচে যাও।

সৌদামিনী বাধা দিয়ে উঠলেন, না, নীচে নয়। নীচে বড্ড মশা, শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক! পড়তে হয়, এখানে বসেই পড়ুক।

বরদা বললেন, কোথায় মশা? ছেলেকে ননীর পুতুল করতে চাও যে। আমরা কাজকর্ম নিয়ে থাকি,—মশা-টশা তো দেখি নে—

মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক তাকিয়ে নীলাদ্রি বলল, রাতেই উপদ্রবটা বেশি হয় কি না!

বরদা বললেন, তাহলে আমার ঘরে বসে পড়গে। বারোটা বাজতে এখনও বাহান্ন তিপান্ন মিনিট। চিটিঙের চ্যাপ্টার আজ শেষ করতেই হবে। কোনখানে আটকে গেলে আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। তোমার সুবিধেই হবে—কি বল?

বরদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। নীলাদ্রি মাথা নেড়ে কাতর কণ্ঠে সায় দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌদামিনী রুখে উঠলেন, আমার হবে না। ও আলো জ্বেলে বসে বসে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না।

বরদা বললেন, তুমি এখানে ঘুমোও। পড়া হয়ে গেলে তারপর যেও। রোজই হচ্ছে, আজ নতুন মানুষ হয়ে গেলে নাকি?

সৌদামিনী জেদ ধরে বসলেন, রোজ হচ্ছে বলেই আজ হবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়ছে। আবার যে একঘুমের পর ছুটোছুটি করব, সে পেরে উঠব না। তাতে তোমার ছেলের পড়া হোক আর না-ই হোক—

মুশকিল! কি করা যায়? বরদা চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তা বউমাকেও নিয়ে চল। নীলে এখানে পড়ুক। বারোটা বাজলে তার পর উনি আসবেন।

সৌদামিনীর তাতেও আপত্তি। না, বউমা যাবে না। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা রয়েছে,

বউমা গেলে হবে না।

অতঃপর বরদার আর ধৈর্য থাকল না। রাগ করে বললেন, হবে না তো কি হবে? পরের মেয়েকে সত্যি সত্যি তো একটা ঘরে ফেলে রাখা যায় না।

সৌদামিনী প্রস্তাব করলেন, নীলুকে বল, সে যদি—

সে কি করে হবে? ওর এগজামিন। বলতে বলতে সৌদামিনীর 'পরে একটু করুণাও হল। অবোধ মেয়েলোক—বোঝে না, এগজামিন কি এবং পেনালকোড কি বস্তু! ঘাড় নেড়ে বরদা বললেন, সে আমি কিছুতে পারব না। এগজামিন সামনে, ওকে আমি বলব কোন্ হিসাবে? একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে তো!

অনুচ্চ তরল কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, আছে নাকি? যাক, দুর্ভাবনা ঘুচল। তিনিই এখন ছেলেকে ডেকে বললেন, নীলু বাবা, তুই আজকের রাতটা এখানে বসে পড়্। বউমা একটা কথাও বলবে না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবে। অসুবিধে হবে?

ছেলে খুব মাতৃভক্ত বলতে হবে। ঘাড় নেড়ে সে তখনই রাজী। বরদা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝেসুজে ঠিক করে বলছ?

নীলাদ্রি বলল, আজ্ঞে, কোন অসুবিধা হবে না।

হবে না, কি করে বল? এখন নেই, পরেও তো হতে পারে! তুমি কি দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছ?

বরদার ধারণা, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পরছে না।

যেতে যেতে আবার মুখ ফিরিয়ে উপদেশ দিলেন, চেঁচিয়ে পড়লে খুব মনঃসংযোগ হয়। আমি ও-ঘর থেকে শুনব। চিটিং আজ রপ্ত করে ফেলতেই হবে। কাল আমি জিজ্ঞাসা করব।

ওঁরা চলে যেতেই নীলাদ্রি দরজায় খিল এঁটে বাঁচল। উমা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজেছে।

উমারানি।

উঁ—

নীলাদ্রি বিছানার ধারে বসে অনুনয় আরম্ভ করল, লক্ষ্মীটি, চোখ মেল। দেখ, কি চমৎকার রাত! একটি বার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—

উমাও বলল, চমৎকার!

কি?

আজকের রাত।

তোমার মুখ তো এদিকে। এদিকের দরজা-জানালা বন্ধ।

উমা চোখ মেলে স্বামীর একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, রাত্তির বেলা বন্ধ ঘরই তো খাসা।

ঘুমোবার মজা হয়—না?

উমা বলল, আচ্ছা, ঘুমের পরে তোমার অত রাগ কেন বল তো? নিজের ঘুমোবার জো নেই—বই মুখস্থ করতে হয়—অন্যের ঘুম তাই দেখতে পার না।

নীলাদ্রি গম্ভীর হয়ে বলল, এমন রাত্রে ঘুমোনো অপরাধ।

চপলকণ্ঠে উমা বলল, তোমার পেনাল-কোডে এ-সব লেখা রয়েছে বুঝি!

হ্যাঁ, এবং ঘুমোলে কি শাস্তি, তা-ও রয়েছে। শুনবে?

উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, রক্ষে কর মশাই। এখন নয়—কাল। বাবা যখন পড়া জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁকে শুনিয়ে দিও।

দরজায় করাঘাত। বাইরে থেকে বরদা ডাকছেন, নীলে, নীলে—

প্রদীপ উস্কে নীলাদ্রি তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে যা মনে এল চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল।

সর্বনাশ, গোলমালের মধ্যে পেনাল-কোড উপরে আনাই হয়নি—আইনের কোন বই-ই নেই—খুঁজতে খুঁজতে কুলঙ্গির কোণে মিলল, মায়ের আধ ছেঁড়া মহাভারতখানা। সেটা সামনে নিয়ে সে প্রাণপণ চিৎকারে আইনের ধারা মুখস্থ করে চলল।

আরও বিস্তর ডাকাডাকির পর মনোযোগী ছাত্র দরজা খুলে দিল। বরদার প্রসন্ন মুখ, ছেলের পাঠ-অভ্যাস বাইরে থেকে কিছু কিছু তাঁর কানে গিয়েছে নিশ্চয়। তিনি সোজা উমার খাটের কাছে গিয়ে ডাকলেন—অ বউমা, বউমা, ঘুমুচ্ছ তো? দেখতে এলাম।

ঘুমন্ত লোকে কথা বলে না, অতএব উমার জবাব পাওয়া গেল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বরদা ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে তাই মনে হল, মা-লক্ষ্মীর ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে কি না দেখে আসি।

নীলাদ্রি বলল, তবে মনে মনেই পড়ি—

বরদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন, না না, তাতে কাজ নেই—আগাগোড়া মুখস্থের ব্যাপার, ও কি মনে মনে পড়ার কাজ? বিশেষ, যখন কোন রকম অসুবিধে হচ্ছে না...কিন্তু সাবধান, সাবধান! পরের মেয়ে এসেছে, গিয়ে নিন্দেমন্দ না করে। ঘুমের ব্যাঘাত না হয়, সেটা দেখবে।

নীলাদ্রি বলল, তা দেখছি বই কি। ঐ তো—অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে।

তোমার যা কাণ্ডজ্ঞান, তোমার উপর আমি ভরসা করি কি না! আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব।

মনের বিরক্তি গোপন করে সহজ সুরে নীলাদ্রি বলল, শীতের দিনে বার বার কষ্ট করে আসবার দরকার কি বাবা?

বাপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

কষ্ট হয়, আমার হবে। তোমার তাতে ক্ষতিটা কি শুনি? পরের মেয়ে এসেছে, আমার নিজের মেয়ে নেই—তাকে একটু যত্নআত্তি করব, তাতে তোমার হিংসে হয় বুঝি?

তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে নীলাদ্রি বলল, বারবার দুয়োর খোলা—পড়ায় মনঃসংযোগের একটু ইয়ে হয় কি না—

এতক্ষণে বরদার নজরে পড়ল, দালানের দিককার জানালাগুলো বন্ধ। বললেন, সমস্ত এঁটে অন্ধকূপ করে রেখেছ। তাই ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি নে। তোমায় বার বার দুয়ার খুলতে হবে না বাপু, জানালা খুলে রাখ—আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাব।

উমা নির্বিকার নিরীহ মানুষটির মতো পড়ে আছে। এবং সে যে ঘুমোয়নি, কোন দিক থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। নীলাদ্রির কিন্তু তাকিয়ে কেমন সন্দেহ হল, চাপা হাসির প্রবাহে ওষ্ঠ তার একটু নড়ছে এবং চোখ দুটো মিটমিট করছে। অথচ এর প্রতিকার নেই। সূচ পড়বার শব্দও

খোলা জানলার পথে বাবার শব্দভেদী কানে গিয়ে পৌঁছবে, যে-কোন মুহূর্তে জানালায় উদয় হয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন চিটিং শেষ হল?

নীচের ঘর থেকে সে পেনাল-কোডখানা নিয়ে এল। উমার শিয়রের দিকে খানিকটা দূরে টেবিল টেনে আনল। তারপর যথা সম্ভব উমার কর্ণবিবর লক্ষ্য করে আকাশভেদী কণ্ঠে পড়া শুরু করল। ঘুমের ঘোরে উমা পাশ ফিরল, পড়া আরও তীব্র হল; ঘুমের ঘোরেই বোধ করি সুগৌর হাতখানা কানের উপর চাপা দিয়ে এসে পড়ল, বিপুলতর উৎসাহে নীলাদ্রি আরও গলা চড়িয়ে দিল।

জানালার ওদিকে এসে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, নীলু, কি আরম্ভ করেছিস? বাড়িসুদ্ধ কাউকে ঘুমোতে দিবি নে?

নীলাদ্রি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, বাবা যে বললেন?

ওঁর কি, একটা কিছু বললেই হল! মা-লক্ষ্মীর জন্য এদিকে দরদ উথলে ওঠে। আরে, এ পড়ায় যে মরামানুষ ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে।

বরদাও সঙ্গে এসেছিলেন। বিরক্ত ভাবে তিনি বললেন, এগজামিন সামনে, সেটা দেখতে হবে তো?...তা নীলে, বরঞ্চ যতটা পড়েছ, এখন মনে মনেই আবৃত্তি কর। চিটিং-এর কত দূর?

নীলাদ্রি বলল আজ্ঞে, রপ্ত হয়ে গেছে।

সৌদামিনী বলল, আবার জানালা খুলে দিয়েছিস কেন রে নীলে? চোখে আলো গিয়ে লাগছে, ঘুম হচ্ছে না।

নীলাদ্রি বলল, বাবা যে বললেন—

বরদা সদয় হয়ে বলেন, তা নীলে, এখন বরং জানালা বন্ধ করেই পড়। তোমার মার ঘুম হচ্ছে না—শরীরটে আজ ভাল নেই।

সশব্দে জানালা বন্ধ হতেই বরদা মনের আনন্দ আর গোপন রাখতে পারলেন না। হেসে হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের কি রকম পড়াশুনোয় চাড় হয়েছে। বারোটা কখন বেজে গেছে, পড়তে পড়তে তা হুঁশই নেই। আমি আবার ওদিকে চুরি করে ঘড়ির কাঁটা পনের মিনিট পেছিয়ে রেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাশ হয়ে যাবে— ❦

"ন-ন-লৌ-ব-লিঃ"

প্রমথনাথ বিশী

স্বর্গের নন্দন বনে পারিজাত বৃক্ষতলে আজ বড় ভিড়। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকল বয়সের দেবতা সমবেত হইয়াছে; শুনিয়াছিলাম স্বর্গে কেহ বৃদ্ধ হয় না; বুঝিলাম স্বর্গ সম্বন্ধে যে সব গুজব শোনা যায়, তার সবগুলি সত্য নয়। কিসের জন্য এ জনতা? দেবতারা কি পারিজাত পুষ্প চয়নের জন্য আসিয়াছেন? না স্বর্গীয় মধুচক্র ভাঙিবার জন্য কোন দুরন্ত দেবশিশু বৃক্ষে উঠিয়াছে সকলে তাহাকে দেখিতেছে? কিংবা ওসব কিছুই নহে, পারিজাতের ডালে একখণ্ড কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। সেই বিজ্ঞাপন পড়িবার জন্য এই ভীষণ দৈব জনতা।

তবে কি স্বর্গেও বেকার সমস্যা দেখা দিল না কি? অসম্ভব নয়। স্বর্গের সনাতন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটি বাড়িয়ে তেতাল্লিশ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে, তারপরে মন্দাকিনীতে তো বন্যা লাগিয়াই আছে। বিশেষ দেবদৈত্যের সেই মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বর্গের পরমার্থিক অবস্থা (স্বর্গের অর্থকে পরামার্থ বলে) দিন দিন খারাপ হইয়া চলিয়াছে, স্বর্গের অবস্থা বড় শোচনীয়।

বিজ্ঞাপনখানার কাছে যাইবার জন্য বড়ই ঠেলাঠেলি পড়িয়া গিয়াছে, ব্যবহারের বেলায় দেখিলাম দেবতারা মানুষেরই মতোই হুড়াহুড়িতে কাহারো উত্তরীয় ছিঁড়িল, কাহারো চুল ছিঁড়িল, এক ব্যক্তি মরিবার সময় নেকটাইয়ের মায়া ত্যাগ করিতে পারে নাই। 'নেকটাই' ধরিয়া অন্য সকলে তাহাকে সরাইয়া দিল, একজন বৃদ্ধের ট্যাক হইতে অমৃতের ডিবা খোয়া গিয়াছে বলিয়া সে বড়ই হৈ চৈ করিতে লাগিল সবশুদ্ধ মিলিয়া সিনেমায় চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট করিবার দৃশ্য। মুদ্রিত বিজ্ঞাপন খণ্ড সমীরণে মৃদু মন্দ দুলিতেছে, সেখানা এই রকমের :—

আবশ্যক-ন—ন—লৌ—ব—লিঃ-এর জন্য তিনজন সাধু, সচ্চরিত্র পরিশ্রমী কর্মী চাই। সত্বর হাতে লিখিয়া সার্টিফিকেটের নকল সহ কত বয়স, কোন জেলায় বাড়ি, পূর্বের অভিজ্ঞতাসহ দরখাস্ত করুন। মাসিক বেতন গুণানুসারে।

বিঃ দ্রঃ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে, কোনরূপ ব্যক্তিগত ক্যানভাস চলিবে না।

অস্পষ্ট স্বাক্ষর—ন—ন—লৌ—ব—লিঃ প্রধান কর্মসচিব।

বিজ্ঞাপনখানা একটু বিস্তারিতভাবে জ্ঞাপন করা উচিত। ন—ন—লৌ—ব—লিঃ আর কিছুই নহে নন্দন নরক লৌহবর্ত্ম লিমিটেডের সংক্ষিপ্ত রূপ। সকলেই জানেন, যে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে দূরত্ব অনেক, যাতায়াতের পথ-ঘাট ভাল নয়। কিছুকাল হইল ডেমোক্রেসির প্রভাবে এই দুই স্থানের মধ্যে যোগ করিবার আন্দোলন চলিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ হাজার জোড়া কিন্তু কান মাত্র দুটি। তিনি কোন আবেদন নিবেদন কানেই তোলেন না, দেবগণ আবার কোমর কসিয়া

লাগিয়া গেল। ফলে স্বর্গের অমৃতের দোকানে পিকেটিং হইল, উর্বশী মেনকা প্রভৃতি মহিলাগণ সভাগৃহে চেয়ার টেবিল ভাঙিতে আরম্ভ করিলেন, স্বর্গের কয়েকটি শিশু দেবতা ঢিল ছুড়িয়া স্বয়ং ইন্দ্রের খাস কামরার কাঁচ ভাঙিয়া দিল। আর সকলকে ছাপাইয়া স্বর্গের বিখ্যাত কবি (ইনি দেবাসুরের যুদ্ধে ট্রেঞ্চ খনন করিয়াছিলেন) নানা ভাষায় খিঁচুড়ি করিয়া এমনি সিংহনাদ করিলেন যে সপারিষদ ইন্দ্রের টনক নড়িল। নন্দন নরকের মধ্যে লৌহবর্ত্ম স্থাপিত হইল।

নন্দন নরকের যোগস্থাপনের পর হইতে স্বর্গের দ্বারপালের কাজ বাড়িয়া গেল। অনেক অবাঞ্ছিত লোক নরক হইতে আসিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল, স্বর্গে চুরি, খুন, গ্রন্থিচ্ছেদ, নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দৈনিকের সম্পাদক মহাশয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিলেন। ফলে কয়েকজন অতিরিক্ত দৌবারিক নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাহারা ঘুষের বশ, সমস্যা যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। তখন ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-এর কর্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন এমন সব ব্যক্তিকে দ্বারয়ান করিতে হইবে যাহারা ঘুষের বশবর্তী নয়, অর্থাৎ সাধু, সচ্চরিত্র, কর্মঠ পরিশ্রমী...ইত্যাদি এইরূপ কয়েকজন লোক চাহিয়া ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।

স্বর্গের ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, প্রাচীর গাত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী পরিল, সম্ভব-অসম্ভব সহাবস্থানে বিজ্ঞাপন দেখা গেল। যেন এক রাত্রের মধ্যে স্বর্গীয় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া চর্মরোগ দেখা দিল। ইন্দ্রের রথে ঐরাবতের পিঠে, উচ্চৈঃশ্রবার কণ্ঠে, নারদের ঢেঁকিতে সর্বত্র কর্মখালির বিজ্ঞাপন। স্বর্গে বড় হৈ চৈ লাগিয়া গেল।

ন-ন-লৌ-ব-লিঃ হেড অফিসে রাশি রাশি দরখাস্ত আসিতে লাগিল, যে কয়জন কর্মচারী ছিল তাহারা আর পারিয়া ওঠে না। শেষে এই দরখাস্তের জন্য একটি নতুন বিভাগ খোলা হইল এবং কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানার দুই জন সুদক্ষ কেরানীকে বিনা নোটিশে ট্রাম চাপা দিয়া "রিকুইজিশন" করা হইল। যথা নির্দিষ্ট সময় অন্তে দরখাস্ত বিবেচনা করিবার জন্য কমিটি বসিল। তিন জন কর্মচারীর জন্য এক লক্ষ দরখাস্ত পড়িয়াছে। স্বর্গের বেকার সমস্যা বাংলাদেশের অপেক্ষাও তীব্রতর।

'সিলেকশান' কমিটি সাতদিন অধিবেশন করিয়া বারখানা দরখাস্ত বাছিয়া বাহির করিল। বারজনই প্রসিদ্ধ লোক, পৃথিবীতে এককালে তাহাদের সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া খ্যাতি ছিল।

কে সেই সৌভাগ্যবান দ্বাদশ জন? পাঠক শ্রবণ করুন সক্রেটিস, সিজার, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, লর্ড কিচেনার, যুধিষ্ঠির, জোয়ান অফ আর্ক, আব্রাহাম, নেবুকার্ডনেজার, হাউপ্টম্যান ও মার্টিন লুথার। এই বারজনকে লইয়া কর্তৃপক্ষের মহা মুস্কিল হইল, কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখেন। প্রশংসা পত্রে কেহ কম যায় না, প্রশংসা পত্র পড়িয়া লিণ্ডবার্গের পুত্রহন্তা হাউপ্টম্যানকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বলিয়া মনে হয়। শেষে কর্তৃপক্ষ ঠিক করিলেন যে তিন জন সর্বাপেক্ষা নিম্নতম বেতনে কাজ করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগকে লওয়া হইবে। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির নিম্নতম বেতনে রাজী হইল—অন্য সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

ইহাদের প্রশংসা পত্রের জোর বড় অল্প নয়। যুধিষ্ঠির ভীষ্ম হইতে ভাণ্ডারকর পর্যন্ত অনেকের সার্টিফিকেট ভরিয়া দিয়াছে। সে মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে, কেবল 'ইতি গজের' ইতিহাসটি চাপিয়া গিয়াছে। স্বর্গে গিয়াছে। স্বর্গে গিয়া যুধিষ্ঠিরের কিছু বুদ্ধি হইয়াছে মনে নয়, ভীষ্ম লিখিয়াছে বেচারী সারা জীবন কষ্ট পাইয়াছে, এখন একটি

চাকরি পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

বুদ্ধ ত্রিপিটক হইতে নিজের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। অশোক, বিম্বিসার, রীজ ডেভিড প্রভৃতি মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, এমনটি আর পাইবে না।

যীশুখ্রীষ্টের প্রশংসাপত্রই সব চেয়ে চমকপ্রদ। কারণবিদ্যায় ইউরোপীয়েরা শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং পণ্টিয়াস পাইলটে লিখিয়াছে আমি ভুল করিয়া লোকটাকে বিচার ছলে খুন করিয়াছি সেজন্য এখন অনুতপ্ত। বার্ণাড শ বলিয়াছে—যীশুই প্রথম সোস্যালিস্ট, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। চেষ্টারটন লিখিয়াছে যীশুই প্রথম সাম্রাজ্যবাদী, যদিও তাহা আধ্যাত্ম সাম্রাজ্য, কাজেই সে সাধু ও সচ্চরিত্র। যীশু ইহাতেও নিশ্চিত হইতে না পারিয়া একখানি পকেট সংস্করণের বাইবেল দরখাস্তের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে।

একদিন স্বর্গের অধিবাসীরা দেখিল ন—ন—লৌ—ব—লিঃ এর তিন জন নব নিযুক্ত দৌবারিক কোম্পানীর উর্দ্দি পোশাক ও টুপি পরিয়া স্টেশনের তিন দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হইল, দুর্বৃত্তগণ চিন্তিত হইল, স্বর্গের পুরুষেরা গ্রন্থি ও মেয়েরা নীবী সম্বন্ধে স্বস্তি অনুভব করিল।

সেদিন সকালে নন্দন-নরক মেল যথাসময়ে নন্দন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। যাত্রীরা পৃথিবীর অভ্যাস ভুলিতে পারে নাই। সকলের মুখেই একটা গেল গেল ভাব, যাহাদের স্বর্গে প্রবেশের টিকিট ছিল তাহারা নিজের বোঝা (পুণ্যের বোঝা) লইয়া সগৌরবে দ্বার অতিক্রম করিল। কেবল একটি লোক সন্দেহজনক ভাবে আশে পাশে ঘুরিতে লাগিল। লোকটির হাঁটুলম্বী পাঞ্জাবী, পরনে লুঙ্গি, দুই পায়ে দুই ধরনের নাগরাই জুতা, আর কানে গোঁজা অর্ধদগ্ধ একটি বিড়ি। যাত্রীরা চলিয়া গেল, ছকুখানসামা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যুধিষ্ঠির গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, টিকিট? ছকু ট্যাকে (যুধিষ্ঠিরের নয় নিজের) হাত দিয়া একটি সিকি বাহির করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে চোখ মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি দাদার রেট কত করে? যুধিষ্ঠির অবাক হইয়া বলিল রেট। টিকিট কই? ছকু ঘুষদাতাদের চির পরিচিত সেই হাসি হাসিয়া বলিল—বলি মোচড় দিয়ে কিছু বেশি নেবার চেষ্টা, আচ্ছা না হয় দু'ছিকি (সিকি) হবে? অপমানিত যুধিষ্ঠির সক্রোধে হিন্দিতে বলিল, নেই হোগা।

তখন ছকু বুদ্ধের নিকটে গিয়া পুনরায় ঐ রূপ বলিল, বুদ্ধ সব শুনিয়া বিশুদ্ধ পালি ভাষায় বলিল, "অসম্ভব"। এবার ছকু খৃষ্টের নিকটে গিয়া একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, প্রণামান্তে স্বর্গে প্রবেশের পরিবর্তে ধর্ম সম্বন্ধে নানা রূপ তর্ক আরম্ভ করিল, বেচারা যীশু স্বর্গে আসিবার পর হইতে ধর্ম আলোচনা করিবার সুযোগ পায় নাই, তর্ক করিতে করিতে সে যেমনি একটু অন্যমনস্ক হইয়াছে অমনি ছকু এক ছুটে দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে বেশি দূরে যাইতে পারিল না। যীশু তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিল, অপর হাত দিয়া ছকু দরজার রেলিং ধরিল। যীশু তাহাকে যত টানে সে কিছুতেই রেলিং ছাড়ে না। তাহার দেহের খানিকটা স্বর্গের মধ্যে খানিকটা বাইরে। যীশুর দুর্দশা দেখিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া দুই জনে তাহার দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন কি টানাটানি। ছকু একহাত দিয়া রেলিং ধরিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া আছে, আর যীশু ও যুধিষ্ঠির তাহার দুই পা ও এক হাত ধরিয়া প্রাণপণে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। বাপ্‌রে ছকুর এক হাতে কি জোর। যে হাতে মর্ত্যে থাকতে সে বহু লোকের গ্রন্থিছেদন করিয়াছে, পকেট সন্ধান করিয়াছে, সিঁধকাঠি চালনা করিয়াছে, যে হাত আজও তাহার বেহাত হয় নাই।

যীশু, বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া দরদর করিয়া ঘামিতে লাগিল। তামাসা দেখিবার জন্য একদল লোক জড় হইল, সকলেই বলিতে লাগিল, কোম্পানি এত দিনে বিশ্বস্ত লোক পাইয়াছে বটে। কিন্তু ব্যাপারটার কোন মীমাংসা হইতেছে না দেখিয়া দর্শকদের মধ্য হইতে একজন (বোধ হয় বাঙালি) বলিয়া উঠিল, কাতুকুতু দিন। ইহা শুনিয়া যীশু তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ছকুর বগলে কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করিল। অমনি কোথায় গেল ছকুর মরীয়া ভাব। কোথায় গেল ধর্মবীরকে পরাজয়কারী বাহুর বল, সে হাসিতে হাসিতে রেলিং ছাড়িয়া দিল। তখন তিন জনে মিলিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ইহাতে ছকু মোটেই রাগিল না, সে হাত দিয়া অবিন্যস্ত পাঞ্জাবী ও টেরি ঠিক করিতে করিতে কান হইতে আধ পোড়া বিড়িটা খুলিয়া যীশুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাচিস হ্যায়? যীশুর নিকটে অনুতাপের অনল ছাড়া আর কোন প্রকার আগুনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে হতাশ ভাবে সরিয়া পড়িল।

ছকু সরিয়া পড়িলে, যীশু অন্য দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই লোকটা একটা সিকির (ছিকি) কথা কি বলছিল? বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির এক সময়ে রাজার ছেলে ছিল, কাজেই সংসারের রীতিনীতি কতক কতক তাহারা জানিত—তাহারা বলিল—উহাকেই বলে ঘুষ খাওয়া। যীশুর দিব্যদৃষ্টির উদয় হইল, সে বলিল—বটে, এতদিনে আমার বিশ্বাস হইতেছে, জুডাস, বেটা আমাকে ধরাইয়া দিবার পূর্বে ঘুষ লইয়াছিল। সে দিনের মতো Duty শেষ হইল! তাহারা নিজেদের মেসে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালে পুনরায় নন্দন-নরক মেল নন্দনে আসিয়া থামিল। পুণ্যের বোঝায় পীড়িত যাত্রীরা স্বর্গে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের অন্যতম পঞ্চানন বাবাজী স্বর্গে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে খৃষ্ট তাহাকে বাধা দিল, পঞ্চানন বলিল আমাকে নিষেধ কর কেন বাপু; আমি সারা জীবন ধর্মাচরণ করিয়াছি; জীবনে এক পয়সা উপার্জন করি নাই কেবল ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি, নিজের পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছি এবং পরের পঞ্চাশ জন পত্নীকে বৈষ্ণবী করিয়াছি; ভিক্ষায় যে সাত হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহার এক পয়সাও খরচ করি নাই, কিংবা দান করি নাই, স্বার্থ ছাড়া কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। অপরে মিথ্যা কথা বলিলে রীতিমত রাগিয়াছি; জীবনে নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অভিনয় করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়া তবেই চুরি করিয়াছি, পরের ধর্ম ছাড়া কখনো নিজের ধর্মের নিন্দা করি নাই, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়াছি; গঙ্গাস্নান হইতে এখনি আসিতেছি, (বাবুজী সাঁতার দিয়া একটি নারিকেল ধরিতে গিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে) তবে কেন আমায় থামাও বাপু। খ্রীষ্ট বলিল—আপনার কথা ঠিক স্বর্গে প্রবেশ করিবার আপনার সব গুণই আছে, আপনাকে আটকাই এমন কি সাধ্য? কিন্তু হাতের কাকাতুয়াটিকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না? বাবাজী রাগিয়া উঠিল কে তুমি বেল্লিক কি নাম বট হে? খ্রীষ্ট বিনীত ভাবে উত্তর দিল, খ্রীষ্ট! বাবাজী একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, রাম ছিঃ ছিঃ কি সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড কারখানা। শেষে একটা খ্রীষ্টানকে এরা দরজায় দাঁড় করাইয়াছে? এমন জানিলে শেষে কে স্বর্গে আসিত। ইহার চেয়ে আমায় সনাতনপুর আখড়া ছিল ভাল। আমার কমলমণি সেবাদাসীদের বয়স কেমন হইয়াছিল ষোল। হায়। হায়।

বাবাজী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এবার কাকাতুয়া চিৎকার করিয়া উঠিল 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে'। বাবাজী হঠাৎ সেবাদাসীর শোক ভুলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল—দেখিলে তো বাপু আমার কাকাতুয়াটি কেমন আধ্যাত্মিক পাখি। তারপর গলার স্বর একটু নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল

উর্বশীকে দেখিতে কেমন? বলি বয়স কত? খ্রীষ্ট সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, আপনি পাখিকে আধ্যাত্মিক বলিলেন বটে, কিন্তু পশু পাখির তো আত্মা নেই। মানুষের আত্মা পুণ্যের বলে স্বর্গে আসে, কিন্তু পশুপাখির আত্মা না থাকায় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া?

গোলমাল শুনিয়া বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবাজী সকলের পরিচয় লইল। তখন চার জনে মহা বিতর্ক বাধিল, মনুষ্যেতর প্রাণীর আত্মা আছে কিনা?

বাবাজী যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম এই—মানুষের আত্মা যদি থাকে, অসভ্য ও বর্বর কোল ভীল, সাঁওতালদের আত্মা আছে কিনা? তা যদি থাকে, তাদের নিম্নে যারা আছে বানর, শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বনমানুষ তাদের আত্মা আছে কিনা? আর যদি বানর জাতির আত্মা না থাকে তবে তাদের উপরে অবস্থিত অসভ্য ও বর্বরদের কেন থাকিবে? (বাবাজী ডারউইন জন্য) খ্রীষ্টরা তিনজন নীরব। তখন বাবাজী বলিল, বাপু তুমি তো বলিয়াছ যে উষ্ট্রও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু ধনীরা পারে না, তবে? তারপর দেখ ইন্দ্রের হাতী আছে, ঘোড়া আছে। তারা কি পশু নয়? বিষ্ণুর গরুড় আছে সে পাখি নয়? আর আর বৈশ্বানরের বাহন ছাগ। এবার বাবাজীর চোখ একটু হাসিল (হায়, এইরূপ হাসির বলেই সে নব নব সেবাদাসী সংগ্রহ করিয়াছে) বলিল—বলি বুঝলে তো?

বাবাজীর কথা শুনিয়া খ্রীষ্ট বুঝিল, বাবাজীকে ঠেকাইবার আশা সফল হইবে না। সে অগত্যা বাবাজীকে পথ ছাড়িয়া দিল। দরজায় ঢুকিবার সময় আধ্যাত্মিক কাকাতুয়া একটি তীব্র ঠোকর মারিয়া খ্রীষ্টের হাতে রক্ত বাহির করিয়া দিল। বাবাজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি সে কথার তো জবাব দিলে না। খ্রীষ্ট হাতের রক্ত চাপিতে চাপিতে বিরক্ত হইয়া বলিল—জানি কিন্তু বলব না। বাবাজী উত্তর না পাইয়া বকিতে বকিতে দ্রুত প্রস্থান করিল।

খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরের বিশ্বস্ততায় স্বর্গে অবাঞ্ছিত লোক প্রবেশ করিতে পারে না। স্বর্গে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া গেল। রেল কোম্পানির সুনাম বাড়িয়া গেল, তাহারা ভাড়া দ্বিগুণ করিয়া দিল এবং কর্মচারীদের মাহিনা অর্ধেক করিয়া দিল কিন্তু কর্মচারী তিনজনের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। তাহাদের দিন যায়, কিন্তু রাত্রি যায় না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন কুলি মন্দাকিনীর টাটকা ইলিশ মাছ আনিয়া বুদ্ধদেবের কাছে রাখিল। বুদ্ধদেব বলিল, আমি মাছ খাই না—সে বলিল, মাছ না খান ডিম খান, ওতে দোষ নেই, ডিমটা নিরামিষ। খ্রীষ্টকে একজন একটি সদ্যোজাত গোবৎস ও এক ভাঁড় তাড়ি উপহার দিল। খ্রীষ্ট দয়ালু না হইলে লোকটা দুঃখিত হয়, গ্রহণ করিল। আর একদিন আর একজন তাহার হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিল; খ্রীষ্ট বলিল—ইহাকে কি ঘুষ বলে? সে জিভ কাটিয়া বলিল—কি সর্বনাশ আপনাকে কি ঘুষ দিতে পারি? ইহা পান খাইবার জন্য কিঞ্চিৎ। গ্রহণ করিলে কোন দোষ নাই কি বল? লোকটা বলিল, কিছু না স্যার। বাংলাদেশ নামে এক দেশ আছে দারোগারা ঘুষের নাম শুনিলে রাগিয়া ওঠে, কারণ তাতে চাকরি যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পান খাইবার জন্য এমন অনেক কিঞ্চিৎ নেওয়া, দোষের হইলে ইংরেজের দারোগা এমন করিতে পারিত?

আর একদিন একজন যুধিষ্ঠিরের নিকটে সুবৃহৎ এক ডালা বোম্বাই ফল মূল তরকারি, (ফল ফুলের নীচে গোপনে মা দ্রৌপদীর জন্য একখানি ঢাকাই শাড়ি ও একজোড়া অনন্ত ও কানের দুল) উপস্থিত করিল। যুধিষ্ঠির গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা তো ঘুষ। আধার বাহক আভূমি প্রণত হইয়া বলিল—স্যার না গ্রহণ করেন তো ক্ষতি নাই, কিন্তু ইংরেজের অপমান করিবেন না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিল—ইংরেজ কে?

লোকটা বলিল—আপনার পরে এখন যারা ভারতবর্ষের রাজা।

যুধিষ্ঠির বলিল—তাহাদের কথা কি বলিতেছ? সে বলিল, ইংরেজের হাকিম ঘুষ নেয়, ডালা গ্রহণ করে। যুধিষ্ঠির নিশ্চিন্ত হইয়া ডালা গ্রহণ করিল। বাসায় গিয়া যুধিষ্ঠির দেখিল ফল ফুলের তলে শাড়ি অলংকার। বুঝিল ডালার ইহাই নিয়ম। পরদিন আর একজন ডালা আনিল, যুধিষ্ঠির প্রথমেই ফলমূল তুলিয়া দেখিল শাড়ি ও অলঙ্কার আছে কিনা না দেখিতে পাইয়া পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।

আর একদিন বুদ্ধদেবের ভিক্ষা পাত্রে এক ব্যক্তি কয়েকটি মোহর দান করিল। বুদ্ধদেব করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি বিস্তার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৎস ইহাকে কি উৎকোচ বলে না? লোকটা তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, সে কি প্রভু। পৃথিবীতে আদালতের কর্মচারী পেস্কার প্রভৃতি মহাজনেরা ভালোমানুষী ছাড়া কোনই কাজ করে না; ইহা গ্রহণে অপরাধ দূরে থাকুক না করিলেই মহাপাতক; আদালতের মহাজনদের পুণ্য জীবন কাহিনী আপনি জানেন না বলিয়াই এমন কথা বলিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে করপদ্ম তুলিয়া আশীর্বাদ করিল।

এমনি করিয়া দিন যায়, বুদ্ধ, যীশু, যুধিষ্ঠির ঘুষ গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে পান খাইবার অর্থ, ডালা, ভালোমানুষী আদায় করে। শেষে এমন হইল যে, তাহারা আর উহা না পাইলে 'বনাফাইডি' স্বর্গ যাত্রীদের পথ ছাড়িয়া দেন না। আর যাহাদের টিকিট নাই, তাহারা অনায়াসে কিছু কিছু দিয়া স্বর্গে অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রথমে স্বর্গের দৌবারিকত্রয় মোহর না পাইলে গ্রহণ করিত না, কিন্তু কিছু কাল পরে টাকা, সিকি, কুমড়ো, লাউ, বেগুন লইয়া পথ ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিল। স্বর্গে আবার চুরি, ডাকাতি, গ্রন্থিচ্ছেদ ও নীবীচ্ছেদ প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। স্বর্গের পুলিশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্বর্গীয় দৈনিকের সম্পাদক স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিল।

ন-ন-লৌ-ব লিঃ কর্তৃপক্ষ পুনরায় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; ব্যাপার কি এসব চোর ডাকাত ঢুকিতেছে কোন্ পথে! যে তিনটি দরজা আছে তাহাতে তিনজন বিশ্বস্ত কর্মচারী দন্ডায়মান। তবে কি তাহারাও ঘুষ খাইতেছে? না না তাহা কখনও সম্ভব নহে। প্রশংসাপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাইবেল, মহাভারত ও ত্রিপিটকের যে মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে ঘুষ খাইবার কথা কিছুতেই মনে হয় না। তবে কি? রেল কোম্পানির প্রধান ম্যানেজার স্থির করিলেন এবার তিনি তিনজনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ব্যাপার কি?

পরের দিন নন্দন-নরক মেল আসিয়া পৌঁছলে, ম্যানেজার চোরের ছদ্মবেশে (ধনী ম্যানেজারের পক্ষে চোরের বেশটাই হয়তো আসল) স্বর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। যীশু তাহার পথ রোধ করিয়া বিশুদ্ধ বাইবেলী ইংরাজীতে বলিল, তোমার টিকিট কোথায়? ছদ্মবেশী ম্যানেজার ভীত ভাবে এদিক ওদিক দেখিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিল, সিকি দেখিয়া যীশু রাগিয়া বলিল, আমি ঘুষ লইব না, কিন্তু লোকটা নেহাত চলিয়া যায় দেখিয়া আবার বলিল—তবে যদি পান খাইতে কিছু দাও সে, হাঁ সে স্বতন্ত্র কথা। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল—তাহাতে কি স্বর্গে ঢুকিতে পারিব?

যীশু তাম্বুল বিহারী হাসি হাসিয়া বলিল—স্বর্গ তো দরিদ্রের জন্যই, তুমি কি বাইবেল পড়

নাই? ম্যানেজার তাহাকে সিকি দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পরদিন আবার ম্যানেজার ট্রেনের টাইমে ছদ্মবেশে বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, টিকিট? লোকটা বলিল—টিকিট নাই তবে স্বর্গে প্রবেশের ইচ্ছা আছে।

বুদ্ধদেব স্পষ্টভাসি লোক, বলিল—দেখো বাপু আমি ঘুষ খাই না তবে ভালোমানুষী বলিয়া কিছু দিয়া থাকিলে লইয়া থাকি।

ম্যানেজার বলিল পয়সা তাহার কাছে নাই। বুদ্ধ রাজার ছেলে ঊনত্রিশ বৎসর পর্যন্ত রাজবাড়িতে ছিল, কাছারীতে খাজনা আদায়ের রীতি তাহার অজানা নয় বিপদকালে প্রজারা কোথায় টাকা রাখে সে জানে, সে লোকটার কাছা নাড়া দিলে টুক করিয়া একটি সিকি পড়িল, বুদ্ধদেব তাহা তুলিয়া কানে গুঁজিয়া লোকটাকে পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাও বৎস, তোমার স্বর্গে বাস অক্ষয় হোক।

তার পরদিন ম্যানেজার পূর্বোক্ত ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির তাহাকে দেখিয়া বলিল—দেখ বাপু, তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি টিকিট তোমার নাই, আমি ঘুষ লইনা কিন্তু আমি ডালা লই। ডালা কোথায়? তখন অনেক দরদস্তুর করিয়া ডালার বাবদ নগদ সাত সিকি পয়সা যুধিষ্ঠির আদায় করিয়া লইল। ম্যানেজার স্বর্গে প্রবেশ করিল।

পরদিন ন-ন-লৌ-ব-লিঃ-এর অফিসে ম্যানেজার সব কথা খুলিয়া বলিল। সভায় স্থির হইল যে, যীশু, বুদ্ধ ও যুধিষ্ঠিরকে ছাড়াইয়া দেওয়া হোক। তিনজনেরই চাকরি গেল। তাহারা কোম্পানির কোর্ত্তা, টুপী প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া মৌলিক গেরুয়া ও ঝুলি লইয়া পথে বাহির বাহির হইল। এখন কোথায় যায়, কি করে? এমন সময় দেখিল একদল বালক, বৃদ্ধ ও যুবক হারমোনিয়াম খোল, খঞ্জনী লইয়া বাহির হইয়াছে, বন্যার জন্য ভিক্ষা করিতেছে তাহারা, দোতলার জানলার দিকে তাকাইয়া তন্ময় দৃষ্টিতে গাহিতেছে

মন্দাকিনীর বন্যাতে আজ হন্যা দিল স্বর্গলোকে।
কোমর জলে দাঁড়িয়ে দেখ খাচ্ছে খাবি কতই লোকে।।
দাও জননী ছিন্ন বাস দাও জননী চালের রাশ।
লক্ষ্মী দিল ছিন্ন শাড়ি, সরস্বতী করুণ শ্লোকে।।

স্বর্গের উত্তর বঙ্গে বন্যা আসিয়াছে। ভিক্ষার ঝুলিতে চাল পড়িতেছে, ডাল পড়িতেছে, দু একখানা ছেঁড়া শাড়িও পড়িতেছে। যীশুরা তিনজন দলে ভিড়িয়া পড়িয়া সোৎসাহে গান করিল—মন্দাকিনীর বন্যাতে হায়—

ঝুলিতে চাল ডাল পড়িতে লাগিল। আজ রাত্রে মন্দাকিনীর তীরে ইহাদের খিচুড়ি হইবে। যে বন্যা আদৌ হয় নাই তাহার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের ইহার চেয়ে ভাল সদ্গতি আর কি হইতে পারে। যাক্ বেচারা বেকার তিনজনের অন্ততঃ আজ রাত্রিটা খাদ্য মিলিবে।

একটুকু বাসা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মাথায় লাঠির বাড়ির মতো এক-একটা বদলির অর্ডার। ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে সেই গোবিন্দছাড়া বৃন্দাবন।

কিন্তু গৌরীর সবতাতেই ফুর্তি। পার্টি খাবে, মানপত্র পাবে, নতুন জায়গা দেখবে, নতুন সব বন্ধু জুটবে—জলে ঢেউ তুলতে তার আপত্তি কি। তুমি তিনকড়ি হালদার সর্ব ছাইয়ে ভাঙা কুলো, তোমারই হয়রানির এক শেষ।

কেউ বললে, 'জায়গা তো খুব ভালো মশাই। পাহাড় আছে।'

পাহাড় ধরে তো আর আহার করা যাবে না।

'পাহাড় কোথায়। সমুদ্র আছে শুনেছি।' বলল অন্যেরা।

'সমুদ্রে কি শয়ন চলে?' হালদার বিরক্ত মুখে বলল, 'আসলে বাড়িই নেই শুনেছি।'

ভূগোলে যাদের অমন জ্ঞান, তারা তখন ইতিহাস নিয়ে পড়ল। আগে আগে যারা ও জায়গায় গিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ইতিহাস। কেউ বললে আছে, কেউ বললে নেই। অন্তত যারা এডিশনাল, ফালতু, তাদের জন্যে না থাকাই সম্ভব। দেখুন না টেলিগ্রামের কি উত্তর আসে।

উত্তর এল কোয়ার্টার্স নেই। তার মানে রাজা আছে রাজ্য নেই। মন্ত্রী আছে পোর্টফোলিও নেই।

'তাহলে উঠব কোথায়?' গৌরীর মুখ পাংশু হয়ে গেল।

চারদিক আঁধার দেখল তিনকড়ি।

'বাড়ি যখন নেই,' গৌরী বললে, 'আমি থাকি। তুমি একাই যাও।'

'একা?' সে যেন কত অসম্ভব, তিনকড়ি অসহায় মুখ করল।

'বাড়িটাড়ি পেলে আমাকে নিয়ে যাবে।'

'ছেলেমেয়ে হস্টেলে, আবার তুমি এখানে! এতগুলি এস্টাবব্লিশমেন্ট চালাব কি করে? তাছাড়া তোমাকেই এখানে দেখবে কে?

'এ জায়গা তো চেনা হয়ে গেছে, পারব থাকতে।' গৌরী বললে, 'বাড়িহীন অবস্থায় আমাকে নিলে অসুবিধেয় পড়বে।'

'তুমি সঙ্গে থাকলে যেমন অসুবিধে তেমনি সুবিধেও। আর কোথাও জায়গা না হয় স্টেশনে থাকব। রোজ দুটো করে কাছাকাছি স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাশ টিকিট কাটব, আর থাকব রিটায়ারিং রুমে।'

'খুব মজা হবে।' সব কিছুতেই গৌরীর ফুর্তি 'কিন্তু ক'দিন পরে যখন জানাজানি হয়ে যাবে?'

'তখন সটান কোর্টের খাসকামরায় গিয়ে উঠব।'

'আরো মজা।'

সেখানকার অধিকর্তাকে চিঠি লিখল তিনকড়ি : 'দিগম্বর যাচ্ছেন তার বাঘছাল যোগাড় করুন।'

'বাঘছাল মানে?' গৌরী ভুরু কুঁচকুলো।

'মানে আচ্ছাদন। এক্ষেত্রে বাড়ি।' হাসল তিনকড়ি।

অধিকর্তা প্রশ্ন করে পাঠাল 'একা আসছেন, না সস্ত্রীক?'

'সস্ত্রীক।' উত্তর দিল তিনকড়ি 'বৈরাগী হয়েছি যখন তখন মালা ফেলব কোথায়?'

অধিকর্তা পরামর্শ দিল, একা আসুন। তুফানের তরী ভারী করবেন না।

কে কার কথা শোনে। সস্ত্রীক পৌঁছুল তিনকড়ি আর সটান সার্কিট হাউসে গিয়ে উঠল। ফাঁকায় এসেছে, সামনে বড় ঘরটাই দখল করলে।

সন্ধ্যায় রঙ্গনাথ এল দেখা করতে। তিনকড়িকে দেখল। তাকাল ইতিউতি। অতিরিক্তকে দেখল না।

'একা এসেছেন?'

'না—'

'কই কোথায়, দেখছি না তো।' এ এলাকায় সবই যেন তার দেখবার কথা—এমনি ভাব করল রঙ্গনাথ।

'ঘরে শুয়ে আছেন।'

'সব চেয়ে ভালো ঘরটাই নিয়েছেন দেখছি।' রঙ্গনাথ একটু বা পাইচারি করে এল।

ঘর বন্ধ। ধাক্কা খেল রঙ্গনাথ। নির্দয়ের মতো বললে, 'কিন্তু, যা বলুন, সাতদিনে বেশি পারবেন না থাকতে। নিয়ম নেই।'

'বাড়ি নেই বদলি এ নিয়ম থাকলে ও নিয়ম চলে কি করে?'

'তা জানি না। রুলস ইজ রুলস।' তাছাড়া রুক্ষ হল, রঙ্গনাথ 'যে কোনো মুহূর্তে কমিশনার আসতে পারে, মন্ত্রীরা কেউ আসতে পারে, তখন তো ভ্যাকেট করতেই হবে।'

'করব। ছাড়ব।' গা-ঝাড়ার ভঙ্গি করল তিনকড়ি।

সাতদিন পর রঙ্গনাথ এল খোঁজ নিতে।

'কি মশাই, বাড়ির খোঁজ পেলেন?'

'বা, এই তো পেয়েছি দিব্যি—' বাইরের ইজিচেয়ারে আরামে গা-ঢালা তিনকড়ি।

'এ নয় মশাই, বলি প্রাইভেট বাড়ি, ভাড়াটে বাড়ি দেখলেন কোথাও?'

'সে তো আপনি দেখবেন।'

'আমার বয়ে গেছে।' ছড়ি ঘোরাল রঙ্গনাথ 'আপনার পিরিয়ড শেষ হয়েছে, আপনি এবার চলে যান।'

'কোথায় যাব? গাছতলায়?' পা নামিয়ে পিঠ খাড়া করল তিনকড়ি 'গাছতলায় বসে রায় লিখব?'

'সে আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না তো কে জানে?'

একটু বুঝি ঢোক গিলল রঙ্গনাথ। ইতিউতি তাকাল। বলল, 'স্ত্রীকে নিয়ে এসেই গোল বাধিয়েছেন।'

'জীবনে স্ত্রী আনাই তো গোল বাধাবার জন্যে।'

'একা হলে হোটেলে-মেসে থাকতে পারতেন, পেয়িং গেস্ট হয়ে কারু বৈঠকখানায়, নয়তো বা স্টেশন প্ল্যাটফর্মে। আমাদের হরেন তরফদার তো বাড়ির অভাবে একটা আলয়ে ছিল। সেখান থেকে অফিস করত।' নিজের মনে হেসে উঠল রঙ্গনাথ 'কিন্তু যাই বলুন এটাকে আলয় করে তুলতে দেব না।'

'তার মানে?'

'তার মানে আরো তিনদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে বাড়ি দেখে উঠে যান।'

'আমার বয়ে গেছে।' সেদিনের শোধ তুলল তিনকড়ি।

রঙ্গনাথের লোকজন অনেক বাড়ির খোঁজ আনল। একটাও পছন্দ হল না গৌরীর। কোনোটা টিনের চালা, কোনোটা কারখানার স্টোররুম, কোনোটা বা একতলার সিঁড়ির তলা।

'বাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি তবু যাচ্ছেন না যে?' চড়াও হল রঙ্গনাথ।

'ওগুলো কি বাড়ি?'

'কি তবে?'

'ওগুলো, আর যাই হোক ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য নয়।'

'ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য এই সার্কিট হাউস?' জুতোর গোড়ালিতে ছড়ির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল রঙ্গনাথ 'এমনতরো কখনো দেখিনি মশাই, শুনিও নি, যে কোনো ভদ্রলোক বাড়ি-ঘর ঠিক না করেই সস্ত্রীক চলে আসে হুড়মুড় করে।'

'কত আরো দেখবেন। কত শুনবেন।'

'কিন্তু যাই বলুন, আপনি এখন ট্রেসপাসার।' রঙ্গনাথ শূন্যে ছড়ি নাচাল 'আপনার মেয়াদ এক্সপায়ার করেছে। দয়া করে এটা মনে রাখবেন।'

তিনকড়ি কথা বলল না।

নিরিবিলি পেয়ে কে একজন তিনকড়ির কানে-কানে বললে, 'চটিয়ে লাভ নেই। যে সহায় হতে পারে তাকে শত্রু করবেন না।'

'কি করতে হবে?'

'স্ত্রীকে দিয়ে করিয়ে একটু চা খাইয়ে দিন। শাড়িটা শুধু রোদ্দুরে মেলে দিলেই কি চলে? এতে আরো বিরক্ত করা হয়। তার চেয়ে শাড়িটাকে একটু চলমান করুন। তাহলে সহজেই হয়ত আরো কদিনের মেয়াদ বাড়ে।'

গৌরীকে বললে কথাটা। গৌরী রাজি হল না। বললে, 'তুমি জানো না, বেড়ালের পিঠে হাত বুলোলে ক্রমশই লেজ মোটা হয়।'

কিন্তু এবার বাছাধন কি করবে? এবার স্বয়ং কমিশনার আসছে।

চল-বিচল নেই তিনকড়ির। ঝড়ে গাছ নড়ে যত তরু বদ্ধমূল তত—এমনি ভাব করে রইল।

'আর সকলে যার-যার ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের মতো', বললে রঙ্গনাথ, 'আপনি যান নি যে?'

'কোথায় যাব? জায়গাটা বলে দিন।'

নামটা মুখে এসেছিল, চেপে গেল রঙ্গনাথ। বললে, 'অতশত বুঝি না। এই আপনাকে রিটন কুইট অর্ডার দিয়ে দিলাম। যদি না মানেন ফিজিক্যালি আউস্টেড হবেন।'

গৌরীকে একা রেখে কোর্ট-ফেরত তিনকড়ি কোথায় চলে গেল।

ফিরল রাত করে।

'এ কি কোথায় গিয়েছিল'? গৌরী হাঁপিয়ে উঠল।

'খবরে কাগজের করেসপন্ডেন্টের খোঁজে।'

'দেশে এত লোক থাকতে ওখানে কেন?'

'যদি জোর করে বার বার দেয় আমাদের, সে খবরটা যাতে ফ্ল্যাশ করে তাই অনুরোধ করতে। গৃহহীন বিচারক সশরীরে বিতাড়িত—ক্যাপশানটাও ঠিক করে এলাম—'

'কিন্তু এদিকে—'

'কি এদিকে? মেয়ে-পুলিস এসেছে?'

'না, কমিশনার এসেছে।'

'শোনো। এক কাজ করো।' একটু বুঝি গাঢ় হল তিনকড়ি 'এর প্রতি গোড়া থেকেই কাঠ হয়ে থেকো না।'

'তার মানে?' ভুরু কুঁচকালো গৌরী।

'তার মানে, কমিশনারকে একটু কমিশন দাও।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'ওঁর কাছে য়্যাপিয়ার করো, দুরবস্থাটা বলো একটু বুঝিয়ে—'

'অসম্ভব,' ফোঁস করে উঠল গৌরী 'আমি গৌরী বলে আমাকে তুমি গৌরী সেন পাওনি।'

'তাহলে এক কাজ করো। খুব করে চুড়ি বাজাও। অস্তিত্বটা ঝংকৃত করো।'

'চুড়ি বাজাব? চুড়ি কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল গৌরী 'আমি কি তেমন অদৃষ্ট করে এসেছি!'

এ আবার তিনকড়ির নতুন সমস্যা। বাজারে গিয়ে এক রাজ্যের বেলোয়ারি চুড়ি কিনে আনল। 'লক্ষ্মীটি, এই-ই বাজাও আপাতত। অতিরিক্ত আছি, পাকাপোক্ত হই, সোনার কাঁকণ গড়িয়ে দেব।'

কমিশনার গোস্বামী রঙ্গনাথকে তলব করল।

'এটা কি মশাই ঘর-গেরস্থালির জায়গা?'

'কেন, স্যার?'

'কে এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক বসবাস করছেন এখানে, দিব্যি সংসার পেতে রয়েছেন—বলি এটা কি—' বিড়বিড় করতে লাগল গোস্বামী।

'সস্ত্রীক আছেন?' আকাশ থেকে পড়বার মতো মুখ করল রঙ্গনাথ 'কই জানি না তো। স্ত্রীলোক তো দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'দেখেছি বৈ কি।' না দেখাই ভালো ছিল এমনি মুখ করল গোস্বামী 'রোদে চুল শুকোচ্ছেন, জামা-কাপড় সানিং করছেন, পাইচারি করতে-করতে গান গাইছেন মৃদু মৃদু—'

'অসম্ভব।'

'বলি এদের জন্যে আজও একটা বাড়ি দেখে নিতে পারলেন না?'

'যা দেখাই পছন্দ হয় না।'

'গোয়াল-আস্তাবল দেখালে চলবে কেন?' গোস্বামী সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা পিষল পা দিয়ে 'ওরা সার্কিট হাউসকেই গোয়াল-আস্তাবল করে তুলবে, এটা আপনি—আপনার পক্ষে ডিসক্রেডিট।'

'কুইট অর্ডার সার্ভ করা সত্ত্বেও এরা যাচ্ছে না।'

'কুইট অর্ডার তো ওঁদের উপর নয়, আমাদের উপর।' গোস্বামী উঠে পড়ল 'অমন ডেঞ্জারাস এলিমেন্টের সঙ্গে একত্র বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। যা দিনকাল, কোন কথা থেকে কোন কথা গজায় ঠিক নেই। আমি আজ বিকেলেই ফিরে যাব।'

গোস্বামী ফিরে গেল।

ডিসক্রেডিট! খেপে গেল রঙ্গনাথ। না, আর নয়, এবার পুলিসকে বলি। পুলিস লাগাই।

সত্যিসত্যিই সে রাত্রে পুলিস পড়ল সার্কিট হাউসে! হটো হটো, সব ঘর-বারান্দা আগা-পাস্তালা ক্লিয়ার করে দাও।

যে যেখানে যত অতিথি-আগন্তুক ছিল, কর্পূরের মতো উবে গেল নিমেষে। কী ব্যাপার? কেউ যেন এল মনে হচ্ছে। কে এল? বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট নিয়ে রাজসমারোহে এ কার আবির্ভাব?

মন্ত্রী এসেছেন?

সর্বনাশ। মাথায় এ বাড়ি নয়, মাথায় এ সর্পাঘাত।

কিন্তু এ একেবারে না বলে কয়ে এলেন কেন? আগে জানলে আমরা সময়মত বেঁধেছেঁদে তৈরি হয়ে ধীরে-সুস্থে চলে যেতে পারতাম। এমনি সব এলোমেলো হয়ে যেত না।

কি করে জানবে আগে? রাস্তায় গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছে। তাই পথে একরাত্রি এখানে একটু বিশ্রাম করে যাওয়া।

একরাত্রির জন্যে একটা ঘর হলেই তো চলে। সমস্ত বাড়িটাই চাই কেন?

হ্যাঁ, সমস্ত বাড়িটাই দরকার। যাতে একেবারে নির্জনে নিঃসঙ্গে থাকতে পারেন। যাতে কোনো কথা না ওঠে, না হাঁটে। সন্দেহের নিশ্বাসও না শোনা যায়। যাতে রাজ্যের সমস্যাগুলো মনের গভীরে ভাবতে পারেন তলিয়ে।

পুলিস এসে গৌরীর দরজায় দাঁড়াল।

'আপনাকে এ ঘর ছেড়ে যেতে হবে এক্ষুনি।'

'আমার স্বামী পাশের শহরে কি এক কনফারেন্সে গিয়েছেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবে। তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না।'

'সে কি? আপনি নিজে অফিসার নন?'

'আমি কোন দুঃখে অফিসার হতে যাব? পরের ঘরে পরের ঘাড়ে বসে খাব এই-ই তো আমার নিশ্চিন্ত স্বত্ব।'

'তাহলে তো কথাই নেই। আপনি ফালতু, আপনার কিছুতেই থাকা চলবে না এখানে—'

'কোন আইনে?' কোমরে প্রায় আঁচল জড়াল গৌরী।

'আপনি অন্তত এ বড় ঘরটা ওঁকে দিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে সিফ্‌ট করুন।'

কে আরেকজন বললে মীমাংসার সুরে।

'আমরা দুজন। আমাদেরই বড় ঘর দরকার।' গৌরী নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'আর অনারেবল মন্ত্রী তো একা, একরাত্রির খদ্দের। অনারেবলকে ডাকুন না আমার কাছে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

কী স্পর্ধা! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। টের পাওয়াচ্ছি।

ট্রেন মিস করে ফিরতে-ফিরতে তিনকড়ির প্রায় শেষ রাত।

চোরের মতো ফিরছে। গেটের সামনে পুলিস ধরতেই আইডেনটিটি কার্ড দেখাল। বলল,

ভেতরে আমার স্ত্রী আছেন। একেবারে একা আছেন। আর বস বাসিন্দে উধাও হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি কাল সকালেই চলে যাব, ছেড়ে দেব, ছুটি নেব।

দেখবেন, আস্তে দরজা খুলবেন। অনারেবেলের ঘুমের না ব্যাঘাত হয়।

এ কি, দরজা খোলা। ঘর ফাঁকা। জিনিসপত্র ঠিক আছে। কিন্তু গৌরী কোথায়? গৌরী নেই।

কী সর্বনাশ! গৌরী লোপাট।

তিনকড়ির ফিরতে দেরি হচ্ছিল দেখে আর্দালিকে রেখে দিয়েছিল গৌরী। ঘুম থেকে তাকে ঠেলে তুলল তিনকড়ি। 'তোমার মা কই?'

'মন্ত্রীর ঘরে।'

'মন্ত্রীর ঘরে!' তিনকড়ির হৃৎপিণ্ডটা খসে পড়ল মাটিতে।

'হ্যাঁ, মা একা আছেন দেখে মন্ত্রী তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়েছেন।'

মন্ত্রীর ঘরের দরজায় মাথা দিয়ে ঢুঁ মারতে যাচ্ছিল তিনকড়ি, কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

সকাল হতে না হতেই দরজা খুলে গৌরী বেরিয়ে এল। তিনকড়িকে দেখে হাসিমুখে বলল, 'আর ভয় নেই, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে!'

যা লাগে দেবে গৌরী সেন। শেষ পর্যন্ত গৌরী সেনের এই খয়রাত! এতদূর!

ঠিকঠাক হয়ে বেরুতে অনারেবল মন্ত্রীর কিছু দেরি হল।

কিন্তু এ তার কি অদ্ভুত পোশাক! চোখে ধাঁধাঁ লাগল তিনকড়ির। পরনে রঙিন লুঙ্গি, গায়ে ঢিলেঢালা রঙিন ফতুয়া, মাথায় চীনেদের মতো লম্বা টিকি আর এমন কি এখন ঠাণ্ডা যে গায়ে ফেরতা দিয়ে পুরু করে কাপড় জড়ানো! তিনকড়ি চোখ কচলাল। অনুপাত ঠিক করতে করতে স্থির করল চাউনি, সামঞ্জস্যের উপশম আনল।

'গৌরীটা এখনো তেমনি ভীতু আছে।' মৃদু হাসি মেখে তিনকড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন অনারেবল 'ঘরে নিয়ে এসে তবে তার ভয় ভাঙালাম। আমরা কলেজে চার বছর একসঙ্গে পড়েছি, থেকেছি এক হস্টেলে, কত ভাব আমাদের গলায়-গলায়। ও গৌরী, আমি উমা। লোকে বলত জোড়ের পায়রা—'

ইনি তাহলে মন্ত্রী নন, ইনি মন্ত্রিণী!

ডাকতে হয়নি, রঙ্গনাথ নিজের থেকেই এসেছে।

মন্ত্রিণী বললেন, দেখুন, গৌরী আমার নিজের লোক। যতদিন ওরা সুবিধামত বাড়ি না পায়, এখানেই থাকবে। উপায় কি তাছাড়া! যাতে থাকতে পারে, কেউ বিরক্ত না করে দেখুন।'

রঙ্গনাথ চেষ্টা করেও গৌরীর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। লক্ষ্মণের মতো মাটির দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। দেখছি। দেখব।'

আর, তাতে চাকরিটাকেও দেখা হবে।

ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি

শিবরাম চক্রবর্তী

ডিটেকটিভ শ্রীভর্তৃহরি সেদিন বিকেলে সবেমাত্র কলেজ স্কোয়ারের এক বেঞ্চে এসে বসেছেন—

জীবন? জীবন যা ভাবা যায় তা নয়, তার চেয়ে ঢের কঠিন, জটিল রহস্যময়। কিন্তু এহেন অনুভূতি ভর্তৃহরির জীবনে এই প্রথম....এই সদ্যোজাত রহস্য অতিশয় সম্প্রতি তাঁর অভিজ্ঞতায় এসে আলোড়ন তুলেছে।

ডিটেকটিভ ভর্তৃহরিবাবু এই মাত্র তাঁর মোটর গাড়িটি মোড়ের পাহারালার নজরবন্দী রেখে গোলদিঘিতে এসে বসেছেন। সান্ধ্যবায়ু সেবনের সদভিপ্রায়ে।

এই সময়টায় এইখানে এসে বসতে তাঁর বেশ লাগে। কাজকর্মের ফাঁকে ফোকরে অবকাশ পেলেই প্রায়ই তিনি এখানে এসে বসেন। দিঘির পশ্চিম দিকে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে ট্রাম্, বাস, অম্নিবাস, ট্যাক্সি, মোটর অবিশ্রাম ছুটোছুটি করে কত রকমের বিচিত্র যান অবিরাম চলেছে—আর কী জনস্রোত! আর এধারে, দিঘির এক কোণে, একটা বেঞ্চে অম্লানবদনে বসে শ্রীযুক্ত ভর্তৃহরি। ছুটবার কিছুমাত্র প্রয়োজন, বিশ্বের কোনো দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে নেই এখন। আপাতত—অন্তত, এই মুহূর্তে তো নেই। কথাটা ভাবতেই কী আরাম!

এই সময়টায় ভর্তৃহরিবাবুর ছুটি!

সেই বেঞ্চে, তাঁর পাশে, আধময়লা জামা-কাপড়ে একজন ভদ্রলোক, একটু বয়স্কই, কোনো দিকে কিছু মনোযোগ না দিয়ে কী যেন ভাবছিল।

আপন মনে কী ভাবছে লোকটা? কোন্ মতলব ভাঁজছে। কোনো চুরি ডাকাতি কিম্বা—কারুকে খুন করার মার্‌প্যাঁচ? কিম্বা তার চেয়ে ছোটখাটো কিছু—কারো পকেট কাটার দুরভিসন্ধি?

ভর্তৃহরি তাঁর স্বভাবসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালিয়ে দ্যান্—পার্শ্ববর্তী লোকটির অন্তস্থল ভেদ করে চালাতে চান—কিন্তু পারেন না।

হয়ত বা পারতেন, তাঁর মর্মভেদী কটাক্ষে লোকটার মর্মভেদ করতে পারতেন হয়ত, অসম্ভব নয়, কিন্তু বয়স্ক লোকটি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতেই উঠে পড়ে হঠাৎ, এবং তেমনি ভাবিত ভাবে এক দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে জনসমুদ্রে গিয়ে মিলিয়ে যায়!

ভর্তৃহরির ওকে নিয়ে যাও বা ভাবনা হয়েছিল, ওর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাও তিরোহিত হল; আবার কেন তিনি ভাবতে যাবেন? অপরের বিষয়ে মাথা ঘামায় চোর আর ডিটেক্‌টিভ, একথা মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই পর যদি নিকটস্থ না হয়, যার-পর-নাই পর হয়ে চলে যায়, তাহলে

তার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক?

ভর্তৃহরি আরামের নিশ্বাস ফ্যালেন—উঃ! কোথাও যদি একটু স্বস্তি রয়েছে! ডিটেক্‌টিভদের জন্যে যদি শান্তি থাকে কোথাও। সব জায়গাতেই বদ্‌লোকের ভিড়। প্রায় সব ব্যাপারেই চক্রান্ত—সমস্ত কিছুর সঙ্গেই গোলমাল বিজড়িত। একদন্ড যে নিশ্চিন্তে কোথাও বসে একটু বিশ্রাম উপভোগ করবেন তার যো কি! ওই যে এই লোকটা আধময়লা কাপড়চোপড়ে, বদ্‌খৎ, বিশ্রী ওই ব্যক্তিটি, আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেল তার উনি আর কী করছেন? যেরকম ওর ধরনধারণ আর আকারপ্রকার, নিশ্চয়ই ও কারু বাড়ি সিঁধ কাটতে কিম্বা খুব কম করে অপর কারু পকেট ছাঁটবার উদ্দেশ্যেই উঠে গেছে—পথে ঘাটে বেওয়ারিশ কারুকে পেলে ধরে খুন্ করতেই বা বাধা কোথায়? উনি তার কী করছেন? ওঁর উচিত ছিল ওর পেছনে পেছনে ফলো করা—তাহলেই হয়তো ফলোদয় হোতো, ফলেন পরিচয়তে হয়ে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে যেত! কিন্তু তিনি আর কী করবেন, কত করতে পারেন একলা? বিশ্বশুদ্ধ সবাই বদ্‌মাইস্, আর তিনি একটি মাত্র সৎ ডিটেক্‌টিভ্ না ঠিক একমাত্র না হলেও, অদ্বিতীয় তো বটেন! যথার্থ ভেবে দেখলে, তাঁর মতো ডিটেক্‌টিভ্ আর কটাই বা আছে? এই ধরাধামে আসামী ধরার ধান্দায়?

যাক্ গে, যেতে দাও। এই দুনিয়ার যাবতীয় অপকর্ম আটকানো তাঁর সাধ্য না! তিনি থাকতেও, পৃথিবীতে তাঁর অস্তিত্ব সত্ত্বেও, গোটাকতক খুন্‌খারাপি, তাঁর হাত ফস্‌কে, এমন কি, তাঁর নজর এড়িয়েই ঘটে যাবে! চোখের ওপরেও ঘটতে পারে! ঘটতে দাও! ঘটুক! নইলে, দারোগারা করে খাবে কি করে? দু'পয়সা পাবে কি করে? না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাবে যে!

আধাবয়সী লোকটি উঠে যেতে না যেতেই ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকুনি দিয়ে বেঞ্চি কাঁপিয়ে একজন তরুণবয়স্ক এসে সেই স্থান অধিকার করল—তার শূন্যস্থান পূর্ণ করল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধস্ফুট স্বরে সে বলে উঠল "ধুত্তোর!" ঝাঁকুনির তোড়ের মুখেই কথাটা বেরিয়ে এল তার।

ভর্তৃহরি সতর্ক হয়ে বসলেন। এই বিরক্তিদ্যোতক আর্তধ্বনির মধ্যে পৃথিবীর সম্বন্ধে একটা অপ্রশংসাপত্র উদ্যত নেই কি? কেমন একটা সমালোচনার ভাব প্রচ্ছন্ন নেই কি ওর ভেতর? জগৎ সংসার যেন ওর সাথে সঠিক সদ্ব্যবহার করছে না—এই গোছের একটা কিছু বিজ্ঞাপন? পৃথিবীর আপামরের প্রতি এই বীতরাগ—বৈরাগ্যবান্ এই ধরনের লোকেরা তেমন সুবিধের হয় না, প্রায়শই দেখা যায়। ভর্তৃহরি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। তার অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যুবকটির অন্তঃস্থল—ওর এই আকস্মিক ভাবের অভিব্যক্তির মর্মভেদ করতে লাগল।

এ-ও কি, এই তরুণটিও কি তাহলে, এর অগ্রগামীর ন্যায়, এক নম্বরের—পাক্কা একটি—তাই না কি এ?

কিম্বা এ বেচারী নিতান্তই গোবেচারী—অপরের, অন্য সব দুষ্ট লোকের চক্রান্তজালে বিজড়িত বিপর্যস্ত নাস্তানাবুদ এক হতভাগ্যই? অসহায় অবস্থায় একান্ত সৌভাগ্যবশে, তাঁরই সাহায্যের উপকূলে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এমনটাও তো হতে পারে। এমন হয় না কি?

বলতে কি, পৃথিবীতে এই দুদলই তো রয়েছে। এক দল নিরুপায়। আরেক দলের অসদ্‌পায়। আর এরা ছাড়াও, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় অন্য এক দল আছেন, যাঁরা এদের পায় পায় বাধা দিচ্ছেন। এদের মিলনের পথে যাঁরা মূর্তিমান অন্তরায়! এদের উভয়ের মধ্যে ভালো করে সংমিশ্রণ হতে—খাদ্যখাদক-সম্বন্ধ স্থাপিত হতে দিচ্ছেন না যাঁরা। এঁরাই শ্রীভর্তৃহরি। এঁরা

ডিটেক্‌টিভ!

ভর্তৃহরির মনে হল, এমনও তো হতে পারে, এর আগের অবাঞ্ছনীয় লোকটি চক্রান্ত জাল বিস্তার করে—ছত্রাকারে ছড়িয়ে চলে গেছে, আর এই যুবকটি সেই-জালেই জড়িয়ে জড়ীভূত হয়ে বিপদের অথৈ থেকে ঘাই মেরে ঠেলে উঠলো এইমাত্তর? অসম্ভব নয়।

এই পৃথিবীতে এবং এই গোলদিঘিতে কিছুই অসম্ভব নয়। কেবল দিঘির জলেই নয়, ঐ সলিলসীমার বাইরেও, মানুষের মধ্যে মৎস্য অবতারের মাছের মতোই বোকা জীবের কিছুমাত্র অভাব নেই।

তিনি একটু কৌতূহলী হলেন।

'তুমি কি কোনো অসুবিধায় পড়েচ বাপু?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'তোমার মেজাজ তেমন ভালো দেখছিনে যেন!'

'মেজাজের অপরাধ কী!' যুবকটি তাঁর দিকে ফিরে তাকালো 'আমি যা মুস্কিলে পড়েচি মশাই, এমন অবস্থায় পড়লে আপনারও মেজাজ ঠিক থাকতো না। অনেক আগেই বিগড়ে যেত! এমন বোকামি করেছি—উঃ! বোকামি করে মানুষ এমন বিপদেও পড়ে!'—বলতে বলতে যুবকটি হঠাৎ চেপে গেল।

'বটে?' ভর্তৃহরি ওকে উৎসাহ দিয়ে উস্কে দিতে চাইলেন 'বল দেখি কী হয়েছে? কিরকম মুস্কিলটা শুনি?'

'বলবো কি মশায়, আজ বিকালে—এই একটু আগে এসে নেমেছি কলকাতায়। চেনা এক বন্ধুর বাড়িতে উঠব এই স্থির। বছর দুই আগে আরেকবার যখন এসেছিলাম তাদের বাড়িতেই ছিলাম। এখন সেখানে গিয়ে দেখি, কোথায় সেই বাড়ি? কোথায় কি! বন্ধুর কোনো পাত্তা নেই!'

'বলো কিহে? খুনটুন করে ফেরার নাকি তোমার সেই বন্ধুটি?' ভর্তৃহরির বিস্ময় আরো বাড়ে 'কিন্তু বাড়িও নেই? বাড়ি পর্যন্ত লোপাট?'

বাড়ির পলায়ন ভর্তৃহরির কাছে ভালো লাগলো না। একটু বাড়াবাড়ি বলেই বোধ হল যেন। বাড়ির পালাবার কী প্রয়োজন ছিল?

'না, না, বাড়ি ঠিকই আছে। বাড়ি কোথথাও যায়নি! যেতে পারে না।' যুবকটির মতো অতদূর নাস্তিক তিনি নন 'তুমি ভালো করে খুঁজে দেখেছ?'

'খুঁজতে কি আর বাকী রেখেছি মশাই? যদ্দুর খুঁজবার তার কসুর করিনি।' যুবকটি জানায় 'কিন্তু খুঁজে আর কী হবে? সেখানে সিনেমা হাউস খাড়া হচ্ছে, নিজের চোখেই দেখে এলাম।... আপনি কি এর পরেও খুঁজতে বলেন?' যুবকটি জানতে চায়।

'হ্যাঁ, এরকম প্রায় হয়ে থাকে বটে।' ভর্তৃহরি এতক্ষণে আন্দাজ পান 'আজ যেখানে ডাইক্লিনিং ছিল, কাল দেখবে সেখানে চায়ের দোকান। বেমালুম রেস্তরাঁ বনে গেছে। তার কদিন পরে যাও, দেখতে পাবে, রাতারাতি রেস্তরাঁ বদলে হেয়ারকাটিং সেলুন! নাপিত খচ খচ করে কাঁচি চালাচ্ছে। চুল ছাঁটবার নামে রগ ঘেঁষে তোমার পকেটের ওপরেই! আর কিছু না, এসব জোচ্চুরি ব্যাপার। অসাধু লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে বেজায়! আসল ব্যাঙ্ক মনে করে আজ যেখানে তোমার টাকা রাখলে, কাল দেখবে সেটা রিজার ব্যাঙ্ক! তোমার যথাসর্বস্বই জলে—তাঁরা দয়া করে লালবাতি জ্বেলে বসে আছেন! যে যা পাচ্ছে। যেখানে পারছে, যাকে পাচ্ছে অপরের মেরে ধরে নিয়ে সটকে পড়ছে! লোক ঠকানো ব্যবসা আর কি!'

'কিন্তু আমার বন্ধু বাড়িসমেত উধাও হয়ে আমাকে যা ঠকিয়েছে মশাই, তার কাছে এসব লাগে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল তার জানা কোথায় একটা হোটেল আছে নাকি! তার জানা সেই হোটেলে আমাকে তুলে দিয়ে ভাড়া নিয়ে সে চলে গেছে। আর আমি করেছি কি, সেই হোটেলে একটা কামরায় আমার ব্যাগ বেডিং সুটকেস ইত্যাদি সব রেখে একটা টুথপেস্ট কেনবার জন্য বেরিয়েছি—তারপর তারপর আর কী বলব? সেই হোটেল আর খুঁজে পাচ্ছিনে এখন!'

'হোটেলের নাম কী?' ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর গলার স্বরে কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণতা। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেছে--জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট মারেনি জেনে তিনি অনেকটা হতাশ হয়েছেন! এখন হোটেল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—এই! হোটেলহারা একটি যুবক মাত্র! তিনি বেশ একটু মর্মাহতই হলেন।

'তাই তো মনে পড়চে না মশাই, নাম মনে থাকলে তো হোতোই। তবে তবে আর মুস্কিল কোথায়?'

'এ আর মুস্কিল কি? হোটেলটা এখান থেকে কদ্দুর? খুব কাছাকাছিই কি? এই গোলদিঘির আশেপাশে হ্যারিসন রোড, মীর্জাপুর আর আমহার্স্ট স্ট্রীট এর সবই হোটেলে ভর্তি! এইখানেই যত রাজ্যের হোটেল আর বোর্ডিং হাউস! আর, একটা তো হোটেল নয়! যাক, একটু ঘুরতে হবে, এই আর কি! বাড়িটা দেখলে চিনতে পারবে তো?'

সেইখানেই তো গোল মশাই! কি রঙের কি ঢঙের, কি রকমের ক'তলা বাড়ি কিছুই ভালো করে দেখিনি! তাছাড়া, কাছ থেকে একটা টুথপেস্ট কিনে এক্ষুনি ফিরে আসব—ভালো করে চিনে রাখবার দরকারও মনে করিনি--'

'এখন দেখচ সব চিনেম্যান—কাউকেই চেনা যাচ্ছে না?' ভর্তৃহরি যুবকটির ভগ্নহৃদয় রসিকতার রস দিয়ে ভর্তি করতে চান '—'তারপর?'

'তারপর এ-দোকান সে-দোকান করতে করতে কখন রাস্তা গুলিয়ে ফেলেচি!'

'তাহলে তো সত্যিই গোল পাকিয়েছো হে! দস্তুর মতো গোল!' অনুসন্ধানের সূত্র পেয়ে, এমন কি দীর্ঘ একখানা সূত্র পেয়েও, ভর্তৃহরির অনুসন্ধিৎসা জাগে না।

গোরু খোঁজা বাড়ি খোঁজায় কার আর উৎসাহ হয়? তার ওপরে, গোরুর জন্যে বাড়ি খুঁজতে হলেই তো হয়েছে!

'ভারি মুস্কিল হয়েছে! বাড়িটা তো চিনে রাখিইনি, কোন রাস্তায় যে তাও জানিনে! অথচ আমার জিনিসপত্র সব—সেই হোটেলেই থেকে গেল। টাকা কড়ি যা কিছু!' যুবকটি হতাশা-মাখানো চোখে তাকায় 'এখন কী যে করি?'

'কী আর করবে? এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে স্বস্থানে প্রস্থান করা--যেখান থেকে এসেছে সেখানেই পত্রপাঠ ফিরে যাওয়া। নিজের বাড়ি পিটটান দেয়া ছাড়া আর উপায় কি? এছাড়া তো আর পথ দেখচিনে। অবিশ্যি, কাছাকাছি থানায় একটা খবর দিয়ে যেতে পারো। তারা যদি তোমার হোটেল আর জিনিসপত্রের পাত্তা পায়, তো তখন তোমার দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।' বলতে বলতে ভর্তৃহরির মুখ বক্র সন্দেহবাদে ভর্তি হয়ে ওঠে। পুলিশের কার্যকারিতার প্রতি তাঁদের—ডিটেকটিভদের আস্থা যে কত কম, কীদৃশ অগভীর, সেই কথাটাই যেন তাঁর বদনমণ্ডলের চারিধার থেকে ভিড় করে বিকশিত হতে থাকে।

'তা না হয় গেলাম। পুলিসে খবর দিয়েই গেলাম না হয়। চলে গেলাম রাত্রের ট্রেনে।

কিন্তু—কিন্তু—'কী যেন একটা কথা, বার হবার আগে দাঁতের চৌকাঠে এসে হোঁচট খায় 'কিন্তু বেয়ারিং পোসটে ফেরৎ যাওয়া যাবে নাতো?'

"তা তো যাবেই না। তা আর কি করে যাবে?" ভর্তৃহরি কথাটা গায়ে মাখেন না।

"না গেলেও যে হয় না তাও নয়। আপাতত অন্য কোনো একটা হোটেলে উঠে দুঃসংবাদ জানিয়ে বাড়িতে তার করে দিলেও হয়। বাড়ি থেকে টি এম ও-তে টাকা আনিয়ে নেয়া যায়। বাবা তো দেশের একজন জমিদার, টাকার তাঁর অভাব নেই, খবর পেলেই টাকা পাঠিয়ে দেবেন এক্ষুনি। কিন্তু—কিন্তু" ছেলেটি আবার দ্বিধান্বিত হয়।

"কিন্তু আবার কি? এক্ষুনি তাহলে খবর পাঠিয়ে দাও—" ভর্তৃহরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা "তার করে পাঠাতেই বা বাধা কিসের?"

"কিন্তু তার আগে একটা ঠিকানায় তো ওঠা চাই। টাকা পৌঁছবে কোথায়? দেখে শুনে একটা হোটেলে ওঠা দরকার বোধহয়—আমার ঠিক ঠিকানা দিতে হবে না?"

"হোটেলের আবার অভাব কি?" প্রশ্নপত্র পাওয়ার সাথেই ভর্তৃহরির উত্তর পেশ।

"কিন্তু কিন্তু হোটেলে উঠতে—টেলিগ্রাম করতে—" ছেলেটির কোথায় যেন আটকে যায়।

"পোষ্টাপিসটা কোন ধারে জানতে চাও?" ভর্তৃহরির জিজ্ঞাস্য হয়।

'উহুঁ...হোটেলে উঠতে টেলিগ্রাম করতে টাকা লাগবে না কি? এসবের জন্য টাকা লাগে বোধ হয়?'...যুবকটি এবার কোনরকমে বাধা উৎরে সাদা কথায় আসে 'আর—সেই টাকা আমার কই? আমার কাছে কিচ্ছু নেই।'

ভর্তৃহরি এই তথ্য বহুক্ষণ আগেই জেনেছেন। তাঁর কাছে এ সংবাদে কোনো নতুনত্ব ছিল না।

'আপনাকে—আপনি—আমাকে—' যুবকটি এত আপনা-আপনির মধ্যে থেকেও বলতে ইতস্ততঃ করে 'আপনাকে সদাশয় ভদ্রলোক বলেই আমার বোধ হচ্ছে। আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন—যদি আমাকে সরল বিশ্বাসে গোটা কয়েক টাকা আপনি—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাকে আমি দিতাম যদি তোমার এই কাহিনীতে আমি আস্থা স্থাপন করতে পারতাম।' ভর্তৃহরি পরিষ্কার গলায় বলেন. 'মুস্কিল হয়েছে কোথায় জানো? হোটেল হারানোয় নয়।' রূঢ় অপ্রিয় সত্যটা বলবেন কি না, ভর্তৃহরি মুহূর্তমাত্র ভাবেন। 'টুথ্‌পেস্ট কিনতে বেরুনোতেও না—'

'তাহলে?'

'মুস্কিল হয়েচে এই যে, সবই ঠিক, কিন্তু যে টুথ্‌পেস্টা কিনেচ, সেইটাই কেবল দেখাতে পারচ না।'

ভর্তৃহরির বিচক্ষণের মতো মৃদু মধুর হাস্য কাহিনীটা ফেঁদেছিলে মন্দ না—প্রায় অপরাজেয় কথাশিল্পীদের মতোই বানাতে পেরেছিলে। কিন্তু তোমার গল্পের ঐখানটাতে গল্‌দ থেকে গেছে! আসল জায়গাটাই কাঁচা রেখে দিয়েছো! আর, সেই কারণেই ধরা পড়ে গিয়েছ! বুঝতে পারছি—"

সপ্রশংস আত্মাভিমানে ডিটেক্‌টিভের সাদা মুখ রঙীন বইয়ের মলাটের মতো মুখর হয়ে ওঠে 'বুঝতে পারছি, এখনো ততটা পোক্ত হয়ে উঠতে পারেনি বালক!'

দুই

ভর্তৃহরির অভিযোগের সাথে সাথেই ছেলেটি চমকে যায়, চট করে জামার পকেটে হাত

পুরে দ্যায়...আর তার পরেই সে এক লাফে খাড়া হয়ে উঠে।

'কোথায় হারালাম তাহলে?' যুবকটির সবিস্ময় কণ্ঠ!

'এক বিকেলের মধ্যে একটা হোটেল আর এক প্যাকেট টুথপেস্ট একসঙ্গে হারানো, পর পর হারিয়ে ফেলা—অনেকখানি অমনোযোগিতার কারসাজি বলে তোমার মনে হয় না কি?'

ভর্তৃহরি আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলেটি শোনবার জন্য সবুর করে না। আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে, তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ছটফট করতে করতে চলে যায়। ঘাড় উঁচু করেই চলে যায় সে। সন্দেহবাদী, বিরুদ্ধ-সমালোচক, পক্ষপাতদুষ্ট ভ্রান্ত জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করেই যেন চলে যায়!

'বেচারি!' ভর্তৃহরিবাবু ঈষৎ সানুকম্প হন! 'দেশ থেকে সদ্য ট্রেনে আসা, টুথপেস্ট কিনতে বেরুনো, হোটেল হারিয়ে ফেলা সবই ঠিকঠাক করেছিল—গল্পটা বানিয়েওছে মন্দ না! বলতেও পেরেছে বেশ গড়গড় করে—মাঝে মাঝে থেমে—দরদভরা গলায়—সবই প্রায় নিখুঁৎ—কেবল সামান্য ঐ একটুখানি ত্রুটির জন্যেই সমস্তটা ভেস্তে গেল। আগাগোড়া আলগা হয়ে বেফাঁস হয়ে গেল বিলকুল! আর একটু বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকে যদি, চকচকে মোড়কে মোড়া টুথপেসটের একটা প্যাকেট দোকানের ক্যাশমেমো সমেৎ নিজের পকেটে মজুত রাখতে পারত—তাহলে বলতে কি, ওকে আমি একটি উদীয়মান প্রতিভা বলেই আখ্যা দিতে পারতাম। ওর জন্যে আর ভাবনা ছিল না তাহলে! নিজের লাইনেই ও খেতে পারত!'

আস্তে আস্তে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে ওঠেন—এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নজর পড়ে বেঞ্চির তলায়, মোড়কে মোড়া দীর্ঘাকৃতি—কী ওটা? একটি টুথপেস্টই তো বটে! দোকানের ক্যাশমেমো জড়ানো, সদ্যকেনা যে তাতে কোনো ভুল নেই! বোঝা গেল, ছেলেটি যে সময়ে গাঁ-ঝাঁকি দিয়ে ঝুপ করে বেঞ্চে এসে বসেছিল, ঠিক সেই সময়েই ওটা ওর পাঞ্জাবির পকেট থেকে টপকে ধরাশায়ী হয়েছে।

ভর্তৃহরি অর্ধস্ফুট একটু আর্তনাদ করেন। ওঁর আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়। মানুষকে ল-সা-গু-র আঁকের মতো যতোটা সোজা মনে করেছিলেন তত সোজা নয়—মানুষের জীবনও গোলোকধাঁধার মতো বেশ একটু জটিল বলেই তাঁর বোধ হয়।

'নাঃ, ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হল। এই অজানা শহরে, অপরিচিত নির্বান্ধব জায়গায় নিরাশ্রয় হয়ে, অসহায় অবস্থায় কোথায় না জানি ঘুরে মরছে এখন।'

এধারে ওধারে চারিধারে খুঁজতে খুঁজতে যখন প্রায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে তিনি উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে দেখতে পেলেন সেই ছেলেটিই জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে টাল খেতে খেতে, ওধারের মোড় ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে এধার-পানেই আসবার চেষ্টায় রয়েছে।

'ওহে, শোনো শোনো'!—সাইরেনের আওয়াজের মতো ভর্তৃহরির একখানা ডাক!

যুবকটি উদ্ধতভাবে ফিরে তাকালো।

'তোমার গল্পের প্রধান সাক্ষী এসে পৌঁছেচে!' এই বলে তিনি প্যাকেটে আটকে—টুথপেস্টটা হাত বাড়িয়ে দিলেন

'এই নাও তোমার টুথপেস্ট! বেঞ্চির তলাতেই পড়েছিল। যখন তুমি ওখানে বসেছিলে তারই এক ফাঁকে ওটা হয়তো তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছিল। তোমার অজান্তেই—তুমি চলে আসবার পর উঠতে গিয়েই নজরে পড়ল আমার। যাক, যাকগে যেতে দাও। তোমাকে অযথা

সন্দেহ করেছি বলে কিছু মনে কোরো না। এই নাও, এখন এই গোটা দশেক টাকা হলে যদি তোমার চলে—'

এই বলে, ভর্তৃহরি তাঁর পকেট হাতড়ে, নোটে টাকায় রেজকিতে এবং খুচরো খাচরায় মিলিয়ে যা ছিল সব ঝেড়ে ঝুড়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিলেন—

'—যদি এখনকার মতো তোমার চলে যায়, আপাততঃ একটা হোটেল দেখে ওঠা আর বাড়িতে তার করে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করো—এবং আমার ন্যায় অবিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তির কাছ থেকে টাকাটা নিতে—অবিশ্যি ঋণ হিসাবেই নিতে...তোমার তেমন আপত্তি না থাকে।'

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে টাকাটা পকেটস্থ করে তাঁর সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দ্যায়।

'—আর এই আমার কার্ড। এতে আমার ঠিকানা আছে।' ভর্তৃহরি বলে চলেন 'এই সপ্তাহের মধ্যে, বা পরে যখন হয়, বাড়ি থেকে তোমার টাকা এসে পৌঁছলে, তার পরে সুবিধা মতো যে কোনোদিন এই টাকাটা ফিরিয়ে দিলেই চলবে। আমার ঠিকানায় এম-ও করে দিতেও পারো। আর, এই নাও তোমার টুথপেস্ট! ভালো করে রাখো! আবার যেন কোথাও হারিও না! এই প্যাকেটটা তোমার বিশ্বস্ত বন্ধুর মতই কাজ করেছে। খাঁটি বন্ধুরা যেমন ছেড়ে চলে গেলেও—দুঃসময়ে ঠিক ফিরে আসে। আসলে এরই কাছে—এর সদ্ব্যবহারের কাছে তুমি ঋণী।'

'ভাগ্যিস, টুথপেস্টটা, আপনি পেয়েছিলেন!' এই বলে ছেলেটি তো তো করে কী দু একটা কথা যেন বলতে গেল। খুব সম্ভব ধন্যবাদের ভাষাই হবে। এবং তার পরেই সে যে ধার থেকে এসেছিল রাস্তা উৎরে ফের সে দিকেই চোঁ চোঁ করে দৌড় মারলো।

'বেচারি!' ভর্তৃহরির মুখ থেকে বার হল আবার তরুণ যুবকটির উদ্দেশেই। ওপর ওপর দেখে আর কক্ষনো আমি মানুষকে বিচার করব না। প্রায়ই ভারী ভুল হয় তাতে। উঃ, কী বিপদটাই না হোতো আজকে। আমার ঠিক না হলেও ছেলেটির তো বটেই। কী অসুবিধেই না পড়ত বেচারা! নাঃ মহামতি শেকসপীয়ার যথার্থই বলেছিলেন—হেরোশিয়োকে না কাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিলেন। জীবন যে কী বিশ্রী রকমের জটিল, মানুষ যে কতদূর রহস্যময়!'

ভাবতে ভাবতে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পায়চারি করতে করতে আবার তিনি পার্কের মধ্যে ফিরে আসেন। গোলদিঘিতে আরো দু একটা চক্কর মেরে, গাড়ি ধরে এবার বাড়ি ফিরবেন। ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরপাক খাবার মুখে, সেই আগের বেঞ্চির কাছাকাছি আসতেই একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য তিনি দেখতে পান। এক ব্যক্তি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে বেঞ্চির নীচে, আশেপাশে, চারিধারে ভারী উঁকি ঝুঁকি মারছে।

দেখবামাত্র লোকটিকে তিনি চিনতে পারেন। ছেলেটির বেঞ্চি অধিকারের আগে, এই লোকটিই, তাঁর পাশের স্থান দখল করে বসেছিল।

'আপনার কি কিছু হারিয়েছে নাকি?' ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করলেন। 'কী খুঁজছেন অমন করে?'

'হ্যাঁ মশাই, এইমাত্র কেনা—', লোকটি আর্তকণ্ঠে জানায় 'একটা টুথপেস্টের প্যাকেট!'

বলা বাহুল্য, সামলাতে ভর্তৃহরির বেশ একটু সময় লাগে।

মানুষ সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার প্রতিও আস্থা আর ততটা সুদৃঢ় নেই, এমন কি নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকেই নতুন এক জীবন-দর্শন রচনায়, কেবল রচনা কেন, মনের মধ্যে

তার মুদ্রণে, পুনর্মুদ্রণে আর পুনঃপুনঃ প্রুফ-সংশোধনে যে সময়ে তিনি মশগুল হয়ে আছেন সেইকালে সে-সমস্ত সবকিছুর ভিত্তিমূল টলিয়ে দিতে এ আবার এক নতুন নিদর্শন?

আধাবয়সী লোকটি তাঁর চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দ্যায় 'টুথপেস্টের জন্যে তত না, ওটা হারালে তেমন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর মধ্যে—ওই প্যাকেটের ভেতরে, আমার মাইনের'—বলবে কিনা, বলে কী লাভ হবে ইত্যাদি ভেবে লোকটা নীবর হয়ে যায়।

'কখানা নোট ছিল?' ভর্তৃহরি জিজ্ঞেস করেন।

'আটখানা দশ টাকার নোট, এ মাসের মাইনের প্রায় সবটাই। টুথপেস্ট কিনে ভাবলুম, যা পকেট মারা যায় আজকাল! নোটগুলো ওর প্যাকেটের মধ্যে পুরে রাখলে নিরাপদ হবে। এই মনে করে রেখে দিয়েছিলুম।'

'আপনার বুঝি পঁচাশী টাকা মাইনে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রায় ঠিক ধরেচেন। নিরানব্বই টাকার সামান্য কেরানি আমি। আঠারো টাকা ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম জমা দিয়ে একাশী টাকা মোটে ছিল।' ভদ্রলোক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন 'কিন্তু আর একটি আধলাও আমার কাছে নেই। বাড়তি টাকাটা দিয়ে ছেলের জন্য টুথপেস্ট কিনেছিলাম।'

'হুঁ।' ভর্তৃহরি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'দেখুন আপনার টাকাটা খোয়া যাবার জন্যে আমিই দায়ী! গলাটা ঝেড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে সুরু করলেন ভর্তৃহরি আচ্ছা, আপনি আমার বাড়ি চলুন। আমি ক্ষতিপূরণ করবো। আমি অবশ্য একটু দূরেই থাকি। কলকাতার কাছাকাছিও বটে আবার বাইরেও বলা যায়—এই ডায়মন্ডহারবার রোডে। তা, আমার মোটর রয়েছে, যাবার সময়ে আপনার অসুবিধা নেই—আর ফেরবার সময় ট্যাক্সি ভাড়াটা আমি দিয়ে দেব।'

নিমজ্জমান লোকটি যেন দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে—দেবতা না হলেও একজন মহাপুরুষ তো বটেই—এবং 'মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন' সেই একমাত্র গন্তব্য পথ অনুসরণ করে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর মোটরে গিয়ে ওঠে।

ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে ভর্তৃহরির মোটর হু হু কর ছুটছে। শহর ছাড়িয়ে—শহরতলী পার হয়ে—একখানা পীচ ঢালা পথের বুকের ওপর দিয়ে। দুধারেই ফাঁকা—নির্জন রাস্তা এবং মাঝে মাঝে এক আধখানা বাড়ি! বাগান বাড়িই বেশির ভাগ।

ভর্তৃহরি বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে বসে—মুখ বুজে চুপটি করে সেই আত্মহারা সর্বস্বান্ত ভদ্রলোক!

হঠাৎ ভর্তৃহরির কেমন একটা খটকা লাগে, কেমন যেন সংশয় জাগে, তিনি পার্শ্ববর্তীর দিকে একবার ভ্রূক্ষেপ করেন। তার পরেই কুটিল একটা কটাক্ষ বা চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসে। লোকটাকে যেন কুটি কুটি করে কাটে সেই চাউনিটা।

এই টুথপেস্ট হারা লোকটি সেই গৃহহারা যুবকটির মাসতুতো ভাই নয় তো?

সন্দেহ হতেই তিনি নিজের বাঁ পকেট হাত পুরে দ্যান—হুম! ঠিক! ঠিকই তো! অবিকল—যা ভেবেছেন!

তাঁর সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়!

অমনি ডান পকেট থেকে তাঁর রিভলবার বার হয়ে আসে।

(গোয়েন্দার পকেটে আর কিছু থাক বা না থাক, পিস্তল আর হাতকড়া প্রায় সমসময় মজুদ থাকে।)

লোকটিও অমনি একটিও কথা না বলে নিজের পকেট থেকে ঘড়ি চেন সব বার করে দ্যায়। বিনাবাক্যব্যায়ে!

ভর্তৃহরি ঘড়ি চেন পকেটস্থ করতে করতে ভাবেন হুঁ, যা ভেবেছি। পৃথিবী কি আর পালটায়? রাতারাতিই পালটায় নাকি? এতদিনের পৃথিবী একদিনে পালটাবার নয়। সব মানুষই প্রায় সেই রকমই হয়ে গেছে। আগের মতই দাগী।...দেখি, হাত দেখি।

ডান পকেট থেকে হাতকড়ি মুক্ত করে পার্শ্ববর্তীর মুক্ত করে পরিয়ে দিতে তাঁর দেরি হয় না। তারপরে, মোটর থামিয়ে, লোকটাকে পথের মাঝখানেই তিনি নামিয়ে দ্যান। পত্রপাঠ তৎক্ষণাৎ! দয়া করে পুলিশে আর দ্যান না, হাতকড়ি হাতে মরুকগে ব্যাটা ঘুরে ঘুরে! ঐভাবে করজোড় অতখানি পথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরাটাই কি ওর কম শাস্তি হবে?

তাছাড়া, তিনি ভেবে দেখেন, ঐ রকম একটা আসামীকে নিজের ল্যাজে বেঁধে সরকারী ঘাঁটিতে পাকড়ে নিয়ে যাওয়াটাই কি কম দুর্ভোগ হোতো এখন? এবং তাছাড়াও, তাঁর মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার ট্যাক থেকেই চেন ঘড়ি খোয়া যায়, নিজের এতবড় বাহাদুরির পরিচয় থানা পুলিশে জানাবার তাঁর গরজ?

ভণ্ড কেরানিটিকে, নিজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সুযোগ সহ, বিপথে বিসর্জন দিয়ে, চিন্তাকুল চিত্তে তিনি গাড়ি হাঁকাতে থাকেন 'অ্যাঁ পৃথিবীর হল কী? মানুষরা সবাই যদি দাগী হয়ে যায়, প্রায় সকলেই যদি চোর ছ্যাঁচোড় বনে' গিয়ে থাকে, তাহলে তিনি একলা ভালো মানুষ হয়ে, একাকী সৎলোক কতো দিক আর সামলাবেন?'

ভাতে তিনি ঘাবড়ে যান।

অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি ভাবেন, ভেবে দ্যাখেন, যাক, তাঁর জানাশোনার ভেতরে একজনও যে সাধু ব্যক্তি তবু আছে, অসাধু সঙ্কুল ঘড়ি চোরদের ধরিত্রীতে এখনো যে টিকে রয়ে গেছে,—তিনি নিজেই রয়েছেন!—এইটাই কি বড় কম কথা? কম বড় কথা কি? একথা ভাবতেও কতখানি আরাম!

পৃথিবী অষ্টম পরমাশ্চর্য, সেই একমাত্র অভিব্যক্তির সম্বন্ধে সগর্ব ধারণা নিয়ে, (আয়নার অভাবে তার দর্শনলাভের কোনো উপায় তখন ছিল না), গৌরবের জয়পতাকা বহন করে ভারাক্রান্ত মনে তিনি বাড়ি ফেরেন।

চৌকাঠের ওধারে পা না বাড়াতেই তার ছোট ছেলে সত্যহরি ছুটে এসেচে।

'বাবা, বাবা! তোমার চেনঘড়িটা আজ তুমি নিয়ে যাওনি যে? তুমি তো বলো তোমার কোনো কাজে কখনো ভুল হয় না? তোমার নাকি দিব্য দৃষ্টি! ভগবানের মতই সবকিছু টের পাও? তবে আজ কেন এমন ভুলে গেলে? টেবিলের ওপরেই পড়ে রয়েছে দ্যাখো গে! তখন থেকেই পড়ে আছে, না, না, তুমি ভয় খেয়ো না বাবা। আমার অনেকবার ইচ্ছা হয়েছিল বটে কিন্তু ওটাকে আমি মেরামত করিনি। ভালো ঘড়ি মেরামত করে কি হবে? ভালো ঘড়িকে তার কল কব্জা খুলে অবিশ্যি আরো ভালো করে সারানো যায় কিন্তু ভালো ঘড়ি সারাতে গেলে তুমি রাগ করো যে! তুমি যে বলো ভালো ঘড়ি কখনো সারানো যায় না। শুধু একেবারে হারানো যায়। তাই ওর ঢাকনি টাকনি কোনো কিছু আমি খুলিনি একটুও কিচ্ছু করিনি, তুমি বাজিয়ে দেখতে পারো।'

বিষের বিষ

সৈয়দ মুজতবা আলী

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা—ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাত-সকাল ভোর বেলা থেকে ক্যাট্‌ক্যাট্‌ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়হাভাতে' ড্যাকরা' —হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশ বার শুনতে হয় না। আর গয়না-গাটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয় সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপর যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বিবিজানের নেই? আগা আহমদ দিন-মজুর; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের বিশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেলতেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়া বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি কাবাব আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো, ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অনন্ত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যাভিচার'। আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকাল বেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বলল, 'গা টা ম্যাজ ম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোঁচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো, 'কোজ্জাবো, মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছ।'

আগা আহমদ্ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নৎ করে গা গতর পানি করে গর্তটা তৈরি করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিলে এক মোক্ষম ধাক্কা। তারপর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটি উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহমদ তার পীর মুরশিদকে 'শুকরিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক—তার বউতো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয় নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশ্‌মনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহম্মদও তাই করলে। 'যাক্‌গে, ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটি গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার: 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এতো মালিকা খনমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা মহম্মদ দেখে—বাপরে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর-গোখরো সাপ' সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি আমি তোমাকে রাজা করে দেব।

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে অত ভয় কিসের!'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধ্যাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা আমি মদ্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে একটা ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাতলক্ষ কালনাগিনী তৈরি হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন ওঝা? ওসব পাগলামো রাখো। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোল। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেবো। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয় সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানেমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—একরাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো বড় কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নীচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানের তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, 'গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজের পথ তোমাকে আমি বাৎলে দিচ্ছি, শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরব আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাব ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তর এনাম, এস্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রামনাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুলকালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে না যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে এসে পৌঁছাল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা মনসার বাপ।

প্রথমটায় তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হদ্দ হল, এখন ফার্সী পড়ে আগা? কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরি—সে চিকিৎসা ডোমই করুক, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্র সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তার পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তাছাড়া এখন তার বিস্তর দাসী-বাঁদী। ওদের তম্বী-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন সাপ?—সেই সাপটাই হবে আর কোনটা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে, অতি লোভ ভালো না—সাপ সরাতে একবারের বেশি না যায়। সে যতই অমত জানায় ইয়ার বক্সী ততই বলে, 'হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়।'

আগাকে জোর করে পাল্কীতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাই বড্ড বেড়েছে না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশি আসবে না। তবু যে এসেছ? তা সে যাক্‌গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে তোমাকে মারব ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচ শ ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মতো শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে। স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতয়াল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার মুকুট। চলো শিগগির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহর-দারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়ালনন্দিনী, অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিস হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুল্লে বিষ।'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছো, তাই তোমার একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বিবি মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এখুনি এসে

পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো—হেঁ, হেঁ—তাই ভাবলুম তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি—তুমি আমার—'

'বাপরে মারে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবন যাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাঈ-তে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটার মরাল' কি, বলো তো।'

আমি বললুম 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ায় নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছেন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা-তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল থাকে। এই যে রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবার, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছ। অন্য 'মরাল'টা গভীর—খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে কোন কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তারপরেই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ করতে না পারো। অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মতো বিষ থাকে তবে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, ক'জনের আছে ও-রকম বউ?'

মাহুরি কুঠিতে এক রাত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ট্রেনে যেতে যেতে ব্যাপারটা যতই ভেবে দেখছিলাম ততোই আরো অদ্ভুত লাগছিলো! বাস্তব ঘটনা অবশ্য অনেক সময়েই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে বিস্ময়কর হয় জানি, তবু যেন এই ব্যাপারটায় বিশ্বাস করতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হচ্ছিলো না।

দু'দিন আগেই বিমলের সঙ্গে আমার মেসের ঘরে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে তুমুল তর্ক করেছি। শেষ পর্যন্ত এ বয়সের তর্কাতর্কির যা পরিণাম হয় তাও আমাদের বচসায় হয়েছে। দু'জনেরই জেদ ও রাগ বেড়ে গেছে এবং পরস্পরকে যা তা বলে যুক্তির অভাব পূরণ করেছি।

আমি বলেছি, 'যেমন ছাতুখোরের দেশে জঙ্গলের মাঝে থাকিস তেমনি জংলী বুদ্ধিও হয়েছে।'

বিমল বলেছে—'শহরের মাঝখানে ইলেকট্রিক লাইটের তলায় বসে বারফাট্টাই মারতে সবাই পারে। এক-রাত ভেরেণ্ডির জঙ্গলের ধারে মাহুরি কুঠিতে কাটাতে পারলে বুঝতাম।'

হেসে উঠে বলেছিলাম—'কাটাবার কি দরকার! তোর ভূত, শহর আর ইলেকট্রিক লাইটকেই বা ডরায় কেন? বেছে বেছে যত পোড়ো বাড়ি আর জঙ্গলে না থেকে সেই তো এখানে এলে পারে!'

বিমল চটে উঠে জবাব দিয়েছে—'তার দায় পড়েছে! তোর কাছে ভূত আছে এ-কথা প্রমাণ করার জন্যে তার তো কোনো মাথাব্যথা নেই!'

বিমলকে আরো রাগিয়ে দিয়ে বলেছি—'তার না হোক তোর তো আছে। তুই নিজে কি কোনদিন মাহুরি কুঠিতে থেকে দেখেছিস!'

বিমল বলেছে—'এখনো রাত কাটাইনি তবে বাইরে থেকে যা দেখেছি তাই যথেষ্ট!'

আমি এ-কথার উত্তরে এমনভাবে বিদ্রূপের স্বরে 'ওঃ'! বলেছি যে বিমল মর্মাহত হয়ে চুপ করে গেছে।

খানিক বাদে গম্ভীর মুখ শুধু বলেছে—'সাহস থাকে তো সেখানে যাস।'

আমি ব্যঙ্গ করে বলেছি—'গেলে, অন্তত মাহুরি কুঠির বাইরে থাকবো না।'

পরের দিন সকালে অবশ্য আমাদের এই তর্ক নিয়ে মন কষাকষির কোনো চিহ্ন আর ছিলো না। বিমল সকালের ট্রেনেই তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। আমি স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। আগের রাতের তর্কের কথা দু'জনে একবার ভুলেও উত্থাপন করিনি।

কিন্তু কে জানতো সে তর্কের জের অমন করে মেটাবার নয়। দু'দিন বাদেই আমাকে সত্যিসত্যিই ভেরেণ্ডির জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়তে হবে তাই বা কে ভেবেছিলো।

বিমল চলে যাবার পর একটা রাত পার হতেই দুপুরবেলা হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। বিমল মরণাপন্ন, এখুনি আমার যাওয়া দরকার।—টেলিগ্রামের মর্ম-এই।

যাওয়া যে দরকার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছোটোনাগপুরের একটা নগণ্য স্টেশনে নেমে মাইল দশ-বারো গেলে ভেরেণ্ডির জঙ্গল পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের মাঝখানে একটা পুরানো তামার খনিকে নতুন করে আবিষ্কার করে আজ দু'বছর বিমল কাজ করছে। সে নির্বান্ধব পুরীতে যে সমস্ত কুলি মজুর নিয়ে দিন কাটায়, সাঙ্ঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা যে কোনো সাহায্যই করতে পারবে না এটা ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম।

টেলিগ্রাম পাবার পরই বিকেলে রওনা হয়ে পড়েছি। ভেরেণ্ডির জঙ্গলে বিমলের নিমন্ত্রণ এভাবে রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে ভেবে সত্যিই অদ্ভুত লাগছিলো আর বিরক্তি লাগছিলো যেতে এমন দেরি হওয়ায়। যে স্টেশনে নেমে ভেরেণ্ডির জঙ্গলে যেতে হয়, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর সব গাড়ির কাছে সে অস্পৃশ্য। তাই বাধ্য হয়ে প্যাসেঞ্জারেই চাপলেও তার শামুকের মতো গতি ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। এতোক্ষণে কি যে বিপদ সেখানে হচ্ছে কে জানে! বিমল অত্যন্ত শক্ত ধাতের ছেলে। সহজে সে কাতর কিছুতেই হয় না। সেই সুদূর জঙ্গলে একলা আজ সে দু'বছর যেভাবে বাস করে আসছে, তা থেকে তার কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়! সুতরাং অত্যন্ত বিপদে না পড়লে সে যে আমায় তার করতো না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম গদাইলশকরী চালের গাড়িতে আমি সেখানে পৌছোবোই বা কখন! তাকে সাহায্যই বা করবো কি!

বিকেলবেলা যে গাড়ি রওনা হয়েছিলো, সমস্ত রাত গুটি গুটি করে চলে ভোর প্রায় পাঁচটার সময় টিনের চাল দেওয়া নিতান্ত আখ্‌খুটে চেহারার একটি স্টেশনে সে-গাড়ি আমায় নামিয়ে দিলো। প্লাটফর্ম বলতে কাঁকর-ফেলা খানিকটা জায়গা, ট্রেনের সব ক'টা পা-দানি বেয়ে সেখানে নামতে হয়।

স্টেশন নয়, মনে হলো যেন কোনো প্রান্তরে নেমেছি, শীতের রাত্রে ভোর পাঁচটার সময় বেশ অন্ধকার থাকে। তার ওপর গাঢ় কুয়াশায় স্টেশনের একটি মিটমিটে তেলের বাতি প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গেছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানব কেউ আছে বলে মনে হলো না। মিনিটখানেক থেমে গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে চলে যেতেই তার নির্জনতা আরো যেন ভয়াবহ হয়ে উঠলো। ট্রেনের আলোয় আর আওয়াজে নিজের নিঃসঙ্গতা এতোক্ষণ এমন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এ স্টেশন থেকে তো বেরুতে হবে। ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তা এখান থেকে দশ-বারো মাইল দূর—এইটুকু মাত্র জানি—কোন্‌দিকে যেতে হবে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। জিগ্যেসই বা কাকে করি! টিকিট চাইতেও তো কেউ আসে না দেখছি।

স্টেশনের অস্পষ্ট বাতিটার দিকে এগিয়ে গেলাম। স্টেশন ঘরে কোনো না কোনো লোক নিশ্চয় আছে।

'ঠরিয়ে!'

সত্যিই একেবারে আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম, মানুষ নয় যেন বাঘের গলার আওয়াজ! পেছন ফিরে কুয়াশায় ঘোলাটে একটা নীল আলো ছাড়া কিন্তু কিছুই প্রথমটা দেখতে পেলাম না। নীল আলোটা আর একটু কাছে এগিয়ে আসার পর বিশাল একটা বস্তার মতো জিনিস অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো। জিনিসটা বস্তা নয়, মানুষের মাথা। প্রকাণ্ড কম্ফর্টার ও তার ওপর

কম্বল জড়িয়ে অতোবড়ো হয়েছে। সেই কম্বল ও কম্ফর্টারের সামান্য একটু ফাঁকের মধ্যে প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ ও দু'টি জ্বলজ্বলে চোখ দেখা গেলো। শরীরের অন্যান্য অংশ অন্ধকারে অস্পষ্ট!

সত্যিই প্রথমটা কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছলাম। সেই কম্বল জড়ানো মুখ থেকে, গম্ভীর বাজখাই গলায়—'টিকিস' শুনেও যেন প্রথমে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারিনি।

আবার আওয়াজ এলো, 'টিকিস কাঁহা?'

এবার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে পকেট থেকে টিকিট বার করলাম এবং পরমুহূর্তে ভল্লুকের মতো একটা মোটা লোমওয়ালা হাত হঠাৎ অন্ধকার থেকে যেন বেরিয়ে এসে আমার হাত থেকে সেটা কেড়ে নিলো, মনে হলো।

সাহস করে জিগ্যেস করলাম—'ভেরেণ্ডির জঙ্গলের রাস্তাটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

নীল আলোটা দূরে সরে যেতে শুরু করেছিলো ইতিমধ্যে। সেটা থামালো এবং কুয়াশার ভেতর থেকে শোনা গেলো—সবিস্ময় প্রশ্ন—'কাঁহা?'

'ভেরেণ্ডির জঙ্গল, যেখানে তামার খনি আছে?'

নীল আলোটা আমার কাছে সরে এলো কম্ফর্টার ও কম্বলের বস্তার তলা থেকে দুটি চোখ আমায় তীক্ষ্ণ সবিস্ময় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, বুঝতে পালাম। ব্যাপারটা কি!

হঠাৎ 'উধর মৎ যানা' শুনে চমকে উঠলাম। এবং কিছু জিগ্যেস করার আগেই বিমূঢ় হয়ে দেখলাম লোকটা চলে যাচ্ছে। পরমুহূর্তে নীল আলোটাই হঠাৎ বোধ হয় নিবে গেলো, অন্ধকারে অন্তত আর কিছু দেখা গেলো না।

কিন্তু আমার এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। স্টেশনের সেই আলোটি লক্ষ্য করে আবার এগিয়ে গেলাম। সেই আলোর কাছেই বাইরে বেরুবার গেটটা পেয়ে তবু আশ্বস্ত হওয়া গেলো। পাশেই স্টেশনের একটি মাত্র ঘর। ভেতর থেকে টরেটক্কা টেলিগ্রাফের আওয়াজ আসছে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে কৌতূহলভরে একবার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে সত্যি বিস্মিত হলাম। একটা কুলি বা চাপরাশিরও সেখানে দেখা নেই।

বাইরেও কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার, শুধু একটা অস্পষ্ট পায়ের ধূসর ধোঁয়াটে রেখা কোনরকমে চেনা যাচ্ছে। আপাতত আর কোনো পথ না দেখতে পেয়ে সেইটিকে অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হল। খানিকবাদেই অন্ধকার কেটে গেলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না। তখন কাউকে জিগ্যেস করে নিলেই চলবে।

কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে জিগ্যেস করবার সুবিধে কিছু হল না। এরকম নির্জন পথ কোথাও আছে বলে জানতাম না। চারধারে বিশাল ঘন-জঙ্গল একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষ দূরের কথা, এই ভোরের বেলা একটা পাখির আওয়াজও সেখানে শোনা যায় না। সৌভাগ্যের কথা, জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলার দু-একটা রেখা ছাড়া এ-পথ কোথাও দু'ভাগ হয়ে যায়নি।

ঘণ্টা-চারেক চলবার পর পথ ক্রমশ ওপরে উঠেছে বুঝতে পারলাম। জঙ্গলও সেখানে আরো নিবিড়। একটা চড়াই পার হলেই দূরে একটা পাথুরে টিবির ধারে ছোটো একটি বস্তির মতো দেখতে পাওয়া গেলো। সে বস্তির পেছনে একটা বিশাল ভাঙা পেড়ো-বাড়ি পাথুরে টিবির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জঙ্গলের ওপরে মাথা তুলেছে।

কাছে গিয়ে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চিহ্ন পেয়ে বুঝলাম, সেইটেই খনি। কিন্তু এখানেও যে

জন-মানব নেই! খোলার চালের ঘরগুলো অধিকাংশই সকালবেলাও বন্ধ। টালিতে ছাওয়া বাংলো প্যাটার্নের একটি বাড়ি মধ্যে দেখতে পেয়ে সেইটেই বিমলের থাকবার জায়গা হবে মনে করে দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দরজায় মৃদু একটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেলো। সামনেই বসবার ঘর, কয়েকটা বেতের চেয়ার ও একটি টেবিল পাতা। পেছনে ভেতরের দিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে।

এঘরেও কেউ নেই।

পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পদশব্দ শুনে চমকে পেছন ফিরে তাকালাম। চমকে উঠবার কথা বটে। প্রায় ছ'ফুট লম্বা অত্যন্ত রোগা ও সরু যে লোকটি ঘরে ঢুকেছে বিজ্ঞাপনের ব্যঙ্গচিত্রে ছাড়া অমন চেহারা কোথাও চোখে পড়েনি আমার।

জিগ্যেস করলাম—'বিমলবাবু কোথায় আছেন বলতে পারো?'

'কৌন্ বাবু?'

'বিমলবাবু। আমি তাঁর অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি! কেমন আছেন এখন!'

'নিঞ্জিনিয়ার বাবু-কো মাঙ্‌তা!' বলে লোকটা হাতের ও মুখের অপরূপ একটা ভঙ্গি করলো!

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, 'নিঞ্জিনিয়ার বাবুই হল, কিন্তু তিনি কোথায়?'

লোকটা আমার দিকে খানিক অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে যা বললো, তার মর্ম বুঝতে আমার মিনিট-দুয়েক লাগলো এবং তারপর স্তম্ভিত হয়ে আমি ঘরের একটি চেয়ারে বসে পড়লাম।

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম। আমি টেলিগ্রাম পেয়ে যখন ট্রেনে রওনা হয়ে পড়েছি তখন বিমল এ-জগৎ থেকেই রওনা হয়ে গেছে। সব চেয়ে আঘাত পেলাম যেভাবে সে মারা গিয়েছে তার বিবরণ শুনে। এক হিসেবে আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। কারণ, কোনো অসুখে বিমল মারা যায়নি, তার মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যজনক।

কলকাতা থেকে ফিরে এসে বিমল বোধহয় আমার বিদ্রূপ স্মরণ করেই জেদের বশে মাহুরি কুঠিতে সমস্ত রাত একলা কাটায়। তার সঙ্গে যারা কাজ করে তার সকলেই মানা করেছিলো কিন্তু সে শোনেনি।

শেষ রাত্রে একটা অদ্ভুত গোঙানি শুনে তার বেয়ারা রামদীন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের মাঠে বিমলকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। ধরাধরি করে তাকে ভেতরে তুলে আনার পর দেখা যায় তার মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন, গায়েও নানা জায়গায় দাগ আছে। সে নিজেই পড়ে যাক বা কেউ তাকে ফেলে দিয়ে থাকুক, কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ার দরুন যে তার মাথায় দারুণ চোট লেগেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর সকালের দিকে আধঘণ্টাটাক তার জ্ঞান হয়েছিলো, সেই সময়েই সে আমায় টেলিগ্রাম করতে বলে। কিন্তু তারপর উন্নতির বদলে ক্রমশ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিকেল চারটের সময় সে মারা যায়।

এদেশের লোকের, বিশেষতঃ অশিক্ষিত কুলি-মজুরদের কুসংস্কার অত্যন্ত বেশি। তাদের ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে ভূতেই যে ফেলে দিয়েছে এ বিষেয়ে তাদের কোনো সন্দেহ নেই, সেইজন্য বিমলের মৃত্যুর পর তার সৎ-কার করেই তারা সদলবলে খনির বস্তি থেকে চম্পট দেয়।

আমি সেইজন্যেই সকালে এসে কাউকে কোথাও দেখতে পাইনি। বেচারা রামদীনও

পালিয়েছিল। যাবার সময় তবু বুদ্ধি করে সে স্টেশনে আমার ঠিকানায় আর একটা তার করে দেয়। আগেই রওনা হবার দরুন আমি সে তার পাইনি। যে স্টেশন মাস্টার সে তার নিজের হাতে পাঠিয়েছিলো তার অদ্ভুত আচরণের ও কথাবার্তার মানে যেন একটু বোঝা গেলো!

যার কাছে সমস্ত খবর পেলাম, ব্যঙ্গচিত্রের মতো চেহারার অদ্ভুত সেই লোকটিই রামদীন। আজ সকালবেলা সে সাহস করে বাবুর জিনিসপত্রের তদারক করতে কিংবা চুরির মতলবে, যে কারণেই হোক 'নিঞ্জিনিয়ার' বাবুর কুঠিতে এসেছে।

সমস্ত ব্যাপার শোনার পর আমার মনের অবস্থা যা হলো তা বর্ণনা করা অসম্ভব। বিমলের এ পরিণামের কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু এ ব্যাপারের পর চুপ করে চলে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। ভূতই হোক আর যাই লোক, এ ব্যাপারে রহস্য ভেদ আমাকে করতে হবে। আমার সঙ্কল্প আমি তখনই ঠিক করে ফেলেছি।

ভেরেণ্ডি জঙ্গলি থেকে নিকটস্থ থানা প্রায় এক বেলার পথ। দুপুরে রামদীনকে দিয়ে সেখানে খবর পাঠিয়ে আমি রাত্রের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আর কিছুর জন্য না হোক অন্তত বিমলের কাছে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যেই মাহুরি কুঠিতে আমাকে এক রাত কাটাতে হবে। তার জন্যে আয়োজন অবশ্য বেশি কিছু করবার নেই। শুধু একটা জোরালো বৈদ্যুতিক টর্চ ও একটা ছোট লোহার রডই আমি সঙ্গে নেবো ঠিক করলাম।

সন্ধ্যের আগে রামদীনের ফিরে আসবার কথা, কিন্তু রাত প্রায় সাতটা হয়ে গেলেও তার কোন পাত্তা পাওয়া গেলো না। মুখে আমায় কথা দিলেও ভূতের ভয়ে সে শেষ পর্যন্ত সরে পড়েছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু পুলিশের লোকেরও কোথায় দেখা নেই কেন! রামদীন কি থানায় খবরও তাহলে দেয়নি?

জঙ্গলের মাঝে পরিত্যক্ত খনির বস্তিতে আমি সম্পূর্ণ একা। রাত ন'টা বাজবার পর আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পুলিশের লোক আসুক বা না আসুক মাহুরি কুঠি বেশি দূরে নয়। দিনের বেলা বাড়িটিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। প্রকাণ্ড দোতলা দু'মহলা কুঠি, কি খেয়ালে যে এখানে এতো বড় বাড়ি কেউ নির্মাণ করেছিলো বোঝা কঠিন। বাড়িটির অবশ্য অত্যন্ত ভগ্নদশা। বড়ো বড়ো গাছ তার দেওয়াল ভেদ করে বেড়ে উঠেছে। বাইরের দিকের ঘরগুলোর জানলা দরজার চিহ্ন আর নেই। এই শুকনো দেশেও ভেতরের ঘরগুলোতে শ্যাওলা ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। ভাঙা দেউড়ি দিয়ে বাইরের মহল পার হয়ে গেলে বিশাল যে সমস্ত গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য ঘর পাওয়া যায়, দিনের বেলাতেও সেগুলো অন্ধকার। দরজা জানলা অধিকাংশেরই নেই, যেগুলোর আছে সেগুলোও কবজা থেকে খুলে পড়েছে। আসবাবপত্র অনেক ঘরে এখনো অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় টিঁকে আছে শুধু বোধহয় ভূতের ভয়ে চোরও সেখানে প্রবেশ করেনি বলে।

অমূলক ভয় আমার নেই। তবু টর্চ হাতে বাইরের দেউড়ি দিয়ে মাহুরি কুঠিতে প্রবেশ করার সময় নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা ছমছম করে যে উঠেছিলো তা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। এমন গাঢ় জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় আমার সত্যি কখনও হয়নি। টর্চের আলোতে যেন সবলে তাকে কেটে বেরুতে হচ্ছে। বাইরের মহলের ওপর নীচের সমস্ত ঘরগুলো ঘুরে দেখে ভেতরের মহলে ঢুকলাম। নীচের ঘরগুলোর দুর্দশা অত্যন্ত বেশি। আগাছায় মেঝে প্রায় ছেয়ে গেছে। ইঁট

সুরকি পাথর জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে স্তূপাকার হয়ে। ঘরগুলোতে ঢোকাও বিপজ্জনক। সে সমস্ত ঘর ছেড়ে এবার ভগ্নপ্রায় সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। দোতলায় ঘরগুলো এখনও অনেকটা ভালো অবস্থায় আছে। একটার পর একটা টর্চের আলোয় ভালো করে পরীক্ষা করে যেতে যেতে কিন্তু অস্বাভাবিক কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। বিমলের মৃত্যুর রহস্য এ বাড়ির সঙ্গে জড়িত না থাকলে অনায়াসে মনে করা যেতো যে, নেহাত কুসংস্কারের দরুণ এখানকার লোক এই বাড়িটিকে এমন বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

বাড়িটির একটি বিশেষত্ব অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি। ঘরগুলো এমন বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো সেখানে দরজা ঘুলঘুলি এমনভাবে ছড়ানো যে, সবসুদ্ধ একটা বিরাট গোলকধাঁধা বলে মনে হয়। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যেতে যেতে পথ গুলিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা এখানে অত্যন্ত বেশি।

সত্যি সত্যিই গুলিয়ে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছিল। খানিক আগে যে ঘর ছেড়ে গেছি সেই ঘরেই আবার ঘুরে এসে সবিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ওপরে ওঠবার সিঁড়িটাও যে ঠিক কোনদিকে হবে বুঝতে পারছিলাম না।

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাথাটা ঠিক করে নিয়ে আবার এগুতে যাব এমন সময় পায়ে যেন একটা কি ঠেকলো। টর্চের আলো সেখানে ফেলে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলাম। জিনিসটা আর কিছু নয়। একটা চত্রমড়ার ব্যাগ, কিন্তু এ ব্যাগটির সঙ্গে আমি পরিচিত। কলকাতায় বিমলের কাছে আমি এটা দেখেছি এবং তার সুন্দর চামড়ার কাজের প্রসংসাও করেছি।

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতরে এক খোপে সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া কড়কড়ে নতুন দশ টাকার নোট। আর একটা খোপে খুচরো কয়েকটা পয়সা ও একটা ছোট কাগজের টুকরো। এ কাগজের টুকরোটা দেখেই আমি চিনলাম, নিজের হাতে বিমলকে এই কাগজে আমার ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম।

বিমল তার মৃত্যুর আগের রাত্রে এই ঘরে যে ঢুকেছিলো এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাগ তার পকেট থেকে পড়লোই বা কি করে! এবং কোনো শত্রুর হাতে যদি তার প্রাণ গিয়ে থাকে তাহলে তারা এ ব্যাগ ছোঁয়নিই বা কেন!

টর্চের আলোয় ঘরটা এবার আমি খুব ভালো করে তন্ন তন্ন করে দেখলাম। ঘরটি আকারে বেশ বড়ো, অন্যান্য ঘরের চেয়ে আসবাবপত্রও একটু বেশি—দু'টি ভাঙা তক্তপোশ, একটা ভাঁঙা টেবিল। দেয়ালে লাগানো একটা কাঠের উইয়ে-খাওয়া বড়ো আলমারি ছাড়া খুচরো আরো অনেক জিনিস ঘরময় ছড়ানো। কিন্তু বিমলের আর কোনো চিহ্ন সেখানে পেলাম না। এমন কি কাল যে সে এখানে ছিলো তার কোনো পরিচয়ও নয়।

তবু এ ঘরেই রাতটা কাটাবার সঙ্কল্প আমি তখন করে ফেলেছি। রাত কাটাবার ব্যবস্থা আমার করাই ছিলো, পকেট থেকে মোমবাতি বার করে ভাঙা একটা তক্তপোশের ওপর রেখে জ্বেলে ফেললাম। টর্চের আলো তো সারারাত জ্বালানো যায় না।

বাতিটা জ্বেলে তক্তপোশের ওপর বসতে গিয়ে কিন্তু উঠে পড়তে হল। পাশের ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে কি একটা ভারী জিনিস পড়ে যাবার শব্দ। এতক্ষণ এই পোড়ো বাড়িতে এ ধরনের কোনো শব্দ কিন্তু শুনিনি।

টর্চটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে কিন্তু প্রথমে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলাম, হুড়মুড়

করে পড়বার মতো কোন জিনিস সেখানে নেই। অথচ আমি স্পষ্ট শব্দ শুনেছি। হতভম্ব হয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আবার আগের ঘরে ফিরলাম। বাতিটা কেমন করে ইতিমধ্যে নিভে গেছে কে জানে! দেশলাই বার করে আবার সেটা জ্বালতে গিয়ে জ্বালা আর হল না।

বাইরের বারান্দায় চটি পায়ে দিয়ে ছটফট করে চলার স্পষ্ট শব্দ। ঝড়ের মতো এবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। টর্চ ফেলবার আগেই কিন্তু শব্দটা থেমে গেছে। টর্চ ফেলে অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি দুটো মান্ধাতার আমলের শুকনো চিমড়ে ছেঁড়া বেহারী চটি সেখানে পড়ে রয়েছে।

না, ভয় তখনো আমি পাইনি, বরং কোনো দুষ্ট লোকের কারসাজি যে এর ভেতর আছে সেই সন্দেহই আমার তখন দৃঢ় হয়েছে। সে কারসাজির সমুচিত শাস্তি দিতে হবে!

চটি দুটো হাতে করে তুলে নিয়ে আবার ঘরে ফিরলাম এবং বাতি জ্বেলে গ্যাঁট হয়ে ভাঙা তক্তপোশের ওপর বসলাম—ঘটনার পরিণতি দেখার জন্যে। ভূতুড়ে চটি যদি হয়ে তো আমার চোখের সামনেই চলুক দেখি! মিনিট-দশেক কোনো কিছুই হল না। ভূতুড়ে চটির ক্ষমতার বহর দেখে নিজের মনেই হাসছি এমন সময় সত্যিই সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

চুপি চুপি আমার পেছনে কে যেন স্পষ্ট আমার নাম ধরে ডাকলো একবার!

মোমের বাতিতে ঘরে তেমন আলো না হলেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পেছনে কেউ কোথাও নেই। তবে এ শব্দ কোথা থেকে এলো!

আমার মনের ভুল? কিন্তু মনের এরকম ভুল হওয়াও তো ভালো লক্ষণ নয়। ভয় পেয়ে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যায় তারাই চোখে নানারকম ভুল দেখে, কানে নানারকম আওয়াজ শোনে বলে তো জানি।

না, আরো সতর্ক ও সজাগ হয়ে থাকতে হবে এবার। নিজের মনের ভুলে ভয় পাওয়ার মতো লজ্জাকর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। এতোক্ষণ শুধু ঘরগুলো ঘোরাফেরা করতেই কেটে গেছে বুঝতে পারিনি। শীতকালের ভোর হতে এখনো প্রায় ছ'ঘণ্টা বাকি। এই ছ'ঘণ্টায় শুধু ঘুমে চোখ না জড়িয়ে আসে এইটুকু দেখতে হবে! বসে থাকলে ঘুম আসে বলে পায়চারি করবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু আশ্চর্য আমার প্রত্যেক পা ফেলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে যদি কারুর পায়ের শব্দ হয় তাহলে তার চেহারাখানা কি রকম তা কল্পনা করাও কঠিন। বারান্দায় একটা হাতি হাঁটলেও বোধহয় অমন শব্দ হতো না।

পায়চারি করতে করতে ইচ্ছা করে একবার থমকে দাঁড়ালাম। বাইরেরও শব্দ গেলো থেমে। আবার চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সে শব্দ শোনা গেলো।

আবার বাইরে ব্যাপারটা দেখতেই যেতে হল। টর্চ নিয়ে সমস্ত পথটা কিন্তু তন্ন তন্ন করে বৃথাই খুঁজে দেখলাম।

ফিরে এসে দেখি আবার আলো গেছে নিভে। না, ব্যাপারটা ক্রমশই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশলাইটা বার করেছি এমন সময়—

'আলো জ্বেলো না, ভূপেন!'

মিথ্যে বলে লাভ নেই, সমস্ত শিঁড়দাড়া বেয়ে একটা বরফ গলানো জলের স্রোত নেমে গিয়ে সমস্ত শরীর অবশ করে দিলো। এ স্পষ্ট বিমলের গলা!

খানিকক্ষণ শুকনো গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুল না, তারপর জড়িতস্বরে কোনো রকমে বললাম—'কে তুমি?'

'আমি! আমি বিমল! দোহাই তোমার, আলো, জ্বেলো না।'

'কেন?'

'তাহলে আমার এখানে থাকা হবে না। তোমাকে দুটো কথা বলে যেতে চাই, তাও বলতে পারবো না। তুমি ভয় পেয়েছো, ভূপেন?'

ধরা গলায় ঢোক গিলে বললাম—'না।'

'তাহলে বসো, টর্চ না জ্বেলে এগিয়ে এসে তক্তপোশটায় বসো।'

আমি হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোশটায় এসে বসলাম।

অন্ধকারে আবার শোনা গেলো—'তুমি আসাতে কি খুশি যে হয়েছি বলতে পারি না!'

কথাটা শুনে নিজে যথেষ্ট খুশি না হলেও বললাম—'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ, তুমি না এলে আমায় এইখানে কতোকাল বন্দী হয়ে থাকতে হতো কে জানে!'

'কেন?'

'দুটো দরকারী কথা না বলে আমি পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারছিলাম না।'

'পৃথিবী ছেড়ে কোথায়?'

খানিকক্ষণ কোন উত্তর পাওয়া গেলো না। আবার জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় বললে না?'

'সে কথা জানতে চেয়ো না, তোমাদের জানবার অধিকার নেই।'

'ও, কিন্তু তুমি কি বরাবর এখানে আছো?'

'বরাবর। যতোক্ষণ তুমি এসেছো তোমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন একটু তোমার পাশে বসবো?'

তাড়াতড়ি বললাম—'না না না, কি দরকার। কিন্তু ওসব শব্দটব্দ কি করছিলে?'

'আমি! না না, আমি নয়, ও ওরা সব করছে!'

সভয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম—'ওরা।'

'হ্যাঁ ওরাও আছে, ওরা ওই রকম করতে ভালোবাসে, আমার কিন্তু ভালো লাগে না। তবে—

'থামলে কেন? কি তবে?'

'তবে অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে হলে বিরক্তি আসে, তখন ওই সব বদ খেয়াল হয়।'

'ওরা কি অনেকদিন আছে?'

'অনেকদিন! যোধমল তো মানসিংহের সঙ্গে মনসবদার হয়ে এসেছিলো, আর দেবদত্ত অশোকের সময়ের!'

'এতোদিন ওরা কেন এখানে আছে?'

'কি করবে? মায়ার বন্ধন! যোধমল এখানকার এক রাজকোষ লুট করবার সময় দামী একটা মোতির মালা পেয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলো। কাউকে সে লুকোনো জায়গা জানাবার আগেই তরোয়ালের খোঁচায় মারা যায় বলে বেচারার আজও মুক্তি হল না।'

একটু উৎসুকভাবে বললাম—'কাউকে জানালেই তো পারে।'

'উঁহুঃ, যাকে তাকে জানালে হবে না, ওর বংশধর, আত্মীয়স্বজন, অন্তত দেশের লোক না হলে জানাবার উপায় নেই।'

'অর্থাৎ মারোয়াড়ী চাই?'

'হুঁ—মারোয়াড়ীরা আবার এধার মাড়ায় না।'

যোধমল সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে বললাম—'আর দেবদত্ত?'

'দেবদত্ত? দাঁড়াও জিগ্যেস করে দেখি!'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ; তারপর শোনা গেলো—'দেবদত্তের উদ্ধার হওয়া আরো শক্ত!'

'কেন?'

'অশোকের সময় ও মঞ্জুশ্রী না ধ্যানশ্রীর কি একটা মূর্তি গড়েছিলো।'

'সেটা এখনো আবিষ্কার হয়নি বুঝি? কোথায় সেটা? আমি না হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে....

'না, না, আবিষ্কার হয়েছে বই কি! কিন্তু পণ্ডিতরা তর্কাতর্কি করে তার নাম নিয়ে বাধালে গোল, কেউ বলছে সেটা মূর্তিই নয়, কেউ বলছে—কি বলে—প্রজ্ঞাপারমিতা!'

'তাতে কি!'

'চুপ চুপ। দেবদত্ত একেবারে ক্ষেপে উঠবে এক্ষুণি! তাতেই তো সব! নাম ঠিক হওয়া না দেখে ও কিছুতেই যেতে পারছে না এখান থেকে!'

'আমি না এলে তুমিও যেতে পারতে না!'

'বোধহয় না।'

'ওই সব বদ খেয়াল!'

'তাও হয়তো হতো এক্ষুণি! মাঝে মাঝে কি রকম নিশপিশ করে....'

'কি নিশপিশ করে? হাত!'

একটু হাসির শব্দ শোনা গেলো—'হাত তাকে বলে না! তবে.....

গলার স্বরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে বললাম—'যাকগে ভাই, তোমার কি কথা ছিলো না, যা বললেই তোমার ছুটি?'

'হ্যাঁ, ছুটি—একেবারে ছুটি।'

একটু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম—'বলা হলেই তুমি চলে যাবে?'

'তৎক্ষণাৎ!'

'কিন্তু তুমি চলে গেলে এই.... এই যোধমল আর দেবদত্ত....'

'না, না তোমার কোনো অনিষ্ট করবে না, আমার বারণ আছে।'

'তবে বলো এবার!'

'এই বলছি....কুঁক!'

'ও আবার কি?'

'ও কিছু না।'

'কিন্তু হেঁচকির মতো শোনাল যেন!'

'পাগল! হেঁচকি কোথায়—কুঁক।'

'কিন্তু আমরা তো ওকেই হেঁচকি বলি।'

'আমরা বলি না!'

'তবে কি ওটা?'

'ও আমাদের ভৌতিক বুৎকার।'

'বুৎকার কি?'

'ও-কথার মানে বুঝবে না! ওটা ও-জগতের কথা!'

'ও জগতের কথা আলাদা নাকি! এতোক্ষণ তো বেশ বাংলা বলছিলে!'

'অনেক কষ্টে অনুবাদ করতে হচ্ছিলো। কিন্তু বুৎকারের অনুবাদ হয় না—কুঁক্।'

'না ভাই, এটা হেঁচকি!'

'আমি তাহলে আলোটা জ্বালছি!'

'দোহাই তোমার! এখনো আমার কথা হয়নি....কুঁক্।'

'কথা তুমি পরে বোলে'খন। এখন একটু জলের চেষ্টা দেখি।'

'আমাদের জল লাগে না, আলো জ্বাললেই আমায় চলে যেতে হবে।—কুঁক্।'

'তা না হয় খানিক চলে গিয়ে তোমার বুৎকারটা থামিয়ে এসো।' বলে সত্যি দেশলাই বার করে মোমবাতিটা জ্বেলে ফেললাম।

কিন্তু একি! সত্যিই ঘরে কেউ নেই! এ কি ব্যাপার!

'.....কুঁক্.....

'বিমল তুমি আছ এখানে?'

বিমলের কোনো উত্তরের বদলে শোনা গেলো—'কুঁক্!.'

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর আমার মনে কোনো সংশয় আর রইলো না। এগিয়ে গিয়ে কড়া দুটো ধরে সজোরে কাঠের আলমারির পাল্লা দুটো খুলে ফেললাম।

'একি বিমল তুমি!—সশরীরে?'

বিমলের গলা থেকে বেরুলো—'কুঁক্।'

ব্যাপারটা এতোক্ষণে বোধহয় অনেকখানি বোঝা গেছে। হেঁচকিটুকু উঠে সব খেচড়ে না দিলে বিমলের ফন্দিকে সার্থক বলা চলতো। তার টেলিগ্রাম আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং আগের দিন মাইল-দশেক দূরের এক মস্ত মেলার জন্যে খনির লোকজনকে ছুটি দেওয়ায় তার অন্যদিকে সুবিধে হয়ে গেছলো। শুধু রামদীনকে এর মধ্যে তাকে টানতে হয়েছিলো। পোড়ো বাড়িতে তার ঘুরমুশ ফেলা ও পেটানোর আওয়াজের যে নমুনা সে দেখিয়েছে তাতে তারিফ তাকে অবশ্যই করতে হয়। অবশ্য স্টেশন মাষ্টারের অদ্ভুত মূর্তি ও আচরণ বিমলের ফন্দিকে সাহায্য করবে একথা সেও ভাবেনি।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি বয়সে তরুণ না হলেও আমার মনটা তরুণ এবং আমার লেখনি তারুণ্যের লক্ষণাক্ত। তাই দশটা তরুণ লেখকের নাম করতে বললে লোক আমার নামটাই করে সব আগে, আর গালাগাল যখন দেয় তখন আমাকেই দেয় সবচেয়ে বেশি। তা দিক, নিন্দায় আমার আয়ু কমে না, তাই মনটাও তরুণ থাকে। উপরন্তু আমার নামটা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বিনা পয়সায় আমাকে বিজ্ঞাপিত করে। আমার কার্টুন যা ছাপে তা আমার চেহারার চেয়ে দেখতে ভালো। ট্রামে ট্রেনে বাসে মেসে আপিসে চায়ের দোকনে আমার নাম যতবার ওঠে কোন ঠাকুর-দেবতার নাম ততবার ওঠে না। এখানে বলে রাখি আমি যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কটাক্ষ করলুম তাঁরা সশরীরে বর্তমান। না, আরো খোলসা করে বলব না।

সুখ্যাতি ও অখ্যাতির মধ্যে প্রভেদ যাই থাক উভয়েই খ্যাতি। আমি খ্যাতি ভালোবাসি। পথে যেতে যেতে যখন কানে পড়ে কেউ ফিস্ ফিস্ করে অন্য কাউকে বলছে, "ইনিই তরুণ সাহিত্যিক মহেশ মহলানবীশ" তখন আমি অনেক কষ্টে আনন্দ সংবরণ করে গাম্ভীর্য রক্ষা করি।

আমাকে খ্যাতির চেয়েও যা উৎফুল্ল করে তা তরুণ সাহিত্যিকদের খাতির। তাদের সকলে যে সাহিত্যিক এটা একটু বাড়িয়ে বলা, হয়তো বানিয়ে বলা। কিন্তু তারা সকলেই তরুণ—বয়সে তরুণ। সন্ধ্যাবেলা তারা কম্পাসের দশটা দিক থেকে ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মতো আবির্ভূত হয় এবং আমার বৈঠকখানায় বসে আমার চা-সিগারেট উজাড় করতে করতে আমার গল্প-উপন্যাস নিয়ে যতটা মেতে ওঠে ঠাকুর-দেবতাদের কথা শুনলে ততটা তেতে ওঠে। আমি যে তাদের একজন এই আমার গূঢ়তম সুখ। তারা যে আমাকে দাদা বলে, মামা কিংবা খুড়ো বলে না, এই আমার আতিথেয়তার চরম পুরস্কার। তারা আমাকে তাদের নিজের নিজের রচনা দেখতে দেয়। আমি আগাগোড়া পড়বার ফুরসত পাইনে, পেলেও তন্দ্রা বোধ করতুম। তবু ঐ সব একসাইজের দু-চার জায়গায় দাগ দিয়ে মনে রখে দিই, কথায় কথায় উদ্ধার করে লেখকদের উদ্ধার করি। ওরা অবাক, কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ওদের রচনায় যেটুকু ওদের স্বকীয়,যেটুকু ওদের তারুণ্য, ওটুকু আমি চোখ দিয়ে আত্মসাৎ করি। কারুর আইডিয়া, কারুর ভঙ্গি, কারুর শব্দচাতুরী। তবে গল্পের প্লট যখন চুরি করি তখন জানিয়ে শুনিয়ে চুরি করা নিরাপদ জ্ঞান করি। "ওহে শৈলেশ, তোমার ঐ গল্পটা আমার এমন ভালো লেগেছে যে, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই—তুমি তোমার প্লটটি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" শৈলেশ বোধকরি ওটা কোনো কন্টিনেন্টাল নভেল থেকে টুকেছে। ও কাজ করতে তার কুণ্ঠা নেই। আর আমিও ব্যস্ত মানুষ। কন্টিনেন্টাল নভেল পড়ি কখন। এতে আমি

অন্যায় কিছু দেখিনে। প্লটের গায়ে কপিরাইটার লেখা নেই। কন্টিনেন্টালরাও যে কার কাছ থেকে সরিয়েছে কে বলতে পারে। স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়ার দু-হাতে প্লট লুট করেছেন। "পূর্ণ শশী মাখে মসী কালো বলুক দেখি?" শেক্‌স্‌পীয়ারের বেলা কোনো শ্বশুরপুত্র অপহরণের অপবাদ দেয় না।

আমার তরুণ ভাইগুলির মধ্যে আমি স্মরজিৎকে একটু বিশেষ স্নেহ করি। ও আমার প্রশংসা করে ক্ষান্ত হয় না। ও আমার চোরাই প্লটের উপর বাটপাড়ি করে ভাষা নকল করে, শিরোনামা জাল করে। আর তামাশা দেখুন, আমার হাতে দিয়ে বলে, "দাদা একটিবার দেখে দিন।" আমি তার পিঠ চাপড়ে বলি "সাবাস", সে যদি সত্যি আমার ভাত মারতে পারতো তা হলে আমি তাকে ধমকে দিতে ইতস্তত করতুম না। আমি জানি আমার একটি গুণ আছে যা বাংলাদেশের অন্য কোনো সাহিত্যিকদের নেই। আমি অবচেতন মনের মনীষী। কিন্তু দেশের নাড়ি নক্ষত্র তো জান্‌তে আমার বাকি নেই। ওরা ভাজে ঝিঙে, বলে পটল। আমিও তুলি পাঁক, কিন্তু তার অঙ্গে একটু গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়ে দিই। আমার গল্পের গন্ধ শুঁকে পাঠক ভাবেন পুণ্যার্জন করছেন। কারণ পাপকে আমি ঘৃণাভাবে দেখাই সমাজকে পাপমুক্ত করতে। আমার বইয়ের শেষ পাতাটা আগে পড়বেন। দেখবেন পাপের শাস্তি আছেই। অন্তত পাপীর ব্যর্থতা আছে, ভয়ংকর ব্যর্থতা। এই তত্ত্বটি স্মরজিৎ আবিষ্কার করেনি। তার যেমন মোটা বুদ্ধি করতে পারবেও না। তাই তার বইয়ের বিক্রি হবে না। পরন্তু সমালোচকরা তাকে বলবে মহেশ মহলানবীশের নকলবীশ।

স্মরজিৎকে আমি বিশেষ স্নেহ করি তার আর একটা কারণ আছে। সে হল কানাই বাচস্পতির ছেলে। "উল্টারথ" প্রণেতা প্রাচীনতত্ত্বের পুরোধা কানাই বাচস্পতিকে কে না চেনে? দৈনিক পত্রে প্রতিদিন ওঁর দেড় কলম বরাদ্দ। লাইন পিছু এক আনা পায়। তাহলে বুঝুন ওর মাসিক আয় কত। আমার এতবড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী আর নেই। আর কিছু না হই আমি একজন এম.এ.। আর কানাই হচ্ছে ঝুটো বাচস্পতি, পাঁচটাকা দক্ষিণা দিয়ে কোনো এক পরীক্ষা পরিষৎ থেকে উপাধি সংগ্রহ করেছে। অথচ কানাই শুধু যে মোটর কেনবার মতো টাকাটা পাচ্ছে তা-ই নয়, তার নাম আজ গ্রামে গ্রামে। তারপর কানাই আমাকে অকারণে ঠুকেছে। আমাকে ঠুকেছে, আমার তরুণ ভাইদের ঠুকেছে। আমাদের যা বাণী তাকে খোঁটা দিচ্ছে, খোঁচা দিচ্ছে। আমরা নাকি এই সনাতন সমাজের মরা গাঙে পাশ্চাত্ত্য সমুদ্রের কর্দমাক্ত জোয়ার আনছি। আমরা নাকি বাংলার পুরুষকে বিলাসী হতে, বাংলার কুললক্ষ্মীকে কুলটা হতে উদ্দীপনা দিচ্ছি। আরো কত কী! তবে রক্ষা এই যে, কানাই রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত কারুর মুণ্ডুপাত করতে ছাড়ছে না। ও যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌটিল্যগর্বী ব্রাহ্মণের প্রেতাত্মা বিংশ শতাব্দীর স্কন্ধে ভর করেছে। ওর ছেলে স্মরজিৎ আমার কাছে ওর নিন্দে করে, ওর জীরদ্দশায় ওর শ্রাদ্ধ করে। এতে আমি বাস্তবিক ভারী খুশি। খুশি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হত। একবার ভেবে দেখুন কানাই লিখছে জামাই ষষ্ঠী সম্বন্ধে বিস্তর বাজে কথা। পরকে আপনার করা, পরের ছেলেকে ঘরের চেয়ে সমাদর করা, বাংলার সনাতন বৈশিষ্ট্য, আর্যজাতির ধর্মঃ সনাতনঃ। তার স্থানে স্থানে দেখি গায়ে পড়ে আমাকে দিয়েছে কিলটা চড়টা। কথা নেই বার্তা নেই প্রবন্ধের মাঝখানে আমার নামটা চাপা রেখে, (তাও যদি নামটা উল্লেখ করতো!) আমাকে নিয়েছে একহাত। "তথাকথিত তরুণ লেখক কেহ কেহ বাঙালীর পরম কল্যাণীয় জামাতা বাবাজীবনকে লইয়া পঙ্ক-হোলি খেলিয়াছেন। নিজের কলুষিত কল্পনার পিচকারীতে ছোপাইয়া স্নেহ-দুর্বলতাময়ী শ্বশ্রূমাতাকে জামাতার নায়িকা করিতে এই কুক্কুরগুলার কেমন করিয়া প্রবৃত্তি হয়?"

স্মরজিৎ বাপকে জানিয়েই আমার কাছে আসে, কেয়ার করে না। বলে, "দাদা আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক সেইটে সত্য। ওঁর সঙ্গে যেটা সেটা আকস্মিক।" আমি বলি, "তোমার নাম স্মরজিৎ, আমার নাম মহেশ। কী রকম অর্থৈক্য। তুমি বই লিখলে লোকে ভাববে আমিই ছদ্মনাম নিয়েছি।" স্মরজিৎ ইঙ্গিতটা বোঝে না। ওর বাপের মতো ওর বুদ্ধিটা স্থূল। কেন এবং কেমন করে ও বিপক্ষের শিবিরে এসে বিভীষণ হল, সেইটে আশ্চর্য ঠেকে। এমনও হতে পারে যে, ও অপর পক্ষের চর। সরলতার ভান করছে। কিন্তু আমি ওকে প্রায় এক বছর কাল পরখ করে দেখলুম। সত্যিই ওর মনটা সাদা, মনটা সাদা বলে গড়নটা মোটা। চুলগুলো কোঁকড়া, নাকটা বোঁচা, হাঁটে থপ থপ করে। ওর সর্বদা বিগলিত ভাব। ওর যখন পিঠ চাপড়ে দিই তখন মনে হয় ও যদি পুষি বেড়াল হত তবে মোলায়েম সুরে ঘড় ঘড় শব্দ করত।

তরুণদের সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করতে করতে আমি তাদের কয়েকজনের ব্যথার ব্যথী হতে পেরেছিলুম, স্মরজিৎ তাদের অন্যতম। তারা সুযোগ পেলেই তাদের পারিবারিক কাহিনী আমাকে ভেঙে বলে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্পে আমাকে ঘুম পাইয়ে দেয়, কখনো স্বপ্নালোকে নিয়ে যায়। তাদের প্রেমের উপাখ্যান শুনে যখন আমি বিশ্বাস করি তখন বলি, "এমন ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছে, আমি এটা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব ঠিক করে রেখেছি।" আর যখন বিশ্বাস করতে পারিনে তখন বলি, "কোন্ বইতে পড়েছ, বলে ফেলো।" কিছুক্ষণ প্রতিবাদ করার পরে যখন প্রেমিক পুরুষ স্বীকার করেন যে, সবটা ঘটেনি, কিন্তু এই বলে তর্ক করেন যে, যা ঘট্‌তে পারত তাও ঘটনার সামিল। আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমি আর কিছু না পেরে থাকি এটুকু জানতে পেরেছি যে, আমাদের অধিকাংশ তরুণ নিউরোটিক। আমার কাছে যারা আসে তাদের অধিকাংশই বায়োস্কোপ দেখে ও নভেল পড়ে তথাবর্ণিত কাল্পনিক জগৎকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে ও নিজেদেরকে সেইজগতের মানুষ বলে ভাবতে ভাবতে সত্যি সত্যি তাই হয়ে যায়। গোলমাল বাধে যখন নভেল না পড়া পাঁচী কিংবা খেঁদি—যাদের ভালো নাম সুলতা কিংবা আরতি—তাদের অনুরাগ আকর্ষণ করে। অথবা পাস করতে না পারলে বাবা কঠিন কথা বলেন। অথবা পাস হলেও মার্চেন্ট আপিসে পর্যন্ত আবেদন না-মঞ্জুর হয়। সাহেবের সঙ্গে একবার ইন্টারভিউ পেলে শৈলেশ কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে নব অভ্যুদয় সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবার ছল পেত না? দুটো কোটেশন ও দশটা অ্যালিউশন দিয়ে নিজের বক্তব্যটা বিশদ ও উদ্দেশ্যটা সফল করত না?

স্মরজিৎ ঠিক নিউরোটিক না হলেও কালের হাওয়া তাকেও স্পর্শ করেছে। সে আমাকে পিছু ডেকে বলে, "দাদা আপনাকে বিরক্ত করতে সত্যিই চাইনে, কিন্তু একটা খবর না দিয়ে বিদায় নিতেও পারিনে।" আমি অগত্যা চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বসি এবং ঠাকুরকে বলি সবুর করতে। স্মরজিৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এগারোটা। কিন্তু এতক্ষণ ওরা সব ছিল, ওদের কাছে কি বলা যায়?'

"কী কথা?"

স্মরজিৎ গৌরচন্দ্রিকা বিস্তার করে। আমি থামিয়ে দিই। আমার কাছে লজ্জা কিসের? আমি তো তোর স্বনামা। আমিও তো তরুণ।

স্মরজিৎ প্রেমে পড়েছে।

এতদিন পড়েনি কেন তার কৈফেয়ৎ দিক্।

কাউকে এতদিন মনে ধরেনি।

মনে মনে বলি, স্মরজিতেরও মনে ধরবার দাবি আছে, যদিও আর কারুর মনে ধরা দুর্ঘট। তারপর?

তারপর স্মরজিৎ কবিতা লিখতে শুরু করেছে। কিন্তু কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। এই বলে সে এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে। সবগুলিই মুক্ত-বন্ধ। ভাবের তাড়নায় মুক্তকচ্ছ ভাবে ধাবমান।

ব্যাঙ কয়, হে আমার ব্যাঙানি
ঠ্যাং দুটি
প্রতিদিন তোমার গলির পথে
পেণ্ডুলাম সম।
তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে
তোমার ঘ্যাঙানি।
কানেই শুনেছি শুধু শুনেছি প্রাণে।

তার স্পর্ধা আমাকেও ঈর্ষান্বিত করলে। আমি এত কিছু পারলুম; কিন্তু কোনো মতে মিল জোটাতে পারিনি বলে কবিতা লিখতে পারলুম না। স্মরজিৎ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমি পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গেলুম—

তুমি যে উর্বশী নও
নও বিয়াট্রিস
আফ্রডিটি নও
নও হেলেনা যে
তাই তুমি সত্যতর
তাই তুমি আমার
প্রেয়সী
তোমার ঘ্যাঙানি
কানেই শুনিনি শুধু শুনেছি প্রাণে।

আমি নিজের সবজান্তত্ব প্রকট করবার জন্যে জায়গায় জায়গায় বদলে দিলুম।

পরিবর্তিত সংস্করণ এইরূপ হল—

"হে আমার ব্যাঙানি"—ব্যাঙ কয়—
"ঠ্যাং দুটি প্রতিদিন পেণ্ডুলাম সম।"
"কোনখানে?"
"তোমার গলির পথে"—ব্যাঙ
মক মক করে।
"তোমার ঘ্যাঙানি"—ব্যাঙ মুখ ফুটে বলে না—
"কানেই শুনিনি শুধু, শুনেছি প্রাণে।"
তারপর মুখ ফুটে—(বলে)
"তুমি থাকো জেনানার জানালা আড়ালে।"

এরপর আমিও কবিতা লেখা ধরলুম। কাগজে যখন দুটি একটি ছাপা হল কোনো কোনো সমালোচক নাম দিলে "গবিতা" এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরা বানালো প্যারডি। এই তো আমি চাই। সুনাম সকলের অদৃষ্টে জোটে না, কিন্তু দুর্নাম জোটে ক-জনের অদৃষ্টে? আমার মতো ক্ষণজন্মা পুরুষের। আর দুর্নামে আমার হার হল কই? কাগজওয়ালারা আমার গল্প আর কবিতা চেয়ে বিনামূল্যে ওদের পত্রিকা পাঠাচ্ছে। দাম দেবে না সেটা জানি। কিন্তু নাম তো হবে।

ইতিমধ্যে স্মরজিতের পায়ের পেণ্ডুলাম সুনলিনীদের পাড়ায় আন্দোলিত হতে হতে আন্দোলন তুলেছে। তাকে একদিন পাকড়াও করে সুনলিনীর বাবা তার বাবার নাম ঠিকানা আদায় করে কানাই বাচস্পতিকে চিঠি লিখেছেন। স্মরজিৎ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বাপকে ধরা দিচ্ছে না। তবে আমার এখানে হাজিরা দিয়ে যায়। বিমর্ষভাবে জিজ্ঞাসা করে, —"দাদা ব্যাঙানির বাড়ি ঠ্যাঙানি খেতে ভয় করিনে। কিন্তু ব্যাঙানিকে না দেখতে পেলে বাঁচবো না।"

আমি দায়িত্বহীন প্রেম বরদাস্ত করতে পারিনে। যে বলে "বাঁচবো না" আমি তাকে ক্ষেপিয়ে বলি, "বেশ তো, আমি তোমার শবদাহ করতে নিয়ে যাবো।" শুধু দায়িত্বহীনতা নয়, মিথ্যাও বটে। প্রাণ দিয়ে ফেলা কবিতা লেখার মতো সোজা নয়। আমার ব্যাঙানির গোঙানি শুনতে শুনতে আমিই কতবার আত্মহত্যার সংকল্প করেছি। তারপর সে সংকল্প ত্যাগ করে ওর শুশ্রূষা করতে লেগে গেছি।

ওকে বললুম, "মিতা, আমাকে কবিতা লিখতে তুমিই প্রবর্তিত করলে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি একটু মানুষের মতো হও তো আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করি।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা আমার পেশা নয়। আমি ইস্কুল মাষ্টার নই। তবু স্মরজিৎকে হাতে নিলুম। কানাই বাচস্পতির উপর শোধ তুলতে হবে, স্মরজিৎ আমার অস্ত্র। ওকে বললুম আমার এইখানেই উঠতে। তারপর সুনলিনীর বাপের কাছে নিজেই গেলুম ঘটকালি করতে।

তিনি গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়ে দুজন ভদ্রলোককে শোনাচ্ছিলেন। আর ডান হাত উঠিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে টেব্‌লের উপর চাপড় মারছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "আমারই নাম তিনকড়ি, বসুন।"

আমি প্রথমটা বুঝতে পারলুম না এই সকালবেলা গান বাজনার এ আয়োজন কেন। তারপর তিনি নিজেই আমার সংশয় ভঞ্জন করলেন।

"এই আমাদের নিউ মডেল। কেমন পরিষ্কার আওয়াজ। কেমন মজবুত মেশিন। দাম মোটে দুশো দশ টাকা। আমার কাছে কিন্‌লে দশ পারসেণ্ট কম পাবেন।" এই বলে আমার দিকেও তাকালেন।

আমি ছাড়া যে দুজন আগন্তুক বসেছিলেন তাঁদের একজন মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললেন, "হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—আমাদের অন্য একটু কাজ ছিল। আগে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন পণ্ডিতরাজ কানাই বাচস্পতি।"

তিনকড়িবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এতক্ষণ বলেননি। না জেনে বড়ো অপরাধ করেছি। ওরে ও ফেলি, পান নিয়ে আয়।" হাত জোড় করে বাচস্পতিকে মস্ত একটা নমস্কার করে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই রইলেন। বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতে থাকলেন। আমিও বাচস্পতিকে অবহিত হয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলুম। দিব্য বলীর্বদের মতো আকার ও

আকৃতি। মুণ্ডিত মস্তকে বিল্বপত্রমণ্ডিত শিখা। পায়ে পণ্ডিতী চটি ও গায়ে কোরা চাদর।

বাচস্পতির সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সেটি বোধ করি তাঁর আপিসের কেউ হবে। সে বললে, "এই যে—এই আপনার কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়ে বাচস্পতি মশায় একান্ত বিগলিত হয়েছেন। তিনি দেশকে যে বাণী দিনের পর দিন শুনিয়ে যাচ্ছেন এক কথায় সেটি হচ্ছে এই যে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। স্বধর্ম কাকে বলি? না, যা স্বদেশের ধর্ম। আর ধর্মই বা কাকে বলি? না, যা লোকাচার। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে আপনি যে অভিযোগ এনেছেন তার থেকে অনুমান করা হয় যে, তাঁর নিজের গৃহেই পরধর্ম—ম্লেচ্ছাচার বিজাতীয় কোর্টশিপ প্রবেশছিদ্র অন্বেষণ করছে।"

বাচস্পতি মৃদু হাস্য করতেই থাকলেন। দেখে মনে হল না যে, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত।

সেই লোকটি নিশ্বাস নিয়ে তাঁর বক্তৃতার অনুবৃত্তি করলে, "বাচস্পতি মশাই স্বনামধন্য সমাজরক্ষী। তিনি আভ্যন্তরিক শত্রুর ভয়ে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করছেন। তাঁর মতে এর একমাত্র প্রতিকার পুত্রের মতি পরিবর্তন। কিন্তু বয়োঃপ্রাপ্ত পুত্রের মতি তিরস্কার বা সদুপদেশের বাধ্য নয়। অতএব নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে—"

বাচস্পতি অমনোযোগের ভান করলেন। আমি মনোযোগের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলুম। গ্রামোফোনের এজেন্ট তিনকড়ি বাড়ুজ্যে হাঁ করে সেই লোকটির কথাগুলি গিলতে থাকলেন।

"প্রস্তাবটা বেশি কিছু নয়। বাচস্পতি মশাই যখন বিপত্নীক ও মেয়েটি বিবাহযোগ্য তখন আপনার দিক থেকে আপত্তি না থাকবারই সম্ভাবনা। থাকলে কিন্তু আমরা আপনার উপর পীড়াপীড়ি করতে অনিচ্ছুক।"

তিনকড়িবাবু স্তম্ভিত। আমিও তদবস্থ। বাচস্পতি তখনো মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকলেন। আর সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। পান হাতে করে ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার করলে একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের তন্বী। সুন্দরী নয়, কিন্তু সপ্রতিভ। পান দিয়ে এক পাশে চুপ করে দাঁড়ালো। তার বাবার আদেশের অপেক্ষায়। তিনকড়িবাবু বোধ করি তার সঙ্গে বাচস্পতিকে মনে মনে মিলিয়ে দেখছিলেন। আমিও তাই করছিলুম। বাচস্পতির স্বপক্ষে একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং ধবধবে সাদা। সুনলিনীর বিপক্ষে তেমনি একটি পয়েণ্ট তার গায়ের রং মলিন শ্যাম। সে গা মেজে আসার সময় পায়নি, পেলে হয়েতো মলিনের স্থলে উজ্জ্বল লিখতে পারতুম।

তিনকড়িবাবু মেয়েকে যাবার অনুমতি দিয়ে বাচস্পতির বাঙ্ময় প্রতিভূকে বললেন, "এ আমার আশাতীত। কল্পনাতীত। ধারণাতীত। তাই মনঃস্থির করতে গৃহিণীর সহায়তা লাগবে। বুঝলেন কিনা এসব তো গ্রামোফোনের ব্যাপার নয়—"

প্রতিভূটিকে অভিজ্ঞ ঘটক বলে মনে হল। তিনকড়ি দরদস্তুর না করে মেয়ে ছাড়বেন না। এটা আঁচতে তার দু-মিনিট লাগল না। "বেশ আপনি চিন্তা করুন, আমরাও। মহেশ মহলানবীশের সাকরেদ হয়ে ছেলেটা বকেছে। নইলে বাচস্পতিদার এমন কি গরজ!" কিছুক্ষণ নীরব থেকে সশব্দে—"আমি মশাই পশুর মতো স্পষ্টবাদী। সারা জীবন গ্রামোফোন্ চিনলেন, মানুষ চিন্‌লেন না। বাচস্পতিদার চরণে চর্ম পাদুকা ও গাত্রে উত্তরীয় দেখছেন, বাইরে যে তার নিজের কেনা অস্টিন দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখেননি। তালতলা গলিতে যে তাঁর নিজের করা দ্বিতল ইষ্টকালয় আছে সেটা দেখেননি। তাঁর পকেট নেই বলে যে মাসের পয়লা তারিখে গড়ে তিনশো টাকা

কোনখান দিয়ে নিয়ে যান তাও অনুমান করতে পারেন না। আর ঐ তো আপনার মেয়ে। বয়স পঁচিশের কম হবে না। আর বাচস্পতিদার মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স। তার মধ্যে তের বছর বিপত্নীক।"

আমি একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়েছিলুম। মহেশ মহলানবীশের কার্টুন কে না দেখেছে? ওরা যে এতক্ষণ চিনতে পারেনি এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে ওরা একটু পরে চিনতে পারবে না।

তিনকড়ি দমে গেলেন। তোতলাতে তোতলাতে বললেন,"ৎ-ৎ-তা আমার পাঁচটি নয় সাতটি নয় ঐ একটি মাত্র মেয়ে। এ-এ-এইবার আই-এ দেবে গ-গ-গরীব হলেও আমার যে একেবারে কিছুই নেই তা নয়। সোজাসুজি না বলছিনে, শুধু কিছু সময় চাইছি, কী নাম আপনার?"

"গিরিজাপতি—"

"গিরিজাপতিবাবু।"

কানাই তার বিরাট বপু নিয়ে উপবেশন সুখ উপভোগ করছিল, গিরিজাপতি তাকে ঠেলা দিয়ে বললে, 'উঠুন বাচস্পতিদা, উঠুন। আপনার সময় এত স্বল্পমূল্য নয় যে, চাইলেই দান করে ফেলবেন। কালকের কাগজেই তিনকড়িবাবুর মেয়ের কোর্টশিপ কাহিনী ছাপা হবে। আর আপনি তো ঘেঁটু পূজার উপর লিখতে যাচ্ছেন, ওরই এক জায়গার একটু কলমের খোঁচা—"

বলতে বলতে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠে বসল। তিনকড়িবাবু কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে আবিষ্কার করে বললেন, "দেখলেন তো মশাই গুণ্ডামি।"

আমি অসহায় বোধ করছিলুম। কানাইয়ের হাতে দৈনিক পত্রের শিলনোড়া দৈনিক একটা করে তিনকড়ির দাঁত ভাঙবে। তিনকড়ি মামলা করতেও রাজী হবেন না, পাছে পারিবারিক প্রাইভেসি ক্ষুণ্ণ হয়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কই মশাই, কনক দাসের একসেট রেকর্ড দেখালেন না? আমি কখন থেকে বসে রয়েছি।"

তিনকড়ি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, "এই যে" করতে করতে রেকর্ডের বাক্স ঘাঁটতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মন ছিল অন্যতরে। বোধ হয় অন্দরে, গৃহিণীর আঁচলে। আমি দয়া করে উঠলুম। বললুম, "থাক মশাই, অর্ডার দেওয়া রইল। ঠিকানাটাও দিয়ে যাই। সময়মতো পাঠিয়ে দেবেন।"

আমার কার্ড পড়ে তিনকড়িবাবু দাঁত বার করে হাসলেন।—"কী সৌভাগ্য, সুনলিনী আপনাকে কতবার দেখতে চেয়েছে। আপনার সমস্ত বই ওকে কিনে দিতে হয়েছে। একটু অনুগ্রহ করে বসতে আজ্ঞা করেন তো ওকে বলি চা করে আনতে।"

আমি ঘাড় নাড়লুম। অন্য একদিন আসব। এ পাড়া ও পাড়া।

স্মরজিৎকে ডাক দিলুম। সে রাশি রাশি "মুক্তকচ্ছ" নিয়ে বিরহ উদ্‌যাপন করছিল। আমার ডাক শুনে খাতাসুদ্ধ উপস্থিত হল। আমি টান মেরে বললুম, "ওসব রাবিশ রাখো। কাজের সময় কাজ, লেখার সময় লেখা।"

ও খুব ভয় পেলে। আমি একটু নরম হয়ে বললুম, "তোমার বাবা সুনলিনীকে বিয়ে করবেন

বলে ক্ষেপেছেন। এ বিয়ে বন্ধ করা চাই-ই।" আমি জানতুম তিনকড়ি দুদিন পরে বাচস্পতির পায়ে না ধরে পার পাবে না।

স্মরজিতের মুখ শুকিয়ে গেল। তার চোখে জল দেখা দিল। তার হাত থেকে কবিতার খাতা মেঝেতে পড়ে হাওয়ায় উড়ল। সে একবার বললে, "ও হো হো," তারপর বললে, "আমি বাঁচব না।"

আমি ধমকে দিয়ে বললুম, "আলবৎ বাঁচবে। ও মেয়েকে বিয়ে করতে হবে তোমাকেই।"

স্মরজিৎ কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ক্ষমা করুন দাদা, বাবা যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সে আমার মা। মাতৃগমন মহাপাপ।"

আমি দেখলুম রাগ করাটা এক্ষেত্রে ভুল পলিসি। তা হলে স্মরজিৎ হাতছাড়া হবে। কানাই জিতে যাবে।

আমি স্মরজিতের মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম, "সে-ই বীর যে ঠিকসময়ে ঠিক কর্তব্যটি করে। সে-ই পুরুষ যে নারীকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে ইতস্তত করে না, অন্যায়কারী যেই হোক।"

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কি একদিনের কাজ? হপ্তাখানেক পরে স্মরজিৎকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলুম যে, সে সুনলিনীকে যেমন করেই হোক বিয়ে করবে। ওদিকে কানাই তিনকড়িকে দিয়ে বিয়ের তারিখ ফেলেছে। আমার কাছে কন্যাপক্ষের একখানা নিমন্ত্রণ পত্রও এসেছে। কানাই যে খুব ধুমধাম করে বৌ আনতে যাবে এ গুজব আমি তার আপিস থেকে আনিয়ে নিয়েছি। বিনাপণে বিয়ে করে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে সে। বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ পেয়ে এজন্যে তাকে অভিবাদন করে এক প্যারাগ্রাফ ইতিমধ্যেই তার কাগজে বেরিয়েছে।

আমারও রোখ চেপেছে কিছুতেই এ বিয়ে আমি হতে দেবো না। আমার ভক্ত-পাঠক-পাঠিকা কানাইয়ের হাতে পড়ে আমার নিন্দা শুনতে থাকবে? অসম্ভব! একালের কলেজে পড়া মেয়ে একটা "রাজভাষা" পড়ে ইংরাজী শেখা ছাত্রবৃত্তি পাস টিকিওয়ালার ঘর করবে? অসম্ভব! যেখানে বয়সের সামঞ্জস্য নেই, শিক্ষার সামঞ্জস্য নেই, রুচির সামঞ্জস্য নেই, সেখানে সুখেরও আশা লেশমাত্র থাকতে পারে না।

বিয়ের দিন স্মরজিৎকে ডেকে চুপি চুপি বললুম, "রাঁধুনি বামুন সেজে সুনলিনীর বাড়ি বহাল হতে হবে। ওর বাবা তোমাকে বাবুবেশে দেখেছেন, খালি গায়ে দেখলে চিনতে পারবেন না। ওদের বাড়িতে কাল বিয়ের হৈ চৈ, কে কার খোঁজ রাখে। একসময় সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেলা সাড়ে নটায় আমি মোটর নিয়ে গলির মোড়ে প্রতীক্ষা করব। তোমরা এলে তোমাদের এখানে এনে সেই রাত্রে বিয়ে দেবো।"

রাঁধুনি বামুন সাজতে ওর লজ্জা, সুনলিনীর সঙ্গে দেখা করতে ওর শঙ্কা এবং সুনলিনীকে বিয়ে করতে ওর বাসনা, এই তেটানায় পড়ে ও কেমন হয়ে গেল। হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। ন যযৌ ন তস্থৌ। আমি ব্যঙ্গ করে বললুম, "কী হে, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যকড়। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে। ঐ সাহসের একটি কণা দেখালে বিয়েও করবে। শ্বশুরের গ্রামোফোনের টাকাও পাবে, হয়তো মাঝারি লেখকও দাঁড়াতে পারো।"

ওকে তালিম দিলুম। ওর নাম ক্ষেত্রমোহন। ওর বাড়ি পুরুলিয়া। কলকাতায় নতুন এসেছে কাজ খুঁজতে; কে ওকে বলেছে এ বাড়িতে বিয়ে। ওর রান্নার নমুনা দেখুন। শ্রীযুক্ত মহেশ

মহলানবীশ ওর রান্নার প্রশংসা করে ওকে সুপারিশপত্র দিয়েছেন!

ওকে কয়েকটা রান্নাও শিখিয়ে দিতে হল। কানাইয়ের চিরদিন এই সমৃদ্ধি ছিল না। কানাই যখন ভিক্ষে করে খেতো তখন স্মরজিৎকেই রান্না করতে হত। সে সব সে একেবারে ভুলে যায়নি, তবে ভোলবার ভান করছে। তাই আমিও শেখাবার ভান করলুম।

বলিদানের পাঁঠার মতো থমকে থমকে ওঠে। একবার এগোয়, একবার থমকে দাঁড়ায়, একবার ফেরে। ওকে তিনকড়িবাবুর গলির মাথায় পৌঁছে দিয়ে আমি একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে জোরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলুম।

ওর উপর আমার ভরসা ছিল না। শেষ পর্যন্ত ও হয়তো তিনকড়ির তিন তাড়া খেয়ে পিটটান্ দেবে। তিনকড়ি ওকে চিনে ফেলতেও পারেন। গেলুম আমার এক পুলিস বন্ধুর কাছে। খুলেই বললুম। না বললেও চলতো কেননা কানাইয়ের কাগজ ওকেও ঠুকেছে, ওর রাগ আছে কাগজের কর্তাদের উপর। ও বললে, "কিছু করতে হবে না। কানাইকে আমি চিনি। অমন ভীতু লোক ভূ-ভারতে নেই। আমি ওর আপিসে ফোন করে জানাচ্ছি, খবর পাওয়া গেছে ওর লেখা পড়ে মুসলমানেরা ক্ষেপেছে। ও যেন এক্ষুনি কলকাতা ছাড়ে।"

শুধু ওইটুকুতে কি ফল হবে? আমার সংশয় গেল না। কিন্তু তারিণী বললে,

"ফলেন পরিচীয়তে। তুমি সবুর করে দেখো, এ ঠিক মেওয়া ফলবে।"

গলিতে ঢুকে শুনতে পেলুম একজন আরেকজনকেও বলছে, "আবার বাধল।"

"কী বাধল, মশাই?"

"হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। শোনেননি কানাই বাচস্পতির ভুঁড়িটা ফাঁসিয়েছে?"

আমি পুলকে শিউরে উঠলুম। নির্দিষ্ট গাড়ি রেখে হর্ন বাজালুম।

স্মরজিৎ ও তার বধূ আসে না। বিবাহসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম দক্ষযজ্ঞের মতো ব্যাপার। পাড়ার অর্ধেক খালি হয়ে গেছে, কলকাতা ছেড়ে উধাও। বাড়ির চাকর বাকরেরাও বলছে, "আমাদের ছেড়ে দিন, কর্তা। আমরা পালিয়ে বাঁচি।" ভিতর থেকে মহিলাদের কান্নার রোল কানে আসছে। আর আমাদের স্মরজিৎ রাঁধুনি বামুনের বেশে পেণ্ডুলামের মতো একটি রেখা ধরে একবার অন্দরের দিকে ছুটে যাচ্ছে, একবার সভার দিকে ছুটে আসছে। আমি তার গতিরোধ করে দাঁড়ালুম। বললুম, "কী ঠাকুর, কী হয়েছে?"

সে কেঁদে বললে, "দাদা গুজবটা কি সত্যি? বাবাকে ওরা জবাই করেছে?"

তাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে বললুম "Mind your own business. নিজের কাজ কত দূর?"

এখনো সে সুনলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পায়নি। অকর্মণ্য। কলকাতা ছাড়বার জন্যে নিশ্চয় সুনলিনী ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। এই তো সুযোগ। তাকে তাড়া দিলুম, "যাও, দেখা করে বলো তুমি ওকে উদ্ধার করতে এসেছ।"

সে কি শোনে? শুধু বলে "হায় হায় বাবা!"

আমি প্যারডি করে বললুম, "হায় হায় হাবা!" তারপর তাকে ধরে নিয়ে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে এলুম। সে যেন আমার বাড়ি গিয়ে সেখানে অপেক্ষা করে। তার বাবার খবর নিতে যেন নিজেদের বাড়িতে যায় না। সেটা গুণ্ডারা ঘেরাও করেছে।

"এই যে শ্রীযুক্ত মহলানবীশ।" তিনকড়িবাবু উন্মাদের মতো বললেন, "ওসব বিশ্বাস

করবেন না, বুঝলেন। মাথার উপর ভগবান থাকতে এ কখনো হতে পারে? আমার দশাটা একবার ভেবে দেখা তো ভগবানের উচিত?"

আমি মনে মনে বললুম, ভগবানকে যতো বড়ো ভাবুক লোকে মনে করে তিনি তত বড়ো ভাবুক নন। মহেশ তাঁর উপর খোদ্‌করী করবে। দেবেই আজ রাত্রে স্মরজিতের বিয়ে।

খবর নিতে তিনকড়ি যাকে পাঠিয়েছিলেন সে এসে পড়ল। বললে, "বাচস্পতি গুম হয়েছেন।"

তিনকড়ি কপালে চাপড় মেরে ডাক ছাড়লেন, "হা ভগবান, গুণ্ডার হাতে গৈবী খুন।"

ভিতরে বামাকণ্ঠের সানাই বেজে উঠল।

দাঙ্গা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে যে ক-জন বাকি ছিল তারাও সরে পড়তে লাগল। পাড়ার ছোকরাদের উপর এতদিন তিরস্কার বর্ষণ হচ্ছিল তারা নিষ্কর্মা বলে। এখন তারাই হল পাড়ার ভরসা। দেখতে দেখতে অনেকগুলি হকি স্টিক ক্রিকেটব্যাট টেনিস র‍্যাকেট বারবেলের ডাণ্ডা কাঠের মুগুর নির্গত হল।

বাপ মরলে ছেলের বিয়ে সেই রাত্রে হতে পারে না। আমার শেষ চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি তিনকড়ির বাড়ি থেকে তারিণীকে ফোন করলুম। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে কানাইয়ের খুনের গুজব রটেছে। কে জানে এই অবলম্বন করে শেষকালে একটা সত্যিকার দাঙ্গা বেধে বসবে। তারিণীও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, বললে, "আসছি।"

ইতিমধ্যে সকলে তিনকড়িকে ধরাধরি করে একখানা তক্তপোশের উপর শুইয়ে দিয়েছিল। পুলিসের লোক দেখে তাঁর চেতনা ফিরল। তারিণী বলল, "তিনকড়িবাবু, আপনি বিবেচক ব্যক্তি। পুলিসের কাছে খবরটার সত্য মিথ্যা যাচাই না করে চট করে বিশ্বাস করে ফেললেন যে, বাচস্পতি মশাই খুন?"

"শুনলুম তিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন।"

"অদৃশ্য হয়তো তিনি স্ব-ইচ্ছায় হয়েছেন। অমন একটা গুজব শুনলে কে না অদৃশ্য হয়ে যায়?"

এইবার আমার পালা। তিনকড়ি ও তাঁর দাদা রাখহরিবাবু আমাকে মুরুব্বী পাকড়ালেন। "শ্রীযুক্ত মহলনাবীশ, বিবাহ তো স্থগিত থাকতে পারে না।"

"তা তো পারেই না।" আমি এতক্ষণ মনে মনে মহলা দিচ্ছিলুম। মহলানবীশের মহলা। বললুম, "হয় আজ রাত্রেই বাচস্পতি-মশাইকে খুঁজে বার করতে হবে, নয় পাত্রান্তরে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে।" তিনকড়ি ও রাখহরি মুখ-চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। হয়তো ভাবলেন মহলানবীশ নিজেই কেন বরের পিঁড়িতে বসে যান না? কানাইয়েরই সমবয়সী, তফাতের মধ্যে আছে এক চির শয্যাগত স্ত্রী। না থাকারই সামিল।

আমি প্রলোভন দমন করলুম। সুস্থকায়া স্ত্রী পেলে আমি তো আর অবচেতন মনের মনীষী রইব না, আমার পেশা যাবে, বাংলার সাহিত্য আমার বিশিষ্ট দান থেকে বঞ্চিত হবে।

বললুম, "দেখুন, বাচস্পতিকে আজ রাত্রে কলকাতায় পাবেন না। প্রাণ আগে না পরিণয় আগে? তা হলে বাচস্পতি ছাড়া কি পাত্র মেলে না? এই তো বাচস্পতিরই ছেলে স্মরজিৎ রয়েছে—"

তিনকড়ি কথা কেড়ে নিয়ে ভারী উষ্মার সহিত বললেন, "সেই হতভাগাটার জন্যেই তো

বিপদ। দু-বেলা সামনের গলিতে ঘুর ঘুর করত। ফেলির পড়াশুনায় মন বসত না, তাই জানিয়েছিলুম বাচস্পতি মশাইকে। কী কুক্ষণেই জানিয়েছিলুম। শ্রীযুক্ত মহলানবীশ তো স্বচক্ষে দেখেছেন সে কী জুলুম।"

"ও কথা ভুলে যান তিনকড়িবাবু।" আমি প্রবোধ দিয়ে বললুম। "উপস্থিত বিবেচনা করুন আজকের এই অর্ধেক খালি কলকাতা শহরে স্মরজিৎকে মেয়ে দেবেন কি অন্য কাউকে খুঁজতে বেরোবেন। স্মরজিৎ বি-এ পাস, এইবার ল' দেবে। আপনার মতো মুরুব্বী আমার মতো হিতৈষী পেলে ও যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাসবিহারী কি তৃতীয় আশুতোষ হবে না কে এ কথা জোর করে বলবে। যৌবনকালে কত মহাপুরুষ কত কীর্তি করেছেন। ও তো শুধু নিজে পায়ের জুতো খইয়ে আপনার বাড়ির সদর রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে।"

তিনি একবার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসে বহুবিধ কাতরোক্তি করতে করতে বললেন, "সেই মেয়ে পাগ্‌লাকেই মেয়ে দেবো। এখন তাকে পাই কোথায়?"

সে ভার আমি নিলুম। গেলুম স্মরজিৎকে আনতে। ভগবানের চেয়েও বড়ো ভাবুক আছে। সে মহেশ। সেই মহলানবীশের মহলা বিধির বিধানকে পরাজিত করে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারে সেই মহলানবীশ।

কিন্তু কোথায় স্মরজিৎ? রয়েছে একখানা চিঠি—"দাদা, পিতার ঈপ্সিতাকে পত্নী করতে পারব না। আমার মরণ শ্রেয়ঃ। চললুম মরণের সন্ধানে। ইতি। অভাগা স্মরজিৎ!"

এইখানেই গল্পটি শেষ করে দিলে পাঠক হয়তো স্মরজিতের মরণে অশ্রুপাত করবেন। সেটা অনর্থক। স্মরজিৎ দিব্যি বেঁচে আছে, তবে আমি ও আমার নবীনা স্ত্রী তার মুখদর্শন করিনে।

চিঠি

বুদ্ধদেব বসু

'চিঠি লিখো কিন্তু।'

শোভা লজ্জিতভাবে হেসে বললে, 'হ্যাঁ, এই বুড়ো বয়সে আবার চিঠি।'

স্ত্রীর কথায় তার এই নেহাৎই যুবকোচিত সখের জন্য সুরেন নিজেও মনে-মনে একটু লজ্জিত হল। ব্যাপারটাকে যা-হোক একটা শোভন আচ্ছাদন দেবার চেষ্টায় সে বললে, 'বাঃ, ছেলেপুলেদের জন্য একটা ভাবনা হবে না!'

শোভা বললে, 'ক'দিনই বা।'

সত্যি, বেশিদিন নয়। যে-দরকারে যাচ্ছে, তাতে বড় জোর দিন চারেক সব সুদ্ধ। 'তা এক জায়গায় গেলে কি আর,' নিজেকে বোঝাবার মতো করে সে বললে, 'চট করে আসা যায়। দু চারদিন দেরি হয়ই। তার উপর আবার মানিকের সর্দ্দি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' শোভা হেসে ফেললে, 'সে হবে খ'ন।'

'মনে থাকবে তো ঠিক?'

'থাকবে। তুমি গিয়েই একটা পৌঁছসংবাদ দিয়ো কিন্তু।'

এবার সুরেনের সুযোগ। বললে, 'দিল্লি-লক্ষ্ণৌ তো আর যাচ্ছি নে। এত ভাবনা কিসের?'

'এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে পৌঁছসংবাদ একটা দিতে হয়।'

'মা-র কাছে লিখবো।'

'বেশ তা-ই লিখো।'

'তুমি মনে মনে রাগ করবে না? একটুও নয়?'

'আর কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ো তো চট করে। কাল আবার সকাল-সকাল উঠতে হবে। খেয়াল আছে?'

সুরেন চুপ করলে, কিন্তু শিগগির তার ঘুম এলো না। এতো আনন্দ তার মনে। কলকাতা পৌঁছে শোভাকে সে চিঠি লিখবে, সেটা সে মনে-মনে তৈরি করছিলো,—না, তা ঠিক নয়, সেটা ভাবছিলো মনে-মনে অস্পষ্ট, অনির্দ্দেশ্যভাবে। যে-কথাগুলো নিয়ে সেই চিঠি, তা সে তখনো জানে না। সে শুধু দেখতে পাচ্ছিলো কার ছবি। চার পৃষ্ঠা ভরা ঘন লাইনে কালো কালির আঁচড়, শাদা খামের উপর তার ব্যবসাদার হস্তাক্ষরে শোভার নাম, টিকিটের উপর ডাকঘরের ছাপ ভাঙা হয়ে পড়েছে। দু'দিন বাদে শোভার জবাব পৌঁছাবে এসে তার হাতে—কাঁচা হাতের লেখা, অনেক কাটাকুটি, পুনশ্চর পর আবার পুনশ্চ। এই রকম রাত্তিরে ঘরে খিল এঁটে আলো জ্বেলে সে লিখবে—অনভ্যস্ত আঙুলে বারবার যাবে কালি লেগে। লেফাফার গোপনতায় আবদ্ধ দুজনের

মনের কথা করবে আনাগোনা। লেফাফাটা প্রথম হাতে এলে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একটু দেখা—কী আছে ভিতরে জানি নে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। তারপর সেটা খোলা—খোলবার সময় হয়-তো আঙুল যাবে একটু কেঁপে। সাদা কাগজের উপর থেকে কতগুলো অক্ষর নীরবে তাকিয়ে আছে। যে-সব কথা এত বেশি সত্য, তা যে এত বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—আশ্চর্য। বড় সহজ কথা, কিন্তু মুখে কখনও বলা যায় না। সহজ বলেই যায় না। আর মুখের কথা—সে তো বলামাত্র ফুরিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। চিঠি—চিঠি হচ্ছে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিষ। তাকে ছোঁয়া যায়। রাত বেশি হলে বার করে এনে আর-একবার পড়া যায়। হয়-তো সে ফিরে এলে, যে-সব কথা তারা চিঠিতে লিখেছিলো, তার জন্য দুজনের মনে মনে একটু লজ্জা করবে। পারতপক্ষে চিঠির কথা তুলবে না। হয়-তো তা-ই হবে। কেননা, চিঠি লেখার তাদের অভ্যেস নেই। অভ্যেস নেই বললে কমিয়ে বলা হয়, এ পর্যন্ত তারা একে-অন্যের কাছে একখানাও চিঠি লেখে নি। সুযোগ পায়নি লেখবার। সাত বছর তাদের বিয়ে হয়েছে, আর এই সমস্ত সময় তারা রয়েছে কাছাকাছি, এমন একটু ফাঁক ঘটে নি যাতে চিঠি লেখা যায়। এই ছোট শহরেই সুরেনের পৈতৃক ভিটে, মস্ত বড় পরিবারের মধ্যে এখানেই সে বরাবর মানুষ হয়েছে। কুড়ি বছর যখন তার বয়েস, তার মা ঐ শহরেই এক বিধবার মেয়েকে খুঁজে বার করে তার বিয়ে দিলেন। শোভার মা ও-শহরে অনড়, দেশে তাঁর বাড়ি-ঘর নেই, অন্য-কোথাও যাবার নেই। শোভা যখন মাঝে-মাঝে মা-র কাছে গিয়ে থাকতো, সুরেন যেতো প্রায় রোজই। বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী বাপের বাড়ি গেলেই উচ্ছ্বসিত পত্রস্রোত উভয় দিকে ধাবিত হতে থাকে—বাঙালি দম্পতীর মধ্যে এটাই রেওয়াজ। সুরেন আর শোভার অদৃষ্টে সে-সুযোগ ঘটলো না। এদিকে সুরেনও তার দাদার সঙ্গে জুটে গেলো বীমার দালালির কাজে; তাদের অঞ্চলে বীমা জিনিষটা তখনো খুব বেশি প্রসার লাভ করেনি। শহরের মধ্যে থেকেই তারা জুটিয়ে ফেললে অনেক গাহেক। সাত বছরের মধ্যে সুরেনকে বাইরে যেতে হয়েছিলো, তার আশেপাশের কোনো গ্রামে, তাকে বাইরে যাওয়া বলে না। কাজের চাপ বাড়তে লাগলো; কোম্পানি বড় ভাইয়ের তদারকে সেই শহরে খুললে এক ব্রাঞ্চ-আপিস। সুরেন এম্‌নিই বাড়ি থাকতে ভালোবাসে, বেড়াতে যাবার সখ তার বড়-একটা নেই। এর পর থেকে, কাজে জড়িয়ে পড়ে বাইরে যাওয়া তার পক্ষে ধারণার অতীত হয়ে উঠলো। আপিসের কাজে তাকে না হলে তার দাদার চলে না। দালালি সে করতো ভালো; ঐটুকু শহরের মধ্যে বীমা করবার মতো এতগুলো জীবন ছিলো, অবাক হতে হয় ভাবলে। নিজের বাড়িতে বসে দু পয়সা রোজগার করে বেশ ছিলো সে, স্ত্রীকে নিয়েও সে সুখী হয়েছিলো। মা দাদা বৌদি দিদি ভাগ্‌নে, নানা বয়সের ছেলেমেয়ে, নানা সম্পর্কের ভাইবোন, প্রাত্যহিক অতিথি অভ্যাগত ইত্যাদির মধ্যে একরকম করে ফুটে উঠেছিলো শোভার সঙ্গে তার মৃদু চাপা গোছের ভালোবাসা। খুব একটা তীব্রতা প্রথম অবস্থাতেও ছিলো না; সাত বছর পরেও, তিনটি ছেলেমেয়ে সত্ত্বেও, অভ্যাসের ঢিল ধরে নি। সুরেনের শুধু মাঝে-মাঝে যেন মনে হতো, সাত বছর ধরে শুধু ওর কাছেই থাকলাম। হঠাৎ ইচ্ছা করতো, কয়েকদিনের জন্য দূরে কোথাও চলে যেতে; শুধু ওকে ফেলে থাকতে কেমন লাগে, তা জানবার জন্য। ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকবে, কিন্তু সেই সমস্তটা ফাঁকা যেন ওকে দিয়ে ভরা। এখানে এত কথা, এত কাজ, এত ভিড়ের মধ্যে ওকে যেন ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, অন্য-কোথাও গেলে ওর সবটা ধরা পড়বে চোখে। তাছাড়া—চিঠি, হ্যাঁ চিঠি লেখাটা দাম্পত্য জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ, সে জানতো। কম মধুর

নয়। বন্ধুরা কেউ-কেউ তাদের বউদের চিঠি দেখাতো তাকে—কী মস্ত-মস্ত ব্যাপার, কত সুন্দর-সুন্দর কথা, বানানো কথার মতো। সুরেন মুগ্ধ হয়ে যেতো। একটা চিঠির কয়েক লাইন তার মন ভুলতে পারে নি 'জানলার কাছে নিমগাছ থেকে ঝরে পড়েছে ছোট-ছোট শাদা ফুল, কয়েকটা উড়ে এসে পড়লো আমার বিছানায়। তক্ষুনি মনে পড়ে গেল তোমার কথা; লিখতে বসলুম চিঠি।' এই পত্রের লেখিকা ছিলেন বি-এ পাশ—সম্ভ্রমে সুরেনের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি। ওরকম চিঠি পেতে ভালো লাগবে, আর লিখতে। ঠিক ও-রকম না-ই বা হল, চিঠি তো হবে। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছা করতো, শোভাকে চিঠি লিখতে—কোনো বাছবিচার না করে যা খুশি তা-ই, মন খুলে শুধু বকে যাওয়া। ঐ রকম একটি চিঠি লেফাফায় ভরে শোভার বালিশের নীচে যদি রেখে দেয়—ভাবতেই হাসি পায়। কিন্তু এমন হাসি পাবারই বা কী, মুখের কথায় যখন কিছুতেই বলবার নয়? কী লিখবে চিঠিতে, সুরেন তা ঠিক জানে না, ভেবে দ্যাখেনি কখনো। শুধু জানে, অনেক কথা লিখবে। বাজে কথা। সাত বছরের মধ্যে এমন একটা দিন এলো না, যেদিন দূর থেকে সে শোভাকে শোনাতে পারে তার মনের বকুনি।

এতদিনে সুযোগ এসেছে। প্রতি বছর তাদের কোম্পানির বাৎসরিক ভোজে ও পরামর্শ সভায় কলকাতার আপিস থেকে তাদের নিমন্ত্রণ আসে। নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার দাদাই—তবে এ-বছর তিনি জ্বরে পড়েছেন বলে তাকে যেতে হচ্ছে। কাল সে যাবে। কলকাতা পৌঁছেই সে শোভাকে চিঠি লিখবে। চিঠি লিখবে, এ-কথা মনে করতেই এত আনন্দ যে স্বভাবত ঘুম-কাতুরে লোক হয়েও খানিকক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুম এলো না। পরদিন রওনা হবার আগে নানা সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যেও এক ফাঁকে সে সুযোগ করে নিলে আর-একবার এ-কথা বলবার—'লিখো কিন্তু চিঠি।'

কলকাতায় এসে সুরেন কয়েকঘণ্টার মধ্যেই দস্তুরমত হাঁপিয়ে উঠলো। এত বড় শহর, এত লোক—এর মধ্যে নিজেকে সে যেন হারিয়ে ফেলেছে, চিনতে পারছে না নিজেকে। তাদের ছোট শহরে সে, রাস্তায় বেরোয় ঢিলেঢোলা-ভাবে; হাতে আছে কাজ, কিন্তু চলার ধরনে ব্যস্ততা নেই—আস্তে আস্তে হাঁটে, পদে-পদে সাক্ষাৎ হয় বিভিন্ন স্তরের পরিচিতর সঙ্গে, কুশল প্রশ্ন-বিনিময়ে, এটা-ওটা-সেটা আলাপে লঘু হয় কাজের দায়িত্ব, অন্তরের প্রসন্নভাব যেন দিনের বিস্তৃত কর্মরাশিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আর এখানে, কলকাতায়, কাজ হচ্ছে নেহাৎই কাজ, চোখ-মুখ বুজে সম্পন্ন করবার, যেমন করে হোক সারবার একটা দায়। সবাই তড়বড় করে চলে, তাকায় না কোনদিকে, কথা কয় না কারো সঙ্গে। যেন এক প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি সবগুলো লোককে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ফুটপাথ ভরে, অসংখ্য ট্রাম আর বাস ভর্তি করে নানা দিক থেকে নানা দিকে আনাগোনা করছে এত লোক—কেউ কাউকে চেনে না, কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই—এই ব্যাপারটা সুরেনের মনে বিভীষিকার মতো ঠেকলো। তার প্রাদেশিক জীবনের সুলভ-অবসর মন্থরতা নিয়ে এখানে সে একেবারে খাপছাড়া। যে-মেসটাতে সে এসে উঠলো, সেখানকার অন্যান্য বাসিন্দারা তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র কৌতূহল দেখালো না—কোত্থেকে আসছেন, কেন এসেছেন, কদিন থাকবেন, এ-সমস্তও নয়। সে যে এসেছে, তাদের মধ্যে একজন নতুন লোক, কিছুই নয় যেন এ-ব্যাপারটা। নিতান্ত প্রয়োজনীয়ের বাইরে কোনো কথা বলবার সে বাইরে থেকে উৎসাহ পেলো না। না পেলো তার নিজের মধ্যে সাহস; রাজধানীর ভাষা তার জিহ্বায় সহজে আসতো না। নামমাত্র আহার করে সে বেরিয়ে পড়লো কাজে; সমস্ত দিন কাটালে

ক্লাইভ স্ট্রিটে তাদের হেড আপিসে। বেরুলো যখন, সন্ধে হয়ে আসছে। শহরের বাণিজ্যকেন্দ্রে ফিরতি স্রোতের খর-চাঞ্চল্য। মৃদুসঞ্চারী সান্ধ্য ছায়ায় প্রকাণ্ড দালানগুলো অশুভ দৈত্যচমূ-র মতো আকাশের দিকে উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কলকাতা তার ইঁট-কাঠ লোহা-লক্কড়, যান-যন্ত্র নিয়ে চারিদিক থেকে সুরেনকে ঠেসে ধরলো। তার নিঃশ্বাস যেন আর সহজে পড়ছে না। কর্মক্ষেত্রে তার সমাদর হয়েছে, স্বয়ং গোল্ডিং-সাহেব তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছেন, কোম্পানি থেকে তাকে একটা বাঁধা মাইনে দেবার প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কিছুই তার ভালো লাগছিলো না। তার চারদিক এমন ফাঁকা, সে এমন একা, এত অসুখী তার জীবনে এর আগে কখনো লাগে নি। শুধু তার শোভাকে মনে পড়ছিলো, শোভার মুখ, মনে পড়ছিলো তার লুটিয়ে পড়া আঁচলের লাল পাড়। মিথ্যে এই ব্যস্ততা, এই কোলাহল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে-চলা এই ভিড়। সব মিলিয়ে গিয়ে রইলো এক নির্জনতা, যেখানে এক শোভা ছাড়া আর-কিছু নেই। মোটে তো একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কতদিন শোভাকে সে দ্যাখেনি। যদি তার নিজের ইচ্ছে-মতই সে চলতে পারতো, তা হলে আজকে রাত্তিরের গাড়িতেই সে যেতো ফিরে।

ভারি মন নিয়ে সে ফিরে এলো তার বৌবাজারের মেসে। সে এসেছে, এই ব্যাপারটায় কোথাও একটু ছাপ পড়লো না। যে যেমন ছিলো, রইলো নিজের মনে। তীব্র ক্ষুধা তার জঠরে, অথচ সে-বিষয়ে তার বোধ ছিলো না। খাবার কথা তার মনেও হল না একবার। এত অবসাদ তার শরীরে সেই পোষাকেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো তক্তপোষের উপর। ঘরের অন্য দিকের সীটে মাথার সামনের দিকে টাকপড়া চশমা চোখে এক ভদ্রলোক পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছেন কোন্ জন্মের পুরোনো এক ছবিদার বিলিতি সাপ্তাহিকের। ধোবার হিসেব আর অশ্লীল ছড়া অঙ্কিত দেয়ালে দুটো মোটা টিকটিকি শিকার নিয়ে লড়াই করছে কি প্রেম করছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইলেকট্রিক বাল্‌বের সামনে একরাশ খুদে-খুদে পোকা তাদের মুহূর্তের জীবন নিয়ে জড়ো হয়েছে। রাস্তার ট্র্যাফিকের অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর ভেসে আসছে অস্পষ্ট হয়ে। পাশের ঘরে স্টোভে ভাজা হচ্ছে ওম্‌লেট, পাওয়া যাচ্ছে তার গন্ধ। সুরেনের ইন্দ্রিয় যে-সব জিনিষ অনুভব করছে, তার মন তা দিচ্ছে ফিরিয়ে, গ্রহণ করতে পারছে না কিছুই। তার মনের মধ্যে একটা শূন্যতা, ভীষণ একাকীত্ব। চুপচাপ শুয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ সেই একাকীত্ব আর শূন্যতা তার মনের মধ্যে যেন কথা কয়ে উঠলো; তারা তোলপাড় তুলছে, কলরব করছে, তারা খুঁজছে ভাষা। তারা প্রকাশিত হবে। এতক্ষণে সুরেনের মনে পড়লো তার সেই চিঠির কথা, শোভাকে যা লিখতে পারবে বলে কলকাতায় আসবার কল্পনায় সে অত খুশি হয়েছিলো। হ্যাঁ, এখনই সে শোভাকে চিঠি লিখবে, সাত বছরের মধ্যে তার প্রথম চিঠি। মনের মতো করে লিখবে একটি চিঠি, মনের কথা দিয়ে ভরে—তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বার-বার মনে পড়ছে তোমাকে। এ-কথা সত্য আর এত সহজ, নিজের মনে উচ্চারণ করে সুরেন নিজেই অবাক হয়ে গেলো। সে উঠে বসলো; বার করলে কাগজ আর কলম; দেয়ালের দিকে মুখ করে, কেউ যাতে না দেখতে পায়, নিজের শরীর দিয়ে কাগজটাকে যথাসম্ভব আড়াল করলে। ঠিকানা আর তারিখ ঘষঘষ করে লিখে আরম্ভ করলে—

'শোভা'

তারপর সে একবার বালিশটাকে বুকের নীচে ভালো করে চাপা দিয়ে নিলে, খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো, বাজে একটা কাগজের উপর কলম দিয়ে কয়েকটা আঁকিবুঁকি

আঁকলে, তারপর আবার তাকালো তার চিঠির দিকে, যেখানে লেখা রয়েছে—

'শোভা'।

'শোভা' কথাটার উপর সে কয়েকবার কলম বুলালে; অক্ষরটা বিশ্রীরকম মোটা হয়ে উঠলো। বালিশটাকে নিলে পালটিয়ে। কলমটাকে ঠিক প্রস্তুত অবস্থায় ধরে সে ভাবতে লাগলো ....ভাবতে লাগলো। কী বলে আরম্ভ করবে? তোমাকে ছেড়ে এসে কিছুই ভালো লাগছে না, বার-বার মনে পড়ছে তোমাকে; ঐ তো তার দুটি কথা, এক লাইনেই শেষ হয়ে যায়। ঐ দুটি কথা নিয়ে কী করে সে পাতা ভরাবে? তার সেই চার পৃষ্ঠা জোড়া চিঠি, যার ছবি মনে-মনে সে দেখছিলো ছবি হয়েই তা রইলো, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অনেক, অনেক দূরে। ঐ তার দুটি কথাই বার-বার, বার-বার লিখে পাতার পর পাতা ভরে যদি সে পাঠাতে পারতো! আর, অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে-ভাবতে সেই দুটি কথার ধার যেন তার নিজেরই মনে ক্ষয়ে আসতে লাগলো, কাগজের উপর তাদের লিখিত হবার যোগ্যতাকে সে আরম্ভ করলে সন্দেহ করতে—এমন কি, ঐ দুটি কথা সত্যি তার মনের কথা কিনা, সত্যি কি শোভাকে ছেড়ে এসে তার কিছুই ভালো লাগছে না, সত্যি কি বার-বার মনে পড়ছে তাকে, তাও যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না। অদ্ভুত আধ-শোয়া অবস্থায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তার কোমর টাটাতে লাগলো। তখন হঠাৎ সে লিখে ফেললে তার চিঠি—

'আজ সকালে নিরাপদে পৌঁচেছি। পথে কোন অসুবিধা হয় নি। মানিকের জন্য চিন্তিত আছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর কী লিখবো। ইতি।'

কাগজটা ভাঁজ করে সে খামে ভরতে যাবে, হঠাৎ থেমে গেলো। কী একটু ভাবলে, তারপর ভাঁজ খুলে বসিয়ে দিলে একটা পুনশ্চঃ

'মনে হচ্ছে আমার ঘরের টেবিলের বাঁ দিকের দেরাজে গোটা সাতেক খুচরো টাকা পড়ে রয়েছে। দেরাজটা চাবি লাগিয়ে রেখো, আর যদি চাবি খুঁজে না পাও, টাকাগুলো তোমার হাতবাক্সে তুলে রেখো।'

কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিলো বলে সুরেন মনে-মনে একটু শান্তি অনুভব করলে। মন্মথ নামে তার এক দূর সম্পর্কের ভাই এসে উঠেছে বাড়িতে; ছেলেটা সুযোগ পেলেই চুরি করতে ছাড়ে না।

কীজ্‌বাব্‌

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়াটা ঠিক কী বস্তু তা সত্যধনবাবু জানেন না, কথার কথা শুনেছেন মাত্র। কিন্তু এখন ওঁর যা অবস্থা তাতে মনে হল সেটাও বোধ করি এর চেয়ে ঢের সহনীয় হত!

চাকরি যাবে না এটা ঠিক, এত সহজে আজকাল কারো চাকরি যায় না! আগেকার দিন নয়, মানে বাদশাহী আমল নয় যে কাঁচা মাথাটাই উবে যাবে কাঁধের ওপর থেকে। এ কথা কোনো ওপরওয়ালাই এ যুগে বলতে পারে না যে, সাতদিনের মধ্যে জবাব না পেলে গর্দান যাবে—কিংবা 'বলতে পারলে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা মিলবে।' সে দিনকাল তো নেইই, এমন কি ইংরেজ আমলও নেই। সেদিক দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তবু অপমান তো বটেই মহামান্য হাকিমের ভ্রূকটিকুটিল মুখে যে বিরক্তি, তাচ্ছিল্য এবং অবজ্ঞা ফুটে উঠবে—দুদিকের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টারের দল প্রকাশ্যেই যে ভাবে হাসাহাসি করবেন—'আজকাল বিদ্যে সকলরেই সমান!' এই বলে—সেটা তো মানসচক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন সত্যধনবাবু। এতকাল সসম্মানে চাকরি করে এসে বুড়ো বয়সে, রিটায়ার করার আর মাত্র দুটি বছর বাকী থাকতে, এই দুর্নামটা কুড়োবেন তিনি? না, এর চেয়ে থ্রম্বসিস হয়ে মরে যাওয়াও বোধ করি ঢের ভালো ছিল!

অথচ আইনতঃ তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারেন না—তা সত্যধনবাবুও জানেন। খেয়ালখুশিমতো উদ্ভট উদ্ভট শব্দের অর্থ বাতলাবার জন্য তাঁকে চাকরিতে নিয়োগ করাও হয় নি। কিন্তু তবু সে কথা কী আর বলতে পারলেন! কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হ'ল তাঁকে নিঃশব্দে।

আর এতগুলি অনুবাদক থাকতে তাঁর ওপরই বা এ চোট পড়ে কেন!

এ স্রেফ অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়! কী কুক্ষণেই 'চীফ' ছাপটা পড়েছিল তাঁর চাকরির ওপর। ঐ তো সব ছোঁড়ার দল আছে—এম. এ. পাস বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, একজন সাধারণ বি.এ.-র অধীনে কাজ করতে হয় বলে বিলাপের অন্ত নেই, ঠারেঠোরে প্রায় প্রত্যহই তাঁকে জানিয়ে দেয় যে ওরা তাঁর চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানে, অথচ কাজের দিকে চাইলে সত্যধনবাবুর চোখ কপালে ওঠে, অভিধান খুলে দেখেও ঠিকমতো অর্থটা বুঝে নিতে পারেন না বাবুরা—! কেন, ওদের কাউকে ডাকতে পারলেন না হাকিম, বিদ্যের দৌড়টা বুঝে নিতেন একবার!

নিতান্তই অদৃষ্ট বলতে হবে। নইলে আজ তো তাঁর আসবার কথাও ছিল না।

আজ কামাই করবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন, কথা ছিল সোমবার আজ স্ত্রীকে নিয়ে তারকেশ্বর যাবেন। কী যে দুর্বুদ্ধি হল, শেষ মুহূর্তে গৃহিণীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আগামী রবিবার পর্যন্ত যাত্রাটা মুলতুবী রেখে অফিসে বেরিয়ে পড়লেন।

কে জানে—বাবা তারকনাথেরই রোষ পড়ল কিনা!

নইলে সবে দুটোর পর হাত মুখ ধুয়ে এসে বাড়ি থেকে আনা বড় বই-ডিবেটা খুলে লুচির দিস্তেয় হাত দিয়েছে আর অমনি সান্যাল হুজুরের চাপরাসী এসে দাঁত বার করে দাঁড়াবে কেন? 'হুজুর সেলাম দিয়া!'

সেলাম দিয়া তো দিয়া—তাই কি খাস কামরামে দিয়া! একেবারে আদালতঘরে, গিসগিস করছে লোকজন, বাদী প্রতিবাদী ব্যারিস্টার অ্যাটর্নীর দল প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে চারদিক থেকে, তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হল বলির পাঁঠার মতো।

'আমাকে ডেকেছেন মি. লর্ড?'

"ও আপনিই আমাদের চীফ ট্র্যানস্লেটর মিঃ মল্লিক? দেখুন তো—এটার কিছু মানে করতে পারেন কি না!"

সামনে পড়ে আছে কোন্ আপীল কেসের কাগজপত্র—ছাপা কাগজের বইয়ের মতো। তার মধ্যে থেকে একখানা তুলে ইঙ্গিত করলেন চাপরাসীকে—সে এলে মেলে ধরল সামনে।

নীচের আদালতে বিবদমান কোন পক্ষের জবানবন্দি বা সাক্ষ্য—তারই ইংরেজী অনুবাদ। তার মধ্যে একটা জায়গায় মোটা ক'রে লাল পেনসিলে দাগ দিয়েছেন মহামান্য জজ বাহাদুর; ইংরেজী হরফেই লেখা কিন্তু তার উচ্চারণ, "কীজ্‌বাব্"। ইংরেজীতে ঠিক এমনি লেখা আছে "Keez Baab." সত্যধনবাবু বারকতক পড়লেন শব্দটা।

আগের বাক্যের সঙ্গে পরের বাক্যগুলো মিলিয়ে ঐ বিশেষ শব্দটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করলেন—অর্থাৎ চট্ ক'রে কিছু খাপ খেয়ে যায় কিনা।

তারপর—সামান্য একটু পরেই সে চেষ্টার নির্বুদ্ধিতাটা নিজের কাছে ধরা পড়ল—এঁরা কি আরও চেষ্টা না করেই তাঁকে ডেকেছেন? নিশ্চয় বেয়েছেয়ে দেখেছেন আগে।

শূন্যদৃষ্টি তুলে তাকালেন সত্যধনবাবু একবার চারদিকে।

হাকিম বাহাদুর, চারদিকে কৌসুলীর দল—আমলাফয়লা চাপরাসী বাদী-প্রতিবাদী—মায় এই বড় উঁচু ঘরখানার সাজ-পাট, ছাদের খিলেন প্রলম্বিত পাখাগুলো—সবেতেই তাঁর সেই শূন্য দৃষ্টি ঘুরে এল একবার।

কিন্তু কোথাও কিছু বুঝি পেলেন না অবলম্বন। এমন কোনো সূত্র মনে এল না যে সেই সূত্র ধরে এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

ঘেমে উঠলেন দেখতে দেখতে। কান ও কানের পাশগুলো আগুন হয়ে উঠল যেন। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পা দুটোতে অকারণ একটা দুর্বলতা বোধ করলেন।

এখনকার ঐ সব তরুণ ছেলেরা গ্রাহ্যও করত না। তারা সটান বলে দিত—'আমি জানি না।' জানতেই যে হবে তার মানে কি?

কিন্তু এইখানেই ওঁর সঙ্গে ওদের তফাত।

উনি এই এতগুলো লোকের সামনে বলতে পারবেন না যে, আমি জানি না।

এতকাল ধরে এইখানে কাজ করছেন, বহু দুরূহ শব্দের অর্থ করেছেন, অনুবাদ করেছেন অনেক অপ্রচলিত শব্দের—আর এখন বলবেন যে 'আমি পারি না!' ছি!!

উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে আছেন মহামান্য বিচারপতি। তাকিয়ে আছে সকলে।

সেদিকে চেয়ে একবার ঢোক গিললেন সত্যধনবাবু।

তারপর মাথা হেঁট করে জানালেন, মি লর্ডের কাছ থেকে তিনি একটু সময় চান। খুবই অপ্রচলিত শব্দ—সুতরাং একটু সময় না পেলে বলা শক্ত হবে।

'বেশ তো! খুব ভাল কথা! বলুন কতটা সময় চান। কাল বলতে পারবেন?'

'আজ্ঞে, চেষ্টা করব খুব—নয়ত আর এক দিন!' বলে ফেললেন সত্যধনবাবু।

'বেশ তাই হোক। আপনি পরশু বুধবার দুটোর সময় আমাকে জানিয়ে যাবেন দয়া ক'রে!'

হাতের ইঙ্গিতে তাঁকে অব্যাহতি দিলেন মহামান্য বিচারপতি। অন্য প্রসঙ্গে মন দিলেন তার পরে।

গৃহজাত লুচি এবং আলু পিঁয়াজ চচ্চড়ি জীবনে এমন বিস্বাদ কখনও লাগে নি তাঁর—এর আগে।

'কি হল দাদা? কী বললেন হুজুর?'

প্রশ্ন করল দু-একজন সহকর্মী।

'না, ও একটা শব্দের মানে করতে পারছিলেন না—তাই!'

খাবারের কৌটো ঠেলে রেখে চায়ের গেলাসটা টেনে নিলেন সত্যধনবাবু।

ক্ষুধা আর কিছুমাত্র নেই; পিপাসাই বরং প্রবল হয়ে উঠেছে, বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে ওঁর। চা-ই এখন শুধু প্রয়োজন একটু। খুব গরম আর কড়া চা।

'তা মনে করে দিয়ে এলেন?'

খুব সরল ভাবে প্রশ্ন করে তরুণ গাঙ্গুলী। কিন্তু তবু গলার আওয়াজে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরটুকু ঠিক বোঝা যায়। মহা ফক্কড় ছোকরা! তবু যদি না বাংলায় এম. এ. হত! ইংরেজী শব্দের মানে খুঁজতে মিনিটে চোদ্দবার গাঙ্গুলীর ডিকসনারী হাতড়াতে হয়।

'হুঁ।' বলে গম্ভীরভাবে হাতের কাজ টেনে নিলেন।

'হু' শব্দটা দ্ব্যর্থক। 'হ্যাঁ' ও হয়—'না' ও হয় আবার 'আচ্ছা দেখছি বা চেষ্টা করছি'—এ রকমও হতে পারে।

কিন্তু কাজে মন দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা নয় ওঁর। এ রকম শব্দ কখনও শোনেন নি তিনি। এর জাত পর্যন্ত চেনেন না এটাও ঠিক। অর্থাৎ কোন্ ভাষার কথা তাই বুঝতে পারছেন না! কোন্ ভাষা আন্দাজ করতে পারলেও না হয় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে অভিধান দেখা চলত।

কাকে জিজ্ঞাসা করবেন তিনি?

কে বলতে পারবে? অথবা এই অন্ধকারে একটু পথ দেখাতে পারবে? মানে কোন্ দিক ধরে চললে, কাকে ধরলে এর হদিস মিলতে পারে—সেটুকু অন্ততঃ বাতলাবে?

এই প্রশ্নই অনবরত মনে মনে করে যেতে লাগলেন তিনি।

অবশেষে ভাবতে ভাবতে যখন প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন—হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুকুমার বাঁড়ুয্যের কথা।

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই তো! এই তো ঠিক হয়েছে! বাঁড়ুয্যের কাছে গেলেই তো সমস্যা মিটে যায়।

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্, জগৎজোড়া নাম। নিজে চব্বিশটি ভাষায় কথা কইতে পারেন।

এঁর কথাটা মনে পড়ে নি এতকাল! আশ্চর্য! বিপদে পড়লে মানুষ এমনিই বেহুঁশ বুদ্ধু বনে যায় বটে।

ওঁর কাছেই তো আগে যাওয়া উচিত ছিল।

অত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী নন আদৌ—সত্যধনবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে একটু। খাতিরও করেন। সুকুমারবাবুর বেয়াই—মেয়ের শ্বশুর—হলেন সত্যধনবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একেবারে এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

সেদিনের মতো কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে উঠে পড়লেন সত্যধনবাবু। ব্যাগের মধ্যে টিফিনের বই-ডিবে আজ ভরতিই রইল—আহারে কিছুমাত্র রুচি নেই আর। খাওয়া যে হয় নি, সে কথাটাও মনে পড়ল না।

প্রথমে গেলেন বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বাড়িতেই। দেখা হল না।

শুনলেন ফিরতে দেরি হবে—ইউনিভার্সিটিতে কী বুঝি জরুরী মিটিং আছে।

গেলেন সেখানে।

সেখানে শোনা গেল যে তিনি অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন। আরও দুটো কি মিটিং সেরে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যাবেন।

অগত্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁকে আবার সেই দুরারোহ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হল, আবার বাস ধরতে হল।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে তখন বুঝি কি জরুরী সভা হচ্ছে—সুতরাং বসতে হল তাঁকে বাঁড়ুয্যে মশাই বেরোলেন রাত নটারও পর।

'কী ব্যাপার? আরে, বেয়াই মশাই যে!'

আন্তরিকতার অভাব হল না। বেশ সৌহার্দ্যের সুরেই কথা বললেন সুকুমারবাবু, হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালেন চামড়া-আঁটা একটা বড় চেয়ারে।

ওঁর নাহক ঘোরাঘুরির সঙ্কট বৃত্তান্ত শুনে মুখে একটা আন্তরিক সহানুভূতিসূচক শব্দ করে বললেন, 'ইস! তাইতো, বড় তো ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আপনাকে! তা কী ব্যাপারটা বলুন তো? এত কী জরুরী দরকার পড়ল!'

ব্যাপারটা বললেন সত্যধনবাবু। অদ্যোপান্ত খুলেই বললেন, আনুপূর্বিক ইতিহাস সহ।

'কীজ্‌বাব্? কীজ বা—ব!...তাই তো। আপনি ঠিক দেখেছেন? কীজ্ বুফ্ নয়? আর্মেনিয়ান একটা কথা আছে K-i-e-t-z B-o-u-f-f—তাই নয় তো?'

'আজ্ঞে তার মানে?'

'তার মানে—আমার ঠিক মনে নেই—যতদূর মনে হচ্ছে এক ধরনের নাচ। বলেন তো গিয়ে আর একবার অভিধান দেখে নেব।'

'আর্মেনিয়ান বললেন তো? আচ্ছা আমিই দেখব'খন। বহু ধন্যবাদ। তবু একটা পথ দেখালেন যা হোক। খুব উপকার হ'ল। নমস্কার!'

শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন সত্যধনবাবু বাড়ির বাস ধরলেন।

উপকার কিছুই হল না বলা বাহুল্য।

বানানও ও নয়। ভাল করেই দেখেছেন সত্যবাবু।

তাছাড়া অর্থের সঙ্গে কোনো মিল তো হচ্ছেই না।

নাচ বটে—তবে সে নাচ নাচছেন তিনি। অন্য কোন নাচের সঙ্গে মিলবে না।

সে রাতটা এরকম জেগেই কাটল। স্ত্রীকে কিছু বললেন না, মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি অল্প, কল্পনাশক্তি আরও অল্প—সহানুভূতির কোনো মূল্য নেই। ওরা শুধু চেঁচাতেই জানে। এ কথা বললে কিছু বুঝবে না। হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। তার ওপর গৃহিণী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার কী হয়েছে বল তো, মুখ ভার, সমস্তক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে আছ, কোন কথার উত্তর দিচ্ছ না? বলি ব্যাপার কী? বুড়োবয়সে চাকরিটা খোয়ালে নাকি?'

তাইতে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। কোন উত্তরই দিলেন না।

একেবারে তাঁর দিকে পিছন ফিরে শুলেন, সমস্ত আলোচনার সম্ভাবনায় ছেদ টেনে দিয়ে।

বিনিদ্র শুয়ে শুয়ে বহু চিন্তার পর আর একটি নাম মনে পড়ল। ডবসন রোডের আদ্যনাথবাবু, পণ্ডিত লোক—ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্য বিদ্যাবিশেষজ্ঞ হিসেবে খুব নাম আছে। এদিকেও সত্যধনবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। শুধু বিদ্বানই নন, বহু দেশ ঘুরেছেন, বিশেষ করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বহুদিন ছিলেন—ওদিককার জবান খুব রপ্ত। যতদূর মনে হচ্ছে শব্দটার চেহারা দেখে ও ধ্বনি শুনে—শব্দটা আরবী ফারসী ঘেঁষাই। নিশ্চয়ই ওঁর কাছে গেলে হদিস মিলবে।

আদ্যনাথবাবুর নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন সত্যবাবু, ঘুমিয়েও পড়লেন শেষের দিকে একটু। কিন্তু সে ঐ একটুই। ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘুম ভেঙে গেল এবং কোনমতে তাড়াহুড়ো করে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে প্রথম ট্রামটি পাওয়া মাত্র হাওড়ার গাড়িতে চেপে বসলেন। এমন যে তাঁর প্রিয় প্রভাতী চা, সে কথাও মনে রইল না।

কিন্তু ডবসন রোডও হতাশ করল তাঁকে।

আদ্যনাথবাবু শুনেই অবশ্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে তুমি দেখছি একেবারে বালক সত্যধন! এর জন্য এত চিন্তা! আর, ঐ সামান্য অক্ষর বাদ পড়েছে—ওটা হবে কীজ কাবাব, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে ও কাবাবটার খুব চল আছে। আমি নিজে খেয়েছি—মানে তখন তো মাংস খেতাম খুব—তোফা খেতে!'

আদ্যনাথবাবু এখন গোঁড়া বৈষ্ণব।

প্রথমটা ওঁর উৎসাহের ছোঁয়াচে সত্যধনবাবুও কিছুটা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু যেন মনে হল গায়ে কে জল ঢেলে দিল তাঁর।

তিনি শুষ্কমুখে বললেন, 'কিন্তু কথাটা আছে—সেখানে ঠিক কোন খাবারের নাম খাপ খাবে না। তুমি অন্য কিছু ভাব।'

'অন্য কিছু হতেই পারে না। গিয়ে মিলিয়ে দ্যাখো গে ভাল করে।' একটু যেন ধমক দিয়েই উঠলেন আদ্যনাথ।

'দেখি।' বলে উঠে পড়লেন সত্যধনবাবু।

'ওকি! আরে এরই মধ্যে চললে কোথায়! বসো বসো—চা-টা খাও অন্তত!'

'না ভাই আদ্যনাথ। ওসব কিছু আর ভাল লাগছে না। এর একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত—'

'তোমার ও মীমাংসা হয়েই আছে। তুমি যদি না বোঝ তো কী করব! তোমার মাথাটাই গেছে খারাপ হয়ে চাকরির ভাবনায়।'

শেষের দিকে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে আদ্যনাথবাবুর কণ্ঠস্বর।

'না ভাই—ও তুমি বুঝবে না। ভগ্‌বানের কাছে প্রার্থনা করি, বুঝতেও না হয়—এতকাল সসম্মানে চাকরি করে এসে এখন এই শেষ দশায় একটা অপ্রতিভ হওয়া—বিশেষ ঐ চ্যাংড়াগুলোর সামনে—মনে হয় তার চেয়ে জ্যান্ত সীতাদেবীর মতো মাটির নীচে সেঁধানো ভাল। ....তুমি রাগ করো না লক্ষ্মীটি—একটু আমাকে সাহায্য করো। কোথায় কার কাছে গেলে সেটা জানা যেতে পারে যদি বলো—'

আদ্যনাথবাবু এবার বোধহয় কিছু বুঝলেন ব্যাপারটার গুরুত্ব—কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'মনে হচ্ছে আরবী ফারসী বা ঐ ধরনেরই কিছু হবে শব্দটা—তা তুমি একটা কাজ করো না বাপু, এখানে ওখানে না ঘুরে কলকাতা মাদ্রাসায় বড় মৌলবী সাহেবের কাছে যাও না। একেবারে খুঁটি ধরগে, খড়-কুটো ধরতে যেয়ে লাভ কি?'

কথাটা সত্যধনবাবুর মনেও ধরল। সত্যিই তো ধরতে গেলে মূল যে তাকে ধরাই ভাল।

তিনি ওখান থেকেই ঠিকানা জেনে নিয়ে এসে উঠলেন মৌলবী সাহেবের বাসায়।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে বসে দাড়িতে হাত বুলালেন। তারপর বললেন, 'ঠিক হয়েছে! আমার যতদূর মনে হচ্ছে কথাটা আরবী—ওটার উচ্চারণ হবে কীজ্‌ব্‌। বালির উপর উট চলে গেলে পায়ের ঠিক দাগ না পড়ে একটু বড় বড় গর্তের মতো চিহ্ন পড়ে থাকে—তাকেই বলে কীজ্‌বুব্‌। মানে ঠিক পায়ের ছাপ নয় অথচ চলে যাওয়ার চিহ্ন—সেই আর কি!'

অগত্যা সেখান থেকেও হতাশ হয়ে উঠতে হল। বলতে বলতেই বোধ করি পাণ্ডিত্যের কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মৌলবীজি।

নিতান্ত বাংলাদেশের এক অজ পাড়াগাঁর ব্যাপার, একঝাড় বাঁশ নিয়ে মামলার সূত্রপাত এর মধ্যে আর যাই হোক উটের পদচিহ্নের কথা আসে না।

সে কথাটা আর অনাবশ্যক বোধেই মৌলবী সাহেবকে বললেন না সত্যধনবাবু, শুষ্ক একটি ধন্যবাদ দিয়ে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এলেন।

জীবনটাই এখন মরুময় ঠেকছে তাঁর এই মাত্র! সেখানে একটা কারো পায়ের চিহ্ন, পথের আড়াল পেলে বেঁচে যেতেন!

সেদিন অফিসে পৌঁছলেন অনেক আগেই।

কেন, তা তিনিও জানেন না।

আসলে বাড়িতে থাকলেই অজস্র প্রশ্ন। নানা রকম জবাবদিহি।

'আচ্ছা কী হয়েছে তোমার বল তো? কী ভাবছ কাল থেকে অত? মুখ অত শুকনো কেন? অফিসের ক্যাশট্যাশ ভাঙো নি তো?'

কিংবা 'তোমার কী হয়েছে বলো তো বাবা? দাঁত ব্যথা করছে? য়্যাসপিরিন খাও না একটা!' ইত্যাদি। মনের বর্তমান অবস্থায় এসব জবাবদিহির কথা ভাবাও যায় না।

তার চেয়ে অফিসে এসে চুপ করে বসে থাকাও ভাল।

তিনি যখন এসেছেন তখন আর কেউ আসে নি, বুড়ো দপ্তরী তৈফুর মিয়া ছাড়া।

সে একটু সকালেই আসে। চেয়ার টেবিল আলমারি বই—সব ঝেড়ে মুছে সাফ রাখে।

তার সঙ্গে কথা কইবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

হয়তো মাসেও একটা কথা বলেন কিনা সত্যধনবাবু সন্দেহ।

তবু আজ তাঁর ঐ রকম নিস্তব্ধ ম্রিয়মান হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটা তার কাছেও কেমন লাগল। বার কতক আড়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখে ঝাড়নখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল একটু। তারপর একটু সেলামের ভঙ্গী করে বললে, 'কী-কী-কী হয়েছে গা ম-মল্লিকবাবু। এমন বোদাপরা মুখ করে বসে আছেন কেন? বা-বাড়িতে কোনো খা-খারাপ খবর আছে নাকি? নাকি আ-আ আপনার তবিয়তটাই খারাপ?'

দপ্তরী একটু তোতলা, কানেও একটু কম শোনে।

উড়িয়ে দেবারই কথা, 'কিছু নয়' বলে থামিয়ে দেওয়ায় হয়তো উচিত ছিল কিন্তু কী যে মনে হল সত্যধনবাবুর, বুঝি তখন তাঁর মনের যা অবস্থা কাউকে কথাটা খুলে না বলে তিনি আর থাকতে পারছেন না—তাই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ওকে খুলেই বললেন।

তৈফুর একটা হাত কোদালের মতো করে ডান কানে লাগিয়ে মন দিয়েই শুনছিল, তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রশ্ন করল, 'কী-কী-কী বললেন? ক-কথাটা যেন কী? কী-কী-কী-জবাব?'

অকস্মাৎ যেন সত্যধনবাবুর মনে হ'ল একসঙ্গে এক হাজারটা কোনো কাঁসার বাসন পাথরে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে 'ঝন' করে উঠল। যেন মনে হ'ল জমাট বাঁধা নিবিড় অন্ধকারের হিমালয় বিদীর্ণ হয়ে আলোর ঝরনা নেমে এল চোখের সামনে।

তিনি যেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতো লাফিয়ে উঠলেন। একটা কী অব্যক্ত শব্দও বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

'কী-কী-কী হল গো ম-ম-মল্লিক বাবু? ক্ষে-ক্ষেপ উঠলেন নাকি?'

তৈফুর মিয়া বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

কিন্তু তখন তাকে উত্তর দেবার সময় নেই। পড়ি কি মরি করে ছুটেছেন সত্যধনবাবু বেঞ্চ ক্লার্কের কাছে।

বেঞ্চ ক্লার্ক বিহারীবাবু তখন সবে এসেছেন অফিসে। ধীরেসুস্থে বসে পকেট থেকে একটা খড়কে কাঠি বার করে দাঁতের খাজ থেকে পানের কুঁচি বার করছেন। হঠাৎ সত্যবাবুকে অমন পাগলের মতো ঢুকতে দেখে তিনি যেন একটু ভয় পেয়ে গেলেন, 'আরে কী হল—ব্যাপার কি সত্যধনবাবু, কোন খারাপ খবর—?'

'উঁ হুঁ উঁহুঁ। কিছু নয়। আচ্ছা বিহারীবাবু, সামান্য হুজুর যে ডিপোজিশ্যানটি কাল দেখাচ্ছিলেন সেটা আছে আপনার কাছে? দেখি একবার!'

'আছে বইকি!' বিহারীবাবু কাগজের সমুদ্র থেকে সেটা খুঁজে বের করে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'বলছি! বলছি!'

কম্পিত হাতে পাতা উল্টে দাগ দেওয়া জায়গাটা বার করলেন সত্যধনবাবু।

'আঃ! জয় জগদীশ্বর! জয় বাবা তারকনাথ! এ রবিবার গিয়ে ষোল আনার পুজো দেবো বাবা! খুব মানটা রক্ষা করে দিয়েছ!'

কথাটা তখনও ভাঙলেন না কারুর কাছে সত্যধনবাবু।

আদালতের নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনমতে অপেক্ষা করলেন। তারপর দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে গিয়ে ঢুকলেন সান্যাল হুজুরের এজলাসে।

'আসতে পারি মি লর্ড?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কী খবর মিঃ ট্র্যানশ্লেটর? সেটা কি পেয়ে গেছেন—সেই মানেটা?'

'হ্যাঁ মি লর্ড সেই কথাটাই বলতে এসেছি।'

'কী বলুন তো? কই, সে জায়গাটা গেল কোথায়?'

বিহারীবাবু তাড়াতাড়ি জায়গাটা খুলে দাগ দেওয়া অংশটা দেখিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ বলুন!' হুজুর বললেন।

'ওটা মি লর্ড আসলে "কী জবাব"? বাংলায় যিনি লিখেছিলেন তিনি লেখবার সময় 'কী'র পর ফাঁক না দিয়ে তাড়াতাড়িতে 'জ'র পর ফাঁক দিয়ে ফেলেছিলেন। যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি সেটা না বুঝেই, অন্য কোন ফরেন শব্দ মনে করে রোম্যান হরফেও ঐ উচ্চারণটা মেনটেন করে গেছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তো এই আসছে মি লর্ড!'

'দেখি দেখি। কী জবাব? তা মন্দ বলেন নি তো। বরং এইটেই ঠিক য়্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে। হ্যাঁ—তাই হবে।'

'ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ মিঃ ট্রানশ্লেটার। ঠিকই ধরেছেন আপনি। আশ্চর্য, কথাটা আমাদের কারুর মনেই পড়ল না! স্ট্রেঞ্জ! মিছিমিছি আপনাকে ব্যস্ত করলাম। আচ্ছা,ধন্যবাদ!'

সগর্বে ও সতৃপ্তনেত্রে চারিদিকে তাকালেন একবার সত্যধনবাবু। কালকের সেই বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিরই যেন প্রতিশোধ এটা।

দেখলেন, উপস্থিত বাদী-প্রতিবাদী-অ্যাটর্নী-কৌসুলি—সকলের চোখেই অনুমোদন এবং—বাঙালির পক্ষে যতটা সম্ভব—একটু প্রশংসাও। একজন মুখ ফুটেই বললেন, ব্যারিস্টার ধনঞ্জয় চৌধুরী, 'ঠিকই বলেছেন আপনি কারেক্ট্! এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না!'

এইতেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন সত্যধনবাবু।

হুজুরকে বিশেষ করে এবং বাকী সকলকে সাধারণভাবে একটি নমস্কার করে বেরিয়ে এলেন এজলাস থেকে।

বাইরের বারান্দায় পড়ে হঠাৎ সত্যধনবাবুর মনে হল দিনটি আজ বড় চমৎকার। ওধারে নিউ সেক্রেটারিয়েটের চূড়ায় একটা মেঘভাঙা রঙিন রোদ পড়ে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে, শুধু বাড়িটা নয়, চারিদিকের আকাশটাও! চাঁদপাল ঘাটে বুঝি কোনো বড় জাহাজ থেকে 'ভোঁ' দিল একটা। দূরে স্ট্র্যাণ্ড রোডে বাস ট্রাম যাবার শব্দ—সবটা জড়িয়ে অদ্ভুত সুন্দর লাগল ওঁর।

আজ যেন অনেকদিন পরে মনে হল পৃথিবীটা মোটের ওপর মন্দ নয়। বেঁচে থাকাটাই একটা পরম উপভোগ্য বস্তু।

তাঁর গৃহিণী পুত্র কন্যা, আত্মীয়স্বজন—বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এমন কি তাঁর সঙ্গে ঐ যে চ্যাংড়াগুলো কাজ করে তারাও মোটামুটি মানুষগুলো সব ভালই। মায় ঐ দপ্তরী তৈফুর মিয়াও।

উঁহু, তৈফুর মিয়া এদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল তৈফুর মিয়া তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্ধব। পরমাত্মীয়।

দপ্তরী তৈফুর মিয়া যে এত ভাল লোক তা এর আগে কোনদিন কল্পনাও করেন নি। ওর ঐ দন্তহীন ঈষৎ ঘাড় বাঁকা চেহারাটাও আজ ওঁর কাছে সুন্দর ঠেকল।....

'বলি ও তৈফুর, ও তৈফুর আলি!'

অফিসে ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে প্রথমেই দপ্তরীকে হাঁক দিলেন, সত্যধনবাবু?

'কী-কী-কী গা ম-মল্লিক বাবু?'

'এই নাও শোন।'

পকেট থেকে দু-টাকার নোট একটা বার করেই রেখেছিলেন, তৈফুর কাছে আসতে হাতে গুঁজে দিলেন।

'কী-কী-কী হবে এ টা-টা-টাকা ম-মল্লিক বাবু?

তৈফুর অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। সকাল থেকেই মল্লিকবাবুর ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না ওর। মাথা খারাপ হতে আরও দু-এক জনকে দেখেছে সে। গোড়ার দিকে নাকি এই রকমই হয়।

'মি-মিষ্টি!' ওকে ঈষৎ ভেঙিয়ে হাসি মুখে বললেন সত্যবাবু।

'মি-মি-মিষ্টি! ব-লি কে-কে-কে খাবে গা?'

'তু-তুমি!'

আদর করে ওর কাঁধটা ধরে নেড়ে দেন একটু। তারপর একটু ঠেলেই ফেরত পাঠিয়ে দেন ওর কাজে।

সাংবাদিকের ডায়রি

লীলা মজুমদার

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে আমাদের দেশে কোনো নতুন আইন জারি করার আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সব প্রদেশের সাংবাদিকদের তলব পড়ে। কাগজের বড়কর্তারা কিছু নিজেরা কাজ করেনা না, হাতে-কলমে যা করার সে-সবই করে থাকে অখ্যাত অপুষ্ট সাংবাদিকরা। এবং তাদের পদ যত সামান্য হবে, তাদের খাটুনিও তত বেশি। অথচ শেষ পর্যন্ত হয়তো আপ্রাণ খেটে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো কোনো কাজেই লাগে না। অনেক সময় ফাইলসুদ্ধ কাগজপত্র হারিয়েও যায় শুনেছি। আর সম্পাদক মশাই যে হামেশাই সব কাগজ টেনে ডাস্টবিনে ফেলে দেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সে যাই হোক, কয়েক বছর ধরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। এভাবে বাড়তে দিলে নাকি পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তার উপরে বাড়ের হার অনুন্নত দেশগুলোতেই অসম্ভব বেশি। ফ্রান্স ইত্যাদি আলোকপ্রাপ্ত ধনী দেশে নাকি বুড়োদের সংখ্যা তরুণদের তিন গুণ। তার উপর ভালো খাবার খেয়ে, উপযুক্ত ব্যায়াম করে আর স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে, ওরা নিজেদের আয়ুগুলোকে ওয়ারিশদের পক্ষে হতাশা-কর ভাবে বাড়িয়ে নিচ্ছে।

অবিশ্যি আমাদের তদন্তের বিষয় ছিল অন্য রকমের। প্রথমে চারদিকে পোস্টার লাগানো হল, সুখী পরিবার কাকে বলে? যাদের দুটিবা তিনটি সন্তান, তাদেরই সুখী পরিবার বলে। এইখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল না। সূত্রের একেবারে মূলে নেমে তদন্ত করতে হল। তাছাড়া আমাদের চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকরা এমন যা-তা লিখতে লাগল যে তার ফলে আমাদের সম্পাদক মশাই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটি অনেকখানি প্রসারিত করে দিলেন। সুখী পরিবার থেকে সুখী বিবাহের কথা তুলে ফেললেন। ঐখানেই ভুল করলেন, কিন্তু সে-কথা তাঁর সামনে বলে কে!!

একজন নামকরা পাঠক লিখলেন, ঠিক করা বিয়ের চেয়ে নিজের পছন্দ করা বিয়ে যে অনেক সুখের, এ বিষয়ে দুটো মত থাকতে পারে না।

সম্পাদক মশাই আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সব চেয়ে দক্ষ সাংবাদিক বলে নয়, আমার অনুপস্থিতি আমাদের আপিসের পক্ষে সব চাইতে কম ক্ষতিকর বলে। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো সম্পূর্ণ সুখী দম্পতি তোমার জানা আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ স্যার, সকলে বলে আমার ন'দাদামশাই আর ন'দিদিমার মতো সুখী দম্পতি দেখা যায় না।"

সম্পাদক মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "তাঁদের কবে বিয়ে হয়েছিল?"

"আজ্ঞে ১৯১৫ সালে, স্যার।"

"তাহলে নিশ্চয় ঠিক করা বিয়ে?"

"আজ্ঞে না স্যার, শুনেছি তাঁরা পরস্পরকে মনোনয়ন করেছিলেন। তাতে অনেকে তাঁদের বাবা-মাদের নিন্দাও করেছিলেন।"

সম্পাদক মশাই উৎফুল্ল হয়ে বললেন "এখনি যাও। দুজনকে আলাদা আলাদা করে ইন্টারভিউ করে এসো। এনেই লেখাটা বিজনবাবুকে দিও। বানান সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই।"

একটু রাগ হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে বলে কি না আমি সর্বদা বাংলায় ভালো নম্বর পেতাম। যাই হক, দুজনকে আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ করলাম।

ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। দেখলাম দুজনেই বিয়ের কথা বলতে উদগ্রীব। পরস্পরের অসাক্ষাতে বলতে হবে বলে আপত্তি করার চেয়ে বরং খুশিই হলেন।

নদিদিমার সত্তরের উপর বয়স। সেকালের ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে, যেমনি তেজ, তেমন দক্ষতা। প্রথমেই বললেন,

"সেকালে দু'চারজন কুখ্যাত দুর্বিনীত মেয়ে ছাড়া সকলেরই ঠিক-করা বিয়ে হত। তবে আমাদের কথা আলাদা।"

কথাগুলো টুকে নিয়ে বললাম, "আলাদা কেন।"

"আহা, তা হবে না? আমার বাবা যৌবনে একবার বিলেতে গিয়ে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে দেখে এসেছিলেন। এতটুকু বেঁটে, এই মোটা, কিন্তু কি তাঁর তেজ। বাবা তো তাঁকে দেখে মুগ্ধ। সেই থেকেই আমাদের তিন বোনকেও ওঁর আদর্শে মানুষ করতে লাগলেন। তাইতো প্রায় বলতে গেলে নিজে পছন্দ করে বিয়ে করতে পারলাম।"

"প্রায় বলতে গেলে বললে কেন, নদিদি?"

"আরে আমি তো আর শহর ঢুঁড়ে বর তাড়িয়ে আনি নি। বাবাই খোঁজ-খবর করে, একটা ভালো দিন দেখে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাত্র-পাত্রীকে পরস্পরকে পছন্দ বা অ-পছন্দ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। বললাম না ভারি আধুনিক মনোভাব ছিল তাঁর।"

একটু অবাক হয়ে বললাম, "তারপর?"

"ঐ যেখানে দুটো বড় আর একটা ছোট হাতি বাঁধা থাকত, তার-ই পাশের পুকুরে কালো রাজহাঁস চরত। সেখানে একটা গোলাপী অ্যাকেসিয়ার গাছ ছিল। তার নীচে কালো মখমলের গালচে বিছিয়ে আমি, ছোটপিসি, বড়পিসি, বড়পিসির ভাগ্নী হেনাদিদি, বাদুড়বাগানের কাকিমা, সবাই বসলাম। একটু দূর দিয়ে বড়কাকা, ছোটপিসে, বড়কাকার ছেলে গুনোদাদা, আরো দু-তিনজন যুবক, যেন কতই গল্প করছেন, এই রকম ভান করে, চারদিকে তাকাতে তাকাতে পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে এলেন।

তাঁদের দেখেই বাবা আর বড়পিসে উঠে পড়লেন, যেন কতই অকস্মাৎ দেখা হয়েছে। দুই দল এক্ হল। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে খাওয়া হল। ছোটপিসি 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে গাইলেন।'

তারপর বড়কাকা হঠাৎ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বললেন, 'ওই যাঃ পানুর ট্রেনের সময় হয়ে গেছে!' অমনি সভা ভঙ্গ হল।

রাতে ছোটপিসী আমাকে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করতেই বললাম, "ছিঃ! কি অসভ্য।" কন্যার মতের জন্যই অপেক্ষা ছিল। পাত্রের তো মেয়ে পছন্দ হবেই, অমন ফরসা, অমন ভালো ঘর, তার উপরে দশ হাজার টাকা। এখন পাত্রীর-ও মত পাওয়া গেল। কাজেই বিয়ের আর দেরি

রইল না।

ন'দিদি থামতেই বললাম, "কিন্তু একেই কি তোমরা নিজে পছন্দ-করা বিয়ে বল?"

"তা নয় তো কি? ওই একবার দেখেই মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। একদিনের জন্যেও অনুতাপ করতে হয়নি।"

আমি বললাম, "তবে যে শুনছিলাম বিয়ের দিন বরযাত্রীরা অভদ্রতা করেছিল, বরের মামা বরকে পিঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, বর কিছুতেই ওঠেনি।"

ন'দিদি হেসে বললেন, 'অ্যাঁ! তাও শুনেছিস? বুঝলি বৈশাখে বিয়ে হয়েছিল। সেদিন ছিল বেজায় গরম, সকলের মেজাজ খারাপ। কি এক সামান্য কারণে বরের বড় কাকা রেগেমেগে বিয়ের পিঁড়ি থেকে বরকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ তো আর সাধারণ ঘটকালির বিয়ে নয়, বর পিঁড়ি আকড়ে বসে রইল। আমি তো ওইরকম হ্যাংলাপনা দেখে লজ্জায় মরে গেলাম! পরে আমার দাদামশাই সটাং মাটিতে শুয়ে পড়ে যেই না বড়কাকার পা জড়িয়ে ধরলেন, অমনি তাঁর রাগ জল হয়ে গেল।'

এই অবধি শুনে আমিও উঠে পড়লাম। যাবার সময় বললাম, "নিজে পছন্দ-করা বিয়ের মতো আছে কি! আমিও তাই করব ঠিক করেছি।"

ন'দিদি বললেন 'সে মন্দ নয়, তবে কিনা—'থমকে দাঁড়ালাম। এর মধ্যে আবার তবে কি?

ন'দিদি একটু লজ্জিতভাবে বললেন, "আসলে আমি ইয়ে—ভুল লোককে দেখেছিলাম।"

"ভুল লোককে দেখেছিলে? তার মানে?"

"তার মানে যাকে দেখে পছন্দ করেছিলাম, সে আসলে একজন কৌতূহলি দর্শক। মোটেই তোর ন'দাদু নয়। শুভদৃষ্টির সময় আমার চক্ষুস্থির! যাই হোক, তাতেই কী এমন বা মন্দটা হল শুনি!"

আর অপেক্ষা না করে সোজা ন'দাদামশাই-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'এবার তোমার দিকটা শুনি দাদু, একবার দেখেই এমন পছন্দ হয়ে গেল যে, কাকা কিছুতেই তোমাকে পিঁড়ি থেকে তুলতে পারলেন না? আমাদের সম্পাদকমশাই জেনে নিতে বলেছেন যে, পাত্রী নির্বাচনে কোন্ গুণটি আগে দেখেছিলে?'

ন'দাদু একটু অবাক হলেন, 'আসলে প্রথম দেখার অনেক আগেই মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। যেই ঠাকুমা বললেন, ঘোতনের মেয়েকে বিয়ে করলে আমি তোকে টমটম গাড়ি কিনে দেব, অমনি মন ঠিক করে ফেলেছিলাম। তা ছাড়া—।'

কর্কশ গলায় বললাম, 'তাছাড়া কি?'

'কি আবার? যেই না কাকা বললেন, উঠে এস! আর আমি পা ওঠাতে যাব, অমনি তোমার ন'দিদির সেই গুণ্ডা মেজদা বজ্রমুষ্ঠিতে আমার হাঁটু চেপে ধরে বলল, খবরদার, উঠবার চেষ্টা করেছ কি হাঁটু ঘুরিয়ে ও-মুখো করে দোব! কি আর করি, অগত্যা বিয়ে করে ফেললাম। এখনও শীতের দিনে ওই হাঁটুটা কনকন করে।'

এই বলে ন'দাদু হাঁটুতে হাত বুলোতে লাগলেন। আমারও আদর্শ বিবাহ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ওইখানেই বন্ধ হয়ে গেল। আদর্শ বিবাহের সঙ্গে প্রেম-ট্রেমের যে কোনো সম্পর্ক নেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি টুকলিকেই বিয়ে করবো। বেজায় ভালো রাঁধে।

পুঃ বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, বাড়িতে অশান্তি হচ্ছিল বলে সম্পাদকমশাইও ওই বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

মুস্কিল-আসান

আশাপূর্ণা দেবী

কার্তিকের প্রথমেই হারাণবাবু মাফ্‌লার বাহির করিয়াছেন। হইলে কি হয় মনে স্বস্তি নাই ভদ্রলোকের। দুই চার জায়গায় যেন পোকায় কাটিয়াছে বলে মনে হয় না?

হারাণবাবুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইতে পারে, তাই বলিয়া এত বড় একটা শোচনীয় ক্ষতির বিষয় দেখিতে ভুল করিবেন? না, দেখিয়াছেন ঠিকই, বুনুনির মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম কয়েকটি ছিদ্র। জানলার মুখে আলোয় ধরিয়া শকুনা দৃষ্টিতে কীটদষ্ট স্থানগুলি পরীক্ষা করিতে থাকেন হারাণবাবু।.....

আবার একটা কিনিতে হবে হয়তো। এই ডামাডোলের বাজারে ঠিক এমনটি না হোক যেমন তেমন একটা কিনিতেও কম পড়িবে না। যুদ্ধের ওজর দেখাইয়া দোকানদারগুলা তো গলায় ছুরি বসাইতে চায়। পশম জাতটা যে আবার অতি ছোটলোক কিনা—পড়শির ঘরে এতটুকু ছিদ্র দেখিয়াছে কি বাড়াইতে শুরু করিয়াছে—আপনাকে বিসর্জন দিয়াও—পরের যাত্রাভঙ্গ করিতে নিজের নাক কাটা যায় যাক।

এই দুই চারিটি ছিদ্রই যে অদূর ভবিষ্যতের অসংখ্য ছিদ্রের অগ্রদূত, সে অভিজ্ঞতা হারাণবাবুর আছে।

অথচ হারাণবাবুর এই শরীর। ফট্ করিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া যাইতে কতক্ষণ? এই কার্তিক হইতে অন্ততঃ চৈত্রের প্রথম দিক পর্যন্ত সে বিষয়ে যথেষ্ট কেয়ার লইতে হয়।

আর হয় নাই বা কখন? নির্ভাবনায় গায়ে হাওয়া লাগাইবার মতো সময় মানুষকে দিয়াছেন ভগবান? কই? এই তো কার্তিক পড়িতেই শীতের আমদানী—হতচ্ছাড়া সময়, "ভদ্রলোকের অখাদ্য" সময়। আবার শীত কমিল কি বসন্ত বাতাস। কবিদের প্রাণ নাচিয়া উঠিতে পারে, গেরস্থ লোকের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। হরিতকী বীজের মাদুলী, আসল বীজের টীকা, আর ইষ্ট দেবতার বীজমন্ত্রের জোরে কোনমতে যদি "মায়ের অনুগ্রহের" হাত এড়াইতে পারিলে তো যথেষ্ট। আবার গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বোন মাসীর বিভীষিকা।

তাহার পরই বর্ষা নামিলেই—সাজিয়া গুজিয়া। বাত, বেরিবেরি, অজীর্ণ, আমাশয়, কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করা যায়? এ ছাড়া ভাদ্রের কাঁচা হিম আছেন, আশ্বিনের নতুন রোদ আছেন, কম কেউই যান না।

এতগুলি আততায়ীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় দুঃখী হারাণবাবুকে। কাজেই যে সকল সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই দুরূহ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হয়, তাহাদের মধ্যে সহসা কেহ নোটিশ দিয়া বসিলে—চিন্তার কারণ আছে কিনা?

যথাসময়ে—ন্যাপথলিন ক্যালোজিরার ব্যবহারের অভাবেই যে মাফ্‌লারটা অযথা সময়ে

নোটিশ দিয়া বসিল এই আক্ষেপে নিজেকে নিজে চড়াইতে ইচ্ছা হয় তাঁহার।

এমন কটু সময়ে সুখেন আসিয়া বসিল। যেমন গুছাইয়া বসিল মনে হয় বিশেষ কিছু বক্তব্য লইয়া আসিয়াছে। হারাণ অবশ্য তাহাতে কটাক্ষপাত করেন না। নিজের তালেই থাকেন।

কিন্তু সুখেনই যে ইহাতে অপমান বোধ করে এমন মনে করবার হেতু নাই, মামার ইচ্ছাকৃত অবহেলাকে অবহেলা করিয়া সহজ স্বরে প্রশ্ন করে, 'মাফ্‌লারটা ছিঁড়ে গেল মামা?'

'ছিঁড়ে গেল? কে বলেছে ছিঁড়ে গেল? সক্কাল বেলা এমন সুখবরটি দিলে কে শুনি?..' হারাণ খেঁকাইয়া ওঠেন।

'কেউ না। এমনি মনে হল বুঝি ছিঁড়ে গেছে, পশমের ঘর গুনছিলেন বোধহয়? যাকগে—বলছিলাম কি আমাদের নীচের তলাটা তো এমনি পড়ে রয়েছে মামা, ভাড়া দিলে হয় না?'

বক্তব্য এক নিঃশ্বাসে বলিয়া লইতে হয়, ভণিতা হারাণবাবুর অপছন্দ অসহ্যই একরকম।

'ভাড়া দিতে হবে? কেন কিসের জন্যে? ভাত জুটছে না? ঘর ভাড়া দিয়ে খেতে হবে?'

পরিষ্কার ব্রেন, অপরের জিভ নড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রেনের কাজ শুরু হয়, কাজেই উত্তর পাইতে বিলম্ব হয় না। কোন সময়ই না।

সুখেন আধখানা জিভ দাঁতের বাহিরে আনিয়া ফেলে, 'ক্ষেপেছেন মামা? টাকার জন্যে ভাড়া! রাম বল। বলছি—আজকাল বাজার খারাপ, চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রবটা শুনেছি সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, অতগুলো ঘর বেওয়ারিশ পড়ে থাকে—কে কখন আড্ডা গাড়ে। এই তো সেদিন ওদের নীরেনের সাইকেলখানাই চুরি হয়ে গেল বৈঠকখানা থেকে।'

'চুরি গেল? কবে গেল? এই যে খানিক আগেই দেখলাম ইয়ার ছোক্‌রা চলেছেন ডানা উড়িয়ে সাইকেলের ঘাড়ে চেপে।'

'যাচ্ছিল নাকি?' কথাটা সুখেন তাচ্ছিল্যের সুরে উড়াইয়া দেয়, বলে 'যাক্‌গে মরুক্‌গে, যার যা খুসী করুক। আমার বলার উদ্দেশ্য অতগুলো ঘর—'হরি ঘোষের গোয়াল' হয়ে পড়ে থাকে—বছরে একদিন ঝাঁট পড়ে কিনা সন্দেহ, কেবল নারায়ণের তাসের আড্ডার ঘটা। তুমি তো কিছু বলবে না—আমাকে কেন মানবে বল? আমি একটা বাইরের লোক বইতো নয়?'

বুদ্ধিমান সুখেন মামার 'হৃদয়-দীঘির' গভীর জলে ছিপ ফেলে।

হারাণবাবুর সহ্যশক্তি এত প্রবল নয় যে, ইহার পরও নারায়ণের টিকি ধরিয়া টানিয়া আনিবেন না।

সগর্জনে ডাকেন, 'এই নারাণ, নারাণে, এই উল্লুক!'

উল্লুক হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসে।

'এই শুয়ার, তাস খেলিস কেন? ঘর ঝাঁট দিস না কেন? দাদাবাবুর কথা শুনিসনি কেন?'

নারাণের ব্রেন পরিষ্কার হইলেও হারাণের মতো তত নয়, কাজেই একবার বাবুর ও পরক্ষণে বাবুর ভাগিনেয়র মুখপানে বিহ্বলদৃষ্টি ফেলে!

'জবাব দে রাস্কেল, খেলিস তাস?'

'আজ্ঞে, আর খেলব না।'

'খেলবি না? তোর ঘাড় খেলবে। খেলবি, একশোবার খেলবি, সিঁড়ির তলায় খেলবি।'

'তাই খেলব।' বলিয়া নারাণ প্রস্থানোদ্যত হয়।

'চলে যাচ্ছিস যে? তোর মুখ দেখতে ডাকলাম? যা—নীচের তলাটা সমস্ত ধুয়ে ফেলগে যা।

যা শীগ্‌গীর....অমনি চলে যাচ্ছিস? —বলি ধুবি কি দিয়ে রে স্টুপিড?'

'ঝাড়ু দিয়ে আবার কি দিয়ে।'

'ঝাড়ু দিয়ে—তোমার গুষ্ঠির মাথা দিয়ে, ঝাড়ু একগাছা আনা দিকিন তোমায় ঝেড়ে দিই। ব্যাটা শয়তান।'

'শয়তান বলবেন না বাবু।' নারাণ ভৃত্যভাব ত্যাগ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' করিতে থাকে।

হারাণবাবু তাহাতে দমে না, সমান তেজে বলেন, 'না শয়তান বলব কেন—রামকেষ্ট পরমহংস, বিবেকানন্দ স্বামী! যা ব্লীচিং পাউডারে ঘসে ধুয়ে দিগে।'

'ও পাউডার ফাউডার দিতে পারব না বাবু, হাত ছেঁদা হয়ে যায়।'

"হাত ছেঁদা হয়ে যাবে'—বটে? নবাব খাঞ্জা খাঁ। তোমার খুলিতে ছেঁদা করব আমি। কেন ফিনাইল নেই বাড়িতে? পাউডার না দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? যা সুমুখ থেকে।'

নারায়ণ বাহিরে যাইতেই হারাণবাবু চেয়ারে বসিয়া পড়েন।

'উঃ, প্রেসারটা বেড়ে উঠল—চড়চড় করে বেড়ে উঠল—তোমার জন্যে এইটি হ'ল বাপু। (সুখেনের দিকে সরোষে চাহিয়া) সকাল থেকে আমার পেছন লাগতে আসা—যাও এখন পরেশ ডাক্তারকে ডাক দিকিন একবার, দেরি কর না যাও। উঃ, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।'

সুখেন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া যায় এবং মিনিট পাঁচেক পরেই পরেশ ডাক্তারকে লইয়া ফেরে সাইকেলের পিছনে বাঁধিয়া।

হারাণবাবু মিতব্যয়ী বটে, তাই বলিয়া ডাক্তারের ফি ফাঁকি দেন না, পড়শি হইলেও না। বেগারের রুগীর বেলায় ডাক্তারে চিকিৎসা শাস্ত্র ভুলিয়া যায়, এই ধারণা হারাণবাবুর বদ্ধমূল।

আজই হারাণবাবুর ডাকে পরেশ ডাক্তার এক পায়ে চটী গলাইয়া ছুটিয়া আসিবেন এটা কিছু বিচিত্র নয়।

যথারীতি ঔষধ ও যথোচিত উপদেশ দান করিয়া দুইটি টাকা পকেটস্থ করিয়া পরেশ ডাক্তার হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে প্রস্থান করেন। পিছন পিছন সুখেনও নামিয়া আসে।

ডাক্তার কার্যনিরত নারায়ণের পানে চাহিয়া থামিয়া দাঁড়ান, 'এই যে ঘরদোর সাফ হচ্ছে দেখছি, উনি ভাড়া দিতে রাজী হয়েছেন তাহলে?'

'আর বলেন কেন? ও খেয়াল। সেই কথার এফেক্ট তো এই ব্লাডপ্রেসার।'

কথাটা বলিয়া সুখেন হাত দুইখানা উল্টাইয়া এক হতাশ ভঙ্গী করে।

'তাইতো—তা এক কাজ কর না—উল্টো গাইতে শুরু করো।'

'উল্টো? তা বলেছেন মন্দ নয়। ঘরটরগুলো দেখে যাবেন?'

'না দেখবার কি আছে—রোজ দেখছি। তুমি বাবা চেষ্টাটি ছেড়ো না।'

'না না, সে কি কথা? আপনার একটা সামান্য অনুরোধ—'

চেষ্টার পিছনে নিজেরও যে 'গভীর তেষ্টা' লুকানো আছে সে কথাটা আর খুলিয়া বলে না সুখেন।

রাত্রের আহার সারিয়া মামা ভাগিনেয়ে আলাপ হয়, রোজই হয়, আজও হইতেছিল....কোন একটা শুভ মুহূর্তে সুখেন 'উল্টা গাওয়া' পালা শুরু করে—'ইয়ে বাবুর' কথাটা একবার শুনলে

মামা? বাজারের মোড়ে দেখা আমার সঙ্গে, বলেন কিনা—"তোমার মামা নাকি একতলাটা ভাড়া দিচ্ছেন হে?" স্রেফ বলে দিলাম—না। বললে, "সে কি হে শুনলাম যে?" আমি চটে গেলাম, বললাম, 'ভুল শুনেছেন।' উত্তরে ভদ্রলোক স্বচ্ছন্দে বললেন কিনা "আমিও তাই ভাবছি, কলকাতা সহরের ভাড়াটে চরিয়ে খাওয়া কি তোমার মামার কর্ম? গোবেচারা ভালমানুষ।"

হারাণবাবুর ধৈর্য্য আবার বাঁকিয়া বসে, গর্জিয়া ওঠেন, 'কে বলেছে একথা, নামটা শুনি তার?'

'ওই যে তোমাদের ইয়েবাবু—কি যেন নামটা? আঃ—সেই যে কাঁচাপাকা গোঁফ, টলফিগার, বেয়াল্লিশ ইঞ্চির বেশী পরে না কখনো—নামটা? আশ্চর্য্য! মেমারিটা আজকাল বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মনে পড়ছে না মামা? তোমার তো খুব মেমারি—সেদিন অত বড় যোগটা মুখে মুখে করে দিলে—'

মামা, ভাগিনের বর্ণিত গৌরব হ্রাস করিতে চান না, কল্পিত 'টলফিগারের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলেন, 'মনে আবার পড়ছে না? খুব পড়ছে, নাম করতে চাইনে, পয়লা নম্বরের বদমাইস একটা—দেখে নেব তাকে আমি। ভাড়াটে চরাবার মুরোদ আমার নেই—তার আছে? বড় আস্পর্ধা হয়েছে সব। নারাণ, পিজবোর্ড আন একটা।'

ঠাকুরের আহ্বানে রান্নাঘরের পথে যাইবার ব্যগ্রতার মুখে বাধাপ্রাপ্ত নারাণ বিরক্তি কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'রাত দুপুরে পিজবোট কোথা পাব বাবু?'

'কোথা পাবে? বিলেত যাও বাবা বিলেত যাও, পাবে। বলি জুতো আসে না বাড়িতে? বাক্স নেই তার?'

জুতো অবশ্যই আসে তবে কোন শুভ মুহূর্তে কে জানে। বাক্স পাওয়া যায় না। অনেক অনুসন্ধানে কোণভাঙা একটা ঢাকনি পাওয়া যায় বাক্সের।

হারাণবাবু তৎক্ষণাৎ কালির দোয়াতে আঙুল ডুবাইয়া তাহার উপর মোটা হরফে 'টু লেট' লিখিয়া দোতলার জানলা হইতে নেকড়ার ফালি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেন।

পরদিন শেষ রাত্রি হইতে ভাড়াটে আসিতে শুরু করে। অনেক কৌশলে সেই 'বিরাট বাহিনীদের' ঠেকাইয়া—বা খেদাইয়া, পরেশ ডাক্তারের ভগিনী-পতিকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় সুখেন।

হইয়া—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। এখন তাঁহার বুদ্ধি আর বরাত-জোর।

ভাড়াটে যখন আসে হারাণবাবু বাড়ি ছিলেন না, না থাকিবার কথা, সেইরূপ সময় ঠিক করা ছিল।

হারাণ আসিয়া চড়া সুরে প্রশ্ন করেন, 'সুখো নীচের ঘরে আলো জ্বলছে কেন রে?'

'ভাড়া এসেছে মামা।'

'এসে গেছে? আজকেই? বলি রাস্তায় বসেছিল নাকি? ওরকম হতচ্ছাড়া লোককে বাড়ি ঢুকতে দিলি অমনি? খোঁজ খবর নিয়েছিস কিছু? জিনিসপত্র এনেছে? না দুটো ফুটো বালতি নিয়ে এসে ঢুকলো?'

'আর তুই—'

'আস্তে মামা, ভদ্রলোক আমাদের ডাক্তারবাবুর ভগ্নীপতি। ছ'মাসের এগ্রিমেণ্ট করেছেন, এক মাসের ভাড়া দিয়েছেন আগাম। এই যে—'

পকেট হাতড়াইয়া চারখানা আস্ত নোট বাহির করিয়া দেয় সুখেন।

ডাক্তারবাবুর ভগ্নীপতি, ও অগ্রিম ভাড়া, উভয় শব্দ হারাণবাবুর টেম্পারকে কতকটা নামাইয়া আনে।

'কি জানি বাড়িখানা এখন আস্ত থাকলে হয়—শয়তান শয়তান এক ডজন ছেলে এনেছে তো?'

'পাবে কোথা? কর্তা গিন্নি, বাচ্চা একটা ছেলে, আর মেয়ে একটা বুঝি!'

'মেয়ে? কত বড় মেয়ে?'

'তা' বেশ বড়ই হবে বোধ হয়, কে অত লক্ষ্য করেছে। ভাড়া দিলে—রসিদ দিলাম, চুকে গেল।'

'চুকে গেল—বললেই চুকে গেল? বাড়িতে এসে আড্ডা গাড়বে—বলি বিনুনি ঝোলানো না সিঁদুর পরা—সেটুকু দেখতে পারোনি?'

'বিনুনি ঝোলানো' মেয়েদের সম্বন্ধে হারাণবাবুর আতঙ্ক ও অভিমত সুখেনের অজ্ঞাত নয়। উড়াইয়া দিবার ভঙ্গীতে মুখ বাঁকাইয়া বলে, কে জানে—সিঁদুর পরাই মনে হল যেন, বিনুনি? কই দেখলাম না তো।

মামা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তচিত্তে নিজের কাজে যান।

বিনুনি ঝোলানো মেয়ে দেখিলে মামার হৃৎকম্প হয়। গায়ে জ্বর আসে।

পরদিন সকালে। মামা শালপাতার ঠোঙায় দুইখানি বেলের মোরব্বা কাছে লইয়া পাতিলেবুর রস গুলিয়া চা পান করিতেছেন, মনটা ঈষৎ হৃষ্ট। প্রেসারটা যেন কিছু কম।

সুখেন ব্লেড সানাইতেছে।

সহসা নির্মেঘ আকাশে বজ্রপাতের মতো নীচের তলায় হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের গান—অথবা আর্ত্তনাদ—যাহাই বলুন—

"মাধবী রাতে-এ-এ—মম মন বিতানে—
মল্লিকা মঞ্জরী গুঞ্জরে—হা—য়।"

হারাণবাবু চমকিয়া ওঠেন, চা চালকিয়া পড়ে।

'সুখো? তবে যে বললি সিঁদুরপরা?'

সুখেন চমকায় না। সহজভাবে বলে, 'কেন? কি হল?'

'এ যে গান গায়?'

'গান? ও—!'

মনে হয় গানটা যেন আগে কানে ঢোকে নাই তাহার।

'গান? ও'—মানেটা কি হল সুখেনবাবু?

'বলছি—গাইছে গাকগে না—'

'গাইবে? গান গাইবে? আমার বাড়িতে? দুপুরে ডাকাতি? সুখো—এ নির্ঘাত বিনুনির কাজ।'

'হতে পারে—আশ্চর্য্য কি?'

সুখেন ব্লেড রাখিয়া গালে সাবান ঘসে। নির্ব্বিকারভাবে ঘসিতেই থাকে।

হারাণবাবু সুখেনের ঔদাসীন্যে মর্ম্মাহত হন।

'হতে পারে? আশ্চর্য্য কি? স্বচ্ছন্দে বলে দিলি? যথেষ্ট আশ্চর্য্য। আমার বাড়িতে গান?

আমার বাড়িতে বিনুনি? চলবে না—চলতে পারে না। সুখো, বারণ করে আয়, এখুনি যা—'

'বারণ করবো কি গো মামা? পাগল বলবে যে। ভাড়া দিয়েছে—রাইট নেই বাড়িতে? বিক্রি করবে না—বাঁধা দেবে না—তা ছাড়া সবই করতে পারে। গান তো গান, শিরিশ বাবুর ভাড়াটে নাচের ইস্কুল খুলেছে বাড়িতে।'

'খুলেছে? তবে যাও তোমার আদরের ভাড়াটেকে ডেকে আনো, আমার টাকের ওপর নেত্য করুক এসে!'

'আর্ত্তনাদ' তখন হাহাকারে পরিণত হইয়াছে...

"সে তোমারে চায়, সে তোমারে চঁ—য়।"

'সুখো, এ সহ্য করবো না আমি।' হারাণবাবুও প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠেন। 'ভদ্রলোকের মেয়ে—'চায়' মানে? কি চায়? কা'কে চায়? উঁ হুঁ এ সব ভালো কথা নয়! সুখো, যাও শিগগির বলো গে আমার মামার ব্লাডপ্রেসার—'

হারাণবাবু মোরব্বা দুইখানি লইয়া রসগোল্লা বোধে নিংড়াইতে থাকেন।

সুখেন এখন সন্তর্পণে গালে ক্ষুর চালাইতেছে।.....

গানের ভাষা স্পষ্ট ভাসিয়া আসিতেছে....কণ্ঠ তীক্ষ্ণ।

"জ্যোস্না বিভ—ল মধুর রাতি—
উন্মনা ম—ন খুঁজিছে সাথী....ঈ....ঈ"

'সুখো দাড়ি রাখ, আগে যা, বলগে যা, মামার গান শোনা বারণ, ডাক্তারের বারণ—'

মোরব্বা পিষ্ট হইয়া হারাণবাবু আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে বাহির হইয়া আসে।

'মামা, ওটা রসগোল্লা নয়—ওতো ডাক্তারের ভাগ্নী।'

'ভাগ্নী ব'লে পেসেণ্ট খুন করবে? তাই এ্যালাউ করবে পরেশ? সুখো আমার প্রেসারটা বেড়ে উঠলো। দে একবার সেই হতভাগাকেই কল দে—'

'ডাক্তারবাবু দেশে গেছেন কাল, দেখি এদের বলে দেখি, কি হয়?'

কামাইবার বহুবিধ সরঞ্জামগুলি ধীরে সুস্থে গুছাইয়া তুলিয়া, ওল্টানো চুলের উপর সাবধানে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুখেন নীচে নামিয়া আসে।

ডাক্তার নাই শুনিয়া হারাণবাবু হতাশভাবে মোরব্বা মাখা হাত চাটিতে থাকেন।

বলা বাহুল্য নীচের কর্তা বাজারে গিয়াছেন। গিন্নি রান্নাঘরে, মরিবার ফুরসৎ নাই তাঁহার,—মেয়েটি আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, সিঁড়ির তলায় যে দরজাটা ভাড়াটের আব্রু রক্ষা করিতে বন্ধ করা ছিল।

সিঁদুর সিঁথিতে নাই, কপালে আছে—লুডোর ঘুঁটির মত প্রকাণ্ড এক টিপ, কানপাশার সাইজ ক্যারম ঘুঁটির কাছাকছি। লম্বা একহারা অজন্তা স্টাইলের মেয়ে, পিঠে বিনুনি ঝোলানো—'ট্যাসেল' সমেত গজখানেকের কম নয়।

সুখেন আগাইয়া আসিয়া হাসিমুখে চাপা গলায় বলে, 'খুব গান হচ্ছিল যে?'

'বিনুনি'ও সহাস্যে উত্তর করে, 'কেন হবে না? বারণ করেছেন নাকি?'

'তাই কি হয়? পাগল। খুব অভ্যাস করবে—তোমার স্টকে এ রকম গান আর কত আছে?'

'কত চান?'

'বেশির দরকার নেই, একটাতেই অনেকটা এগিয়েছে। ডাক্তারবাবু কবে আস্‌ছেন?'

'রবিবারে নাকি বলছিলেন।'

'শুক্কুর শনি রবি—ওতেই হবে। হরদম চালিয়ে যেও।'

'আমার বুঝি লজ্জা করে না?'

'ইঃ লজ্জা? প্রাণের দায়ের কাছে আবার লজ্জা। তা ছাড়া মাস্টারের টাস্ক।....

উপরে আসিয়া বলে, 'রাজী হল না মামা, বলে পয়সা খরচ করে মাস্টার রেখেছি—গান না শিখলে বিয়ে হবে না মেয়ের।....'

মামা অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন আর হাত চাটিতেছেন।....

সন্ধ্যায় মামা আসিতেছেন—রিক্সায়। আকর্ণ মাফলারে ঢাকা, গায়ের র‍্যাপার টানিয়া পা ঢাকিয়াছেন, যদিও মোজা আছে—তবে অল উল নয় তাই এত সাবধানতা।

মন বিষণ্ণ—বিকেলের দিকে দুইবার নাকি হাঁচিয়াছেন। বাড়ি গিয়া ফুটবাথ লইবেন কি না, চিন্তা চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে দরজা পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছেন.....সহসা পশমের ঢাক্‌নি ভেদ করিয়া কানের গোড়ায় বাজিয়া ওঠে—

"আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান—
তার বদলে আমি—"

ফুটবাথের বদলে মাথার রক্ত ফুটিয়া ওঠে হারাণবাবুর। সোজা উপরে উঠিয়া যান, দরাজ গলায় হাঁক দেন, 'সুখো!'

সেই মাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়া সুখেন সদ্য পাটভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবীটির তদ্বির করিতেছিল। মামার ডাকে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসে।

'মামা ডাকছো?'

'ডাকছি—নীচে যাও, নেটিশ দিয়ে এসো। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ।'

'আবার কি হল?'

'শুনতে পাচ্ছ না কি হল?'

সুখেন শুনিতে পায়—

"সেই কথাটি কভু পড়বে তোমার মনে—
বর্ষামুখর রাতে—ফাগুন সমীরণে—"

'ওঃ গান?'

যেন সেইমাত্র এ বিষয়ে অবহিত হয় সুখেন।

'কিন্তু মামা, নোটিশ তো চলে না, এগ্রিমেন্ট করেছে যে?'

'এগ্রিমেন্ট? কি সর্ব্বনাশ! কদ্দিনের?'

'ছ'মাসের মামা।'

'সুখেন। এই নাও ধরো, বসিয়ে দাও মাথায়, একঘায়ে শেষ করে দাও—'

হাতের মোটা লাঠিটা ভাগিনেয়ের দিকে বাড়াইয়া ধরেন মামা।

রবিবার আসিল। শেষ পর্যন্ত পরেশ ডাক্তারও আসিয়াছেন। মামা 'কল' দিয়াছেন তাঁহাকে।

সুখেন লাঠির ব্যবহারে রাজি নয়, অগত্যাই টিঁকিয়া থাকিতে হইয়াছে মামাকে, তবে মৃতপ্রায় অবস্থা। গত তিন দিন অর্দ্ধাহারে অল্প নিদ্রা এবং অতি মানসিক বিপ্লবে মামা চিঁ চিঁ করিতেছেন।

ডাক্তারকে দেখিয়া একবার উঠিয়া বসিয়াছেন মাত্র। না বসিলে নাকি দেখা ঠিক হয় না।

'কি হারাণবাবু ভালো তো?'

'ভালো হলে তোমায় ডাকবো কেন ডাক্তার? টাকা তো আমার কামড়াচ্ছে না।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো বটেই—প্রেসার বুঝি আবার—'

'ব্লাড প্রেসার নয় ডাক্তার, নতুন রোগ।'

'বটে? কি হয়েছে বলুন তো?'

'বলছি—তোমার ভাগ্নীর বিয়ে হয়েছে পরেশ?'

'কই আর হচ্ছে? মেয়েটাকে নিয়ে ভগ্নীপতি তো—'

'পাগল হতে বসেছে—কেমন? হতেই হবে—পাগল করানো মেয়ে যে। বলি আমায় ভাগ্নেকে তোমার পছন্দ হয় ডাক্তার?'

'বলেন কি? বিলক্ষণ। তার আবার কিছু—'

'কথা থাক ডাক্তার, মাথা ঘুরাচ্ছি—বলছি—তোমার ওই ওস্তাদ ভাগ্নীটিকে আমার হতভাগা ভাগ্নেটার সঙ্গে জুড়ে দাও—বিনুনি ঝোলানো বন্ধ হোক ওর!'

নাড়ী না দেখাইয়া ধপাস করিয়া শুইয়া পড়েন হারাণ।

পাত্রী আশীর্বাদের আসরে, সাবধানে বালাপোষের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া ধানদুর্বা তুলিতে তুলিতে হারাণবাবু দরাজ গলায় বলিয়া ওঠেন, 'দেখো বৌমা, তোমার বাবাটি অতি ধড়িবাজ, অতি ফিচেল লোক বুঝলে?'

বৌমা কি বুঝিল কে জানে, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে।

'হ্যাঁ আর একটা কথা—'

গানের গলায় নয়, মৃদু গলায় 'বৌমা' উত্তর করেন, 'জানি, গান গাইব না আর—'

'গাইবে না? কেন গাইবে না? আলবৎ গাইবে—একশোবার গাইবে, কিন্তু ওই ছাইপাঁশগুলো গেয়ো না বাছা, ভালো ভালো গান নেই? ধরো যেমন—

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিসনে ফেলে।'

কুহু

সুমননাথ ঘোষ

কু-হু-উ....কু-হু-উ....

কোকিলের ডাক তো নয়, যেন কোন কিন্নর-বিনিন্দিত কণ্ঠ থেকে সঙ্গীতের দু'টি গমক সুধার তরঙ্গের মতো সহসা আছড়ে এসে পড়লো পরমেশবাবুর বাড়ির ওই দোতলার ঘরে—তেরোর একের একের ডি, বাঞ্ছারাম অক্রূর সেকেন্ড লেনের একেবারে শেষ প্রান্তে জরাজীর্ণ, সাবেকী আমলের পাতলা ইঁট দিয়ে তৈরি যে বাড়িটার সর্বাঙ্গে নোনা ঝরছে, দেওয়াগুলোর অস্থিতে পঞ্জরে দূর্বা না গজিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অশ্বত্থগাছ, যার শত শত শিকড় শিরা-উপশিরার মতো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে বাড়িটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে, তাই দেখলে মনে হয় বুঝি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় পা দেবার আগে ওটা তৈরি হয়েছিল—তারই মধ্যে কেমন করে যে সেই কোকিলের ডাক গিয়ে পৌঁছল তা গবেষণা-সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। বিশেষ এই অসময়ে অর্থাৎ সকালে, দু'বাড়ির ছেলে-পড়ানো সেরে, সবে যখন এসে তিনি গায়ের জামাটা খুলে পুরনো ক্যালেন্ডারের পেরেকটার ওপর ঝুলিয়ে তালপাখা দিয়ে হাওয়া না খেয়ে পিঠের শেষপ্রান্তস্থিত ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে ছোট মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ করতে কলঘরটা নীচের ভাড়াটে-কর্তা খালি করে দিয়েছেন কিনা—কারণ লোকটা ভারি শুচিবায়ুগ্রস্ত, পাঁচবার মাটি দিয়ে হাত না ধুলে তার হাত পরিষ্কার হয় না—এবং যখন জিবের ওপর আঙুলটা ঘষতে ঘষতে একেবারে গালের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে, ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দে মুখ প্রক্ষালন করতে করতে গলায় মসীকৃষ্ণ উপবীতটা দু'হাতের আঙুলের ফাঁকে তাঁতির মতো সুতোর টানাপ'ড়েন দিতে দিতে 'গঙ্গা গোদবরী চ' আবৃত্তি করতে করতে চৌবাচ্চা থেকে মগের পর মগ জল ঢেলে চলেন মাথায় এবং ওদিকে ঠিক সময়ে স্নান করতে না পেরে আপিসে লেট হয়ে যাবার আশঙ্কায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেয়ের আসাপথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকেন পরমেশবাবু, ঠিক তখন তাঁর সেই সুদুর্লভ ক্ষণিক অবকাশে যখন কোকিলের ঐ ডাক তাঁর কানে এসে আঘাত করলে না, একেবারে মর্মে গিয়ে বিঁধলো, তখন কণ্ঠে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সুর মিশিয়ে তিনি বলে উঠলেন, আ-মো-লো, এ যে দেখছি কোকিলের ডাক। —তা এখানে এ উৎপাত এলো কোথা থেকে?

সত্যি কথা বলতে কি, এই এক বাড়িতে ছাব্বিশ বছর কাটলো পরমেশবাবুর, কিন্তু কোকিলের ডাক ত দূরের কথা, কখনো একটা চড়ুই পাখির কিচিরমিচিরও শোনেন নি—শুধু ছুঁচো আর চামচিকের রাজত্ব, তাই ওখানে বুঝি অন্য কোন জীব প্রবেশ করতে ভয় পায়। তাই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি কোকিলের কথাটা। শীতের পর যে এখনো বসন্ত আসে, আজো যে

তেমনি ষড়ঋতুর উৎসব চলে প্রকৃতির প্রাঙ্গণ জুড়ে, তা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। ওই সঙ্কীর্ণ গলিটার দু'পাশে ছোটবড় যত বাড়ি সবগুলিরই অবস্থা বুঝি ওরই মতো। শুধু অসূর্যম্পশ্যা নয়, বিশুদ্ধ অক্সিজেন্ এর অভাবে সবাই যেন মুমূর্ষু। গলিটার গোলকধাঁধা পেরিয়ে আলো-বাতাসের সঙ্গে এক টুকরো নীল আকাশ, কিছু সবুজ ঘাস ও দু'চারটে গাছপালা দেখতে হলে অন্তত দশ মিনিটের পথ হেঁটে আসতে হয় পরমেশবাবু সেটা বিলক্ষণ জানেন। হাতের পাখাটা থামিয়ে আবার চিন্তা করতে থাকেন, তবে কি কোন বাড়িতে কেউ কোকিল পুষেছে! কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়। তা'হলে ত আর কোনদিন এ ডাক তিনি শুনতে পেতেন! একবারও কিন্তু এ কথাটা তার মাথায় গেল না যে সেদিনই প্রথম ডাকল সেই কোকিল কুহু ক'রে।

অথচ এর জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সওয়া ন'টায় বাসা থেকে বেরিয়ে তিন পয়সার সেকেণ্ড ক্লাসে ট্রামে ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যখন তিনি আপিসের পিছন দিকের 'গো-ডাউন'টার মধ্যে গিয়ে ঢোকেন এবং মালের আমদানি রপ্তানীর হিসাব মেলাতে বসেন কানে কলম গুঁজে, তখন বেলা দশটা বাজলেও তাঁর ঘরে জ্বলে হাজার বাতির আলো। আবার ছুটির পরে একটা ছেলে পড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখনো রাত্তির আটটা বেজে যায়। তাঁর জীবনে দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। আপিসে যেদিন ছুটি থাকে, উপরিপাওনার লোভে সেদিনও তিনি মাল গুদামের চাবি খুলে হিসাবনিকাশ করতে ভোলেন না। তাই আজ এমন অসময়ে হঠাৎ কোকিলের ডাক কোথা থেকে এলো, এই নিয়ে যখন মনে তোলপাড় করতে লাগলেন, ছোট মেয়েটা ছুটে এসে বলল, বাবা শীগ্‌গির ওঠো—কলঘর থেকে এইমাত্র পুঁটির বাবা বেরুলেন।

নিমেষে কোকিলের চিন্তা যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়, আর সেইসঙ্গে পরমেশবাবুর মনে পড়ে স্নান, আহার ও এতটা পথ গিয়ে ট্রাম ধরা, তারপর আপিসে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট লেট্ হ'লে নতুন সাহেবের মুখবিকৃতি! কিন্তু এ সবের জন্যে দায়ী নীচের তলার শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকটি। কাজেই অন্তরের সমস্ত ক্রোধ তৎক্ষণাৎ তার ওপর গিয়ে বর্ষিত হয়। সত্যি, কলঘর থেকে যেদিন ওঁর বেরুতে বিলম্ব হয় সেই দিনই পরমেশবাবুর আপিসে লেট হয়ে যায়।...

সেদিন আপিসে তৃতীয় দফা চায়ের বেঁটে গ্লাসে চুমুক দেওয়ার পর পকেট থেকে পানের ডিবেটা বার করেই পরমেশবাবু গৃহিণীর ওপর মনে মনে চটে উঠলেন, নিশ্চয়ই আজ পান কম দিয়েছে, নইলে এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল কেন?

চায়ের গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে একসঙ্গে দু'টো পান গুণ্ডিসহযোগে গালের মধ্যে পুরে একটা বিড়ি না ধরালে নাকি নেশা জমে না, কাজে উৎসাহ আসে না পরমেশবাবুর। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি কলম ফেলে উঠে গেলেন পান কিনতে।

পিছনের দরজাটা দিয়ে বড় গলিটায় নেমেই তিনি চমকে উঠলেন। ওপারে ফুটপাতের এককোণে কাঠের বাক্সর ওপর পানের ডালা সাজিয়ে যে পানউলীটি বসে আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে হেসে হেসে চুপি চুপি কি কথা বলছিল অনুপম। তাঁদের আপিসের মধ্যে সবচেয়ে সচ্চরিত্র ও লেখাপড়া-জানা ছোকরা বলে তাকে মনে মনে ভারি শ্রদ্ধা করতেন পরমেশবাবু।

কি জানি কেন অনুপমও তাঁকে দেখামাত্র চট্ করে সেখান থেকে সরে গেল এবং অন্যপথে একেবারে আপিসের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। ওঃ, তাহ'লে দেখছি সবাই ডুবে জল খায়, সবাই

ধম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির! আমি ভেবেছিলাম বুঝি, চারটে পাশ করা একালের ছোকরা, ওর অন্তত কোন বার-দোষ নেই।

আপন মনে গজগজ করতে করতে পরমেশবাবু রাস্তাটা পার হয়ে সেই পানউইলীর কাছে গিয়ে এক আনার পান কিনে, তার সঙ্গে গুণ্ডি, কিছু সুপরি ও পানের বোঁটায় চুন চেয়ে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে কাজে মন দিলেন।

পাঁচটা বাজার তখনো অনেক দেরি। টেবিলের ওপর স্তূপাকার কাগজপত্রের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছেন পরমেশবাবু; রেসের ঘোড়া ফিনিশ দেবার আগে যেমন দ্রুততম গতিতে ছোটে, তাঁর কলমও অনেকটা তেমনি ভাবেই চলছিল। তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট তরুণ যুবক কমলাক্ষ অকারণে উসখুস করছিল যাতে পরমেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিছুতেই যখন তা সম্ভব হল না, তখন সে তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। কলমটা থামিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর থেকে জালি গেঞ্জি উঁকি মারছে, পরনে দিশি জরিপাড়ে ধুতি, পায়ে কালো সোয়েডের চকচকে জুতো।

বারকতক মাথায় ঝাঁকড়া চুলের পিছন দিক হতে ঘষে সঙ্কোচের সঙ্গে কমলাক্ষ বললে, স্যার, আজ একটু আগে ছুটি দিতে হবে!

ঝাঁঝালো কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, এখনো এত কাজ বাকি, বোম্বের ডেস্‌প্যাচ আসেনি—সব জেনেশুনে আপনি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান, তাহ'লে একা এসব আমি করবো কখন?

অনুনয়ের সুরে এবার কমলাক্ষের কণ্ঠ করুণ হয়ে এলো। বললে, স্যার, কাল ফার্স্ট আওয়ারে এসে আমি সব ক'রে দেবো। এখন না বেরুলে সাড়ে পাঁচটার মেচেদা লোক্যালটা আর ধরতে পারবো না। তাতেও পৌঁছতে রাত্তির আটটা হয়ে যাবে।

শ্বশুড়বাড়ি যাবেন বুঝি?

সলজ্জকণ্ঠে উত্তর দিলে কমলাক্ষ, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

তাহ'লেই হয়েছে! কাল আপিস কামাই করবেন ত আবার?

না স্যার, কাল আমি কিছুতেই কামাই করবো না। আপনাকে কথা দিচ্ছি। সেকেণ্ডে ট্রেন নাগপুর প্যাসেঞ্জার সাড়ে ছটায় মেচেদা থামে। ওটা ধরবোই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কমলাক্ষের দিকে তাকিয়ে এবার পরমেশবাবু প্রশ্ন করলেন, আজ শুক্রবার, আজ না গিয়ে কালকে গেলেই ত ভালো হ'তো, একেবারে রবিবারটা কাটিয়ে সোমবারে এসে কাজে লাগতেন। তাতে আমরাও সুবিধে হতো কাজের। একটু ভেবে দেখুন। এমন কী জরুরী কাজ যে শুধু রাতটুকুর জন্যে এত ছুটোছুটি করে অর্থব্যয় ক'রে যেতেই হবে! আর কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পরে গেলে চলে না?

স্যার, আমি কথা দিচ্ছি কাল আসবোই। আজ আমায় যেতেই হবে, বড্ড দরকার! আমতা আমতা করে জবাব দিলে কমলাক্ষ।

বড্ড দরকার যদি সত্যি থাকে তাহ'লে যান! কলমটা তুলে নিয়ে তিনি আবার লিখতে শুরু করেন, একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্ত্রী বুঝি ওখানে?

আজ্ঞে হাঁ। বলেই সলজ্জ ভঙ্গীতে চট্ করে তাঁর সামনে থেকে চলে গেল কমলাক্ষ!

পাঁচটা বাজার ঘণ্টা পড়তেই, আপিস খালি করে যত কেরানীর দল বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরমেশবাবুর ঘাড় তোলার অবসর নেই। তখনো তাঁর কলম তেমনি দ্রুত ছুটে চলেছে।

পৌনে ছটা নাগাদ কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে তিনি হাঁক দিলেন, এ রামস্বরূপ—রামস্বরূপ... আরে কাঁহা গিয়া—ফাটক বন্ধ্ করনে হোগা, হাম যা রহা।

কিন্তু, কোথায় রামস্বরূপ? তার কোন পাত্তাই নেই।

ছ'টা যখন বেজে গেল ফিরিঙ্গী গির্জের ঘড়িতে, তখনো দারোয়ানটাকে দেখতে না পেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি গেলেন তার ঘরে খোঁজ করতে। আপিসের পিছনে যে পথে কলঘর ও প্রস্রাবখানায় যেতে হয়—তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে তবে একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছোট্ট ও নীচু একটা পাকা ঘর দারোয়ানের। তার সামনে একখানা দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে বৃদ্ধ রামস্বরূপ রুপোর মোটা বালা ও মল পায়ে দেওয়া এক হিন্দুস্থানী যুবতীর মাথা হাঁটুর ওপর রেখে বুঝি উকুন বাছছিল। পরমেশবাবুকে দেখেই সে বৌটাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আজ এত্ না জল্দি হো গিয়া বাবুজী? প্রশ্ন করলে।

বিড়ির টুকরোটা মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরমেশবাবু উত্তর দিলেন, কমলাক্ষবাবু ছুটি নিয়ে আজ আগেই চলে গেছে, একা আর কতক্ষণ ভাল লাগে বলো পাঁড়েজী!

ইয়ে ত ঠিক বাত হ্যায় বাবুজী! একলা কোই কাম্মে মন্ চলতা নেহি। বলে পায়ের খড়মে খটাখট শব্দ করতে করতে চাবির থোলো হাতে এগিয়ে এসে রামস্বরূপ যখন পরমেশবাবুর গুদাম ঘরের দরজাটা টেনে ভারী তালাটায় চাবি ঘোরাতে লাগল তখন শুধু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ত এখানে একাই থাকতে বরাবর, ওই জেনানা তাহ'লে তোমার কে পাঁড়েজী?

দারোয়ানের পাকা গোঁফে ঢাকা ওষ্ঠপ্রান্তে যেন নিমেষে হাসির ছোঁয়াচ লাগল।

চাবিটি কষে ঘুরিয়ে তালাটা টেনে দেখতে দেখতে শুধু জবাব দিলে, ও আমার একরকম ভাইঝি হয় বাবু!

বাসায় ফিরতেই দেখেন, ঠিকে ঝিটা দরজার পাশে বসে আছে। পরমেশবাবু প্রশ্ন করলেন, কি গো লক্ষ্মীর মা, তুমি আজ এত রাত্তির পর্যন্ত যে রয়েছো—ব্যাপার কি?

আমি আর আপনার কাজ করতে পারবনি, তাই মাইনে লেবার তরে বসে আছি।

কেন গো, কি হল তোমার আবার?

পরমেশবাবুর মুখের কথা মিলোবার আগেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী রাজবালা। চোখ টিপে, তাঁকে চাপা গলায় বললেন, সে অনেক কেলেঙ্কারি, বলবো'খন। তুমি এখন ওর টাকাটা হিসেব ক'রে চুকিয়ে দাও। এ মাসের এই চোদ্দ দিনে ওর মোট পাওনা হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা।

পরমেশবাবু ঘরে ঢুকে জুতো জামা খুলে আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় জল স্ত্রীর কাছে চেয়ে খেলেন। তারপর জামার পকেট থেকে দু'টাকার একখানা নোট নিয়ে বিছানার কোণটা হাতড়াতে লাগলেন—হ্যাঁগো, এখানে যে সকালে দেড়টা খুচরো টাকা রেখেছিলুম, কি হল?

রাজবালা বললেন—ও, সেটা আমি নিয়েছি।

কেন? প্রশ্ন করলেন পরমেশবাবু।

একটা দরকারী জিনিস কিনেছি। বলতে বলতে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, আমার বারবার সন্দেহ ছিল যে, মুখে যে সবসময় ধর্মের কথা আওড়ায় আর স্নান করতে গিয়ে পাঁচবার মাটি দিয়ে হাত পরিষ্কার করে সে লোক কখনো ভাল হতে পারে না।

কেন, কি হয়েছে শুনি? কি করলে ও তোমার?

আমার করবে? এতবড় আস্পর্ধা? ফোঁস করে উঠলেন রাজবালা। ওই লক্ষ্মীর মা যখন কলঘরে বাসন মাজছিল তখন নাকি তার আঁচলে একটা পাঁচটাকার নোট বেঁধে দিয়ে বলেছেন, তোর বাড়ি যাবো আজ রাত্রে—ব্রাহ্মণ-ভোজন করাস এই দিয়ে।

পরমেশবাবু বললেন, বল কি, এ যে বিশ্বাস হয় না।

রাজাবালা বলছেন, মিছে কথা বলে ওর লাভ কি? কৈ, তোমার নামে ত বলতে আসে নি। তাই নোটখানা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—নীচের তলায় আর কাজ করবে না। আমাদের একার কাজের জন্যে ও আর এতটা পথ আসবে না। তাছাড়া মাইনে নীচে থেকেই তো বেশি পেতো। পোষাবে কেন আমাদের একার কাজে?

তখনো পরমেশবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন, কিন্তু আমি ত ওঁকে অত্যন্ত শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে জানতুম।

হাঁ-হাঁ—ভিজে বেড়াল—সবাই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! জানি।

লক্ষ্মীর মা'র কানে বোধ হয় কথাটা গিয়েছিল! তাই সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, বামুন? ঝাড়ু মারি অমন বামুনের কপালে! আমি গরিব, লোকের বাড়ির এঁটো বাসন মেজে খাই বলে কি আমার মান-ইজ্জৎ নেই! আমারও পুরুষ আছে। সাড়ে সতেরো টাকা খরচ করে বামুন ডেকে মন্ত্র পড়ে তার বিয়ে হয়েছে। আমাকে কি অন্যবাড়ির ঝিয়ের মতো পেয়েছে, যে বাসন মাজছে, সে-ই রান্না করছে, আবার সে-ই বাবুর মুখে তামাক জুগিয়ে তার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে। কালে কালে আরো কত দেখতে হবে তা কে জানে। ছি,-ঘেন্নায় মরে যাই!

আচ্ছা, তুই চুপ কর্। বাবু ঘরে রয়েছে তোর খেয়াল নেই? এই নে তোর টাকা। বলে তাকে তখনই বিদায় ক'রে দিলেন রাজবালা।

ওপর-নীচের দরজাগুলো ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে তবে পরমেশবাবু রাত্রে শুতে যান। এবং প্রতিদিন তাঁর আগেই রাজবালা ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে তার মধ্যে একটু স্থান ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু আজ কি হল কে জানে, হঠাৎ ঘরে ঢুকেই পরমেশবাবু দেখেন, রাজবালা দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে বিলতি ক্রীম ঘষছেন।

দরজায় খিল এঁটে দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, এ আবার কি?

রাজবালা নতুন শিশিটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে আরো একটু ক্রীম তুলে নিতে নিতে জবাব দিলেন, বললুম ত তখন একটা জিনিস কিনেছি।

তা তুমি যে এতদিন পরে আবার ক্রীম কিনতে যাবে মুখে মাখবার জন্যে তা কেমন ক'রে ধারণা করবো?

কেন, আমার কী এমন বয়েস হয়েছে যে একটু ক্রীম মাখলে লোকে নিন্দে করবে? তোমার মতো আমার ত আর চুল পাকে নি?

আহা, আমি কি তাই বলছি! তুমি ত কোনদিন এসব মাখো না, তাই বলছিলুম।

তুমি কোনদিন ইচ্ছে করে একটা কিনে দিয়ে দেখেছো, মাখি কি না মাখি? আজ সকাল থেকে কেমন একটা টানের হাওয়া দিচ্ছে—মুখের চামড়া যেন শুকিয়ে উঠছে, তাই ছেলেটাকে দিয়ে এটা কিনে আনিয়েছি। ভারি চমৎকার গন্ধ করছে, না? বলে সমস্ত মুখটায় ভাল করে ঘষে রাজবালা স্বামীর নাকের কাছে আঙুলটা তুলে ধরতে, পরমেশবাবু একটা নিঃশ্বাস টেনে বললেন, সত্যি, ভারি চমৎকার গন্ধ ত!

মাখো না একটু! কতকাল ত তুমি এসব ছোঁও নি। বলে সোহাগে গদ্‌গদ হয়ে পরমেশবাবুর মুখে মাখিয়ে দিতে লাগলেন।

বিছানায় ছ'টা ছেলেমেয়ে ঘুমচ্ছিল। তারা কেউ যদি হঠাৎ চোখ খোলে এই সময়? বড় ছেলেটার ত প্রায় পনেরো বছর বয়স হল। দেখতে পেলে কী মনে করবে! তাই ভয়ে ভয়ে একবার সকলের মুখের ওপর চোখটা বুলিয়ে নিয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, হয়েছে—হয়েছে—!

আহা, আর একটু বুঝি তর সইছে না। সব তাতে তোমার বাড়াবাড়ি। দেখ দিকিনি মুখের চেহারা একেবারে ফিরে গেল! সব সময় তুমি এমন নোংরা হয়ে থাকো যে কে বলবে তোমার বয়স এই ছেচল্লিশ! যেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হয়ে গেছো বলে মনে হয়। আজ থেকে রোজ রাত্তিরে শোবার আগে এটা না মাখলে তোমায় বিছানায় শুতে দেবো না!

হুঁ। বলে শুধু মুচকি হাসলেন পরমেশবাবু।

হাসলে যে? বলতে-বলতে স্বামীর কাঁধের ওপর মাথাটা রাখলেন রাজবালা, অকারণেই।

মুখে হুঁ ব'লে কথাটা উড়িয়ে দিলেন বটে পরমেশবাবু, আসলে কিন্তু মনে মনে তিনি চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ আজ কি হল গিন্নীর! এতকাল পরে আবার সোহাগ উথলে উঠলো কেন?

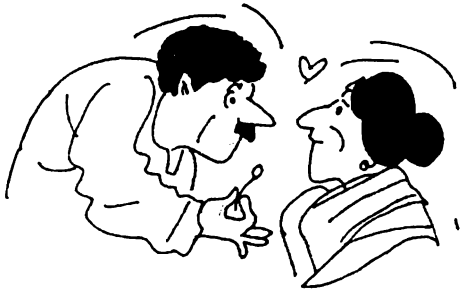

জেনানা সংবাদ

বিমল মিত্র

বিলাসপুরের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মারা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়লো না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী-বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠলো—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তার আট-দশটা নাবালাক ছেলেমেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউ-এর ভারটা নেবে তা হলে কে? প্রভিডেন্ট ফান্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হল।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসেবে আইডিয়াল—

টি আই বুড়ো এন্টনি বললে—আমি তা হলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তা হলে আমাকে আর আজীবন ব্যাচিলর থাকতে হতো না।

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার। বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটি কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানতো। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও অজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোনো ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে—

মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দুপাশে মাথা হেলতে লাগলেন। বললেন—তা হলে বলুন-না কেন মাহেঞ্জোদাড়োতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালী মেয়ের কঙ্কাল—

পাশের হল্-এ বিলিয়ার্ড খেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডর-এর খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইন্স্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন-এর ওপর দুদলের ব্যাডমিন্টন খেলা চলছে। আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু ঠুংরি গান চলেছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধ হয় ওয়ান-ডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে-মেল লেট্। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিমটিমে ল্যাম্প জ্বেলে সার সার টাঙ্গাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।....

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না, মেটা সাহেব—

গুরুবচর্ন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই রেল-লাইনের

তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পি'তে এসে বসবাস করতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিকপুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে!

স্টেশনমাস্টার মুদেলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও 'মনসুন' আরম্ভ হল না! গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচেলর মানুষ, তরুণী মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তা ছাড়া বেঙ্গলে কখনও যাই নি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সরোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিং-এ এসেছিলেন—

টি-আই বুড়ো এন্টনি বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী...

গুরুবচন মেটা বললেন—তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—জব্বলপুরে—

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালী নই, বাঙলাদেশে কখনও যাই নি—তারপর আমার অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ—

টি-আই বুড়ো এন্টনি বললে—তা হোক—বলুন মিঃ মেটা—ভেরি ইন্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশবাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায়, তো আর প্রধান কারণ হলো বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইন্টারেস্টিং—তার পর? বুড়ো এন্টনি বললে।

—তবে একটা কন্ডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করবো, তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয় জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তাতে আপনারা রাজী?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংরেজী প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ্ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন-এ ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ হল। কাট্‌নি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধ হয় পেণ্ড্রা রোডের পথে অমরকন্টকের রেঞ্জ-গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পূর্বদিকে প্লাটফরমের উপর গোস্ রুটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্লাটফরমের তালগাছ প্রমাণ লাইট-পোস্টটার আগাপাশতলা শুধু পোকায় পোকা।...

গুরুবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা—আমি

তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সব লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়িতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালী ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গণ্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেক্‌শানগুলো...আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌গতপুর, বীণা, এলাহাবাদ-কাট্‌নি...সাতদিন আটদিন পরে হয়তো একদিন বাড়ি এলাম...আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালী ব্যবসা, আর ফুর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন শিকার করা...

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল-ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা ষোলো বোরের...আর আমি নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর-ফিফ্‌টি—

যখনি ট্যুর-এ যেতাম—ওটা থাকতো সঙ্গে। কখনও কখনও তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার-অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেমে মাইল তিনেক দূরে এক নদীর ধারে মাচা বাঁধা হলো বাঘ মারবার জন্যে—উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোণ সেখানে এসে মিশেছে—জায়গাটা বাঘ শিকারের পক্ষে আইডিয়াল...বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচার ওপর আমি আর পেন্ড্রা-রোডের ঠাকুর সাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী—আর আমাদের 'কিল্‌'টা রাখা হল ঠিক...

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবান্তর প্রসঙ্গ। আমার এ গল্প তো শিকার-কাহিনী নয়, এ-গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি—

আপনারা হাওবাগ স্টেশন দেখেছেন? নেমে সোজা পুবদিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোট-বড় অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে-রাস্তাটা বি-এন-আরের মতো মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ-মুখো আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি...এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজিরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও-তল্লাট অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়িটাতে, আর তার পর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আরের জমিতে বিরাট বিরাট আম গাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিমমুখো 'শিয়ালকোট লজ'—আমার বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলাটায় একটা ভাড়াটে এল।

এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূর। তারপর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্সা করতে হবে। বাজার-হাট সবু দূর। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি।

কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাসের ভাড়া অ্যাডভান্স-ও দিয়ে দিলে। রসিদটার নীচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়িভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব সিং বললেন—স্বামীনাথন! বাঙালী 'স্যারনেম' তো অমন শুনি নি কখনও, ব্রাদার।

সোনাপার সাহেব বললেন—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফ-এর কাছে শুনেছি—বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেম-গুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফ-এর একজন কাজিন ছিল, তার সারনেম 'গোস'—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—তা কেন—স্বামীনাথ কখনও কোনও বাঙালীর সারনেম হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েণ্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন, মিস্টার মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হল তার হাজব্যান্ড-এর সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে, বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং.....আমাদের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তারপর—তারপর?

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হল—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম। কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা? একদিন কি দুদিন মাত্র দেখছি ওদের—তা ও দু' এক সেকেণ্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক, চেহারাটাও ভালো করে দেখা হয় নি। আমি বাড়িতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে দশ বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক এক দিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান-ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাঙলা গান—গানটার এক লাইন আমার এ এখনও মনে পড়ে—শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের লেখা গান—হে নটরাজ—হে নটরাজ....

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইতো—বেঙলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তার পর শুনুন—গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন—

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকে' গেছি কিনতে, দেখা হলো সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়িতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ—এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাইবাসায় থাকতো ওর বাবা, ফরেস্ট অফিসার, ওর নাম মিস সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রইস্ আদমি—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও-লোফারটা কে?

আমি বললাম—ও ওর হাজ্‌ব্যান্ড—হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হল?

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারি খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে কইয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে।

চাইবাসার সব লোকই নাকি ভালোবাসতো সুজাতাকে। বড়লোক বাপ। ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ি, কখনও শেরোয়ানি, কখনও শালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দহাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা-কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাউজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হলো ভারি মজবুত গড়নের মেয়ে। ভঁইষের দুধ, ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল—

সেদিন প্রথম আলাপ হল—

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্শনে, মহাসামুন্দের পি-ডাব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল্-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুর পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তার পর সেটা নিয়ে গণ্ডিয়া জাংশানে ন্যারো-গেজ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার 'শিয়ালকোট-লজে' এসে পৌঁছুলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগে-আগে বুল্-ডিয়ারটা নিয়ে ঘরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে-আস্তে আসছি। কদিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম—দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরী রাখে—গিয়েই একগ্লাস খেয়ে নেবো—

কিন্তু গেট্ দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ্-সিল্কের বুটিদার শাড়ি-ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার একজোড়া পা-ঢাকা চটি—দুদিকের ব্লাউজের নীচে থেকে সমস্ত হাতদুটো মাস্ল্-ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত-ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম!

তার পরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরলে—

বললে—ষোলো বোরের বন্দুক ব্যাবহার করেন আপনি?

বললাম—তিনরকমই আছে, যখন যেটা সুবিধে সেইটে নিই—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—হল্যান্ড অ্যান্ড হল্যান্ড—আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন?

—তার কিছু ঠিক নেই—তবে অ্যাল্ফা ম্যাক্স-ই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের ওপর রেখে 'এইম্' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে; আঙুলটা কাটা।

দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছে, এতোয়ারিতে মুন্সিজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে,—আর পাঠালাম একতলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেইদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হল। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এইসব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমতন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন—

গোয়াড়িঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্ মেরে এনেছে দু'তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু করেছে—বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

বললে—আজ সকাল-সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম আমার বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক্' মারবার কিন্তু....আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি সে-ও আসবে তার আগেই—

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে, এই পঁচিশ বছর পরেও, কারণ অমন মাংসের রোস্ট্ জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না। শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময় নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না। কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে-খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া গ্রীন পিজিয়ন্টা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন, কোথায় লাগে ফাউল। যা হোক ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালীর সাজে সেজেছিল। একটা পীককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট শাড়ি ফিগারটাকে লেপ্টে জড়ানো, আর চিতাবাঘের মতো ডোরা-ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নীচেয় বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে-মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের মতো কর্কশ-কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে-সাপের ফণার মতো হাতের মাস্লগুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে।

আমি যেতেই পরদা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন, মেটাজী—

বললাম—মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধ হয় কোন কাজে আটকে পড়েছে, সেলস্ম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

বললাম—ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো, আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরী ছিল, ছ শো টাকা মাইনে পেতো—সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই মোটরের সেল্সম্যানশিপ ধরেছে। এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো—তা যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারে না ও—এমন ঘর-কুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোন স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়, মিসেস স্বামীনাথন,—কিন্তু ছ শো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজ্নেসের বাজার যে-রকম—

—না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল চাকরি তো

চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কেন?

—হয়তো আত্মহত্যা করে বসতো। বলা তো যায় না—

—কেন, আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না—পুরুষমানুষ যে অমন সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও সুসাইড করতে গিয়েছিল—

—কেন? আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি—

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে—হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তারপর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানী আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তাছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি-সি-এস থেকে শুরু করে আ-সি-এস পর্যন্ত পাঁচ ছ'জন ক্যাণ্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধেয় আমাদের বাড়ি আসছে...আর হ্যারি তো ছ শো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের এ্যাকাউনটেন্ট—আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার—সেন্টিমেন্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল শুনতে। মিসেস স্বামীনাথনের গল্প বলার সময় ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গী হচ্ছিল সাতে সেন্টিমেন্টাল হ্যারি কেন, যে-কোন পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম—তার পর—

খিলখিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তারপর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি—কিন্তু হ্যারি ওমনি ছাড়েনি আমাকে—অমন নাছোড়াবান্দা পুরুষমানুষও আমি আর দুটো দেখি নি, মেটাজী—এই দেখুন না—বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখালে উঁ-চু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার অ্যাডমায়াররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের জন্যে এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম—কেন?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত নটা বাজতে চললো এখনও তো হ্যারি আসছে না—

বললাম—আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয় কোন কাজে আটকে গেছে—

তার পর শুরু হল ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনদিন ভুলবো না। খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগলো। বললাম—তারপর, বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেইদিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন, কুমার আর অলকের—কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুরবেলা

বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর-বাইক নিয়ে—অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি—

—যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যের আগে, কিন্তু হলো না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে বড়বিল সাইডিং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে; বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হল এমন গড়ানে, তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে—একটু বিশ্রাম করতেই হবে—

সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ডটা বাধালে—

বললাম—কোন কাণ্ড?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজি নিন মেটাজী—আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে—

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা-পান শেষ করলাম, তারপর বোধ হয় একটা ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে—ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও কেউ না-কেউ শোবার জন্যেই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করি নি—কিন্তু বিপদ ঘটলো তার পর। হ্যারি বললে, আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কী করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ও হল মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান। আর তা ছাড়া মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারি বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরা-ই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমার সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট....আপনাকে আর দুস্লাইস রুটি দেব, মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারির মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বারো বোরের বন্দুকটায় একমুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে টিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে—আপনি আর একটু কারি নিন, মেটাজী—কিছুই খেলেন না দেখছি...

বললাম—ও কথা থাক, আপনি বলুন তারপর কী হল—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো, এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকে পড়েছে—কী বলেন—

বললাম—তার পর বলুন—

—তার পর আর কি—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, দেরি হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো একটুকুর জন্যে, কিন্তু আমার আঙুলটা....বাইরে যেন সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টা বাজলো, না মেটাজী?

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি—এতক্ষণে বোধ হয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল রিক্সায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌঁছুবার আগেই হ্যারি না-এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবার ভেবেছি, সেদিন আমার

সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল-না আরো অনেক পরে, যখন খাওয়া দাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তা হলে মিসস স্বামীনাথনও অমনভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার কিনা করলো আমারই উপস্থিতিতে।

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয়—

তারপর কী একটা বেয়াদবি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসলো। দেখলাম মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ-কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। চীৎকার করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল....

তার পর হ্যারির চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি! অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হল। শেষে আমার দিকে একবার কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেড্‌রুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিরে বললে—চিয়ারিউ, বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হল না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হল—মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক—তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো অ্যাণ্টনি বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং—তার পর

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রান্‌কার্ডস আর অলওয়েজ স্কাউণ্ড্রেলস্—ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি তো বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে—কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনো আপত্তি করেন নি—বরং—

মুদেলিয়ার বললেন—তা তো করবেই না, আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কোলকাতার হোটেলে পাবলিক্‌লি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সিরিয়াস অবজেক্‌শন টু ইট—

টি-আই অ্যাণ্টনি বললে—চুপ করুন আপনারা। তার পর বলুন মিঃ মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন। বিলাসপুর রেলওয়ে কলোনি এখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুরের ইয়ার্ডে শান্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশ চম্‌কে দেয়। আর, এই ইনস্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লি রেডিওতে এখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোন ওস্তাদজী।

মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে খেতে গেছি—রাত্রের খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট্ ছিল, আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—বাঙালী নয়, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা নিয়ে উঠে এল। এসে আমার

সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—

গুড্ ইভিনিং, বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে আরও হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না—

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই-যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসের রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগে না তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়।

বললাম—এবার তা হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি উত্তর দিলেন না তো?

—কী কথা?

—ওই আপনি টের পান কিনা—

—কেন বলুন তো, আমি পেলেই বা....

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস্ হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হলো আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না—তখন আপনি ওটা খান কেন?

—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন—হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বললে—আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছ শো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মোটরগাড়ির পেটি সেল্‌স্‌ম্যান—তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি—তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে—সুজাতা কি আমায় কম ভালোবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমনি সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? একরাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না—আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস্ করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন একনিষ্ঠ ভালোবাসার তুলনা হয় না, মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ—আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যান্‌সীকে দেখুন—ওই যে বসে আছে—

দূরের টেব্‌লে বসা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালেন হ্যারি।

বললে—ওই ন্যান্‌সীকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াবো তত খাবে—একবারও 'না' বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—সুজাতাকে কত বলেছি খেতে—কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে এক শো হাত দূরে পালিয়ে যাবে—ওদের আর সব ভালো মশাই,

বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্‌জারভেটিভ—

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যান্‌সীর টেব্‌লে গিয়ে বসলো।

কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওয়াবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলাম নীচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যবসায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

মিসেস স্বামীনাথনকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। বললে—সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি, মেটাজী—

বললাম—হয়তো কোন কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না এখন এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা এবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাবো—

—এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাঁকে?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে, সব জায়গায় খুঁজবো—আজ একটা গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার' আজ কয়েক শো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তার পর এই রাত হল...আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন, আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদ্‌লে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক প'রে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। শালোয়ার আর সেরোয়ানি পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি! কিন্তু বাঙালী মেয়ে স্বামীনাথনের এই পোশাকে আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে-মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালা-ধরা পোশাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে ঘুরে খুঁজে বেড়ানো রোমান্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়সে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—জেন্টস সাইকেল বলেই এ পোশাকটা পরলাম—এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার, মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই-বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে—এর চেয়েও অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে...আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, মেটাজী—হাজব্যান্ড

যাদ মনের মতো না হয়, তার চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তার পর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায় নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী—হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন। আমি বললাম—কিন্তু এমনও হতে পারে, হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও...

'কিংসওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধির মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরুল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। বললে—আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না, মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে পারে না—ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্যে কীই না স্যাক্রিফাইস করেছি....হ্যারি অমন আন্‌ফেথফুল হতে পারবে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না...কিন্তু....

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হল যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে শুরু করেছে, তার পর কেউটে-সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন...সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়....সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী—

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল-জি ধার দিতে পারেন মেটাজী?

—কেন, এল-জি কী করবেন?

—আগে দিন, তার পরে বলবো—একটু শীগ্‌গির করুন—মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

—এবার বলুন এল-জি কী করবেন?—আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্য আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি, কিন্তু গড্ ফরবিড্, আপনার কথা যদি সত্যি হয়, মেটাজী, তখন, আমি কী করবো! হ্যারিকে গুলী করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি, কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে আমি ওকে রক্ষা করবো কী করে, মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো—হাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরি না হয়—

তার পর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হল।

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—স্প্লেনডিড্ মিস্টার মেটা, স্প্লেনডিড্—তারপর—

মুদেলিয়ার সেটশনমাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়েছিলাম 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিক্‌শন'—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তা হলে—

সোনাপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু, চোদ্দ বছর বয়সে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশনমাস্টার—ভাবছেন চরম স্যাল্‌ভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জানলেন কী—একটু মদও খেলেন না—একদিন অফিস কামাইও করলেন না, কখনও বে-নিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই—রাত অনেক হয়ে গেল...

ইন্‌স্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার! পেড্রারোডের দিক থেকে একটা মালগাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনের প্রতিধ্বনি বার বার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্লাটফরমের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও শুরু হল না।

—তার পর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংসওয়ে' হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই! হয়তো ন্যান্‌সীর সঙ্গে রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের একী ভয়াবহ কাণ্ড। সারাদিন হ্যারির নাওয়া-খাওয়া নেই, তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারাদিন। তার পরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার-করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকানে দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হল—আর কোন দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না, এক বাঙালী মেয়ে ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট-গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা দূর থেকেই যা—

সে যা হোক—সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্‌সী সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালোবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালোবাসতে পারে?

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাই নি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরের ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হল।

কয়েকদিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট-লজ'-এ, তখন সে-প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তারপর হ্যারি স্যুট্ টাই পরে সাইকেল-রিক্সয় চলে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিমটিম আলো জ্বালিয়ে সাইকেল-রিক্সয় চড়ে।

সে দিন রাত্রে তবে কি হ্যারিকে 'কিংসওয়ে'তেই পাওয়া গিয়েছিল? ন্যান্‌সী কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।

সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।

বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম—মেটাজী—

বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার কথাটাই আগে বলুন—

সুজাতা বললে—তাই বলি। আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজ-টা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগে নি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—

বললাম—এবার আমার কথাটা বলি। সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হল সঙ্গে গেলে হতো—ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালো জ্ঞান হলো না, মিসেস স্বামীনাথন—

সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোন থার্ড পার্সন নেই—

বললাম—আপনি কি সত্যিই ও-বিষয়ে সিরীয়স—

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মতো মানুষ হই নি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না, ওই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা ওর—আর কোনও কিছুতে নেই মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার লোক নয়—কিন্তু যদি—

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—ও বাড়ির দিকেই আসছিল—সারাদিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে, বাড়িতে এসে খাবার পর্যন্ত সময় পায় নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকী ভাড়া—একটা রসিদ সময় মতো পাঠিয়ে দেবেন—

কি জানি কেন তখনও সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময় সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী, যদি কোনদিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে....আমার ওই বারো বোরের বন্দুক এল-জি লোড্ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন—

বললাম—না না মাফ করবেন সুজাতা-বাঈ, আমি কিছু জানি না, সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনওদিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আন্‌ফেথফুল হয় তা হলে... সে আপনি ব্যাচিলর মানুষ ঠিক বুঝবেন না—

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও এমনি জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয় নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোন কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি-এন-আরের আমবাগানের দিকে চেয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল

একগ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা পাশের চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোন মালাগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনের বাগনের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরলো মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দুজনেই উইশ্ করলাম। তার পর আধঘণ্টাও কাটে নি, হঠাৎ দেখি একটা সাইকেল-রিক্স আসছে আমারই 'শিয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায় নি। গেট-এর মধ্যে সাইকেল-রিক্সটা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁশ আর সঙ্গে সেই ন্যান্সী—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না....।

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হল না। এখানে ন্যান্সীকে নিয়ে এলো কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দুজনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিক্সাওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দুজনেই জানে না, কোথায় কোন বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্সাওয়ালা—

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে—ও মেয়ে তো সে-কথা ভোলবার নয়!

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হল এখন একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তার পর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্' করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফ-এর পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হল আমার। ওটা তো আমার এল জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জি'টা দিয়েছি, তা হলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জি' টা বেরোয়। তারপর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধে....

আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্‌গ্রীব হয়ে। নীচে ওদের তুমুল ঝগড়া চলছে। মাঝে মাঝে সুজাতার গলা। তার পর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে.....

গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন—থামলেন কেন, মেটাজী—

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষে হল কিনা বলুন মেটাজী, আর দেরী করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি দুজনকেই মারলো, না, একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চারুপানি-খাওয়া বুদ্ধি, মুদেলিয়ার গারু! এল-জি তো একটা শুনে আসছেন। দুজনকে মারবে কী করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা? বড় সমস্যায়

ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না, এই আমি বলে দিলাম।

টি-আই বুড়ো এন্টনি সামনে মুখ এগিয়ে নিয়ে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে।

গুরুবচন মেটা বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্পটা যেখানে আমি শেষ করবো তার পরে আমাকে আর কেউ কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধহয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধহয়—যা হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি...

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়তো পাগল ভাবতো। তার আসতে প্রায় একঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হল নীচেকার গোলমাল যেন থেমে এল। পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি। আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায়, পরাজয়ের কলঙ্কে অপমানে একেবারে থ্যারোলি অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলে না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে—দেখছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তারপর আমাকে টানতে টানতে বললে—কাম্ অন্ মেটাজী, কাম্ অন্—

আমি হতবাক্ হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম—তার পর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি—আমি এর প্রতিশোধ নেব...বলে একমুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

অবশেষে

প্রতিভা বসু

সুকুমারবাবু পাড়ার রমণীমোহন। তেরো থেকে ত্রিশ বছর বয়স অবধি সকল মেয়েদেরই তিনি একচ্ছত্র সম্রাট।

তাঁর নিজের বয়স কত কেউ জানে না—যার যে-রকম পছন্দ অনুমান ক'রে নেয়। তেত্রিশ বছর বয়সের মহিলারা বলেন, 'অন্তত পক্ষে চল্লিশ—' কুড়ি থেকে তেইশেরা বলেন, 'ককখনো অত না—বড় জোর পঁয়ত্রিশ—' আর তার নিচের মেয়েরা বলে, 'সুকুমার-দার আবার বয়স কী, তিনি আমাদের চিরতরুণ বন্ধু।'

শুধু বয়সই না—আরো রহস্য আছে তাঁর। তিনি কি চিরকুমার, না বিপত্নীক? না কি তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন? এ নিয়েও পাড়ায় মাথা খাটানো হয়, কিন্তু সেই রহস্যের কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কোনো দুঃসাহসী মেয়ে (কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে যার বয়স) তাকে এই প্রশ্নটি করেছিলো। সুকুমারবাবু হেসে বললেন, 'স্বামী হবার যোগ্যতা আমার আছে নাকি?'

মেয়েটি বললো, 'এত যিনি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনিই যদি কোনো মেয়ের স্বামী না হবেন, তাহ'লে কিন্তু বড়োই দুঃখের কথা।'

'প্রেমিক যে, সে প্রেমিকই—সে কারো স্বামী নয়।'

এ-কথা থেকে কী প্রমাণিত হ'ল। কিন্তু তবু সকলেই ভেবে নিলে, তিনি চিরকুমার। আর বলাই বাহুল্য, অবিবাহিত পুরুষের প্রতি মেয়েদের একটা স্বাভাবিক করুণা আছে। সকলের সমাদরে তিনি স্ত্রীলোকর্জিত জীবনেও বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গলাভে ধন্য হ'লেন।

আসলে সুকুমারবাবুর চেহারাখানা ভারি সুন্দর। লম্বা বলিষ্ঠ গড়ন—একমাথা ঝাঁকড়া চুল আর চোখ দুটি একেবারে খাঁটি প্রেমিকের মতো! এই চোখ তিনি দরকার-মতো ব্যবহার করেন। যে-বয়সের মেয়ের উপর যে-ভাবে দৃষ্টিপাত দরকার তা তিনি ঠিক জানেন। মহিলাদের কাছে গেলেই তাঁর চোখ আনত হয়, মুখের দিকে প্রায় তাকানই না বলতে গেলে—যুবতীদের সঙ্গে আবার এই চোখই ঘন-ঘন মিলিত করেন তিনি—আর যারা ছেলেমানুষ তাদের সঙ্গে চটুল, সস্নেহ—যখন যে-রকম করলে কাজ আদায় হয় তা-ই করেন।

থাকেন একটি ছোটো ফ্ল্যাটে, একটি চাকর নিয়ে। প্রায়ই চাকরটির রান্না করতে হয় না—এ-বাড়ি থেকে দই-মাছ ও-বাড়ি থেকে আলুর দম, বিকেলবেলা শিঙাড়া—এ-রকম পালাক্রমে রোজই প্রায় কোনো-না-কোনো বাড়ি থেকে কিছু আসেই।

একটি নতুন মেয়ে এলো পাড়ায়। মেয়েরা মুখে-মুখে বলাবলি করতে লাগলো তার কথা।

কেউ বললো, 'হাজার হোক, মফস্বলের তো ব্যবহার জানে না।'—কেউ বললো, কিসের! কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন—দেখতে তো ঐ—অহংকারখানা আছে সাড়ে-ষোলো আনা।—অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্করা বললো, 'বেশ কিন্তু—দেখলেই আলাপ করতে ইচ্ছে করে।' আর পাড়ার ছেলেরা ঘুরঘুর করতে লাগলো বাড়ির তলা দিয়ে।

মেয়েটি নির্বিকার। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে—ছেলেমেয়েদের আনাগোনা আর কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করে না। সে যেন এ-রাজ্যে নেই, এইরকমই তার মুখের ভাব।

'আমাদের পাড়ায় ভাই ও-রকম হাঁড়িমুখো মানুষ আর আসেনি—' গিন্নীরা আহারাদির পর বলাবলি করলেন। 'কী জানি—আমার কিন্তু বেশি সুবিধের ঠেকছে না—' অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একজন গিন্নী বললেন, 'সধবা মানুষ, তার স্বামী কোথায়? অত বড়ো একটা ধাড়ি মেয়ে নিয়ে অমন একা-একা থাকে কেমন ক'রে?'

'মেয়েটি তো আশুতোষ কলেজে পড়ে। আর ওর মা মৃন্ময়ী গার্লস স্কুলে কাজ করেন।' কোন গিন্নির অল্পবয়স্ক একটি মেয়ে এ-কথা বললো। 'ও বাবা, তুই আবার এত খবরে পেলি কোথায়?' মা অবাক হবার ভান ক'রে বললেন। মেয়েটি গর্বিত ভঙ্গিতে হাসলো শুধু।

খবর পাওয়া শক্ত নয়। মেয়েটি যে রোজ সকালবেলা একটি বেঁটে ছাতা আর বই হাতে নিয়ে গটগটিয়ে চ'লে যায় ট্রাম-লাইনের ধারে, এ আর না দেখে কে! আর, ওরা কে আর কেমন, এ নিয়ে এ-পাড়ায় এত গবেষণা হয় যে তাতে মায়ের মাষ্টারির খবরটা সংগৃহীত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

টালিগঞ্জ ব্রীজের ও-পিঠে তখন প্রায় গ্রাম ছিলো বললেই হয়। এখন যা বাড়ি-ভাড়া, এর চার ভাগের একভাগও তখন ছিলো না। অনেকেই শস্তার লোভে গিয়ে ক্রমে-ক্রমে সেখানে এই পাড়াটির সৃষ্টি করেছেন। আজকাল খোঁজ পেয়েছেন অনেকেই, কিন্তু বাড়ির সংখ্যা এতই অল্প ছিলো যে পাড়াটি আর তেমন বর্ধিত হ'তে পারেনি। সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা বোধ হয় ওই সুকুমারবাবুই। নতুন অধিবাসী কেউ এলে সর্বাগ্রে তাঁর সঙ্গেই সকলের আলাপ হয়। এবারে কিন্তু ব্যতিক্রম হ'ল। অতি অল্পবয়স্ক এক প্রিয়দর্শন যুবক তাঁকে টেক্কা দিলো এবার।

মেয়েটিকে যদি সুন্দরী বলি, কিছুই বলা হবে না। পল্লবিনী লতা বলতে আমরা কী বুঝি? বর্ষার সজল ঘাসের মতো আভাময় শ্যামল রং আর মেঘের মতো ঘন কালো চুলে ভরা মাথা। ও যখন সোজা তাকিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, সমবয়সী মেয়েরা অকারণেই ব'লে ওঠে 'আহা ঢং!' আর যুবক ছেলেগুলো চটপট ঘুম ছেড়ে জানলায় দাঁড়ায়—বয়স্ক মহিলারা, অর্থাৎ যাদের যৌবন প্রায় যায়-যায়, তারা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সুকুমারবাবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো। পাড়ায় অমন একটি মেয়ের আবির্ভাব হ'ল, আর তিনিই কিনা তার নাগাল পেলেন না এখনো? আর সেই তিনদিনের ছোকরা অভিজিৎ—সেই আজ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলো?

ঘন চুলে ব্যাকব্রাশ ক'রে ঐ সকালবেলাতেই দাড়ি কামিয়ে, মুখে পাউডার দিয়ে, চমৎকার ধোপ-দুরস্ত কাপড়জামা প'রে সুকুমারবাবু তাড়াতাড়ি ট্রামলাইনের ধারে এসে দাঁড়ালেন। একটু পরেই দেখা গেলো, লম্বা সোজা রাস্তাটি দ্রুত পদক্ষেপে পার হ'য়ে মেয়েটিও এসে দাঁড়লো সেখানে। কিন্তু অত বড়ো একটা জলজ্যান্ত সুকুমারবাবুকে সে গ্রাহ্যই করলো না—পৃথিবীতে যেন একমাত্র তার নিজের অস্তিত্বই যথেষ্ট—সুকুমারবাবু চেষ্টা করলেন একবার চোখে চোখ ফেলতে,

কিন্তু ব্যর্থ হ'লেন। অবশেষে এগুলেন তিনি। মনোরম হাস্যে তাঁর মুখ ভ'রে গেলো—কাছে গিয়ে দু'হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! অ্যাদ্দিন ধ'রে পাড়ায় এসেছেন, অথচ এখনো আলাপ হয়নি।'

বিনীত হাস্যে মেয়েটি প্রতিনমস্কার ক'রে আবার অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

সুকুমারবাবু বললেন, 'কলেজ যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার।'

'বরাবরই এ-কলেজে পড়ছেন?'

'হুঁ—'

আর কী বলবেন সুকুমারবাবু? এত সংক্ষিপ্ত কথার পরে কি আর এগুনো যায়! ট্রাম এলো, আর সেদিনের মতো ঐটুকুতেই শেষ করতে হ'ল আলাপ। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না—কয়েকদিন পরেই দেখা গেলো মেয়েটির সঙ্গে তিনি দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন।

এবার পাড়ার মেয়েরা চঞ্চল হ'ল। কোন-এক যুবতী বিদ্রূপ করলো, 'সুকুমারবাবু সাবধান, এ কিন্তু স্বখাত সলিল।'

একজন বয়স্ক মহিলা বললেন, 'এবারই সুকুমারবাবুর আইবুড়ো নাম ঘুচবে।' আরেকজন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তা যা-ই বলো বাপু, হালচাল কিন্তু আমার ভালো মনে হচ্ছে না—' সুকুমারবাবু সব শুনে বললেন, 'মেয়েটি চমৎকার।'

জ্বলন্ত তেলে ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়লো—সকল বয়সের মেয়েরা চীৎকার করে উঠলেন একযোগে।

'ঐ আপনাদের চমৎকার!'

'আপনার পছন্দের প্রশংসা করতে পারলুম না, সুকুমারবাবু। সত্যি! ঐ তো প্যাঁকাটি একখানা—'

সুকুমারবাবু মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু একটা ভারি মুশকিল। হয় ট্রামে উঠে, নয়তো ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে ছাড়া অন্যত্র মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবার কোনই সম্ভাবনা দেখতে পেলেন না সুকুমারবাবু। কী আর করেন—ভোরবেলার সেই মধুর নিদ্রাটির উপরেই অত্যাচার চালাতে লাগলো ঘন-ঘন।

মেয়েটি কিন্তু আলাপি মন্দ না। চেহারার মতো তার কথাবার্তাও ভারি মিষ্টি। মাঝে-মাঝে যখন হেসে ওঠে আর গালে টোল পড়ে তখন সুকুমারবাবু অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন। কী যেন মনে পড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে একটু বেশি আকর্ষিত হন তিনি।

অভিজিৎ (সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি) বললো, 'সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখছি বেশ আলাপ হয়েছে আপনার।' বলাই বাহুল্য তার গলার স্বরটা খুব সুখের নয়—আর এ-ও বলা বাহুল্য যে যিনি এত বেশি রমণীমোহন তাকে পছন্দ করা নবযুবকদের পক্ষে সহজ নয়।

মল্লিকার ধনুকের মতো বাঁকা ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেলো। বললো, 'ভদ্রলোক চমৎকার'।

অভিজিৎ জবাব দিলো না।

মল্লিকা বললো, 'কথা বলছেন না যে? আপনার ভালো লাগে না ওঁকে?'

অভিজিতের সঙ্গে একমাস হ'ল আলাপ হয়েছে মল্লিকার—এ-পাড়ার প্রথম বন্ধুই সে। এমন নয় যে সুকুমারবাবুর মতো সচেষ্ট হ'য়ে আলাপ করেছে অভিজিৎ—আলাপ হয়েছে দৈবক্রমে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু সত্যিই কলেজ থেকে ফেরার পথে ট্রামে উঠতে গিয়ে কাপড় জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো মল্লিকা—অভিজিৎ তাকে হাতে ধ'রে না-তুললে হয়তো একটা দুর্ঘটনা ঘটতো। এও একটা দুর্ঘটনা বইকি। কিন্তু এতে মানহানি হ'তে পারে—প্রাণহানির ভয় তো নেই।

শুক্রবার সকালবেলা অভিজিৎ পড়তে যায় প্রোফেসরের বাড়ি—কাজেই ঐটেই তার ফেরবার সময়—যদি হোঁচটটা মল্লিকা কাল খেতো তাহ'লে তো আর এ-ঘটনা ঘটতো না! বুকের মধ্যে অভিজিৎ লুকিয়ে রাখলো কথাটা। যে-মেয়েকে নিয়ে পাড়ায় এত কানাকানি —তার সঙ্গে এই রোমান্টিক সংঘর্ষের গল্পটা ফলাও ক'রে বলবার ইচ্ছেটাই ছিলো স্বাভাবিক—সব ছেলের মতো সকালবেলা সেও কি ঘুম-জড়ানো চোখে জানলায় দাঁড়ায়নি? মনে-মনে কি সে আলাপ করেনি এই মনোহারিণীর সঙ্গে—আর সে কথা ব'লে বন্ধুদের ঈর্ষাভাজন হবার সাধ কি একদিনও হয়নি তার মনে? কিন্তু কার্যকালে তার মনে হ'ল এ তো বলবার কথা নয়—এ আপন অন্তরের মধ্যে ভরে রাখবার কথা।

তারপর দেখা গেছে ঘন-ঘন, কিন্তু অগ্রসর হ'তে সময় লেগেছে। একসময় দেখা গেলো, সেই অসম্ভব লজ্জা আর সংকোচের গণ্ডী এড়িয়ে তারা একটু-আধটু কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। এ-রকম একটা চরম মুহূর্তে যদি সুকুমারবাবুর মতো মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় তা হ'লে কি হৃদয় আনন্দে নৃত্য করতে পারে? কাজেই মল্লিকার মুখে সুকুমারবাবুর প্রশংসা শেলের মতোই বিঁধলো অভিজিতের বুকে।

কৌতুক বোধ করলো মল্লিকা—আড়চোখে অভিজিতের বিরস মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শুনলুম উনি ইকনমিক্সের ভালো ছাত্র ছিলেন—ফার্স্টও হয়েছিলেন এম.এ.-তে—ভাবছি ওঁর কাছে একটু পড়লে হয়।'

যথাসম্ভব উদাস মুখে অভিজিৎ বললো, 'বেশ তো।' পরমুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'মেয়েরা যে কেন ও-সব ছাই বিষয় পড়ে।' এখানে বলা দরকার অভিজিৎ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র।

মল্লিকা হেসে বললো, 'তা' হলে মেয়েরা কী-বিষয় নিলে আপনি সুখী হন?'

'সুকুমারবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন।'

মল্লিকা কিছু বলবার আগেই ট্রাম থামলো—সেই টালিগঞ্জ থেকে আশুতোষ কলেজের দূরত্ব যে মাত্রই এইটুকু, সেজন্য যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হ'য়ে সে নেমে পড়লো তাড়াতাড়ি। অভিজিৎ র'য়ে গেলো—সে যাচ্ছে এলগিন রোডে তার প্রোফেসরের বাড়ি।

এদিকে সুকুমারবাবু ভাবলেন, 'দুধের ছোঁড়াটা তো ভারি চালাক হয়েছে। আজকাল কি রোজই ওর প্রোফেসরের বাড়ি যাওয়া থাকে নাকি? নাঃ, দেখাশোনার ক্ষেত্রটা আর-একটু প্রসারিত না-করলেই নয়। কত আর ট্রাম-লাইনে ছোটাছুটি করা যায়—কত আর পকেটের পয়সা খরচ ক'রে অকারণে ট্র্যামে বেড়ানো যায়। আর তাছাড়া, ওই ছোঁড়ার যন্ত্রণায় ট্র্যামে ওঠাও দুষ্কর!' সুযোগ বুঝে তিনি বললেন, 'আপনার সঙ্গে কি ট্র্যাম ছাড়া অন্যত্র সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ?' অবাক হ'য়ে মল্লিকা বললো, 'কেন বলুন তো?'

'তাই তো দেখছি—এই কলেজের সময় ছাড়া আপনি তো আর বেরুবেন না—আর কখনো

বাড়ি যেতেও বললেন না।'

লজ্জিত হ'য়ে মল্লিকা বললো, 'বা রে, তা কেন? আপনি যদি সত্যি কখনও যান আমাদের বাড়ি, সে তো আমাদের সৌভাগ্য।'

'সৌভাগ্যটা আপনার নয় আমারই। তাছাড়া আপনার মা শুনেছি অত্যন্ত বিদুষী মহিলা—তাঁর সঙ্গে আলাপ করবারও ভারি ইচ্ছে হয় মাঝে-মাঝে।'

'নিশ্চয় যাবেন। আমারই আগে বলা উচিত ছিলো—খেয়াল হয়নি।'

বাড়ি ফিরেই সেদিন মল্লিকা মা-কে বললো কথাটা।

আধ-শোয়া অবস্থায় একখানা বই পড়ছিলেন তিনি। মেয়ের কথা শুনে মুখ তুলে বললেন, 'কে রে ভদ্রলোক?'

'আছেন একজন—বেশ লোক!—আসতে চান একদিন—আসুন না, মা!'

আসল কথা কিন্তু অন্যরকম। সুকুমারবাবুর আসা-যাওয়া দিয়ে মল্লিকা অভিজিতের জন্য সেতু গড়তে চায়। সুকুমারবাবুকে আমন্ত্রণ করতে তার কোন সংকোচ নেই, কিন্তু মুখ ফুটে মা-কে সে অভিজিতের কথা বলতে পারলো না। তবু মনে হ'ল—একজনকে আসবার অনুমতি দিলে মা এদিন আর-একজনকেও আসতে দেবেন।'

সংযুক্তা দেবী ঈষৎ চিন্তা করলেন। মেয়ের সরল আগ্রহকে বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করলেন তিনি। একটি যুবতী মেয়েকে নিয়ে কোন পুরুষ অভিভাবক ছাড়া থাকা যে কী বিড়ম্বনা, তা তিনি হাড়ে-হাড়ে জানেন। এক্ষুণি হয়তো একটা কথা উঠবে। কিন্তু তবু বললেন, 'বেশ তো।' মল্লিকা খুশি হ'য়ে মায়ের চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে-করতে বললো, 'এটুকু বলতে তুমি এত চিন্তা করলে, মা?'

'কী করবো বল। তোকে তিন বছরের শিশু নিয়ে বেরিয়েছি সংগ্রামে। আগে ছিলো নিজের চিন্তা, এখন হয়েছে তোর চিন্তা।'

'আমার? আমার জন্য কোন চিন্তা নেই।' পরম নিরুদ্বেগে মল্লিকা মা-র পাশে শুয়ে পড়লো।

মেয়েকে আদর করতে-করতে সংযুক্তা দেবী বললেন, 'আমার শরীরের তো এই অবস্থা। এদিকে ইস্কুলের ছুটিও ফুরালো—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কী ক'রে কী হবে।'

'তখন তো শুনলে না, একটু বেশি মাইনে পেয়েই অমনি কলকাতায় এলে—না-এলে কি আর অসুখ করতো। আমরা মৈমননসিং-এই বেশ ছিলুম।'

কথাটা বললো বটে মল্লিকা, কিন্তু মনে-মনে অনুভব করলো অন্য রকম। এখানে না-এলে কি অভিজিতের সঙ্গে দেখা হ'তো?

মা বললেন, 'কলকাতার অপরাধ কী? ওখানে থাকলেও এ-অসুখ আমার বাড়তোই। এই হার্টের ব্যারাম কি আমার আজকের? কিন্তু আমি ভাবছি, প'ড়ে থাকলে উপায় হবে কী?'

'কিচ্ছু হবে না।' অসহিষ্ণু হ'য়ে মল্লিকা বললো, 'এখন আসল কথাটা বলো তো, ভদ্রলোককে আসতে বলবো নাকি?'

সংযুক্তা দেবী হেসে বললেন, 'বল্ পাগলি বল্।' মায়ের এই স্নেহের সুযোগটা এবার নিলো মল্লিকা।—'তাহ'লে মা, আরেকজন বন্ধুকেও বলবো কিন্তু।' অন্যমনস্ক হ'য়ে মা বললেন, 'বেশ তো।'

চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত শরীর একটু অকালেই ভেঙে পড়েছে তাঁর, তবু তার মধ্যেও লাবণ্যের চিহ্ন পরিস্ফুট। ভাঙা মুখের মধ্যেও একটা সকরুণ সৌন্দর্যের চিহ্ন যাই-যাই ক'রেও একেবারে মুছে যায় নি। মার মুখে দিকে তাকিয়ে মল্লিকার ভারি ভালো লাগলো। এত সুন্দর মা তার—অথচ শোনা যায় তার বাবা অন্য-কোন মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আশ্চর্য ভদ্রলোক। মা-কে সে জড়িয়ে ধরলো ছোটো মেয়ের মতো।

ওদিকে সুকুমারবাবু পাঁচটার অনেক আগেই সাজগোজ ক'রে বেরোলেন। খবরটা একটু দেবার মতো বইকি—বিশেষ, অভিজিতের কর্ণগোচর তো করতেই হবে!

একজন তরুণী বললেন, 'একেবারে পাকা কথাটাই আজ দিয়ে আসবেন বোধ হয়। কী বলেন?'

সুকুমারবাবু হাসি মুখে বললেন, 'দেখি।'

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আসতে তাঁর একটু দেরি হ'ল। মল্লিকা অভিযোগ করলো, 'এত দেরি করলেন?'

'কী করি বলুন! মনটা তো চ'লে এসেছে ঠিক সময়েরও আগে—এই বাস্তব শরীরটা নিয়েই পড়েছিলুম মুশকিলে—নানা কাজে ঘুরে বেড়াতে হ'ল—'

'বসুন মা-কে ডেকে দি—' হরিণীর গতিতে পাতলা শরীর নিয়ে মল্লিকা অদৃশ্য হ'ল। সেদিকে তাকিয়ে আবার যেন সুকুমারবাবুর কী মনে পড়লো।

একটু পরেই ঘরে এলেন সংযুক্তা দেবী। বজ্রপতনেও কি মানুষ এতখানি চমকায়? সে-দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলেন সুকুমারাবু—ঠোঁট ফাঁক হ'য়ে শব্দ বেরুলো, 'তুমি?'

সংযুক্তা দেবী বুকের মধ্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডে দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলেন—সামনের একটি আসনে তিনি বসলেন চুপ ক'রে। আজ আঠারো বছর পরে পরিত্যক্ত স্বামীকে দেখে তাঁর কেমন লাগলো কে জানে। কিন্তু অতীতের সেই তীব্র আত্মাভিমান বোধ তাঁর আর জাগলো না। স্বামী অন্য-কোন মেয়ের প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন ব'লে যে-কঠিন দুঃখ তিনি তখন পেয়েছিলেন, হৃদয়ের মধ্যে আজ আর তার কণামাত্রও অনুভব করলেন না। শারীরিক অসুস্থতা সামলে ভালো ক'রে তাকালেন সুকুমারবাবুর দিকে, তারপর অত্যন্ত সহজ গলায় বললেন, 'কেমন আছো?'

চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে হাসিমুখে মল্লিকা ঘরে ঢুকলো। সংযুক্তা দেবী বললেন, 'বাবাকে প্রণাম কর, মলি।' সুকুমারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই তোমার মেয়ে।'

মল্লিকা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছবির মতো।

আর সুকুমারবাবুর বিহ্বল গলা দিয়ে একটি আওয়াজ বেরুলো, 'আমার মেয়ে?'

বাইরে অভিজিতের গলা পাওয়া গেলো, 'আসতে পারি?'

মুহূর্তে সুকুমারবাবু নিজেকে মানিয়ে নিলেন অবস্থার সঙ্গে—মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে প'ড়ে নিলেন তার চোখের ভাষা, তারপর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন, 'কে, অভিজিৎ নাকি? এসো বাবা, এসো।' অত্যন্ত স্নেহশীল প্রৌঢ়ের মতোই শোনালো সুকুমারবাবুর গলা। নিজের পাশে হাত দিয়ে বললেন, 'এই যে, এখানে বোসো।'

অচল টাকা ও চালু মাল

কুমারেশ ঘোষ

এখন মটন কাটলেট আর এক কাপ চা খেয়ে ফট্‌কে কাউন্টারে গিয়ে পকেট থেকে একটা রূপোর টাকা বের ক'রে দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেস্টুরেন্টের মালিক তার হাতখানা খপ্ ক'রে ধরলো—অচল টাকা চালাতে এসেচো—জালিয়াৎ।

হঠাৎ বেখাপ্পা ধরা পড়ায় ফট্‌কে পড়ায় ফট্‌কে তো থ'! রেস্টুরেন্টের অন্যান্য লোকগুলোও চঞ্চল হয়ে উঠলো। যাদের প্লেট তখনও খাবার, সবে খেতে শুরু করেছে, তারা অবশ্য উঠলো না, তবে যারা প্লেটে প্রায় সারা ক'রে এনেচে বা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে বাকী, তারা সবাই প্রায় রা-রা শব্দে এসে পড়লো কাউন্টারের কাছে—কি হয়েছে মশাই? ব্যাপার কি?

—আরে মশাই, এইটুকু, ছেলে, জালিয়াতি শিখে গেচে!—মালিক হতাশায় ভেঙে পড়লো—এদেশের আর ভাস্যি নেই।

—হ্যাঁ, ওহে খোকা! এসব কি? —দু-একজন প্রশ্ন করলো ফট্‌কেকে।

—আমি কি জানতাম? —ফট্‌কে তার মুখখানা কাচুমাচু ক'রে উত্তর দিলো।

—জানতে না? কচি খোকা!—একজন ধমকে দিতেই তার মুখ থেকে টোস্টের লালা-ভেজা টুকরো দু'চারটে ঠিকরে এসে পড়লো ফট্‌কের গালে মুখে।

ফটকে বাঁ হাত দিয়ে (কারণ ডান হাত তখনও রেস্টুরেণ্ট-মালিকের হাতের মধ্যে ধরা) সেগুলো মুছে ফেলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—সত্যি দিব্যি গেলে বলচি, আমি জানতাম না টাকাটা অচল!

মালিক দাঁত খিঁচিয়ে বললে—আবার দিব্যি করা হচ্চে। ওতে তো আর পয়সা লাগে না।

এমন সময় একজন মোটা বেঁটে লোক, মাথায় টাক, দিব্যি ভুঁড়ি ঘন, ছাঁটা গোঁফ—এগিয়ে এলেন সামনে। হাফ-প্লেট মাংস আর পাউরুটি খেয়ে চায়ের কাপে তিনি চুমুক দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এ গোলমাল শুনে তিনি ভাবলেন তাঁর ঐ চায়ের চাইতে ঐ ব্যাপারটাই বেশি মুখোরোচক। তাই, তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ শেষ ক'রেই এগিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক বললেন—দেখো খোকা, আমাকে যদি ঠিক বলো তবে ছাড়িয়ে দেব, নইলে পুলিশে—বুঝলে? আমি পুলিশে যখন ছিলাম, এমন ব্যাপার ঢের দেখেচি।

—ঠিক, ঠিক!—একজন এককালে-পুলিশের লোককে হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল সবাই—ঠিক আপনিই ব্যবস্থা করুন।

ভদ্রলোক বললে—দেখো খোকা, তুমি যে অপরাধ করেচ, তাতে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে। তুমি জাল টাকা চালাবার চেষ্টা করেচো!

ফট্‌কের মনে ততক্ষণে বোধকরি একটু সাহস ফিরে এসেচে। হয়তো ভাবলো সে, এতগুলো লোকের কাছ থেকে চাঁদা ক'রে চাটি খেয়ে মরে যাওয়ার চাইতে বরং জেলে যাওয়া ঢের সোজা! বললে—বারে, আমি কি জাল টাকা তৈরি করি যে, জেলে যাবো?

—তবে? কোথায় পেলে ঐ টাকা?—ভদ্রলোকের কথায় পুলিশী ধমক।

ফট্‌কে এবার ঢোক গিলতে লাগলো—ঐ টাকাটা? টাকাটা কোথায় পেলাম বলচেন? আজ্ঞে, টাকাটা—আমি—

—বলো না তাড়াতাড়ি!—আবার ধমক।

—এই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

—মিথ্যে কথা!

ফট্‌কে তাড়াতাড়ি শুধরে নিলো—না, না ঠিক কুড়িয়ে না, তবে অনেকটা ঐ রকমের। একটি লোকের পকেট থেকে—

—অ, পকেটমার!—সবাই প্রায় আঁতকে উঠলো।

মালিক বললে—ছোঁড়াকে মার লাগানো দরকার।

—না, না—দাঁড়ান আপনারা।—একদা-পুলিশ কর্মচারী সবাইকে থামিয়ে দিলেন। ফট্‌কেকে বললেন—তোমাকে তবে পকেটমারের অপরাধে—

—কিন্তু আমার কথাটি আগে শুনুন।

—এর পরেও তোমার কথা শুনতে হবে? বেশ বলো—

—বলছিলাম কি—ফট্‌কে আবার ঢোক গিলতে লাগলো—ঐ টাকাটা যখন অচল তখন তো ওর দাম নেই—

—তা তো নেই!

কাজেই—ফট্‌কে বললে—আমি সেই ভদ্রলোকের পকেট থেকে টাকাটা নেওয়ায় তাঁর কোনো ক্ষতিই হয়নি। কারণ ওটার তো কোনো দামই নেই, ঢেলা! বরং তার পকেটের ওজন কমিয়ে দিলাম।

—আরে, এ যে বড়ো চালু ছেলে দেখচি।—সবাই ব'লে উঠলো।

প্রাক্তন পুলিশ ভদ্রলোক হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন—হুঁ, এ ছেলেকে পুঁতলে পাকা ব্যারেস্টার হয়ে গজাবে দেখচি—

—কিন্তু, রেস্টুরেণ্টের মালিক বললে—আমারই যে ক্ষতি হল। একটা কাটলেট—

ফট্‌কে অতি করুণ সুরে বললো—আপনার ক্ষতি করতে আসতাম না! কিন্তু অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল, একটা গোটা মাটন কাটলেট খাবার! তাই—

এমন সময় একজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন এসে রেস্টুরেণ্টে! ফট্‌কেকে দেখে চিৎকার ক'রে উঠলেন—হতভাগা ছেলে! তোর এই কাণ্ড! পটলার কাছে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এলাম! তোর মার দেরাজ থেকে অচল টাকাটা এনে এইসব কাণ্ড! কী খেয়েছিস্?...এই নিন মশায়, যা দাম। কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোক এক টাকার নোট একখানা টেবিলের ওপর রাখলেন। সবাই হাঁ হয়ে গেল।

ফট্‌কে মালিকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে তার বাবার হস্তগত হ'ল। তবে পরে কি হল জানিনে। কারণ, আমি আমার চিংড়ির কাটলেটে আবার মন দিলাম।

নাম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে-বসতে তাগিদ, 'কই ঝি'র কি করলে? বলে বলে যে আমরা হয়রান হয়ে গেলাম—' খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট-দশ টাকা মাসিক মাইনের যদি বা ঠিকে ঝি বার কয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবে না।

আশেপাশে যে কয়েক ঘর কামার আর নমঃশূদ্র প্রতিবেশী আছে আগে তাদের বিধবা বোন আর মেয়েদের ভিতর থেকেই এসব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আজকাল দিনকাল বদেলেছে। পুরুষদের মজুরির রেট হয়েছে এখন দু-তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান-সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ, ঝি-চাকর খাটতে আর কেউ রাজী নয়।

ঘুরে ঘুরে দু-তিন বাড়িতে গিয়ে ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা পেড়ে ফেললাম। কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়, নিজের সংসারেই নানান ঝামেলা,' আবার কেউ-বা পরিষ্কার মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তাহলে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করার জন্য একজন মেয়েছেলে না হলে নিতান্তই যে আমাদের নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধ মাইলখানেক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুর নিচে নামতে চায়। তাও রাত থাকতে থাকতে, খুব ভোর-ভোর সময় গিয়ে পৌঁছলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হতে হতে তরল কাদায় সেই জল রূপান্তরিত হয়। তিন ননদ-বৌদিতে প্রথম দিন-দুয়েক কলসী-কাঁখেবেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা শুরু করেছিল কিন্তু তৃতীয় দিনেই দেখা গেল, তাদের মধ্যে দুজনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। বলবার কিছু নেই। দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে ওঠে না।

জলের পর আগুন। রান্না করতে গেলে, সুলতার প্রায় চোখ ছলছল করে ওঠে আর কি! শহরের মতো কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোন রকম জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করা যায়নি। উমা আর রমা দুজনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো পাতা আর ছিটকে ডাল সংগ্রহ করে এনেছে। আহার্য তৈরির তাই একমাত্র ভরসা। আমি অবশ্য আশ্বাস পেয়েছি এবং আশ্বাস দিয়েছি যে শিগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিষ্পত্র শুকনো শুকনো ডাল নিয়ে যেসব গাছ এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাই জ্বালানি রূপে সুলতার উনানের পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে।

কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈতৃক বাড়িতে মাসখানেকের জন্য সপরিবারে বিশ্রাম এবং চিত্তোবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি-চাকরের আর কমলা-কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ করে তুলল।

পাশের গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবন মণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের বার ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভর্তি করে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি করে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্যে ভেবো না। তোমার পিসীমা একাই একশ। কাজকর্ম দেখে যদি পছন্দ হয় তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝি'রা নাকি সব রাজার ঝি হয়েছে।'

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো মুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দুজনে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা, পিসেমশাই না হয় বুড়ো মানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ করো না দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললাম, 'দুই-ই ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধরনের সন্দেহের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখি যদি পারো।' বলে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, 'ওগো, একবার এদিকে এসো তো, বাড়ির কর্তা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে বসে জ্বালানির জন্য দা দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলোকে ঝি ছোট ছোট করে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আটহাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার-দুয়েক চেষ্টা করল, কিন্তু কোনবারেই মাথায় আর তা রইল না।

সুলতা ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'চেহারাখানা দেখো একবার।'

এতক্ষণ চেহারার কথা আমার মনেই হয়নি। ঝি'র আবার কেউ চেহারা দেখে নাকি। বিশেষত সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলে না, তার চেহারা কি রকম কে দেখতে যায়।

সুলতার অনুরোধে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই-বা ওরা হাসি চাপতে পারছিল না। বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মতো চেহারা, কোন অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুঁত আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড়ো মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারী ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নিচের অং কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারার পুরুষালি ধরনটাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝির আঙ্গিক গঠনের এই বৈসাদৃশ্যই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর করে তুলেছে বুঝতে পারলাম। সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দর হয় এবং গৃহকর্ত্রীর সুরুচি

এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্যে স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব করে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজকর্ম সব দেখে নিয়েছ? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এ দেশের মানুষ আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুলতা বললো, 'তা তো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন কদমছাঁটা করেছ কেন? চুলগুলি কি দোষ করল?'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভরে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ করে দিলাম একদিন ছেঁটে!'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগতভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকানোয়, বেণী কি কবরী রচনায় অনেক সময় তার ব্যয় হয়। কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা করে উপভোগ করে। সুলতার জন্য সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুলতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমার বিনা অনুমতিতেই সুটকেশ থেকে পুরানো সরু নকসীপেড়ে ধুতিখানা বের করে আনল। আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের আধপুরনো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলি পরো দেখি, ওভাবে তুমি তো দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। ছিঃ ছিঃ।'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজ হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেল।

কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আটহাতি জীর্ণ ময়লা চীর পরে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ-কর্ম করছে। উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারী বাধো বাধো ঠেকে আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছেন দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল, 'থাক তোমার ঘামাচি দেখে আমার আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামুটি উন্নতি হয়েছে।

রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজকর্মে সবাইকে সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোন কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোন অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চির খণ্ড নয়, অবসরমতো বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাব গাছের শুকনো গুঁড়িগুলি রসো চেলা করে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না। বুকের আঁচল মাথায় জড়িয়ে নেয়। তারপর লোহার মতো শক্ত আমের গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পড়তে থাকে; দর দর করে

ঘাম ঝরে পড়ে পিঠ বেয়ে।

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি করে বলে, 'থাক না রসো, এসব পুরুষের কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত করে জবাব দেয়, 'আহাহা কী সোহাগের কথাখানা গো। আমাকে করতে হবে না তো কে করবে শুনি? চাকর-বাকর কামা-কৃষাণ আছে দু-চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে এসে করতে পারবে। কোপ দেওয়া দূরে, কুড়ুলখানা যদি ভালো করে ধরতে জানতো তবু না হয় বুঝতাম। গুণের ওই তো একখানা সোয়ামী। এরপর আবার পুরুষের কাজ আর মেয়েমানুষের কাজ বলে বকাবকি করছ বউঠাকরুণ।'

নায়ক-নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি আমার কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্যে কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু রসোর কুড়ুলের খট্‌খট্ শব্দ চলতে থাকে অবিরাম। খানিক বাদে এসে রসো আবার আপসোস করে সুলতার সঙ্গে।

'সোয়ামীর নিন্দা করলাম বলে রাগ করেছ নাকি বউঠাকুরুণ?'

সুলতা হাসি গোপন করে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দে শুনলে রাগ হয় না? তোর হত না?'

জানলা দিয়ে চোখে পড়লো রসো তার বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ধরেছে, 'হু এইটে হত।'

উমা হঠাৎ ধমকের সুরে বলে, 'ছিঃ, ওসব কি?'

রসো পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়। 'কাজের কথা বলছিলে বউঠাকুরুণ। কাজের আবার মেয়ে-পুরুষ আছে? যে যা জানে তার সেই কাজ? তাই তাকে মানায়।'

রমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের রসরাজ যে আবার বক্তৃতা দিতে জানে দেখছি, বৌদি।'

রসোর পৌরুষকে স্বীকার করে নিয়ে ওরা তার নাম রেখেছে রসরাজ। চাল চলনে রুচিতে প্রসাধনে নিজেদের সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিয়ে মনে আর কোন ক্ষোভ নেই সুলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওর বেশ-বাসে আচার ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কী আছে। ও যে কেবল আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওর মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাথার সব চুল পেকে যাওয়ায় কোন মেয়ের বাপ রাজী হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার বড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটুলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে আসা তিনি শুরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবা খেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানো না, জানতে কতক্ষণ?'

প্রথম দিনকয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু করে রস পেতে লাগলাম, নেশা জমে উঠল।

তবু কবিরাজের মতো জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতড়ি, ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তারপর অধীরভাবে বললেন, 'না হে, তুমি তো রাত ভোর করে দিতে চললে দেখছি। বসে বসে আমি কি করি বলো তো। অন্তত একটু ধোঁয়া টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতুম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশাই-এর জন্যে তামাকের ব্যবস্থা করে দিলাম। হুঁকো-কলকে এল, মাটির ভাঁড়ে রইল মাখা তামাকের গুলি, আগুন-মালসায় দগ্‌দগ করতে লাগল চেলা কাঠের আগুন। নবাবী শিষ্টাচারে আরও একধাপ অগ্রসর হলাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোন কাজ নেই। এখানে কাছাকাছি থাকবি, কবিরাজ মশাই যখন তামাক চাইবেন, ভরে তামাক দিবি।'

রসো হাতমুখ নেড়ে বলল, 'আহাহা কী সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভরে দাবা খেলবেন আর আমি বসে বসে কেবল তামাক ভরে দেব! আমার বুঝি আর মানুষের গতর নয়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সঙ্কুচিত হয়ে বলল,'বকো না দাদাবাবু, মুখে বললুম বলে, তোমার কথার কি সত্যিই অমান্য করতে পারি! তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশাই-এর তামাক-তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ হতে না হতে আর এক ছিলিম রসোকে ভরতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড়ো বড়ো এক একটা গুলি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি বলি করেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর কটা দিনই বা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আর তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারিনি। সুলতারা এ নিয়ে অনেকবার অনেকরকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকমের।

একটু বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বারবার আপত্তি করতে থাকায় খেলা অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটলি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড়ো বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীর আঁচলধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকের লক্ষণ। সে আঁচল যে রসে একবার ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তাকি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল তা লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্তে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো আলোটা একটু ধরো তো, ভারী অন্ধকার রাস্তা।'

বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি থাকুন। পথঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশাইর তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ পড়ল না কি রাস্তায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছন থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। অমন অন্ধকারে যেও না।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশাইর একখানা হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে রসো তাকে হিড়হিড় করে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো?'

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল; 'হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওকে। এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই?'

কবিরাজ মশাইর চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখালো। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে। হাত ছেড়ে দিতে মনে হল কব্জিটা তাঁর মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ তাঁর হল কি করে? রসোর অন্তরে-বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব বলে কিছু আছে?

মহকুমা শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্যে রোগটা প্রত্যেকবার এই সময়টা এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ করে বলতে লাগল, 'সব তো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের?'

সুলতাদের বললাম, 'দোষ কি। নাও না টীকা।'

বারান্দায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হল। পাড়ার কৌতূহলি ছেলেমেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে তারা আর এগুলো না।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের অভ্যাসমতো তিনজনেই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রসো এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলি চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওর নামটা?'

বললাম, 'ডাকি তো রমা করে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোশাকি নাম উজ্জয়িনী। সুলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারের কাছে ঠিব মধুরেণ সমাপয়েৎ হল না।

রসোর শক্ত শাবলের মতো হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড় কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞাসা করল 'নাম?'

বললাম, 'রসো।' রসো একবার আমার দিকে তাকাল, চোখ বুলিয়ে নিল সুলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আজ আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আট-হাতি ময়লা ধুতি। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চলে গেলে বললাম, 'আমরা জানতাম না। এ নাম তুই কোথায় পেলিরে?'

রসো ভারী লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'পাবো আবার কোথায়? পোড়ারমুখো কবরেজ সেদিন ওই নামেই ডেকেছিল।'

তপনের চৌরচর্চা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তিন সপ্তাহ ছুটির পরে, ব্যাঙ্কে ফিরে এসে, আমার ঘোরতর সন্দেহ হল যে, তপনের একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

না—চেহারায় কিছুই বদলায় নি। সেই চোঙামার্কা প্যান্ট, সেই সরু গোঁফ, সেই খাড়া খাড়া চুল। হৃদয়ঘটিতও কিছু নয়, মানে প্রেমে পড়েছে কিংবা বিয়ের কথা চলেছে এ-রকমও মনে হল না। তা হলে তো বেশ ভাবুকের মতো দেখাত, উদাসভাবে চেয়ে-টেয়েও থাকত, ক্যাব্‌লা-ক্যাব্‌লা হয়ে যেত। আমি স্পষ্ট দেখলুম, চোখে সেই ধূর্ততা, মুখে সেই মিটিমিটে গা-জ্বালানো হাসি। প্রেমে পড়লে কিংবা বিয়ের ব্যাপার হলে ওরকম ধড়ীবাজের মতো দেখায় না কাউকে।

বরং আমাকে এসে, সম্ভাষণ করে বললে, 'তুমি যে-রকম মোটা হচ্ছ সু-সু-সুক—'

বললুম, 'আমি মোটেই শুশুক নই—আমার নাম সুকুমার।'

'না—সু-সু-সুকুমার নয় বরং সু-কু-কুমড়ো বলা যায়। নইলে একটা হিপ-হিপ—'

আমি বললুম, 'হিপ্-হিপ্—হুর্‌র্‌্যা!'

সরু গোঁফের নীচে তপনের মিচকে হাসি আরো ধূর্ত হয়ে উঠল 'না-না, হুর্‌র্‌্যা নয়। হিপ্-হিপ্-পটে'—

'পট্যাটো?'

'তার চেয়েও খারাপ। হিপ্-হিপো-পটেমাস!'

'বটে, আমি জলহস্তী?'—চটে গিয়ে বললুম, 'তিন সপ্তাহ পরে ফিরেছি, কোথায় কুশল-টুশল নেবে, তার বদলে জলহস্তী বলা হল আমাকে? আর তুমি কী? তোমার নাম পোকা দা নয়?'

পোকাদা—এই নামটা শুনলেই নার্ভাস হয়ে যায় তপন। হাড়-জ্বালানো হাসিটা বন্ধ হল তক্ষুনি।

'ডোন্ট সে পোকাদা। ওটা আমার নাম নয়, ব-বদনাম। ছে-ছে-ছেলেবেলায় একটা পোকা ধরে খেয়েছিলুম, তারপর থেকে—'

'নিশ্চয় বেশ বড়ো সাইজের, কালো—'ভোঁ-ভোঁ শব্দে উল্টে-পড়া একটা গুব্‌রে পোকা ধরে খেয়েছিলে। তোমার মতো বাজে লোক এর চাইতে বেটার পোকা খেতেই পারে না।'

রেগে তপন আরো তোতলা হয়ে গেল।

'আর তু-তু-তুমি? নিশ্চয়—ক-ক্-কোলা ব্যাঙ্ খেয়েছিলে একটা। তাই হি-হি-হি-হিপ্—

মরুক্‌গে—এইরকম মো-মো-মো-মোটা হয়ে যাচ্ছ। শেষে একদিন ফ-ফ-ফটাশ করে ফেটে যাবে।'

বলে—গোঁ গোঁ করতে করতে নিজের কাউন্টারে চলে গেল।

—এ-জাতীয় সদালাপ আমাদের সর্বদাই হয়ে থাকে, এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু সন্ধের পরেও যখন তখন তপন আমার বাসায় এল না, তখন আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে থাকল। এ-রকম তো হওয়ার কথা নয়। আমি বাসায় থাকব—অথচ তপন আসবে না—এসে আমার পুরো এক প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে যাবে না, দু'ঘণ্টা বক বক করে আমার মাথা ধরিয়ে দেবে না, এমন অঘটন ঘটতেই পারে না।

সাড়ে আটটা বাজল—তবু পাত্তা নেই। সিনেমা দেখতে গেল? তা-ও অসম্ভব, কারণ আমি এখানে থাকলে নিজের পয়সায় সিনেমা দেখবে এমন পাত্রই সে নয়। আর কাউকে ম্যানেজ করছে? তা-ও হতে পারে না—আমার এমন মোটা ঘাড় থাকতে আর কারো স্কন্ধারূঢ় হবে সে, আর কেউ ঘাড় পেতে দেবে তার জন্যে—দ্বিতীয় কোনো এহেন নির্বোধ ব্যক্তি এই ধুরন্ধর শহরে আছে বলে জানা নেই আমার। তা ছাড়া—ইংরিজি, বাংলা, যে-কোনো সিনেমাই হোক—ছবি আরম্ভ হতে না হতেই—তপন কানের কাছে সমানে ফিসফিস করে, সম্পূর্ণ অযাচিতভাবেই গল্পটার ব্যাখ্যা করতে থাকে। আমি—অদূরের হিমালয়ের মতোই অনন্ত ধৈর্যে তা সহ্য করে যাই, আর কেউ হলে থাপ্পড় মেরে পাশ থেকে উঠিয়ে দেবে তপনকে।

না—এসব নয়, ব্যাপার আরো সিরিয়স। শেক্‌স্পীয়ারের ভাষায় ডেনমার্ক রাজ্যে একটা গোলমাল আছে কোথাও!

বসে বসে তপনের প্রতীক্ষায় 'হবসন-জবসন' করবার কোনো মানে হয় না—একবার নিজেকেই যেতে হচ্ছে তা হলে। মহম্মদ যদি পর্বতের (তপনের মতে আমি ক্রমে গিরিগোবর্ধন হয়ে উঠেছি—যদিচ আমার লেটেস্ট ওজন দু'মণের বেশি নয়) কাছে না আসেন, তা হলে পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হয়। অগত্যা কাতরভাবে বেরিয়ে পড়তে হল আমাকেই।

হুঁ—বাড়িতেই আছে। নইলে, আধখোলা একটা জানলার খড়খড়ি দিয়ে আলো দেখা যেত না। কারণ, পৈতৃক বাড়ি আপাতত তপনের একলারই অধিকারে—তার মা-বাবা বছরখানেক ধরে শিলিগুড়িতে রয়েছেন বড়ো ছেলের কাছে। আর তপনের মেজদা পাকাপাকি দিল্লীর বাসিন্দা।

কিন্তু বৈশাখের এমন মনোহর সন্ধ্যায়—যখন চারিদিকে এ-রকম উতরোল হাওয়া এবং সামনের আমবাগানের অসংখ্য চিড়চিড়ে পোকা সেই হাওয়ায় উড়ন্ত—তখন সে হাওয়া এবং পোকাকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে এভাবে পোকাদার জানলা বন্ধ করে রাখবার মানে কী? সন্দেহজনক—ঘোর সন্দেহজনক। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তপন ক্রিমিন্যাল হয়ে গেল নাকি? রোজগার বাড়াবার জন্যে বোমা তৈরির কটেজ ইনডাস্ট্রিতে মন দেয় নি তো? কিংবা নোট জালই করছে হয় তো? যে লোকের এমন বদ্‌খৎ চোঙা প্যান্ট এবং যে অমন বাজে রকমের তোতলা—তার অসাধ্য কিছুই নেই বলেই আমার ধারণা। নইলে বনমুরগী মারতে গিয়ে পোষা মুরগী মেরে দেয়, মাছধোয়া জল দিয়ে পায়েস রেঁধে খাওয়াতে চায় এবং 'অয়েল মাস্‌ক্' পরে, একটা ভয়ঙ্কর মোটরগাড়ি কিনে নিজের এবং বন্ধুর প্রাণনাশের চেষ্টা করে, মিসেস ঘোষালকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ঘোলের হাঁড়ির মতো উলটে দেয় তাঁকে?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলুম—পুলিসে খবর দেব নাকি? বোমা কিংবা জাল

নোটসুদ্ধু ধরেই নিয়ে যাক ওকে। কিন্তু আমার মোটা শরীরের ভেতরে একটা রোগা-পট্‌কা বিবেক হঠাৎ চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে উঠল। আহা, হাজার হোক—বন্ধু তো। এক সঙ্গে কলেজেও তো পড়েছিলে। অন্তত একটা চান্‌স দাও ওকে।

অতএব, একটা চান্‌স্‌ই দেয়া যাক। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ডাকলুম 'তপন!'

সেকেন্ড তিনেক চুপ। কানের কাছে চৈত্রের হাওয়া, কিছু পোকা এবং ক'টা মশা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। তারপর আচমকা—আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে ভেতর থেকে একেবারে সেন্ট্রিমার্কা চ্যালেঞ্জ 'হু কাম্‌স দেয়ার?'

হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। নিঃসন্দেহেই তপন। কিন্তু হঠাৎ এরকম সম্ভাষণের মানে কী?

সামলে নিয়ে বললুম, 'ফ্রেন্ড।'

ভেতর থেকে আবার চড়া গলায় জিজ্ঞাসা 'হোয়াট্ ফ্রেন্ড?'

এ তো আচ্ছা ফ্যাচাঙে ফেলল। হোয়াট্ ফ্রেন্ডের মানে কী? এতক্ষণে সন্দেহের ওপর কিঞ্চিৎ আলো পড়ল আমার। নিশ্চয় গাঁজা খাচ্ছে দরজা-জানালা বন্ধ করে। গাঁজায় দম না দিলে হতেই পারে না এরকম। আমি মাথা চুলকে বললুম, 'এ ফ্রেন্ড ইন নীড।'

'হোয়াট?'

গাঁজাখোরের নিকুচি করেছে! গর্জন করে বললুম, 'ব্লুজম ফ্রেন্ড! হল এবার? দরজা খোলো বলছি। আমাকে সমানে মশায় কামড়াচ্ছে—আর ইয়ার্কি হচ্ছে ঘরে বসে?'

এতক্ষণে ভেতর থেকে খিকখিক করে মিচকে-মার্কা হাসিটা শুনতে পাওয়া গেল।

'বুঝেছি। সু-সু-শুক্—'

'শুশুক নই, সুকুমার।'

'হিপ হিপ—'

'হুররা।' এবার আমি আরো জোরে গর্জন ক'রে বললুম, 'লুক হিয়ার পোকাদা, যদি এক মিনিটের মধ্যে দরজা না খোলো, আমি পুলিসে খবর দেব।'

খুট করে ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ এল একটা। তারপর তপন বললে, 'সরি গলা চিনতে পারিনি। দরজা ভেজানোই আছে—ঠে-ঠেলে ঢুকে পড়ো।'

গলা চিনতে পারেনি—চালিয়াতির জায়গা পায়নি আর! অতি বিখ্যাত আমার গলার আওয়াজ—এক এবং অদ্বিতীয়—সেই গলায় একবার সঙ্গীত প্রচেষ্টা শুনে আমার এক রসিক আত্মীয় পালটা দু'লাইন গান শুনিয়েছিলেন আমায় 'তোমার কণ্ঠস্বরে, কোকিলের পুচ্ছ ঝরে!' সেই গলা চিনতে পারল না। ধড়ীবাজ আর কাকে বলে!

একটা ঘোর জিঘাংসা নিয়ে আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গেলুম, এবং তৎক্ষণাৎ—

এবং তৎক্ষণাৎ—কোনো রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্পের মতো আমাকে অভিষিক্ত করে দিয়ে—কোন্ শূন্য থেকে ছড়ছড় করে একরাশ জল! আমি লাফিয়ে উঠলুম, তারপরেই পায়ের তলায় মেজেতে একটা দারুণ গতিশীলতা অনুভব করা গেল এবং দু মণ শরীরে ভূমিকম্প জাগিয়ে সবেগে ধরাশায়ী হতে হল আমাকে। আর কানে এল তপনের খিক-খিক হাসি 'এক্‌স-এক্‌স্ পে-পে—মরুকগে সা-সাক্‌সেস্ ফুল!'

সব ব্যাপারটা সামলে নিয়ে ধাতস্থ হতে প্রায় মিনিট দশেক সময় গেল আমার। তপন

আমার ভিজে জামাটা খুলে নিয়েছে, আমার এই জগদ্দল বপুকে—কী মন্ত্রে জানি না—তুলে একটা চেয়ারেও বসিয়ে দিয়েছে।

মাথার ওপর বন বন করে পাখা ঘুরছিল, তাতেই আমার কানের ভোঁ ভোঁ শান্ত হল একটুখানি। এবং চোখ খুলেই দেখলুম সামনে তপনের শ্রীমুখ। এবার আর মিচকে হাসি নয়—পরম পুলকে বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে রয়েছে তার।

আর সেই বিকশিত হাসি দিয়েই আমাকে অভ্যর্থনা করল সে।

'এক্স্-এক্স্পে-পেরিমেন্ট সা-সা-সাকসেসফুল।'

'কিসের একস্পেরিমেন্ট?'—সেই দুর্ধর্ষ আছাড় খেয়ে কোমর টনটন করছিল, তাই তখনো আমি নিদারুণ ক্রুদ্ধ হতে পারলুম না 'আমাকে মার্ডার করবার?'

'না। চো-চো—'

'চোপরাও।'

'চো-চোর ধরবার।'

'আমি চোর?'—কোমরের ব্যথাটা অত জাঁদরেল না হলে আমি লাফিয়ে উঠে তপনের টুঁটি চেপে ধরতুম।

'টে-টেক ইট ইজি সুকুমার—' এক্স্পেরিমেন্টের আনন্দে এবার আর শুশুক বলল না—বরং বেশ আদর করেই আমার কাঁধে হাত রাখল "কফি খাবে এক পেয়ালা? তা হলে তৈ-তৈ-তৈ—'

'হ্যাং ইয়োর কফি!'—আমি জিঘাংসু চোখে ওর দিকে তাকালুম 'কিসের আনন্দে তুমি তা-তা-থৈ-থৈ করছ হে? কে চোর? কোথায় চোর? নরহত্যা করবার এইরকম বিটকেল প্ল্যানের মানে কী?'

'তা হলে সব খু-খুলে বলছি—' আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে তপন বলল, 'চারদিকে তা-তাকিয়ে দ্যাখো একবার।'

দেখলুম এবং সমস্ত রাগ ভুলে গিয়ে প্রথমে বিহ্বল, তারপরে বিমূঢ়, তারও পরে স্তম্ভিত হলুম আমি।

যে দরজায় পা দিয়েই আমার অপঘাত, তার মাথার ওপরে দড়ি-বাঁধা একটা বিরাট ঘটি উপুড় হয়ে আছে, সেইটেই আমার সর্বাঙ্গ শীতল জলে অভিষিক্ত করিয়ে দিয়েছিল; দরজার সামনে একরাশ—না কলা নয়, কলার খোসা (কলাগুলো অবধাতিরভাবেই তপন খেয়েছে, —তাতে পা দিয়েই আমি ধরাশায়ী হয়েছিলুম। ছিটকিনির সঙ্গে আবার এক জোড়া চামচে ঝুলছে। ঘরের তিনটে বন্ধ জানালার নীচে কতগুলো মেটে হাঁড়ি উপুড় করা—তাদের পাশে আবার সেই কলার খোসা। এই জানলাগুলোতেও দড়িবাঁধা কতগুলো কাঁটা চামচে ঝোলানো হয়েছে। আর একটা জানলার মাথায় জালিকাটা একটা থলের মতো কী যেন লেপটেও রয়েছে। তপনের বিছানার ওপরে আবার একটা এয়ার-গানও দেখতে পেলুম আমি।

কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে এইসব দেখে আমি বললুম 'লুম্বিনি'।

'লু-লু-লুম—মরুগ গে—মানে কী ওর?'

'সরল বাংলা ভাষায় পাগলা গারদ। কিন্তু তোমাকে বেঁধে রাখবার কেউ নেই এখানে?'

'ঠা-ঠাট্টা নয় সুকুমার। লে-লে-লেট কী এক্সপ্লে-প্লে-'

অতঃপর তপনের সেই ভাষ্য। সেই তোতলামির কণ্টাকারণ্য আর বিস্তার করতে চাই না—মোটামুটি ব্যাপারটা এই

শহরে দিন পনেরো ধরে ছিঁচকে চোরের অত্যন্ত উপদ্রব বেড়েছে। এর বাক্স, তার জামাকাপড়, অমুকের বাসন নিদেনপক্ষে তমুকের গাড়ু—যা পাচ্ছে তাই লোপাট। এদিকে তপন একেবারে বাড়িতে একা। তার ওপর কী বলে ইয়ে—তার ঘুমটাও একটু নিবিড়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এইসব প্রোটেকশ্যান নিতে হয়েছে। সন্ধ্যের পরে দরজা-জানলা এইভাবে সে রেডি করে রাখে। তাই আর বেরুনো হয় না বাড়ি থেকে।

অর্থাৎ—চোর যদি ছিটকিনি কেটে ঢুকতে চায়—চামচেগুলোতে সংঘাত লেগে প্রথমে টিনটিন করে ওয়ার্নিং বাজবে; তারপর দরজা যদি খুলেই ফেলে—ওপরে ঝুলছে এক ঘটি জল—তপনের আবিষ্কৃত অটোম্যাটিক সিসটেমে সেটা উল্‌টে গিয়ে জল ঢালবে চোরের মাথায়; চোর হকচকিয়ে গেলেই কলার খোসা—শিয়োর সাক্‌সেস—আমিই তার প্রমাণ।

এই পর্যন্ত বলেই তপন—আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্বালা ধরিয়ে সেই মিচকে-মার্কা হাসি হেসে বললে, 'আমি ঠিক বুঝেছিলুম—তোমার ওখানে যদি সন্ধ্যেবেলা না যাই, তুমিই ঠিক চলে আসবে। এবং তারপর—'

তারপরই বটে।

আমি ঘোর রবে বললুম, 'ইডিয়ট'।

'ইডিয়ট? সা-সা-সায়েন্টিফিক ব্রেন।'

'সায়েন্টিফিক ব্রেন! তা হলে একবার আই-এসসি ফেল করেছিলে কেন?'

'ফরগেট দ্যাট। এখন তুমি জা-জা-জানলাগুলো—'

'কোমরের ব্যথা ভুলে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম 'চুলোয় যাক তোমার জানলা। আমি বাসায় চললুম। আই টেল ইউ পোকাদা, তুমি সবচেয়ে বাজে পোকা খেয়েছিলে, একটা ম্যাগনাম গুব্‌রে পোকা। জীবনে আমি যদি আর কখনো তোমার মুখদর্শন করি তো—'

'আহা—চ-চটে যাচ্ছ কেন?'—তপন আবার আমাকে চেপে বসিয়ে দিলে চেয়ারে 'এবার জা-জানলাগুলো। লেট মী—এ-এ-এক্‌স্—'

আবার সেই তোতলামির কাঁটাবন। তা থেকে জানা গেল জানলাতেও একই সিস্টেম—ছিটকিনি খুললেই কাঁটা-চামচের ওয়ার্নিং। তবু চোর ঢুকে পড়লে হুড়মুড় করে মেটে হাঁড়ি ভাঙবার আওয়াজ—কী বলে, তপনের ঘুম—মানে যা একটু প্রগাঢ়—সেটা তো তাতে ভাঙবেই, পাড়ার লোকেরও লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর কলার খোসা তো আছেই। শিয়োর সাকসেস।

আমি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললুম, 'কাঁকে। তোমার যথাস্থান।'

'নো কাঁকে।'—তপন ব্যাজার হয়ে বললে, 'আমি কাঁকে দেখেছি। এ ভে-ভেরী ব্যাড প্লেস। সেখানে যাবার কোনো দ-দ-দরকার নেই আমার। নাউ—হ্যা-হ্যাভ ইয়ু সীন দিস এয়ারগান?'

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে এবার আমাকে একটু কৌতূহলী বোধ করতে হল।

'এয়ার গানের কর্ক দিয়ে চোর মারবে নাকি?'

'নো-নো—আমি কি গাধা?'

'গাধা তোমার চেয়ে অনেক রেস্‌পেকটেবল। গাধাকে অপমান করবার কোনো রাইট নেই তোমার। তুমি একটি ম্যাগনাম গুব্‌রে পোকা।

'শা-শা-শাট-আপ! আচ্ছা—ওইদিকে—ওই জা-জা-জানলার মাথায় গোল খোপখোপ ওটা দেখতে পাচ্ছ কি?'

'হুঁ—দেখছি। কী ওটা? থলে নাকি? গাঁজার কলকে-টলকে ওতেই রাখো বোধ হয়?'

'নট থ-থলে স্যার—নো গাঁজা-বিজনেস্—ওটা যাকে বলে—নো-নেচারস গিফট। প-প-প্র—'

'আর কষ্ট করতে হবে না—' আমি বিদ্রূপ করে বললুম 'প্রকৃতির অবদান।'

'কারেকট। প-পর-পর—মরুক গে অবদান। কী ওটা জানো? বো-বোলতার চাক।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। আমি তো অফিস করি—আড্ডা ফা-ফা দিয়ে বেড়াই, খে-খে-খেয়ালই করিনি। বাড়ি ফিরেই কু-কুকার খুলে আহার এবং ঘু-ঘুম। (আমি ব্র্যাকেটে বললুম, 'তুমি একটি ঘুঘু।') ওই জা-জানলাটা কোণের দিকে বলে খো-খোলাই হয় না। একদিন বো-বো-বোলতার ডাক শুনে দেখি—ওখানে ইয়া বড়া এক চাক বানিয়েছি। ভে-ভেঙে ফেলব ভাবছি, এমন সময় 'চো-চোরের হাঙ্গামা'। তখন ভাবলুম—শা-শা—'

'গালগাল দিচ্ছ নাকি হে?'

'না-না-শা-শাপে বর। ত-তবু যদি চো-চোর ঢুকেই যায়—দ-দম করে এয়ারগানের এক গু-গুলি চালাব চাকে। ব্যাস—বোঁ-বোঁ করে বেরিয়ে চো-চোরকে একেবারে—'

'আর তোমাকে ছেড়ে দেবে বোধহয়? খাতির আছে বুঝি?'

তপনের সরু গোঁফের নীচে আবার একটুখানি উদ্ভাসিত হাসি ফুটে বেরুল 'আমি কি অতই বো-বোকা নাকি? রা-রাত্তিরে পায়ের কাছে একটা মোটা কম্-কম্—'

'কমবখ্ত!'

'মানে কী?'

'মানে হতচ্ছাড়া। হয় লুম্বিনী, নয় কাঁকে।'

'নো-নট—লুম-লুম-নট কাঁকে। ভে-ভেরী ব্যাড প্লেসেস। আমি একটা মোটা কম-কম-কম্বল মুড়ি দিয়ে—'

'চুলোয় যাও।'

তপনের সব ক'টি দাঁত আবার বিকশিত হল চ-চটে যাচ্ছে কেন? এ-এ-এক্স্—মরুক গে—মানে সা—সা-সা-সাক্সেসফুল। তুমিই প্র-প্র—'

'প্র-পরা-অপ—'

'নো স্যাং—স্যাং—স্যাংক্রীট গ্রা-গ্রামার। তুমিই প্র-প্রমাণ করে দিয়েছ। আমি ভে-ভেরী হ্যাপী।'

কী করব, ব্রহ্মতেজ নেই, নইলে রাস্কেলকে আমি ভস্মীভূত করে ফেলতুম। কিছুক্ষণ অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললুম, 'আমি আছাড় খেয়েছি বলে তুমি খুব হ্যাপী—না?'

'অ-অফকোর্স'—চোখ দুটো ধূর্ততায় মিটমিট মরতে লাগল তপনের 'একেবারে ধ-ধড়াম্ করে কো-কোলা ব্যাঙের মতো—র‍্যাদার—হা-হাতির বাচ্চার মতো প-পড়ে গেলে! লা-লাভলি! ক্যামেরাটা থাকলে ছ-ছবি তুলে নিতুম। কোথায় লাগে 'ল-ল-লরেল হার্ডি!'—খুশিতে তপন যেন গুলগুল করতে লাগল 'আই সে—হিপ-হিপ-পটেটো-ট-টমাস—একটা জা-জানলাও

একটু ট্-ট্-ট্রাই করবে?'

খুব হয়েছে—আর নয়। উঠের পিঠে শেষ খড় কাকে বলে! কোমরের ব্যথা নিদারুণ জিঘাংসায় বিলীন হয়ে গেল আমার।

লাফিয়ে উঠে—এয়ার-গানটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললুম, 'তোমার মতো ট্রেটর বন্ধুকে আমি খুন করব—'এই এয়ারগান দিয়েই গুলি করব!'

'আ-হা-হা—পী-পী—প্লীজ—শু-শু-শুক—'

এয়ার-গানটা কেড়ে নিতে চাইল। এবং—এবং দ্রাম!

টানাটানিতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। কর্ক গিয়ে লাগল সোজা বোলতার চাকে। তীরবেগে বেরিয়ে এল হলুদ বর্ণের ডোরা-কাটা প্রাণী—ঘরের জোরালো ইলেকট্রিক আলোয় দিবালোকের মতোই দেখতে পাচ্ছে আমাদের। শত্রু পরিষ্কার তাদের সামনে।

'আমার ঝকঝক—'

কিন্তু কোথায় কম্বল? হাতের কাছে সে কম্‌বখ্‌ত তখন রেডি ছিল না। দরকারের সময় কবেই বা থাকে?'

আমার আগে তপনই দরজার দিকে দৌড় মারল। এবং তারই কলার খোসা। তারা এবারেও চোরকে চিৎ করল, অর্থাৎ তপন নিজে পড়ল, আমাকে আর একবার তার সংঘাতে ভূপাতিত করল। সেই শিয়োর সাকসেস—নির্ঘাৎ!

কিন্তু ঘরে ভরে তখন জেট-প্লেনের মতো আওয়াজ। যৌথ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যৌথ উত্থান—একেবারে বিদ্যুদ্বেগে। তারপর আমবাগানেরর মধ্য দিয়ে টেনে দৌড়।

'চ-চলো সু-সু-সুকুমার, তোমার বা-সাতেই রাতটা কা-কা—'

হাঁপানির মধ্যে কা-কা ধ্বনি হারিয়ে গেল তার।

কিন্তু দরজা যে খোলা রইল—যদি চোর ঢুকে—এই ফাঁকে—'

'যা-যা-যাকগে। চু-চুলোয় যাক চো—চো—'

বলতে বলতে চোঁ-চোঁ শব্দে—লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে—আমাকে ছাড়িয়ে ক্লীন পঞ্চাশ গজ বেরিয়ে গেল।

পিক পয়েন্ট

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ছোট গল্প প্রসঙ্গে এক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লেখকের মন্তব্য মনে পড়ল। তিনি বলতেন বীজ হিসেবে যে কোনো একটা সত্যি ঘটনা নাও। তার আসল রং কিছু বাতিল করে কিছু নকল রং চড়াও। ঘটনার কিছুটা ব্যক্ত করো কিছুটা অনুক্ত রাখো। যে-টুকু অনুক্ত রাখলে পাঠক সেটুকু ধরার জন্য যেন হাঁসফাঁস করে। সেটাই ছোট গল্পের পিক্ পয়েন্ট।

আজ নিজের অভিজ্ঞতায় সবিনয়ে আমি তাঁকে বলতে পারি, নিছক সত্যও গল্পের থেকে অভিনব অনেক সময়। তার পিক্ পয়েন্ট আরোহণের জন্য নকল রং চড়ানো বা ঘটনার কিছু অনুক্ত রাখা নিষ্প্রয়োজন। ঘটনা যদি জীবনের হয় তো তার তাপটুকুই আসল লভ্য বস্তু।

এ-ক্ষেত্রে অবশ্য তাপ না বলে পরিতাপও বলা যেতে পারে।

ঘটনাটা শুনেছিলাম এক নামী অ্যাডভোকেট বন্ধুর মুখে। সে-ও কোনো রকম প্রস্তুতি নিয়ে শুনি নি। ছুটির দিনের বেশি বেলায় তার ফাঁকা দপ্তরে বসে গল্প করছিলাম। গেটের সামনে প্রকাণ্ড একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে থামল। যে ভদ্রলোক নামলেন ওই গাড়িতে তাঁকে অন্তত মানায় না। পায়ে চটি, পরনে মোটা তাঁতের ফরসা ধুতি, গায়ে আধ ময়লা সিল্কের ফতুয়া, মাথায় কদম ছাঁট চুল। দেখলে মনে হবে কোনো অবস্থাপন্ন ক্লায়েন্টের বয়স্ক এবং এককালের শৌখিন মুহুরী প্রয়োজনে মালিকের গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু অ্যাডভোকেট বন্ধুর মার্জিত ব্যস্ততা এবং অভ্যর্থনা দেখে মনে হল গাড়ির মালিক ইনিই হবেন। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বন্ধু দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো—আসুন বীরেশ্বরবাবু আসুন, এত বেলায় সশরীরে নিজে চলে এলেন, একটা টেলিফোন করলেই তো হতো! বসুন, বসুন—

অতএব আমিও ভালো করে লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোককে। বয়েস ষাটের কিছু নিচে হবে। উঁচু লম্বা সৌম্যকান্তি। কিন্তু বিষণ্ণ বদন।

ধীরে সুস্থে বসলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন একপলক। আমি বসে থাকব কি পাশের ঘরে উঠে যাব ঠিক করতে না পেরে বন্ধুর দিকে তাকালাম। বন্ধু সামান্য মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ওঠার দরকার নেই জানালো, তারপর ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল, আপনার সব কিছু রেডি—পার্টি সাড়ে চার লাখ টাকাই হোয়াইট দিতে রাজি হয়েছে—আজ রবিবার, সামনের বুধবার সব লেন-দেন হয়ে যাবে, আপনি সেদিন ঠিক এগারোটায় রেজেস্ট্রি অফিসে আসুন, আমি তার আগেই ক্লায়েন্ট নিয়ে উপস্থিত থাকব।

জবাবে ভদ্রলোক সামান্য মাথা নাড়লেন। বন্ধু ড্রাফ্ট এগ্রিমেন্টের ফাইলটা তাঁর সামনে

এগিয়ে দিলো। কিন্তু উনি সেটা স্পর্শও করলেন না। অন্যমনস্কের মতো দুই এক মিনিট বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন আস্তে আস্তে। একটু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, আচ্ছা চলি, বুধবারে ঠিক সময়ে দেখা হবে।

বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল তাঁকে।

আমার ভিতরটা উৎসুক হয়ে উঠেছে কারণ এই কালো বাজার আর কালো দিনেও ভদ্রলোক সাদা টাকা চান। সেও দু'দশ হাজার নয়, সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

বন্ধু ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

আর বলো কেন, জলের দরে একটা সোনার খনি বিকিয়ে গেল, টাকা থাকলে নিজেই কিনে নিতাম।

—খনিটা কি?

—বার অ্যান্ড রেস্তোরাঁ।

পান ভোজের যে জম-জমাট কেন্দ্রটির নাম শোনাল বন্ধু, বে-রসিক হলেও সেই নাম আমার অপরিচিত নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতে হাল ফ্যাশনের সেই সুরালয়ের সামনে সার বেঁধে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে দেখেছি।

—এই ভদ্রলোক তার মালিক?

—হ্যাঁ, বুধবার থেকে মালিকানা বদলে যাচ্ছে।—মাস গেলে ওর থেকে কম করে হাজার দশেক টাকা রোজগার ছিল ভদ্রলোকের!

—বেচে দিচ্ছেন কেন?

মুচকি হেসে বন্ধু জবাব দিলো, সেটাই গল্প।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গল্প হবে কিনা জানি না। ঘটনার অভিনব নজিরটুকুই শুধু তুলে ধরব।

—বীরেশ্বর গাঙ্গুলি অনেকটা নিজের চেষ্টা আর পুরুষকারের জোরে সামান্য থেকে বড় অবস্থার দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তার সূচনা করে গেছলেন তাঁর বাবা। মাঝ বয়সে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা গাঁজা আর তাড়ির দোকানের লাইসেন্স জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ভালো রকম সুখের মুখ দেখার আগেই তিনি চোখ বোজেন। বীরেশ্বর গাঙ্গুলি সে বছর আই-এসসি পাস করে বি-এস-সিতে ভর্তি হয়েছেন। লেখাপড়া সিকেয় তুলে দোকান চালানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান খোলা রেখে ব্যবসার মোড় ঘোরাবার উদ্যমে লেগে গেলেন। সে উদ্যম সফল হল। গাঁজা আর তাড়ির দোকানের রূপান্তর ঘটল বিলিতি আর দেশীয় অভিজাত সুরা বিপনীতে। সাদা কথা ভালো মদের দোকান করে বসল একটা। নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘুঁচে গিয়ে উঁচু মহলের সংস্রবে এলেন।

টাকা আসতে লাগল। নিজের বাড়ি হল, গাড়ি হল। কিন্তু ব্যবসার চোখ কান সটান খোলা তখনো। অবসর সময়ে নামকরা বারগুলোয় ঘোরাফেরা আবার নতুন রাস্তায় পাড়ি দেবার সঙ্কল্প আঁটলেন। বড় সড় একটা বার আর রেস্তোরাঁ জাঁকিয়ে তুলতে পারলে লাইসেন্স পেতে কতক্ষণ?

লাইসেন্স পেলেন। মধ্য কলকাতার এক জমজমাট জায়গাতেই হাল ফ্যাশানের পান ভোজনালয়ের পত্তন ঘটল। কমলা সুপ্রসন্ন। বছর তিনেকের মধ্যে আর মদের দোকান রাখার প্রয়োজন অনুভব করলেন না তিনি। মদের দোকান বেচে দিয়ে পান ভোজনালয়ের দিকেই লক্ষ্য স্থির করলেন।

কমলার বিত্ত বর্ষণ বাড়তেই থাকল।

মানুষটা ভেতরে ভেতরে ব্যাধ উপনিষদের ভক্ত ছিলেন হয়ত। নির্লিপ্ত চিত্তে মাংস কাটছেন, ভিতরে ঋষিটি আত্মার বাণীতে সমাহিত। বীরেশ্বর গাঙ্গুলিও কর্মযোগে সেই গোছের একাগ্র, কিন্তু নির্লিপ্ত। এ যাবৎ সুরা বস্তুটি কখনো ঠোঁটে ঠেকিয়ে দেখেন নি কি রকম খেতে। কর্মযোগের ফলটুকু শুধু ব্যাঙ্কে জমা করেছেন আর বিষয়ে রূপান্তরিত করে চলেছেন।

বিয়ে করেছেন তিরিশ বছর বয়সে। সুরা বিপনী থেকে সুরালয়ে পা বাড়াবার আগে। শিক্ষিতা মেয়ের প্রতি একটু ঝোঁক ছিল। বিয়ে আগেই হতে পারত। কিন্তু তাঁর বিত্তের উৎস জানার পর গোটা কয়েক পছন্দসই শিক্ষিতা মেয়ের বাপ সরে গেছেন। কিন্তু টাকা থাকলে শিক্ষিতা মেয়ে জুটবেই না এমন কোন কথা নেই। সুনয়নীর বিয়ে দিয়েছেন তাঁর মামারা। ভাগ্নি সে বছর ইকনমিক্স-এ ভালো অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করেছেন। মেয়েও সুশ্রীই। কিন্তু বিয়ের বাজারে অনার্স আর শ্রী'র জোরটুকুই যে সব নয় সে অভিজ্ঞতা মামাদের হয়েছে। মামারা বীরেশ্বর গাঙ্গুলির বিত্ত আর বিষয় দেখেছেন, মোটামুটি খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন স্বভাব-চরিত্রের অপবাদ নেই—তারপর খুশি মনে নিখরচায় ভাগ্নির বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সুনয়নী দেবী গোড়ায় গোড়ায় বেশ সন্দেহের চোখে দেখেছেন স্বামীটিকে। সন্দেহ নিরসনের পরেও স্বামীর পেশাটিকে সুনজরে দেখেন নি। বিয়ের পরেও পড়াশোনা ছাড়েন নি তিনি। যথা সময়ে এম-এ পাসও ভালোভাবেই করেছেন। তার আগে মাসে সাড়ে তিন শ' টাকা মাইনে দিয়ে তাঁকে বাড়িতে পড়ানোর জন্য প্রফেসর রেখে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। তার জন্য কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন নেই। টাকা আছে বলেই দায়িত্ব পালন করা হয়েছে—এর বেশি কিছু নয়।

'যতই টাকা থাক, ঘরে ভালো খেয়ে দেয়ে আর আরামে ঘুমিয়ে মুটিয়ে যেতে আপত্তি সুনয়নী দেবীর। অতএব কলেজের চাকরিতে ঢুকেছিলেন তিনি। এখন তিনি রাশভারি অধ্যাপিকা সেই কলেজের। নিজের বিশাল গাড়িতে যাতায়াত করেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর সহ-অধ্যাপিকারা ঈর্ষার চোখে দেখেন তাঁকে। কিন্তু সুনয়নী দেবীর ধারণা, আড়ালে তাঁরা বিত্তের উৎস নিয়ে অর্থাৎ স্বামীর সুরালয়ের ব্যবসা নিয়ে আড়ালে আবডালে টীকা-টীপ্পনী কেটে থাকেন।

বীরেশ্বর গাঙ্গুলি লক্ষ্য করেছেন, স্ত্রীটির তাঁর টাকা বাড়ি গাড়ি সবই পছন্দ—শুধু ওই ব্যবসাটি ছাড়া। ব্যবসা সম্পর্কে স্ত্রী শুধু নিরুৎসক নয়, ভেতরে ভেতরে বীতস্পৃহ বলেই ধারণা তাঁর।

পর পর তিনটি মেয়ে তাঁর। ছেলে নেই। বড় মেয়ে অমিতা এম-এ পড়ে। মেজো সুমিতা বি-এ পড়ে। আর ছোট মেয়ে নমিতা এবারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। মেজো আর ছোট মেয়ের মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না, বড় মেয়ে অমিতারও যে বাপের ব্যবসাটি খুব পছন্দ নয়, বীরেশ্বর গাঙ্গুলি সেটুকু অনুভব করতে পারেন! অথচ মেয়ে তিনটে তাঁর যেন বুকের হাড় তিনখানা। একটা ছেলের বাসনা ছিল। সেটা টের পেয়ে স্ত্রী নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন, ছেলে নেই ভালোই হয়েছে! বড়ো হয়ে সে তো তোমারই ওই ব্যবসাই দেখত, স্বভাব-চরিত্র মতি-গতি কেমন হতো কে জানে—সুখের থেকে সোয়াস্তি ভালো।

শুনে বীরেশ্বর গাঙ্গুলি মনে মনে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা ব্যক্ত করেন নি।

প্রচ্ছন্ন আঘাত আরো পেয়েছেন। বড় মেয়ে অমিতার একটা ছেলের সঙ্গে গোপনে মেলা-মেশা ধরা পড়েছে। সুনয়নী একাধিক দিন নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর মাথায় আগুন জ্বলছে। মেয়েরা বিষম ভয় করে তাদের রাশভারী মা-টিকে। অমিতা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা

করেছে, ছেলেটা খুব ভালো ছেলে—গেল বারে খুব ভালো ভাবে এম-এ পাস করেছে। বলেছে, এর মধ্যে তো ইয়ে কিছু নেই—

কিন্তু কার কথা কে শোনে। মেয়েকে আচ্ছা করে ধমকেছেন সুনয়নী দেবী। অভিমানে মেয়ে নিজের কানে হাত দিয়ে বলেছে, ওই ছেলের সঙ্গে আর মিশবে না, মা নিশ্চিন্ত থাকুক। মা তাতেও ঠাণ্ডা হতে পারেন নি। নির্বিলিক স্বামীটিকে দু'কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, কোন লোকের মেয়ে দেখতে হবে তো, এরকম মতি-গতি হবে সে আর বেশি কি।

অভিযোগ শুনে ভদ্রলোক বিমূঢ়।

এরপর ঘটনাটা ঘটল বড় মেয়ে অমিতার বিয়ের সমস্যা নিয়েই। সুনয়নী মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর তিনি ঘরে মেয়ে পুষতে রাজি নন। তাঁর গুরু গম্ভীর তাগিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখলেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। তাঁর দ্বারা যেটুকু সম্ভব তাই করলেন। সমস্ত বড় কাগজে বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষায় লোভনীয় কিছু চটক ছিল। যার ফলে গাদা গাদা চিঠি আসতে লাগল। এত চিঠি থেকে বাছাই বাছাই করে সম্ভাব্য পাত্র বের করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবু ঠাণ্ডা মাথায় সেই কাজটি করলেন সুনয়নী দেবী। কার ওপর নির্ভর করবেন?

এই ছাঁটাই বাছাই বীরেশ্বর গাঙ্গুলির খুব মনঃপূত হল না। কারণ স্ত্রীটি ব্যবসায়ী ছেলে মাত্রই বাতিল করে দিলেন। সব কটাই চাকুরে ছেলে বাছাই করলেন তিনি। বড় চাকুরে অবশ্য, কেউ আই-পি-এস। কিন্তু চাকুরে পাত্রের ওপর খুব একটা মোহ নেই বীরেশ্বর গাঙ্গুলির। যত বড়ই চাকরি হোক, কত আর মাইনে?

এর মধ্যে একটা ছেলে তবু মন্দের ভালো। বিলেত-ফেরত এনজিনিয়ার হাজার দুই টাকার মাইনের চাকরি। লিখেছে আনুকূল্য পেলে স্বাধীন ব্যবসা করার ইচ্ছে। সুনয়নী দেবীর এইটুকুই খারাপ লেগেছে। আর বীরেশ্বর গাঙ্গুলির এইটুকুই ভালো লেগেছে। তিনি ভাবছেন, এখানে বিয়ে হলে পরে না হয় লাখ দু'লাখ দিয়ে জামাইকে ব্যবসায় নামিয়ে দেবেন।

বরাত জোরে এই ছেলেটিকেই পছন্দ হয়ে গেল সবকটির মধ্যে। যেমন স্মার্ট তেমনি সুপুরুষ। বিলেতে বছর চারেক কাটিয়ে এসেছে। সেখানেও মোটা মাইনের চাকরি করত। তাই এখানকার চাকরিতে মন ওঠে নি।

মেয়ে দেখাদেখি এবং কথাবার্তা এগোতে থাকল। লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয়ে আসতে লাগল। ছেলেটার চেহারা আচরণ কথাবার্তা যত ভাবছেন তত বেশি ভালো লাগছে সুনয়নী দেবীর। যেটুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে তাও ভালোই। লোকে জামাই দেখে প্রশংসা করবে। না তাঁর আপত্তি নেই। খবর পেয়েছেন, ছেলের পক্ষেই নাকি মেয়ের বাপের কি ব্যবসা শোনার পর খুঁত খুঁত করছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক ভেবেছে নী দেবী। যত ভালোই হোক, মদের দোকানের কোন মালিকের ছেলের সঙ্গে তিনি কি মেয়ের বিয়ে দিতেন? সেদিক থেকে ছেলে খুবই উদার বলতে হবে। ছেলে দু'কথায় তার বাবা মায়ের খুঁতখুঁতুনি নস্যাৎ করে দিয়েছে, ব্যবসা করেন বলেই যে ভদ্রলোক নিজেও মদ গেলেন তোমাদের কে বলেছে?

এ-পর্যায়ে আসার পর বীরেশ্বর গাঙ্গুলির চিন্তাস্রোত জটিল খাতে বইতে লাগল। মেয়েরা তাঁর চোখের মণি, বিশেষ করে বড় মেয়ে তো সব থেকে আদরের। চিন্তা ভাবনা স্বাভাবিক। ছেলেটা কেমন, তার ভেতরের চরিত্রই বা কি—তার কতটুকু জানতে পেরেছেন তিনি। এই এক ব্যবসায়ে নামার পর মানব চরিত্র বিশেষ করে তরুণ চরিত্রের ওঠা-পড়া তিনি যেমন দেখেছেন তেমন আর কে দেখেছে?

রোজ সন্ধ্যা হতে না হতে যারা তার বার-এ ভিড় করে আসে তাদের বেশির ভাগই তরুণ অর্থাৎ বাইশের থেকে পঁয়তিরিশের মধ্যে বয়েস। অনেক চেনা মুখ ভালো ছেলের অধঃপতন দেখেছে তাঁর এই দুটো চোখ। তখন তিনি নিস্পৃহ। কিন্তু এখন আর এতটা নিস্পৃহ হতে পারছেন না। এক একটি অতি শিক্ষিত ভদ্র ছেলের বার-এ এসে তরল বস্তু অঢেল জঠরে চালান করার পর যে মূর্তি ধরে তাও তিনি অতি নিস্পৃহ চোখে দেখে অভ্যস্ত তিনি! তাঁর বার-এ ভাবী জামাইয়ের মুখখানা কখনো দেখেছেন কিনা আঁতিপাঁতি করে মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। ঠিক মনে পড়ল না। কিন্তু ওই রকম স্মার্ট ছেলে হামেশাই আসে—এই মিলটুকুই তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে, চিন্তিত করে তুলেছে। দেখেছেন কখনো? দেখেন নি? দেখেছেন?

এই চিন্তাই ক্রমশ পেয়ে বসতে লাগল। জানা দরকার, খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার, যে দিনকাল, আর ছেলে ছোকরাদের যা মতিগতি—মেয়েটা শেষে চিরকাল চোখের জল ফেলবে?

এর ওপর কাগজে সেদিন আবার একটা খবর পড়ে দুশ্চিন্তা চতুর্গুণ পেয়ে বসল মাথায়। হিসেব করে দেখা গেছে আধুনিক কালের শতকরা সত্তরটি উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্ন ছেলে সুরাসক্ত। শতকরা সত্তর! না খুব অবিশ্বাস করেন না বীরেশ্বর গাঙ্গুলী। অসম্ভব নয়, তার ওখানেই তো লাইন করে খদ্দের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন এখন। ভিড় বাড়ছেই। শতকরা সত্তর জন হলে সুরাসক্ত নয় কে সেটা বাছাই শক্ত। ও-দিকে ভাবী জামাইটিও উচ্চশিক্ষিত, আর দু'হাজার টাকা মাইনে যখন অবস্থাপন্নও বটে। ওই ছেলেও ভেতরে ভেতরে কি, সেটা জানা যাচ্ছে কি করে? নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হবেন কি করে?

চিন্তায় চিন্তায় রাতে ঘুম গেল বীরেশ্বর গাঙ্গুলির।

ভেবে চিন্তে যাচাইয়ের একটা পথ বার করলেন তিনি। এতকাল ব্যবসা করার পর সুরাসক্তদের রীতিনীতি কিছুটা জানা আছে তাঁর। যে যার কাজের এলাকায় বার অথবা বাড়ির কাছাকাছি (খুব কাছাকাছি নয় তা বলে) বার-এ হানা দিয়ে থাকে। এবং যে যেখানে অভ্যস্ত সে সেখানেই গিয়ে থাকে।

অতএব পছন্দ মতো দুটো বার-এর নাম বাছাই করলেন তিনি। একটা ছেলের আপিস এলাকায় আর একটা তার বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে। দুটো বার-এ যদি দু'সপ্তাহে হানা দেন তিনি বিকেলের কয়েক ঘণ্টা করে তাহলেই বোঝা যাবে। সপ্তাহে দিন দুই অন্তত আসবে না এ-রকম পানা-সক্তের সংখ্যা বিরল। তাদের তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না।

প্রাণের অধিক আদরের মেয়ের জন্য এটুকু ধকল তাঁকে পোহাতেই হবে।

প্রথম ছেলের আপিস এলাকায় বার-এ ঘণ্টা আড়াই করে কাটালেন দিন ছয়েক। বিকেল ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। কোণের এক টেবিলে অল্প ড্রিংক আর কিছু খাবার নিয়ে বসেন। এমনিতে কে তাকে দু'আড়াই ঘণ্টা বসে থাকতে দেবে। সেখান থেকে শ্যেন দৃষ্টিতে খদ্দেরদের আসা যাওয়া লক্ষ্য করেন। শেষে শুধু খাবারটুকু খেয়ে এবং গেলাসের জলীয় পদার্থ হাত ধোয়ার বউলে ঢেলে দিয়ে উঠে আসেন।

আধা-আধির বেশি নিশ্চিন্ত। কিন্তু গোটাগুটি নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এর পর সন্ধ্যার দিকে দিন দু'য়েক ছেলের বাড়ির এলাকার বার-এ হানা দিলেন একইভাবে। তারপর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

তারপর অনেক দিন আরামে ঘুমালেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি।

তার পরদিন সন্ধ্যায় সেই অঘটন!

ভদ্রলোক সেদিন খুশি মনে তাঁর নিজের ব্যবসা দেখছেন। বাড়িতে কি ঘটে গেল খবরও রাখেন না। হঠাৎ বাড়ি থেকে টেলিফোন। স্ত্রীর গলা। যেমন গম্ভীর তেমনি ঠাণ্ডা—এক্ষুণি চলে এসো।

—কেন? কেন?

—এসে শুনো।

রিসিভার রাখার শব্দ। বীরেশ্বর গাঙ্গুলি অবাক। তারপরেই গাড়ি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির দিকে ছুটলেন।

কঠিন মুখেই সুনয়নী দেবী তাঁর প্রতিক্ষায় ছিলেন।

পাত্র এবং পাত্রী উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগ আছে এমন এক ভদ্রলোক মাঝখানে থেকে বিয়েটা পাকাপাকির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। খানিক আগে এসে বীরস বদনে তিনি সুনয়নী দেবীকে জানিয়েছেন, পাত্র পক্ষ আজ তাকে ডেকে সাফ জবাব দিয়েছেন, এ বিয়ে হবে না।

সুনয়নী দেবী আকাশ থেকে পড়েছেন।—কেন? কি হল হঠাৎ?

ভদ্রলোক সহজে বলতে চান নি কি হল। সুনয়নী দেবীর পীড়া-পীড়িতে যে কথা বলেছেন তার সারমর্ম, ছেলে আপিস থেকে বেরিয়ে তাদের সেখানকার এক বার-এ স্বচক্ষে দু'দিন তার ভাবী শ্বশুরকে ঢুকতে দেখেছে, এবং আরো দু'দিন সেই বার-এর সামনে তাঁর গাড়ি দাঁড়ানো দেখেছে।

ওদিকে ছেলের বাপের মাইল তিনেক করে হাঁটা অভ্যেস রোজ। তিনিও তিনদিন ভাবী বৈবাহিককে তাঁদের ওদিকের বারে ঢুকতে দেখেছেন, এবং আরো দু'দিন তাঁর গাড়িও দাঁড়ানো দেখেছেন। অতএব তাঁরা বুঝে নিয়েছেন সুনাম খোয়ানোর ভয়ে মেয়ের বাপ নিজের বার ছেড়ে অন্য বার-এ নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। বিয়ের পর ছেলে দেখবে তার শ্বশুর মদ খেয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে এটা চান না বলেই এ বিয়ে হবে না।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই গেল বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। —কি হয়েছে?

সুনয়নীর দুই চোখে সাদা আগুন ঠিকরোচ্ছে। জবাব না দিয়ে চেয়ে রইলেন খানিক।

—ডাকলে কেন? কি হয়েছে বলো না?

—তুমি আজকাল অন্য বার-এ যাতায়াত করছ?

আচমকা আঘাত খেলেন যেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি।—তা তার মানে কোন্ বার-এ?

—অমিতার যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেই ছেলের আপিসের দিকের বার-এ আর তার বাড়ির দিকের বার-এ একদিন নয়, কয়েকদিন তোমাকে সে সব জায়গায় দেখা গেছে—ঠিক কি না?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে বীরেশ্বর গাঙ্গুলির—না মানে আমি—

আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন সুনয়নী দেবী। তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, মানে টানে শুনতে চাওয়া হয় নি! তুমি গেছলে কিনা জানতে চাই? হ্যাঁ কি না এক কথায় জবাব দাও।

—হ্যাঁ—কিন্তু আমি তো—

শেষটুকু মুখেই থেকে গেল। জ্যা-মুক্ত শরের মতো সুনয়নী দেবী শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এত জোরে যে বীরেশ্বর গাঙ্গুলির মনে হল কানের পর্দার ওপর মস্ত বোমা ফাটল একটা। বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

রত্নলাভ

বিমল কর

গল্পটা রত্নদিদির মুখেই শোনা। তাঁরই গল্প।

গল্প শুরুর আগে একটু ভূমিকা সেরে নিতে হয়। আমাদের এক আত্মীয়ার বিয়েতে গিয়েছিলাম ধানবাদের দিকে। কোলিয়ারিতে। না গিয়ে উপায় ছিল না, আত্মীয়জনে দুঃখ পেতেন, ক্রুদ্ধ হতেন। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখি, স্বজনে কুটুমে বাড়ি একেবারে হট্টশালা। চেনাজানা প্রায় সকলেই এসেছেন। এমন কি রত্নদিদিও। ওঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে, থাকেন হাজার মাইল তফাতে, অন্তত দু জায়গায় ট্রেন বদল করে আসতে হয় এদিকে, তবু এসেছেন।

অনেককাল পরে রত্নদিদিকে দেখলাম। বছর পনেরো তো অবশ্যই। বললাম, 'তুমি একলা এসেছ! এলে কেমন করে? বয়েস তো হয়েছে, দিদি। ছেলে তোমায় ছাড়ল?'

রত্নদিদি বললেন, 'আসব না কেন? ছেলে বউ কি ছাড়তে চায়। ঝগড়া মাচিয়ে দিলুম। নাতি বলল, এ বুড্ঢি রেল ডিব্বায় তুমি উঠতে পারবে না, পুলিশ পাকড়াও করবে। বললাম, যা যা আমায় পুলিস দেখাস না, তোর বাপের মতন পুলিশ আমি ট্যাকে গুঁজি।'

রত্নদিদির কথায় হেসে ফেললাম।

'পারল আটকাতে! কেমন গটগটিয়ে চলে এলাম। নাগপুর পর্যন্ত একটা লোক সঙ্গে ছিল। তারপর একলা।'

'তোমার সাহস আছে।'

'থাকবে না কেন! আমি কি তোদের মতো ভেতো? এই দেখ, এখনও আমার ষোলোটা দাঁত আছে নিজের, চোখে চশমা পরি সেলাই-ফোঁড়াইয়ের সময়, নয়ত আকাশের চিলও দেখতে পাই। কান আমার ঠিক আছে। তবে জানিস ভাই, ডান হাতের কনুইটা মাঝে মাঝে খটাস করে আটকে যায়। ভাঙা জিনিস মেরামত হলে কলকব্জায় একটু গোলমাল থাকেই। কী করব বল? ভগবানের তো কামারের হাত, দু-চারটে হাতুড়ির ঘা না মেরে কি রেহাই দেয়!'

বয়েসে মানুষের অনেক কিছু বদলে যায়, তবে গড়ন বিশেষ বদলায় না। দিদি মাথায় লম্বা ছিলেন, দোহারা গড়ন। সেই রকমই আছেন প্রায়। পিঠ হয়ত সামান্য নুয়ে পড়েছে, কৃশ হয়েছেন কিছুটা। গাল ভেঙে মুখ সরু সরু দেখায়। মাথার সব চুল সাদা ধবধবে। ঘাড় পর্যন্ত চুল। মাথায় কাপড় দেন না। গায়ের রং তামাটে, ঝকঝকে ভাবটা আর নেই। রত্নদিদিকে দেখলে বেশ বোঝা যায়, বাইরের জল বাতাস ধুলো ময়লার শুধু নয় সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশারও একটা ছাপ পড়ে গিয়েছে হাবেভাবে চেহারায়। ওঁর নিজের কথাবার্তায় ততটা হয়ত পড়েনি।

সুতোর শাড়ি, কালো বা খয়েরি ধরনের ছাপা পাড় থাকে শাড়িতে। গলায় একটি সরু হার, হাতে দু গাছা ফিনফিনে চুড়ি। কানে কিছু পরেন না, আঙুলেও আংটি নেই।

রত্নদিদি আমাদের সামান্য দূর সম্পর্কের দিদি। তাঁকে যে বেশি দেখেছি তাও নয় তবু আগে জামাইবাবু বেঁচে থাকতে ওঁরা দু-চার বছর অন্তর একবার করে শ্বশুরের দেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে বেড়াতে আসতেন, দেখাশোনা করে যেতেন যতটা পারতেন আমাদের সঙ্গে। জামাইবাবু চলে যাবার পর সে-পাট চুকে গিয়েছে।

অনেককাল পরে আবার রত্নদিদিকে দেখে ভালোই লাগল। তাঁর যেমন বয়েস হয়েছে আমাদেরও তেমন কম বয়েস হল না। আমি নিজেই তো কবে ষাট ছাড়িয়ে গিয়েছি।

কথায় কথায় একবার বললাম, 'দিদি, হাজার মাইল ঠেঙিয়ে যখন এদিকে এসেই পড়েছ তখন বিয়ের পাট চুকলে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চলো। দশ বিশ দিন থেকে সকলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেও। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তোমাকে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের।'

রত্নদিদি হেসে বললেন, 'না ভাই, আমায় টেনে আর নিয়ে যাস না। পাক্কা দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছে ওপরওলা। মাথার ওপর বড় ছেলে, বুঝলি তো! এ হল অন্য রাজার রাজত্ব। হুকুম না মানলেই পেয়াদা পাঠাবে।....না রে, এবারে হল না, আবার যদি কোনদিন আসি তখন কথা রাখব তোদের। এবারও কি এমনি এলাম ভাবছিস! দেখলাম, আমাদের ডালপালায় এটি হল শেষ শুভকাজ। না এলে হয় না। তাছাড়া আমাদের বাঙালি বাড়ির বিয়ে-থা কতকাল দেখিনি। দেখতে সাধ হল।'

'কেমন দেখলে?'

'ভাল লাগল না। এ কি বিয়ে রে! এ যেন সত্যনারাণের পুজো! নৈবিদ্যি সাজিয়ে বসে থাকলি তোরা আর তোতলা বামুন এসে দুটো মন্তর পড়ে চলে গেল। তারপর তো দেখি যা হচ্ছে সবই ভাড়ার ব্যাপার। ভাড়ার লোক বাসর সাজায়; ভাড়াটে একদল লোক এসে রান্নাবান্না করে খাইয়ে যায়, কতক লালসবুজ বাজি জ্বাললি তোরা, ঝম্পঝম্প বাজনা বাজালি—ব্যস, বিয়ের পাট চুকে গেল। এই বিয়ে দেখে কি সাধ মেটে নরেন! বিয়ে ছিল আমাদের সময়ে। বিয়ে তো সাত পাকে মাত্তর, কিন্তু বিয়ের আগে পরে ঊনপঞ্চাশ পাক! কত হইচই, হাসিখুশি হইহল্লোড়, মেয়েদের আচার, ভোজনের ভিয়েন, বিয়েতলা সাজানো, পিঁড়ে পাতা, আলপনা—বিয়ের রুমাল পদ্য, বাসরের রঙ্গতামাসা....কোথায় গেল সেসব! যাই বলিস, আমার বাপু মন ভরলো না।'

'আজকাল এই রকমই হয়, দিদি; মানুষের আর সময় কোথায়? লোকবল অর্থবল—তাই বা কোথায়?'

'তা নয় রে, ভাই, এখনকার দিনে সবাই কাঁচা রঙে কাজ সারতে চায়, পাকা রঙের দিন ফুরিয়েছে।'

এমন সময় সত্যদার গিন্নি কৃষ্ণাবউদি বলল, 'দিদি, এই বিয়ে নিয়ে নানা টানা-হেঁচড়া হচ্ছিল। মেয়ের নিজের পছন্দ, ছেলেরও। চেনাজানা হয়েছিল ওদের। আমাদের তো মেয়ের তরফ, বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে, এতেই আমরা খুশি।'

কথাটা বোধ হয় জানা ছিল না রত্নদিদির। শুনলেন। তারপর কী মনে করে যেন হাসলেন। বললেন, 'চেনা-জানা বিয়ে! তাই নিয়ে টানা-হেঁচড়া। আমায় আর ওসব বলিস না। আমার

বিয়ের গল্প জানিস! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হতে লেগেছিল আঠারো দিন। আমার বিয়ে নিয়ে, আঠারো মাস লড়াই! সে যে কী কাণ্ডই হয়েছিল তোরা ভাবতেই পারবি না।'

গল্পটা সত্যি আমাদের জানা ছিল না। জানার কথাও নয়। একসঙ্গে তো মানুষ নয়। একেবারে নিজেরও কেউ নয় রত্নদিদি। ওঁরা থাকতেন এক প্রান্তে আমরা অন্য প্রান্তে, আর রত্নদিদি? বিয়ের সময় আমাদের নিশ্চয় শিশু অবস্থা।

আমি হেসে বললাম, 'তোমার বিয়ের গল্পটাই না হয় বলো, শুনি।'

'শুনবি! তা হলে বলি!'

না-শোনার কারণ ছিল না। বিয়েবাড়ি এখন অনেকটাই নিঝুম। বিকেলের গোড়ায় কন্যা-বিদায়পর্ব মিটে গিয়েছে। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এসেছিল। বাতি জ্বলছে ঘরে। বাইরে প্রথম ফাল্গুনের মরা শীত আর সদ্য বসন্তের দু-চার ঝলক বাতাস মেশামিশি হয়ে আছে। বাড়িটার চেহারা উড়ুখুড়ু। খানিকটা ম্লান। ছেলেছোকরার দল যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়ে আরাম করে নিচ্ছে আজকের মতন। কাল থেকে আবার তত্ত্বতাবাসের খাটুনি।

আমাদের দিকের অন্য ব্যবস্থা। বয়স্কজন থাকব বলে যথাসম্ভব সুখসুবিধের ওপর নজর রাখা হয়েছিল।

রত্নদিদির ঘরটি ছোট। খাট বিছানা পাতা। সেখানে বসেই আমরা চার-পাঁচজনে গল্পগুজব করছিলাম।

দুই

রত্নদিদি গল্প শুরু করলেন।

"একটু গোড়া থেকেই বলি, না বললে বুঝবি না," রত্নদিদি বললেন। "আমার বাবা ছিল পোস্ট মাস্টার। সরকারি চাকরি। চাকরির লেজ যত বাড়ে বাবাও তত পুরনো হয়, আর দু-তিন বছর অন্তর বদলি পায়। ছোটখাট শহরেই বদলি হত বাবা। আমরাও বাবার পেছন পেছন আজ মতিপুর, কাল গুজুডি, পরশু রামনগর ঘুরে বেড়াই। পাঁচ ঘাটের জল খাই পাঁচ জনে। পাঁজ জন বলতে বাবা মা আমি আমার ছোট ভাই অনু আর আমাদের এক পুষ্যি ভরতদাদা। ভরতদাদা বাবার কাছেই দশ-বারোটা বছর থেকে গিয়েছিল। বাড়ির হাটবাজার করা থেকে পাঁচ-মেশালি ফাইফরমাশ খাটা ছিল ভরতদাদার কাজ।

"আমার বাবাকে লোকে বলত, মাস্টারবাবু, কেউ বা বলত মাস্টারমশাই। নিজের কাজকর্মে বাবার সুনাম ছিল, খাতিরও করত লোকে। বাবার ছিল দুটো শখ। তাস খেলাটা অবশ্য শখ ছিল না, ছিল নেশা; শখ বলতে ওই জ্যোতিষীবিদ্যে করে বেড়ানো, আর মাঝে মাঝে এস্রাজ টেনে নিয়ে বসে নিজের মনে একটা সুরটুর বাজানো। বাবার আর-একটা ঝোঁক ছিল, সিদ্ধি খাবার। সিদ্ধির সরবত, সিদ্ধির গুলি—এ বাবা প্রায়ই খেত, নিজের হাতে তরিবত করে তৈরী করেই খেত।

"মা ছিল আমার নির্বিবাদ মানুষ। শান্তশিষ্ট। হাসিখুশি। দোষের মধ্যে মা গাদা গাদা পান খেত। আবার করত কী, বাবার আনা কাঁচা সিদ্ধিপাতাও মাঝেমাঝে পানের মধ্যে মিশিয়ে দিব্যি খেয়ে নিত। বলত এতে মুখশুদ্ধি হয়।

"তা এইভাবেই বড় হতে হতে আমার বয়েস হয়ে গেল পনেরো। শাড়ি পরতে শুরু

করেছি। আমি মাথায় ঢেঙা, গায়ে হিলহিলে, লম্বা লম্বা হাত-পা। ওপর পাটির ডান দিকের দাঁতে এক গজদন্ত। জোরে হাসলে দাঁতের ছটা বেরিয়ে যায়।

"আমরা তখন বরিহাগঞ্জ বলে একটা ছোট শহরে থাকি। কে একজন—এখন আর মনে পড়ে না, আমার এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল। আমাদের সময় পনেরো ষোলোয় আকছার বিয়ে হত। তা ছাড়া সম্বন্ধ আনলেই তো বিয়ে হবে না, কথাবার্তা চলতে চলতে, দেখাশোনা, পছন্দ—সেসব করতে করতে কম করেও একটা বছর। ওরই ফাঁকে মেয়ের বয়সও বেড়ে যায়।....তা প্রথম সম্বন্ধটা দুটো ধাপ এগুতে পারেনি। কেঁচে গেল। কিন্তু ওই যেমন রেল স্টেশনে দেখছিস না গাড়ি আসছে জানাবার আগে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে, এটাও সেরকম। সম্বন্ধ একবার শুরু হওয়ার মানে জানান দেওয়া হয়ে গেল, মেয়ে এবার তোমার বিয়ের ঘণ্টি বেজে উঠেছে।

"প্রথমটার কথা আমার মনে নেই। কোথাকার ছেলে কে জানে, পাতে দেবার যুগ্যি নিশ্চয় ছিল না, নয়ত মা-বাবার গরজই হল না কেন! তা সে যাই হোক, তখন থেকেই মাঝে মাঝে কথা ওঠে, এক আধটা চিঠিপত্তরও আসে। ষোলো পেরিয়ে আমি তখন সতেরোয় পা দিয়েছি, তখন একটা সম্বন্ধ এল জামালপুর থেকে। কথাবার্তাও দু-চার ধাপ এগুলো। শেষে ভেস্তে গেল। বাঁচা গেল।

"সেই বছরেই শেষাশেষি একটা ছোঁড়াকে একদিন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি দেখলুম। পোস্ট অফিস আর ইউনিয়ন বোর্ডের ছোট হাসপাতালের কাছেই ছিল আমাদের থাকার বাড়ি। ছোট বাড়ি, মাথায় টালির ছাদ, সামনে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিয়ে বাগান করেছি আমরা, সামনে উঁচু-নিচু মাঠ, আম আর কাঁঠালের বড় বড় গাছ দু চারটে, ও পাশে হাসপাতাল। বাড়ির গায়েই আমাদের ইঁদারা। সে-জলের স্বাদই আলাদা।

"প্রথমে বুঝিনি ছোঁড়াটা কোথ থেকে এল? পরে শুনলাম, হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে। মামা-মামির কাছে বেড়াতে এসেছে। তা তার মামার বাড়িতে এসেছে আসুক, আদর খাক মামির, আমার তাতে কী! কিন্তু ছোঁড়াটার ভাব-গতিক তো ভাল নয়। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, গায়ে হাফ শার্ট, পায়ে কাবালি স্যাণ্ডেল। তখন প্যাণ্ট পরার চলন হয়নি এত, ধুতিই পরত লোকে। ছেলেটার বয়েস বেশি নয়, আমার চেয়ে বড়, তবে অনেক বড় নয়, বাইশ-টাইশ হবে। ডাক্তারকাকার সাইকেল নিয়ে হাসপাতালের মাঠে আমাদের বাড়ির সামনে সকাল বিকেল চক্কর মারে। আর আমায় দেখলেই, সাইকেল নিয়ে কসরত দেখায়। হাসে। চোখ নাচায়।

"ডাক্তারকাকার মেয়ে মানি ছিল আমার ন্যাওটা। বছর বারো বয়স। দিদি বলত আমায়। আমার কাছে পড়তে আসত মাঝে মাঝে, সেলাই শিখত; বাজার কি স্টেশনের দিকে দরকারে যেতে হলে মানি আমার সঙ্গে থাকত।

"মানিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর ওই দাদাটার নাম কিরে? মানি বলল, ডাকনাম লালু। ভাল নাম লালমোহন।....নামটা বলেই ফেললাম। আমার অত লজ্জা নেই। মানামানিও নেই।

"নাম শুনে হাসি পেল। লালুর চেহারায় কোথায় যে লাল ছিল বুঝলাম না। গায়ের রং আমার চেয়েও কালো। গায়ে কাঠ। মুখচোখ চলনসই, বড় বড় চোখ, মাথার চুল ভেড়ার লোমের মতন কোঁকড়ানো।

"মানিকে বললাম, করে কী তোর দাদা? মানি বলল, ডাক্তারি পড়ে। এবার ডাক্তার হবে।

আমার তো গোড়ায় বিশ্বাস হয়নি। ওই লালমোহন, অমন হ্যাংলা প্যাংলা চেহারা যার, ফাজিল ফক্কর ধরনের হাবভাব—সেই ছেলে পড়বে ডাক্তারি! মানুষ তো দূরে থাক ওকে ঘোড়ার ডাক্তারি পড়তেও কেউ নেবে না।"

রত্নদিদি নাকমুখ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে এমনভাবে বললেন কথাটা যে আমরা হেসে ফেললাম।

জানলার গায়ে জলের জগ ছিল। কয়েক ঢোঁক জল খেলেন রত্নদিদি। মশলার কৌটো থেকে মশলা বের করে মুখে দিলেন। এ তাঁর নিজের হাতে তৈরী মশলা। জোয়ান মৌরি আর কী কী সব মিশিয়ে করা।

"খাবি মশলা?"

আমরা কেউ কেউ মশলা নিয়ে মুখে দিলাম।

"তারপর?"

"তারপর—" রত্নদিদি বললেন, "তারপর দেখি, কথাটা ঠিকই। লালমোহন বাঁকড়োর মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি পড়ে। পড়া প্রায় শেষ করে এনেছে। আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে বাঁকড়ো দূরও নয়, ভাগা আদরা লাইন দিয়ে যেতে হয়।....তা একদিন লালুচাঁদ তার মামি আর বোনের সঙ্গে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এল। ডাক্তার কাকিমা তো প্রায়ই মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসত। আমার ছোট ভাইটা তখন হামজ্বর নিয়ে পড়ে আছে। দেখতে এসেছিল ডাক্তার কাকিমা, সঙ্গে লালুচাঁদ। চলে যাবার সময় লালু আমার মাকে বলল, মাসিমা—এই মেয়েটার পেটে কৃমি আছে নাকি? বড় কৃমি থাকলে এই রকম রোগাটে চেহারা হয়।....মা বলল কই না তো! ও বরাবরই এই রকম ছিপছিপে তবে কাজকর্মে তরতরে।....লালুচাঁদ হাসল। বলল, বড় কৃমি থাকলে ওই রকম তরতরে হয়। ভেতরে কামড়ায় তো, তাই। আমি কিছু বললাম না তখনকার মতন।

"পরের দিন বিকেল বেলায় দেখি, কাঁঠালতলার একপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে লালু সিগারেট ফুঁকছে। গিয়ে ধরলুম তাকে। চমকে উঠেছিল। বললাম, অ্যাই—কৃমি কত বড় হয়?...আচমকা ধরা পড়লে চোরের যেমন অবস্থা হয় সেই রকম অবস্থা হল লালামোহনের। তোতলাতে তোতলাতে বলল—কেন, বড় বড়ও হয়; এক বিঘত দেড় বিঘত। অনেক সময় জোড়া কৃমিও থাকে। ভেরি ব্যাড্। কৃমি মুখ পর্যন্ত উঠে আসে।....বললাম, ও—তা তোমার নিজের পেটে কী আছে, কৃমি না কেঁচো? ছাগলদের পেটে একরকম কেঁচো থাকে লম্বাই আধ হাত।

"লালমোহন থতমত খেয়ে গেল। বলল, তুমি আমায় ছাগল বললে? জানো আমি এল এম এফ পরীক্ষা দিচ্ছি। আজ বাদে কাল ডাক্তার হব।

"ঠোঁট উল্টে আমি বললাম, অমন লম্ফ আর হেরিক্যান ডাক্তার গণ্ডায় গণ্ডায় হয়।...

আমার পেটে কী আছে তুমি জানলে কেমন করে? তোমার নিজের পেটের খবরটা নাও আগে গিয়ে। খবরদার, আমার সঙ্গে ফুক্কুরি করতে এসো না, তোমার ডাক্তারি ঘুচিয়ে দেব, আমায় তুমি চেনো না।

"বললাম বটে, কিন্তু কাকে। কী কানকাটা নাককাটা ছেলে রে ভাই। মান অপমান জ্ঞান নেই ধমক খেয়ে তার মজা যেন বেড়ে গেল। সাইকেলেব চক্কর শুরু হল একেবারে আমাদের বাড়ির গায়ে। ঘন ঘন দেখতে আসতে লাগল আমার ভাইকে। একটু আড়াল পেলেই আমায় দেখে

পিটপিট করে হাসত, আর বলত, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়, চোখ পাকালে পেটের কৃমি মরে না।

"ভাই সেরে উঠতে না-উঠতেই আমি পড়লাম। বড় বয়সের হাম। সে কী কষ্ট। ডাক্তার লালমোহন আমায় হামে পড়তে দেখল। ততদিনে তার স্কুল খুলে গিয়েছে। চলে গেল।

"ভাবলাম, বাঁচা গেল। আর তো পেছনে লাগতে আসবে না সে!...ওমা, তোরা শুনলে অবাক হয়ে যাবি, লালমোহনের কত বড় দুঃসাহস আর শয়তানি বিদ্যে! আমি সেরে উঠেছি, হঠাৎ একদিন এক চিঠি। একেবারে খামে। ভেবে দেখ কাণ্ডখানা! তখনকার দিনে কোনো গেরস্থবাড়ির আইবুড়ো মেয়ের নামে কি কেউ চিঠি লিখত? আবার খামের ওপরে আমার নাম, নিচে কেয়ার অফ বাবার নাম। ধর, বাবার নাম যদি নাও থাকত—তবু তো পোস্ট মাস্টার। তার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখলে সে চিঠি কার নজরে পড়বে গো! বাবার হাতেই পড়ল চিঠি। মায়ের হাত ঘুরে সে চিঠি এল আবার আমার হাতে। ভয়ে লজ্জায় মরি। রাগে মাথায় আগুন জ্বলে যায়। এমন বেহায়া, অসভ্য, হদ্দ বোকা কেউ হয় নাকি? চিঠির খাম আগেই খোলা ছিল। ভেতরে কী দেখলাম জানিস? শুনলে তোদের বিশ্বাস হবে না। চার-ছ লাইনের এক চিঠি লিখেছে লালমোহন। চিঠির ঠিক ঠিক ভাষা আমার মনে নেই, তবে লেখার ঢঙটা ওই রকম ভাই রতনমণি, আসিবার সময় তোমার হামজ্বর দেখিয়া আসিয়াছি। এতদিনে নিশ্চয় তোমার জ্বরজ্বালা সারিয়াছে। বড় বয়সে হামজ্বর অতি মন্দ। পরে বড় ভোগায়। সাবধানে থাকিবে। তোমার কথা মতন আমাদের এখানকার এক নার্সারির কাগজ পাঠাইলাম। ফলফুলের নাম ও দাম পাইবে। সবই লেখা আছে। পয়লা নম্বরের গাছগুলিতে টিক মারা আছে। লক্ষ করিয়া দেখিও। মামাবাবু মামিমাকে আমার প্রণাম জানাইলাম। তোমরা স্নেহ জানিবে। ইতি তোমার লালুদা।

"চিঠি পড়ে আমি আকাশ থেকে পড়ি রে? এক ফালি চিঠি তো চারপাতা ছাপানো নার্সারির কাগজ। ফলফুলের নাম দাম। আমি একেবারের জন্যেও লালমোহনকে ফলফুল নার্সারির কথা বলিনি। আমাদের বাড়ির সামনে তিন হাতের বাগানে একটা কলাগাছ, লাউমাচা একটা। দুটো লঙ্কাগাছ আর ফুলের মধ্যে জবা, চাঁপা আর শীতের সময় দু-চারটে গাঁদা। বাগানে আমার জল দেওয়াও হয় না, ভরতদা দেয়।....আমার মাথায় কিছু ঢুকলো না। নার্শারির ছাপা কাগজ কেন পাঠালে লালমোহন? তার মতলবটা কী? ছাপা কাগজগুলো বারবার দেখেও আমার বাপু বিদ্যে হল না বুঝি ওর মধ্যে কী হেঁয়ালি আছে।

রত্নদিদি একটু থামতেই আমি হেসে বললাম, "হেঁয়ালি ছিল নাকি?"

কৃষ্ণাবউদিও হেসে বলল, "পায়ে ধরে পিসি সাড়া দেয় না মাসি—সেই রকম হেঁয়ালি নাকি?"

রত্নদিদি কাপড়ের আঁচল মুঠো করে মুখের সামনে তুলে জোরে জোরে হাঁচলেন বার দুই। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। কাল ছিল ত্রয়োদশী, আজ চতুর্দশী। শুক্লপক্ষ। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন বাইরে, বাতাস বইছে।

"ছিল। কিন্তু তখন বুঝিনি," রত্নদিদি বললেন, "পরে বুঝলাম। নার্শারির ছাপা-কাগজ পাঠিয়ে ও বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দিয়েছে—সেটা ধরতে পারলেও বুঝতে পারিনি। ফলফুলের ছাপা নামগুলোর তলায় যেখানে যেখানে পেনসিলের টিক আছে—সেই অক্ষরগুলো বেছে বেছে সাজিয়ে নিলে বোঝা যায় লালু আমার 'লাবে' পড়েছে।"

কৃষ্ণাবউদি জোরে হেসে ফেলে বলল, "আপনি তো বললেন, হেঁয়ালি ধরতে পারেননি।"

"পারিনি তো! কেমন করে পারব।...তারপর লালমোহন আবার যখন এলো, আমায় বলল, তোমার মাথার ঘিলু আছে না গোবর! কিস্যু বুঝতে পার না। নিয়ে এসো নার্শারির কাগজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। গোলাপের 'লা' আর বেলের 'বে' নিলে কী হয়—বুঝতে পার না? ঘেণ্টু কোথাকার!.... বললাম, সে-কাগজ ফেলে দিয়েছি।....হাঁ হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, ফেলে দিয়েছ! তুমি মেয়ে, না হান্টারওয়ালি! এই ভাবে কেউ চাবুক মারে বুকে!"

আমরা হেসে ফেললাম। হো হো করে।

সত্যদা বলল, "লালমোহন কি প্রায়ই আসত তোমাদের ওখানে?"

রত্নদিদি বললেন, "আসত মানে! এই তোমার গরম আসছে, পুজোয় আসছে, শীতে আসছে, দোলের ছুটিতে আসছে—দু এক মাস অন্তর অন্তর হাজির। বাঁকড়ো তো কাছেই আসতে চাইলেই আসা যায়।"

"তারপর—?" আমি বললাম।

রত্ন দিদি হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ আমি বাহাত্তুরে বুড়ি। আমার আর লজ্জাশরম কী! যা বলব, খোলাখুলি বলব। লালমোহনের সঙ্গে আমার ভাবসাব হয়ে গেল বেশ। ও এলেই আমার ভাই মন ফুরফুর করত। চলে গেলে বুক হু হু করত। তা যাই বলিস, লালুর মামা-মামিও ভাগ্নে বলতে ছিল অজ্ঞান। ভালবাসতও খুব। এই যে তাদের ভাগ্নে হরদম ফাঁক পেলেই মামার বাড়িতে ছুটে আসে—তাতে ওদের সায় ছিল, খুশি হত। কিন্তু ভাগ্নে যে কার টানে ছুটে আসে তা কি অত বুঝত! একটু-আধটু বুঝত নিশ্চয়। তারা তো কানা নয়। আমার বাপ-মাও নয়। বুঝত ঠিকই, মুখে কিছু বলত না। বলবেই বা কেন! ছেলে হবু ডাক্তার, মেয়ের বয়েস আঠারো হল। ঘরে মর্যাদায় সমান সমান। ভেতরে ভেতরে একটা সায় ছিল দু তরফের।

"তবে আমাদের সময়ে দিনকাল তো অন্যরকম ছিল। আজকালকার মতন চোখের সামনে নাচানাচি করার যো ছিল না। লুকিয়ে চুরিয়ে এপাশ ওপাশ নজর রেখে কথাবার্তা, মেলামেশা।

"ওর তখন পরীক্ষা। শেষ পরীক্ষা। লালমোহন বইপত্তর গুছিয়ে মামার বাড়িতে পরীক্ষার পড়া করতে এল। তাই তো বলত মুখে। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ভিড়লে পড়া হয় না। বাড়ি সেই পাড়াগাঁয়ে, বাপ জমিজায়গা, ধানচাল, পুকুর বাগান নিয়ে থাকেন।

"মামার বাড়িতে এসে লালমোহনের যখন বইপত্তর খুলে বসেছে, তখন এক বিকেলে বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল একটা। আমার বেশ মনে আছে দিনটা। বর্ষাকাল নয়, তবু থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। দিন দুপুর মেঘলা। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিপঝিপে বৃষ্টি।"

"তা সেদিন—এই মাঝ দুপুরে লালমোহন বাঁশি বাজিয়ে ডাকল আমায়। এ তোর আড়-বাঁশি নয়, সিটি-বাঁশি। ফুরর-ফুর—ফুরর-ফুর। চেনা বাঁশি আমার। মেঘলা দিন, দু পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে খানিকটা আগে, আমি নিজের ঘরে খাটে শুয়ে শুয়ে 'ইন্দিরা' পড়ছিলাম। বাবার আমার পড়ার নেশা ছিল। এক আলমারি বই, নাটক নবেল, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, দু-একটা পুরনো ইংরেজি বই—এই রকম সব।...কাজকর্ম না থাকলে আমি চুপ করে শুয়ে থাকতাম খানিক, না হয় পুরনো পড়া বই আবার পড়তাম। সেদিন শুয়ে শুয়ে 'ইন্দিরা' পড়ছি। ওই যে একটা জায়গা আছে বইয়ে—'ধানের ক্ষেত,/ঢেউ উঠেছে,/বাঁশতলাতে জল।/আয় আয় সই, জল আন গে/জল আনি গে চল—', পড়তে পড়তে হেসে মরছি নিজের মনে—এমন সময় শুনি ফুরর-ফুর,

ফুরর-ফুর।...বুঝলাম লালুবাবু ডাকছেন। বই রেখে উঠে পড়ে বাইরে এলাম। এদিক তাকাই ওদিক তাকাই বাঁশিওলাকে দেখতে পাই না। ভর দুপুর, ঘন মেঘলা, বৃষ্টির দরুন মাঠঘাস ভিজে, চারপাশ ফাঁকা, হাসপাতালের দিকেও কেউ কোথাও নেই, দুপুরে কেউ থাকেও না, বন্ধ হয়ে যায় হাসপাতাল, দুটো গোরু আর ছাগল চরছে কাঁঠালতলার দিকে। আমতলাও ফাঁকা। খুঁজতে খুঁজতে আমতলার কাছে এসে দেখি, লালুবাবু একটা আমডালের ওপর পাতার আড়ালে কায়দা করে আধশায়া হয়ে বসে আছে। বসে বসে ভিজে আমপাতার পাতলা ডাল নাড়িয়ে জলের ফোঁটা ফেলচে নিচে। আমায় ভিজিয়ে দেবার আগেই সরে দাঁড়ালাম। চারপাশ দেখছি আর কথা বলছি দুজনে; কেউ যদি আচমকা বাইরে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির, কিংবা ডাক্তার কাকার বাড়ি থেকে—আমায় দেখতে পাবে, লালুবাবুকে পাবে না। আমায় দেখলে হয়ত ভাববে, গাছতলার নিচে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার ওই একটা দোষ ছিল, এটা সেটা, কানের ফুল, হারের লকেট, পয়সা কড়ি বড় হারাতাম। আমার নামই হয়ে গিয়েছিল 'হারানি'।...তা দুজনে গল্প করছি, কথার তো কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না আমাদের, হঠাৎ দেখি লালুবাবু গাছের ডাল থেকে একেবারে ধপাস করে মাটিতে। শব্দ হল। পড়েই চিৎ। আর নড়ে না চড়ে না। চোখের পাতা বন্ধ। আমার ভাই, বুক ধড়াস করে উঠল। চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে ওকে একবার ডাকি, একবার নাড়া দি, তবু সেই কাঠের মতন পড়ে আছে। যাঃ, অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধ হয়। কী করি? আমাদের বাড়ির গায়ে ইঁদারার পাড়ে দড়ি বালতি পড়ে থাকে। ছুটে গিয়ে বালতির জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলাম। মৃগী রোগীর মতন মুখ করল একবার। তবু সাড়াশব্দ নেই। ভীষণ ভয় ধরে গেল। কী যে করি? বেঁচে আছে তো? ধারেকাছে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, সেই গোরু দুটো আর ছাগল ছাড়া। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, লালুবাবুর চটি জোড়া গাছতলায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল, জুতোর গন্ধ শোঁকালে বেহুঁশ লোক হুঁশ ফিরে আসে শুনেছি। দৌড়ে গিয়ে একপাটি চটি কুড়িয়ে এনে লালুবাবুর নাকে চেপে ধরলাম। হাতে হাতে ফল রে ভাই। মরা মানুষ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। লাফ মেরে উঠে বসল লালুবাবু। বলল, তুমি আমার মুখে জুতো ছোঁয়ালে, গোবর লাগিয়ে দিলে নাকে! কী বিচ্ছিরি গন্ধ! চললাম, আর নয়। যে মেয়ে লাভারের নাকে গোবর লাগানো জুতো ঘষে দেয়, সে মেয়ে নয়, মোষ। বলে লালুবাবু ঘেন্নায় নাকমুখ মুছতে মুছতে দে দৌড়।"

রত্নদিদি নিজেই হেসে উঠলেন। আমরাও অট্টহাসি হেসে বললাম, "জুতোটা না ঘষলেই পারতে! ইচ্ছে করে ঘষে দিয়েছিলে নাকি?"

রত্নদিদি মাথা নেড়ে বললেন, "না ভাই, বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে দিইনি। তাই কি কেউ দেয়। তখন কেমন মাথায় গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম।"

"তারপর কী হল?"

"কী হল! সে আর এক কাণ্ড। বাবুর মুখে জুতো ছোঁয়ানোর প্রায়শ্চিত্ত করতে একদিন সন্ধের মুখে আমাদের বাড়ির সদরে কাঠচাঁপা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে—এই তোর দু-চার পলকের জন্যে নিজের নরক গলাটা এগিয়ে দিতে হল। আমি কি যেচে দিয়েছিলুম নাকি।....ও হঠাৎ বলল, তোমার গালে শুয়োপোকা পড়ছে। শিগগির দাও—ফেলে দি। ওই একটু ভুল হয়ে গেল, প্রথম, আর সেই মুহূর্তে মা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। দেখে ফেলল। লালুকে আমি ধাক্কা মেরে সরাবার আগেই সে নিজেই সরে পড়ল।"

আমাদের হাসির রোল উঠে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল বোধ হয়।

"এ তো দেখছি—"

"দেখবি আবার কী! ওইটুকুতেই সর্বনাশ হয়ে গেল।" রত্নদিদি বললেন, "লালুর পরীক্ষার পড়া হচ্ছে না ঠিকমতন বলে সে ফিরে গেল বাঁকুড়ায়। আমি থাকলাম মায়ের নজরে নজরে।.... দেখতে দেখতে মাস ফুরোলো। পরীক্ষা হয়ে গেল লালুর। পাশ করে হাসপাতালেই হাত পাকাতে লাগল। দেখাসাক্ষাৎ আর হয় না। শেষে লালুর মামাই বিয়ের কথাটা পাড়ল বাবার কাছে। বাবা বলল, ছেলে তো চেনাজানা, ডাক্তারও হয়েছে—ভাল কথা। তবে ওই ছেলের স্বভাবচরিত্র বুঝতে হবে। আর দেখতে হবে—ভবিষ্যৎটা কেমন? কোষ্ঠী দেখাতে হবে। বাবা নিজে দেখবে। তারপর কথা—!"

আমি বললাম, "আবার কোষ্ঠী কেন?"

"বাবার যে বিশ্বাস কোষ্ঠীতে, তখন এগুলো হত।"

"এখন আরও বেশি হয়।"

"লালুদের বাড়ি থেকে তার ছক কোষ্ঠী এল। বাবা নিজে পাঁজিপুথি নিয়ে বসল। আমার ছক গেলে লালুদের বাড়িতে।....দশ বিশ দিন সময় গেল বাবার কোষ্ঠী বিচার করাতে ভাল করে। তারপর বাবা বলল, এই বিয়ে হবে না। জাতকের পতন-যোগ আছে। মানে ছেলের অনিবার্য পতনযোগ। সেটাই ভীষণ খারাপ যোগ। মারকতুল্য। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপতে পারে—তবে...

আমি হেসে বললাম, "পতন-যোগ তো কেটেই গিয়েছিল, দিদি! গাছ থেকে পড়ার পর আর কিসের ভয়! অন্য পতন তো তোমার সঙ্গে, প্রেমে পতন।"

রত্নদিদি বললেন, "কে কাকে এ সব বোঝায়! বাবা ছেলের খুঁত ধরে বলল, পতন-যোগ আছে পাত্রর, তো ও-বাড়ির থেকে ছেলের বাবা বলল, মেয়ের ছক থেকে তাদের পণ্ডিত দেখেছে যে, মেয়ের বন্য জন্তু দ্বারা দংশনের যোগ আছে। অগত্যা এ-বিয়ে হবে না।"

"কিন্তু হল তো বিয়ে!"

"হল বইকি! কেমন করে হল সেটা এবার শোন।"

তিন

বিশুর মা আমাদের জন্যে চা এনেছিল। বিয়েবাড়ির কাঠের ট্রে; ছোট ছোট কাপে কয়েকজনের মতন চা। কেউ নিলাম, কেউ নিলাম না। রত্নদিদি দু বেলা দু বারের বেশি চা খান না। তিনি চা নিলেন না। বরং আরও একবার জল খেয়ে মশলা মুখে দিলেন।

বাইরে বুঝি বসন্তের দমকা হাওয়ায় ঝাপটা থেমে গিয়েছে। শীতের সিরসিরে ভাবটাই গায়ে লাগছিল। জ্যোৎস্না আরও পরিষ্কার। উজ্জ্বল।

"তারপর কী ঘটল, বলো?" আমি হেসে বললাম।

রত্নদিদি বললেন, "বলি।...তিন-চার মাস আমাদের আর দেখাদেখি নেই। চিঠিপত্তর লেখার দিনকাল তখন নয়, সে সাহসও নেই। সেই একবারই যা চিঠি লিখেছিল লালুবাবু। এদিকে বিয়ের কথাও ভাঙতে চলেছে। মনটন ভাল থাকবে কেন, বল! রাগ হত খুব। ভদ্দরলোকের ছেলে তুমি, একটা ভাল ছক কোষ্ঠীও করাতে পার না! বাবার মুখে কতবার শুনেছি, যদু মধু বেলা অনিলার ছক কোষ্ঠী বিচার করে বাবা মাকে বলছে, "বেশ ছক গো, দেখে বড় আনন্দ হল, বিয়ে

হলে মিলমিশ হবে খুব, রাজযোটক।'...পরের কোষ্ঠীতে যা হবার হোক, আমাদের তাতে কী! আমরা তো আর যোটক হতে পারছি না। বলবি, আমারও তো ছকটক ভাল ছিল না। আমি বলছি, মোটেই তা নয়। বাবা হল মেয়ের বাপ—সে যদি ছেলের বাড়ির লোকদের তাগ বাড়িয়ে বলে, ছেলের ছকে দোষ আছে—তারাই বা মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ছাড়বে কেন!

"বিয়ের কথা ভেঙেই যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন আবার লালুবাবু এসে হাজির। তার ভাবসাব দেখে মনে হল, বাড়ির গুরুজনদের কথাবার্তা নিয়ে সে একটুও মাথা ঘামায় না। বরং নতুন ডাক্তার হয়ে তার চেহারা খুলেছে, আরও বড় বড় ভাব হয়েছে, আমতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, যখন তখন, দিব্যি আমাদের বাড়ি এসে মাকে বলছে—মামিমা একটু চা খাওয়ান, দুধ কম, আমি আবার কড়া চা ছাড়া খেতে পারি না। কী আর বলব মামিমা, হাসপাতালে এত খাটায় যে দিনে দশ-বারো বার চা না খেলে জোর পাই না। খাটতে আমার ভালোই লাগে। এই বয়সে খাটব না তো কখন খাটব বলুন। কুঁড়েমি দেখলেই আমার মাথা বিগড়ে যায়। ওই যারা খায়দায় আর ঘুমোয়—তাদের কিস্যু হয় না।....এই ভাবে নিজের বাহাদুরি ফলায় মায়ের কাছে। আর আমায় খোঁচা মারে।"

কৃষ্ণাবউদি বলল, "বিয়ের কথা তো ভেঙেই গিয়েছে তবু উনি এভাবে আসতেন আপনাদের বাড়িতে?"

"আসবে না কেন, দু কান কাটা যে—", রত্নদিদি হেসে বললেন, "তা ছাড়া ডাক্তার কাকার ভাগ্নে, আমাদের প্রতিবেশী। দু বাড়িতে অত ভাবসাব, ডাক্তার কাকিমা মায়ের বন্ধুর মতন, লালুও আমাদের কত চেনাজানা হয়ে গিয়েছে। বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে গেলেও একেবারে সব কিছু উপড়ে মাটিতে নুয়ে পড়েনি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।..... তা লালমোহন এবার এসে মাকে যত তোয়াজ করতে শুরু করল, তার বেশি করতে লাগল আমায়। তখন শীত পড়েছে। ওদিকে জব্বর শীত পড়ত, ভাই; পৌষ মাঘে একটা লেপে কুলোতো না রাত্তিরে। ভোরে তোলা জলে হাত ছোঁয়ানো যায় না, হাঁদারার টাটকা জলে ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু যেই না—বালতির জলে বাতাস এসে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কনকনে। সকালে সামনের মাঠটা হিমে শিশিরে ভিজে যেন অসাড় হয়ে থাকত।.....রোজ সকালে দেখতাম, লালমোহন আমার ঘরের বন্ধ জানলার কাছে এসে ঠকঠক করে টোকা মারত। ধড়মড় করে উঠে বসতাম, জানলা খুললাম কী দেখি মাথায় হনুমান টুপি, গায়ে ভট কম্বলের অলেস্টার, গলায় মাফলার, লালুর মুখ। তখন সবে রোদ উঠেছে, সুয্যির মুখ দেখিনি, তার আগেই লালুর মুখ। তখনই ঠিক হয়ে যেত, বেলায় কোথায় কখন দুজনে দেখা হবে। আবার বেলায় যখন দেখা হত, বলে দিত বিকেলে কেমন করে দেখা হবে। এই ভাবে সারা দিনে তিন-চার বার দেখা হত দুজনে আড়ালে। কখনো বন্ধ হাসপাতালের পেছনে করবী ঝোপের কাছে। লালু আমায় বলত, একেবারেই ঘাবড়াবে না, বিয়ে আমাদের হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না; আমি আর এক সেট কুষ্ঠীগুষ্টি করিয়ে দিচ্ছি বাঁকড়োর ফেমাস পণ্ডিতকে দিয়ে, হরিসাধন জ্যোতিষার্ণব দেখবে সেই কুষ্ঠীতে আমি রাজা, তুমি রানি।....আর তখনও যদি তোমার বাবা বাগড়া মারেন, তোমায় নিয়ে আমি পালাব রতনমনি। সেরেফ ক'টা মাস। আমি চাকরির চেষ্টায় আছি। তুমি লক্ষ্মী, একটু সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে।"

"ক'মাস লাগল মেওয়া ফলতে?" আমি বললাম হাসতে হাসতে।

"তা লাগল ক' মাস। তার আগে এক কাণ্ড হল। লালুবাবু যে সেবার একটা বাক্স ক্যামেরা

নিয়ে এসেছে ফটো তুলবে বলে, আমায় বলেছিল। ফটোও তুলত, আমি নজর করিনি। একদিন বলল, আমার একটা ছবি তুলবে। আমি না না করলাম। কিন্তু সে একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষে একদিন শীতের দুপুরে, কেউ যখন কোথাও নেই, হাসপাতালের পেছনের সেই করবী ঝোপের পাশে একটা পাথরের ওপর বসালো আমায় লালু। বলল, সে সব ব্যবস্থা করে ক্যামেরাটা মানির হাতে দেবে। নিজে থাকবে আমার পাশে, ফটো তুলবে মানি। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। লালুবাবুও শুনবে না। শেষে আমার পা ধরতে আসে। কী করব, রাজি হয়ে গেলাম।"

"ফটোও তোলা হল যুগলের?"

"হল। কিন্তু শয়তানিটা কী করল জানিস লালমোহন।" রত্নদিদি বললেন, "মানিকে ঠিকঠাক দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একবার সব দেখে নিয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। আমার ভাই লজ্জাই করছিল। মুখ তুলে তাকাতে পারি না। ওদিকে মানিকে রেডি হতে বলে লালুচাঁদ পেছন থেকে ঝপ করে আমার চোখ টিপে ধরল। আর ওদিকে ছবি তোলাও হয়ে গেল মানির। ফটো তুলে নিয়ে মানি দে ছুট। আমি হতভম্ব। বুঝলাম, মানিকে সবটাই শেখানো পড়ানো ছিল। রাগের মাথায় লালুর হাত খামচে, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে যা মুখে এল বলতে বলতে বাড়ি ফিরে এলাম। রাগে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।"

রত্নদিদি একটু চুপ করলেন। কিছু যেন ভাবছিলেন।

বললাম হেসে, "ফটোটা উঠেছিল?"

"উঠেছিল মানে, কপালে থাকলে কী না ওঠে রে? লটারির টাকাও উঠে যায় চাপরাশির কপালে। মানির হাতে তোলা সেই ফটোও লালমোহনের কপালে উঠে গেল।....তা ভাই বলতে পারিস, ফটোটা উঠল বলে বিয়ের ফাঁসটাও লেগে যেতে পারল।"

"কী রকম?"

"রকম আর কী! লালুবাবু চৌখস ছেলে। বাঁকড়োতে থাকতে থাকতেই বি. এন রেলের হাসপাতালে চাকরি জোগাড় করে ফেলল ছোট ডাক্তারের। তারপর একদিন বাবার নামে এক রেজিস্ট্রি এল। নতুন ছক কোষ্ঠী আর পাঠাবার দরকার হয়নি ওর। শুধু ওই ছবির একটা কপি পাঠিয়ে দিল বাবাকে, আর লিখলো—'আপনাদের বিবেচনায় যা হয় করিবেন। আমি দূরে চলিয়া যাইতেছি, নতুন চাকরি, বিলম্বে আমার অসুবিধা হইবে।"

"সেই ফটো তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল?"

"দেবার জন্যই তো তুলেছিল। কম সেয়ানা নাকি ও। মাথায় যত ফন্দিফিকির তত বুদ্ধি। আইবুড়ো এক মেয়ের অমন ছবি, পেছন থেকে চোখ চেপে ধরে আছে এক ছোঁড়া—ওই ছবি দেখার পর কোন বাপ-মা আর বসে থাকতে পারে? অন্য সম্বন্ধ-ই বা করবে কেমন করে! কোন সাহসে! কাজেই বিয়েটা হয়ে গেল।" রত্নদিদি হাসলেন, "লালুবাবুর রত্নলাভ হল।"

"বিয়েতে খুব ধুম হয়েছিল তাই না!" কে যেন বলল মেয়েদের তরফ থেকে।

"তা হয়েছিল। তবে তোদের আজকাল যেমন দেখলাম তেমন নয়। সে অন্য রকম, নিজেদের লোকজন, পাড়াপড়শি নিয়ে ধুম। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলা সেরে বরের সঙ্গে চলে গেলাম দূরে। সেখান থেকে চাকরির বদলি ঘটতে ঘটতে আটশো হাজার মাইল দূরে গিয়েই পড়লাম একদিন। আমাদের আর এদিকে ফেরা হল না। তারপর একদিন তোদের জামাইবাবু তো চলে গেলেন। আমিই পড়ে থাকলাম ছেলে বউ নাতি আগলে। কী করব বল? কপালে আমার

যেমনটি লেখা ছিল সেই ভাবেই আছি। দুঃখ করে কী লাভ!"

সবাই চুপ। একটু যেন গম্ভীর হয়ে এল আবহাওয়া। অবস্থাটা হালকা করার জন্যে আমি বললাম, "তা সেই ফটোটা তুমি রেখেছ, না হারিয়ে ফেলেছ!"

মাথা নেড়ে রত্নদিদি বললেন, "হারিয়ে ফেলব কেন, রেখে দিয়েছি। তা বলে সেটা কি আর দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা যায়! লোকে দেখলে বলবে কী! ছেলেরাও তো বড় হয়ে উঠেছিল। আমার বাক্সর তলায় লুকিয়ে রেখে দিতাম।"

"আহা, রত্নদিদি—সে ফটো যদি একবার দেখতে পেতাম...!"

"পাগল, তোদের দেখাতাম আর কী!...এবারই কি হল জানিস! শীতের আগে একদিন আমার তোরঙ্গ খুলে চাদরটা জামাটা বার করছি রোদে দেব বলে। আমাদের ওখানে শীত একেবারে কসাই, মায়াদয়া নেই, পড়লো তো গা-হাত-পা কেটে রক্ত বার করে দেয়।....তা আমি তোরঙ্গ খুলে আমার শালটা চাদরটা ফ্ল্যানেলের জামাটা বার করছি, করতে করতে তোরঙ্গর তলায় রাখা ফটোটা হাতে এল। তুলে নিয়ে দেখছিলাম। কত পুরনো ছবি, মামুলি একটা ক্যামেরায়, ছবিটা হলুদ হয়ে গিয়েছে। বেসম-বেসম রং, এখানে ওখানে দাগ ধরেছে। উঠে গিয়েছে খানিক—তবু ঘটি হাতা জামা পরা বিনুনি ঝোলানো রোগা পাতলা একটা মেয়েকে চোখে পড়ে, আর পড়ে খোঁচা খোঁচা মাথার চুলের একটা ছেলেকে, মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে শার্ট আর হাতকাটা সোয়েটার। ছেলেটা মেয়েটার পেছনে দাঁড়িয়ে। চোখ টিপে ধরে আছে মেয়েটার। ও ছবি দেখলে কেউ তোদের রত্নদিদির ছবি বলবে না, তোদের জামাইবাবুরও নয়।.... নিজের মনে ছবিটা দেখে নিজেই বুঝি হাসছিলাম, এমন সময় হুড়মুড় করে নাতি এসে পড়ল। ফটোটা লুকাতে গিয়েও পারলাম না। নাতি কেড়ে নিল। দেখল খানিক। তারপর কী বলল জানিস?"

"কী?"

"বলল, এ বুড়িয়া কার পিকচার এটা?"...কী বলি বল নাতিকে? বললাম, ও এমনি। হবে কারও। বাক্সর মধ্যে পড়েছিল।....তা ফটোটা ফেরত দিতে দিতে নাতি বলল, বুঢড্ডি টিভিতে ওল্ড হিন্দি ফিল্ম দেখায় দেখেছ? অছ্যুত কন্যা, ঝুলন—দ্যাট টাইপ্.....বেচারি হিরোইন...ফালতু, আন্টি! একদম ফালতু! বলে সে চলে গেল।....আমি আর কী করব! দেখলাম একটু, তারপর কাগজে মুড়ে—যেমনটি ছিল তোরঙ্গের তলায় রেখে দিলুম।....ভাবিস না রাগ বা দুঃখ হল! কেনই বা হবে ভাই! পঞ্চান্ন ষাট বছর কী কম! অত পুরনো ছবির দাম কী! কদরই বা হবে কেন! নাতিই বা কেমন করে চিনবে তার ঠাকুমা ঠাকুরদাকে ওই ফটো থেকে! চেনা যায় না।"

রত্নদিদি চুপ করে গেলেন। আমরাও চুপচাপ। ততক্ষণে দিদির মাথার ধবধবে সাদা চুলের ওপাশে জানলা ঘেঁষে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসেছে। মনে হচ্ছিল, আলোটা যেন রত্নদিদির মাথায় মাখানো। সামান্য পরে মুখেও নেমে আসবে।

হঠাৎ দেখি রত্নদিদি একটু হাসলেন। বললেন, "আবার কী মনে হয় জানিস একবার। নাতি হয়ত কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। করেও আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করল। ওটা কী কম পাজি না ধুরন্ধর। কেমন ঠাকুরদার নাতি দেখতে হবে তো!" ❦

এক সের বেগুন

রমাপদ চৌধুরী

বীরভূম জেলার রায়মঙ্গল কেন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা আবুল হোসেন হায়াত সাহেব কেন মাত্র সতেরোটি ভোট পেয়ে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন এবং তাঁর ভোট-বাক্সের উপর কেন একটি হাস্যকর উপহার পাওয়া যায়, সে রহস্য সম্প্রতি উদঘাটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই উপহার-সামগ্রীটির মধ্যেই তাঁর পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে।

হায়াত সাহেব সাধারণ নির্বাচনে পারজিত হয়েছেন এ সংবাদ পাঠ করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরাই স্তম্ভিত হয়েছেন। মদিও রাজনৈতিক দলবিশেষ ইতিমধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হায়াত সাহেবের পরাজয় ও তাঁদের প্রার্থীর আশাতীত জয়লাভকে তাঁদের দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার নিদর্শন বলে প্রচার করতে শুরু করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, নির্বাচনে কোন প্রার্থীর জয়লাভের পিছনে রাজনৈতিক দলের কিংবা দলীয় প্রার্থীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই কার্যকরী হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে জয়ী প্রার্থী আবদুল করিম সাহেবের জনপ্রিয়তাকে ইতিপূর্বে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছিলো এবং ঘোড়দৌড়ের ভাষায় যাকে আপসেট বলা চলে, তেমনই একটি নির্বাচনের প্রকৃত ঘটনা জানাবার জন্য এবং এই নির্বাচন ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এই নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমি যখন স্বয়ং করিম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি কোন উল্লাস প্রকাশ করা দূরের কথা, স্পষ্ট স্বীকার করেন যে, এই ফলাফলকে তিনি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।

স্মরণ থাকতে পারে, হায়াত সাহেব এ অঞ্চলের অক্লান্ত কর্মী এবং একনিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে দীর্ঘ বাইশ বছর যাবৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং গত দুটি নির্বাচনেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি হয়েছে বলে শোনা যায়নি, বা তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতে পারেন নি এমন সন্দেহও করা সম্ভব নয়। কারণ বিধানসভার অধিবেশনকালীন সময়টুকু ব্যতীত সারা বৎসরই তিনি স্বগ্রামে বসবাস করেন এবং আপন চেষ্টায় তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা ছাড়া বিধানসভাতেও তাঁর নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় গ্রামবাসীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয় ইস্কুলের জনৈক শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে, হায়াত সাহেব যে মাঝে মাঝেই স্বদলের গ্রামবিরোধী ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে দলীয় প্রধানদের বিরাগভাজন হয়েছেন তাও এ অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ অজ্ঞাত নেই। তৎসত্ত্বেও কেন যে হায়াত সাহেব এভাবে পরাজিত হলেন তার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে

গিয়ে একটি বিচিত্র সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কোন কোন জননেতা এই সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, এমন কি দু-একজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে এ খবরও জানা গেছে। কিন্তু হায়াত সাহেবের মতো জনপ্রিয় প্রার্থীর মাত্র সতেরোটি ভোট পাওয়ার সংবাদ বোধ করি সমগ্র নির্বাচনের ইতিহাসেই একটি দুর্বোধ্য রহস্য হিসাবে স্বীকৃত হবে।

গত পরশুর সংবাদপত্রে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং সে ফলাফলের তালিকায় দেখা গেছে, করিম সাহেব সতেরো হাজার তিন শো বাষট্টিটি ভোট পেয়েছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু পেয়েছেন দু হাজার এক শো আটান্নটি ভোট, এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও হায়াত সাহেবের বাক্সে মোট সতেরটি ভোট পড়েছে। গতকালের বিভিন্ন সংবাদপত্রেও এ বিষয়ে নানা জল্পনা কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং হায়াত সাহেবের পরাজয়কে অনেকে দলীয় জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করছেন। কিন্তু এ রহস্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে এসে জানা গেল যে, হায়াত সাহেবের বাক্সে কেবলমাত্র সতেরোটি ভোটপত্রই পাওয়া যায়নি, এ ছাড়াও আরেকটি দ্রব্য পাওয়া যায়। অফিসার নাকি স্থানীয় এক ভদ্রলোকের কাছে গল্পচ্ছলে জানান যে, হায়াত সাহেবের বাক্সের উপরে কোন ভোটদাতা একটি বেগুন রেখে যান। উক্ত ভোট-কেন্দ্রের উভয় রাজনৈতিক দলের এজেন্টরাই এ কাহিনী সমর্থন করেন, এবং পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, কয়েক দিন পূর্বে কোন এক পোলিং বুথে ভোট-বাক্সের উপরে কেউ একটি বেগুন রেখে যায়, এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। অবশ্য সে সংবাদে কোন প্রার্থীর বাক্সের উপরে বেগুনটি পাওয়া যায় উল্লেখ করা হয়নি এবং বলা বাহুল্য, সে সময়ে খবরটি পাঠ করে সকলেই কৌতুকবোধ করেছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে উক্ত সংবাদটি কৌতুককর মনে হলেও ঘটনাটির পিছনে কি গভীর তাৎপর্য ও করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে তার কিছুটা হদিস বোধ হয় পাওয়া গেছে।

রায়মঙ্গল কেন্দ্রের ভোটার-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ষাট হাজার। তন্মধ্যে তেরো হাজার মুসলমান ও সাতচল্লিশ হাজার হিন্দু। সুতরাং কোন কোন মহলে যে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনে এবার সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকট হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ সাম্প্রদায়িক কারণে করিম সাহেব তেরো হাজার ভোট পেয়ে থাকলেও স্বীকার করতে হবে, অন্তত চার হাজার হিন্দু ভোটও তিনি পেয়েছেন। অথচ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীধর বসু হিন্দুদের ভোট অধিক সংখ্যায় পেতেন, এবং মুসলমানদের ভোট পেতেন হায়াত সাহেব। কারণ হায়াত সাহেবের পিতা এতদঞ্চলের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মৌলবী ছিলেন এবং দরিদ্র মুসলমান চাষীদের উন্নতির জন্য হায়াত সাহেব প্রাণপাত করেছেন বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। অন্য পক্ষে করিম সাহেব কিঞ্চিৎ সাহেবী ভাবাপন্ন, দরিদ্র মুসলমান চাষীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগই তিনি রাখতে পারেননি, কারণ ব্যারিস্টারী পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁকে অধিকাংশ সময় কলকাতায় থাকতে হয়। সুতরাং এই বিস্ময়কর ঘটনাটির জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে অকারণে দায়ী করা চলে না।

আরেকটি মহলের গবেষণায় প্রকাশ, জামিদারি উচ্ছেদের পক্ষে হায়াত সাহেব যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদি দিয়েছিলেন, তার ফলেই নাকি তিনি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল পরিবারগুলির ভোট থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং করিম সাহেব প্রাক্-নির্বাচন সফরে ক্যানাল ট্যাক্সের বিরোধিতা করে

যে সব বক্তৃতা দেন, তা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে এবং সেটেলমেণ্ট অফিসের নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, রায়মঙ্গল কেন্দ্রের মাত্র সাতশো পরিবার জমিদারী উচ্ছেদ আইনের আওতায় পড়েন এবং আইন-অন্তর্ভুক্ত একুশ হাজার বিঘা জমির মালিক পাঁচ-ছয় শো জনের অধিক নয়। সুতরাং নীতিগত কারণে হায়াত সাহেব সাতশো পরিবারের পরিবার-পিছু পাঁচজন করে ধরলে সাড়ে তিন হাজার ভোট হারাতে পারেন, এবং করিম সাহেবও পাঁচ-ছয় শো পরিবার থেকে ক্যানাল ট্যাক্স-বিরোধী বক্তৃতার দৌলতে বড় জোর আড়াই হাজার বা তিন হাজার ভোট পেতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে করিম সাহেব পেয়েছেন সতেরো হাজারেরও বেশি ভোট, এবং হায়াত সাহেব পেয়েছেন মাত্র সতেরোটি। অথচ গত নির্বাচনে হায়াত সাহেব তেইশ হাজার ভোট পেয়েছিলেন।

অবশ্য হায়াত সাহেব মাত্র সতেরোটি ভোটই পাননি, উপরন্তু তাঁর বাক্সের উপরে পাওয়া গেছে একটি বেগুন। এই বেগুনটি অনেকের কাছে কৌতুককর মনে হলেও আমার মনে হয়, হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ পাওয়া যাবে এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই।

কলকাতা শহরে বসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা অবশ্য আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এবং পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা শূন্যের পরিবর্তে যেমন 'রসগোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করে, তেমনই একটি বেগুন দান করে কোন ভোটার হায়াত সাহেবের বাক্সকে শূন্য করবার পক্ষপাতী ছিলো বা প্রতিপক্ষেরই কেউ বেগুন দিয়ে কোন তুকতাক করতে চেয়েছিলো এমন মনে করা যেতে পারতো। এমন কি হায়াত সাহেব নিজেও এই রহস্যটির এই ধরনের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি আমাকে জানান যে, রায়মঙ্গলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নতির জন্য সরকার কোন চেষ্টাই করেননি, সুতরাং তাদের মধ্যে কারও কারও তুকতাকে বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য ব্যাপারটার অন্য ব্যাখ্যাটাও তিনি আমাকে জানান। এ-হেন পরাজয় সত্ত্বেও কৌতুকে বলেন যে, কোন চাষী ভোটার হয়তো বেগুনটি তাঁকে খাবার জন্যে দান করে গেছে, বা ভোট দিতে এসে ভুলক্রমে বাক্সের উপর নামিয়ে রেখে গেছে।

এই সূত্রে কথোপকথোন করতে করতে তিনি নির্বাচনের কথা ভুলে বেগুন সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেন, এবং জানান যে, তাঁর বাড়ির উঠোনেও কয়েকটি বেগুনচারা ছিলো এবং তাতে এক সের ওজনের বেগুনও ধরতো। হায়াত সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বিধানসভায় যেতে হতো এবং দীর্ঘদিন কলুটোলার একটি হোটেলে বাস করতে হতো। সে কারণে বেগুনের চারাগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সেগুলির পরিচর্যা করতে পারতেন না, এ কথা জানিয়ে তিনি মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বলেন যে, নির্বাচনে পরাজিত হয়ে তাঁর উপকারই হয়েছে, কারণ এখন আর তাঁকে কলুটোলার নোংরা হোটেলে বাস করতে হবে না, পরম আনন্দে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র ভিটাবাড়ির সামনের বাগানে বেগুনের পরিচর্যা করতে পারবেন।

হায়াত সাহেবের এই বেগুনপ্রীতির বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি যখন সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম, এবং এর সঙ্গে ভোট-বাক্সের কোন সম্পর্ক আছে কি না মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন তিনি একটি বিস্ময়কর খবর প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চার বৎসর পূর্বে তিনি একবার বিধানসভার অধিবেশন সমাপ্তির পর গ্রামে ফিরছিলেন, এমন সময় গ্রামের

হাটে একজনকে ঝুড়ি-ভরতি বড় বড় বেগুন বেচতে দেখে এত দূর প্রলুব্ধ হন যে, সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং কিছু বেগুন কিনতে তাঁর ইচ্ছা হওয়ায়, বেগুনওয়ালা এক সের বেগুনের জন্যে তিন আনা পয়সা চায় এবং হায়াত সাহেব কোন দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সা দিয়েই বেগুনগুলি নিয়ে চলে আসেন। ঘটনাটির উল্লেখ করে হায়াত সাহেব হাসতে হাসতে আমাকে জানান যে, সে রাত্রে পেঁয়াজ সহযোগে তিনি শুধু বেগুনপোড়া দিয়েই ভাত খেয়েছিলেন।

এই সূত্রেই তাঁর স্মরণ হয় যে, তিনি যখন বেগুন কিনছিলেন, তখন পিছন থেকে কে যেন মন্তব্য করে, হায়াত সাহেবের দেখি আজকাল এক সের বেগুন না হলে চলে না।

এই স্থানীয় অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতে রায়মঙ্গল কেন্দ্রের নির্বাচনী সাফল্যের বিশ্লেষণের মধ্যেই হায়াত সাহেবের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ এবং ভোট-বাক্সে রাখা বেগুনটির সব রহস্য, আমার ধারণা, সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, জমিদারী উচ্ছেদ, ক্যানাল ট্যাক্স—বহুজনে বহু মতামত হয়তো প্রচার করবেন, রাজনৈতিক দলগুলি হয়তো এই নির্বাচনী ফলাফলের মধ্যে কোন দলবিশেষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বা হ্রাসের হদিস পাবেন, কিন্তু দরদস্তুর না করে তিন আনা পয়সার এক সের বেগুন কেনার ফলে যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা গদিচ্যুত হতে পারেন, এ খবর অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য।

এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে আমি ইতিপূর্বে বিস্ময়কর বলেছি। তার কারণ হায়াত সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেরার পথে সেই গ্রামেরই এক দরিদ্র মুসলমান চাষীর সঙ্গে আমার দেখা হয়, এবং তাকে আমি স্টেশনের পথটা দেখিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করি। পরিবর্তে সে প্রশ্ন করে জানতে চায়, আমি গ্রামে কার বাড়ি গিয়েছিলাম। উত্তর শুনে চাষীটি উপহাসের হাসি হাসে এবং বলে যে, সে আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলো যে, আমি নবাবজাদার বাড়ি গিয়েছিলাম। 'নবাবজাদা' বলতে সে কাকে বোঝাতে চায় জিজ্ঞাসা করায় লোকটি হেসে বলে যে গ্রামে নবাবজাদা তো একজনই আছেন। ইতিমধ্যে আরো দু-চারজন লোক এসে জড় হয় এবং হাসতে হাসতে বলে যে, এখন তারা হায়াত সাহেবকেই নবাবজাদা সম্বোধন করে। এবং তাঁর পরাজয়ে যে তারা খুশী হয়েছে তাও প্রকাশ করে।

আমি বিস্মিত হয়ে তাদের উল্লাসের কারণ জানতে চাই। তখন একজন সহাস্যে বলে যে, হায়াত সাহেব মানুষটি ভালো ছিলেন বলেই তারা তাঁকে মাথায় করে রেখেছিলো। কিন্তু বিধানসভার সদস্য হয়েই তিনি নাকি ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেন! আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বলি যে, তাদের ধারণা ভুল, হায়াত সাহেব যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বলা বাহুল্য, তাদের প্রকৃত মনোভাব জানার জন্যই আমি হায়াত সাহেবের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করি। কিন্তু এর ফলে লোকগুলি রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং জানায় যে, হায়াত সাহেবের কথা বলতেও তাদের লজ্জা হয়। তিনি নাকি হাটে বেগুন কিনতে গিয়ে দরদস্তুর করেন না। তিন আনাই দিয়ে দেন। এবং যিনি বাড়ির গাছের বেগুন খেতেন তাঁর নাকি বর্তমানে এক সের বেগুন না কিনলে চলে না।

এর পর আমি সমগ্র অঞ্চল সফর করে হায়াত সাহেব সম্পর্কে জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত জানবার চেষ্টা করি, এবং জানতে পারি যে শুধুমাত্র এক সের বেগুনের দরদস্তুর না করে কেনার সময় যারা তাঁর আশেপাশে ছিলো তারা ক্রমে ক্রমে হায়াত সাহেবের পরিষ্কার

জামাকাপড়ের দিকেও দৃষ্টি দিতে শুরু করে। এইভাবে নানা গুজব চতুর্দিকের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করে এবং অনেকের এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে ধারণা হয় যে বিধানসভার সদস্য হওয়ার ফলে তিনি নিশ্চয় খুব বড়লোক হয়ে গেছেন। অন্যথায় হায়াত সাহেবের মতো একজন দরিদ্র জননেতা এক সের বেগুন কিনলেন কেন, এবং কিনলেও দরদস্তুর না করে তিন আনা দাম কেন দেবেন?

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন গুজব রটনা শুরু হলে শেষ পর্যন্ত তা কত সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর হতে পারে পরবর্তী ঘটনাটি থেকেই তা প্রমাণ হবে। হায়াত সাহেব যখন বৎসর দুই আগে প্রাণপণ চেষ্টায় একটি মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা করেন সরকার ও সাধারণের সাহায্য নিয়ে, তখন সকলেই বলতে শুরু করে যে তিনি এখান থেকেই দু-পয়সা রোজগার করেছেন।

কিন্তু তার জনকল্যাণ প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ কদর্থ করা হয় বৎসরখানেক পূর্বে তিনি যখন রায়মঙ্গলে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হন। কারণ, এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আরেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলো বটে, কিন্তু বালিকাদের জন্য নয়।

এ পর্যন্ত হায়াত সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের নানা কাল্পনিক অভিযোগ থাকলেও তাঁর চরিত্রের উপর কেউ কোন কটাক্ষ করেনি। কিন্তু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শুনে সকলেই রুষ্ট হয় এবং প্রশ্ন করে যে হায়াত সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ বালিকাদের উপর পড়েছে কেন। ফলে তাদের সুপ্ত আক্রোশ পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত হতে শুরু করে এবং হায়াত সাহেবের মতো জননেতাও অল্পদিনের মধ্যেই লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হন। এ কারণেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ যদিও তাঁর মতো অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ দেশসেবকের শোচনীয় পরাজয়ে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছে তথাপি রায়মঙ্গল কেন্দ্রের জনসাধারণ এই পরাজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে সমর্থ হয়নি।

কাটামুণ্ডের উপাখ্যান

গৌরকিশোর ঘোষ

অতঃপর সেই কাটামুণ্ড কহিল, "মহারাজ আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। দেখিবামাত্র আপনাকে চিনিয়াছি, আপনি উজ্জয়িনীর অধিপতি এবং বত্রিশ সিংহাসনের অধিকারী ভুবন বিদিত বিক্রমাদিত্য। আমার কিছু মাত্র ভ্রম নাই।"

মহারাজ বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুণ্ড, তোমার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি অবাক হইয়াছি। আমি বিদেশী। এদেশে পূর্বে কখনও আসি নাই, তথাপি দর্শনমাত্র আমাকে চিনিয়া ফেলিলে। এরূপ আশ্চর্য ক্ষমতা আমি কুত্রাপি কাহারও মধ্যে দেখিতে পাই নাই। এই ইন্দ্রজাল তুমি কোথায় শিখিয়াছ?"

কাটামুণ্ড কহিল, "মহারাজ আমি ঐন্দ্রজালিক নহি। আমি বাঙালী। এবং আমার যে গুণপণা দেখিয়া আপনি নিরতিশয় বিস্ময়বোধ করিতেছেন, তাহা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবিশেষের কোনও বিশেষ গুণ নহে। আমাদের প্রকৃতিই এইরূপ যে আমরা বিদেশী নেতাদের পূজা করি এবং স্বদেশীয় নেতাদের পুড়িয়ে মারি। উহা আমাদের স্বভাবধর্ম। এদেশের পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই এই গুণটির অধিকারী। আমরা বিদেশী নেতাদের চরণবন্দনা করি, তাঁহাদের বাক্যে অচলা ভক্তি-জ্ঞাপন করি, তাহাদের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসকে কখনোই টলতে দিই না। তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতে আমাদের শরীরে ও মনে স্বেদ কম্প হর্ষ ও পুলক অবিরল উৎসারিত হয়।"

দীর্ঘপথ অতিক্রমজনিত পরিশ্রমে মহারাজ কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। পিপাসাও বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু কাটা-মুণ্ডের সকল সাতিশয় আশ্চর্যজনক কথাবার্তা তাঁহাকে এমনই হতবাক করিয়াছিল যে, তাঁহার আর ক্ষুধাপিপাসা বা পরস্পরের কথা কিছুমাত্র মনে পড়িল না। তিনি সাহস করিয়া যে লৌহদণ্ডের উপরিভাগে কাটামুণ্ডটি ঝুলিতেছিল, তাহার নিকটবর্তী হইলেন।

মহারাজের গণনা অনুসারে যদিও ইহা কৃষ্ণপক্ষ, এবং এখন রাত্রি তৃতীয় যামে তথাপি এদেশের পথঘাট সমুজ্বল প্রদীপমালায় এইরূপ আলোকিত যে দিবারাত্রির প্রভেদ বোঝা দুষ্কর। একটি সুউচ্চ বর্তিকাদণ্ডেই কাটামুণ্ডটি ঝোঝুল্যমান ছিল, মাঝে মাঝে দক্ষিণাবায়ুর হিল্লোলে মুণ্ডটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিতেছিল।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুণ্ড, আমার সম্পর্কে তুমি কতটা জান?"

কাটামুণ্ড কহিল, "মহারাজ, এদেশের সহিত আপনার কণামাত্র পরিচয় ঘটিলে আপনি আর এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। ইংরাজিতে একটি কথা আছে—"

কাটামুণ্ড এই পর্যন্ত বলিয়া একটু থমকিয়া গেল। সতত ঘূর্ণ্যমান মুণ্ডটি ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে মহারাজের মুখোমুখি হইয়া পড়িয়াছিল।

মুণ্ডটি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, আপনি আবার ইংরাজি বোঝেন তো?"

মহারাজ মস্তক সঞ্চালন করিয়া উত্তর দিলেন, "না। ইংরাজী বস্তুটা কী?"

কাটামুণ্ড কহিল, "উহা একটি বিদেশী ভাষা। উহা ইংরাজ নামক আমাদের এক প্রাক্তন শাসকের ভাষা। শাসককুল সাগর পার হইয়াছেন। কিন্তু ভাষাটি রহিয়া গিয়াছে। আমাদের মনের ভাব যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এই ভাষা ব্যবহার করি।"

মহারাজ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া একটি প্রশ্ন করিতে গিয়া দেখিলেন, মুণ্ডটি বায়ুর আবর্তে ততক্ষণে অন্যদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। তাই তিনি নিরস্ত হইলেন। মুণ্ডটি অর্থাৎ মুণ্ডের আননটি ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় মহারাজের সম্মুখস্থ হইল এবং উভয়ের চারিচক্ষে মিলন ঘটামাত্র উহা ফিক করিয়া হাসিয়া দিল।

তারপর বলিল, "মহারাজ আপনার বিস্ময়ের কারণ বুঝিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্বে, আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। বলুন তো, যে বর্তিকাদণ্ডে আমার এই মুণ্ডটির টিঁকি বাধা রহিয়াছে, তাহা কিরূপ ভাবে দণ্ডায়মান আছে?"

মহারাজ ভাবিয়াছিলেন, এই মুণ্ডটিও তাল বেতালের ন্যায় না-জানি কি বেয়াড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। তৎপরিবর্তে এইরূপ একটি সহজ প্রশ্ন পাইয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

মহারাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "উহাকে উল্লম্ব বলে।" কাটামুণ্ড খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "মহারাজ বাঁচিয়া গিয়াছেন, চাকুরি পাইবার নিমিত্ত আপনাকে পাবলিক সারভিস কমিশনের সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয় নাই। এইরূপ জবাব শোনামাত্র মহামান্য সদস্যগণ আপনাকে তদ্দণ্ডে বাতিল করিয়া দিতেন।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, আমার উত্তর সঠিক হয় নাই?"

কাটামুণ্ড বলিল, "অবশ্যই হইয়াছে, তবে উহা ইংরাজি হয় নাই। আপনাকে বলিতে হইবে ভারটিক্যাল, নচেৎ আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের বোধগম্য হইবে না।"

কাটামুণ্ড আরও এক পাক ঘুরিয়া আসিয়া দেখে মহারাজের মুখ চোখের বিমূঢ় ভাব তখনও কাটে নাই। কাটামুণ্ড সট্ করিয়া মহারাজকে চোখ মারিতে তিনি সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

কাটামুণ্ড বলিল, "মহারাজ, এমন দেশটি আপনি কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবেন না। এদেশের যাবতীয় নেতৃস্থানীয় লোক বিদেশী ভাষায় ভাবেন, স্বপ্ন দেখেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা, দেশের বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ক যাবতীয় পরিকল্পনা রচনা, আলোচনা ও প্রয়োগ বিধি বিদেশী ভাষার মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজ্য শাসন, কর সংগ্রহ, সেচ, কৃষি, পশুপালন, বিচার, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের শিরোনাম, যানবাহনে গন্তব্যস্থলের নাম ও ভাড়া-নির্দেশক লিখন, নাগরিক স্বাস্থ্যবিধি, রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব, সভা সমিতির ভাষণ পরীক্ষার ফলাফল, উপাধিপত্র।"

মহারাজ আঁতকাইয়া উঠিলেন, "হা, হতোস্মি। এদেশের কি কোন ভাষা নাই।"

কাটামুণ্ড কহিল, "থাকিবে কেন না? আছে। আ-মরি বাংলা ভাষা।"

মহারাজ আবার হতবাক হইলেন। এবং মুণ্ডটি আরেক পাক ঘুরিয়া আসিলে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তবে যাবতীয় কার্য যদি বিদেশী ভাষাতেই সম্পন্ন হয় তাহা হইলে এ দেশের ভাষা কোন্ কর্মে লাগে?"

কাটামুণ্ড কহিল, "প্রধানত কবিতা রচনা করিতে কবিগণ উহা ব্যবহার করেন এবং অশিক্ষিতা ললনাগণ স্বামীকে পত্র লিখেন।"

মহারাজ কহিলেন, "এদেশের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। এই বিচিত্র দেশ সম্পর্কে আরও জানিতে কৌতূহল হইতেছে। হে মুণ্ড, তুমি অনেকক্ষণ যাবৎ নানা তথ্য সরবারহ করিয়া আমার কৌতূহলকে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়াছ। তুমি যদি ক্লান্ত না হইয়া থাক তবে এই আশ্চর্য দেশের কথা আরও বল।"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ, আপনি বেতালসিদ্ধ। আপনার অনায্য কিছু নাই। আপনি এই মুহূর্তে নগরীর কেন্দ্রস্থলে দৃক্‌পাত করুন। কী দেখিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।"

মহারাজ তন্মুহূর্তে বেতালকে স্মরণ করিয়া তাহাকে বার্তা লইতে প্রেরণ করিলেন। বেতালও তদ্দণ্ডে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আসিয়া মহারাজকে যাহা যাহা বলিল, মহারাজ তাহা তাহা মুণ্ডকে শুনাইয়া দিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "এই মুহূর্তে তখন একটি বিরাট পুরুষের মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে মহা ধূম হইতেছে। নৃত্য গীত ও আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে। সমবেত জনতা আনন্দে আত্মহারা হইয়া কোলাহল করিতেছে এবং মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি দিতেছে। হে মুণ্ড বল, উনি তোমাদের কোন্ কীর্তিমান পুরুষ, যাঁহার মূর্তি ঘিরিয়া তোমাদের এত আনন্দ, এত উত্তেজনা?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ উনি মহামতি লেনিন। ইওরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া রুশ নামে এক অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ আছে। মহামতি লেনিন সেই দেশের সর্বপ্রধান নেতা। উনি উঁহার দেশের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া দলতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। এবং ঐ মহাপুরুষের উত্তরাধিকারীগণ সেই তন্ত্রকে দলতন্ত্রে রূপায়িত করিয়াছেন। মহামতি লেনিনের এই বৎসর জন্মশতবর্ষ পূর্তি হইয়াছে। সেই কারণে আমাদের দেশের লোকেরা ফুর্তির ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন।"

মহারাজ এই আশ্চর্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তারপর শুধু বলিলেন, "সাধু, সাধু।"

মুণ্ড বলিল, "মহারাজ, আরও আছে। আপনি উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আর একটি মূর্তি আছে, উহার দিকে একবার দৃক্‌পাত করুন এবং আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, তথায় কী ঘটিতেছে!"

অনন্তর মহারাজ আবার বেতালকে স্মরণ করিলেন এবং বেতাল পূর্বের ন্যায় ঘুরিয়া আসিয়া যাহা যাহা বলিল, মহারাজ তাহা মুণ্ডকে শুনাইয়া দিলেন।

মহারাজ কহিলেন, "তিনটি রাজপথের সংযোগস্থলে রক্ষিত একটি মূর্তিকে ঘিরিয়া কিঞ্চিৎ গোল উপস্থিত হইয়াছে। মূর্তিটি মুণ্ডিত মস্তক ষষ্টিধারী কোনও কৃষকের বলিয়াই বোধ হইতেছে। কয়েকটি বালক আক্রোশবশত ছেনি হাতুড়ি ইত্যাদি লইয়া মূর্তিটি ভাঙিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। কিছু লোক নিকটে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে। হো হো হা হা রবে হাস্য করিতেছে। উহারই ভিতরে ত্রস্ত উদ্‌ভ্রান্ত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি! সংবাদপত্রে মুখ ঢাকিয়া সেই পুরুষ বিড়বিড় করিয়া বলিতেছে, 'প্রতিবাদ করতে বলছেন? আমি হরিদাস পাল প্রতিবাদ করার আমি কে? তাঁর উত্তরাধিকারের ন্যায় রক্ষার দায় আমার উপরে তো কেউ চাপায় নি।' হে মুণ্ড, এ সকল কী রহস্য আমাকে বল। প্রথমে বল, কটিবাস পরিহিত ঐ কৃষক পদযাত্রী কে? ঐ বালকগুলিই বা কাহারা? কি হেতু তাহার এত আক্রোশভরে ঐ কৃষকের মূর্তিটিকে ভাঙ্গিতে চাহিতেছে? ঐ হতভাগ্য কৃষক কী এমন অপরাধ করিয়াছে? আর সংবাদপত্রে মুখ লুকাইয়া যে উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষটি এইরূপ বিলাপ করিতেছে সে-ই বা কে এবং কেনই বা সে এরূপ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ, আপনি যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন সেগুলির উত্তর একে একে শ্রবণ করিলে আপনি আমাদের জাতির সমুদায় ইতিবৃত্তই জ্ঞাত হইবেন। বলিতেছি, অবধান করুন। মহারাজ, কটিবাস পরিহিত যষ্টিধারী ঐ পদযাত্রীর মূর্তিটি কোন কৃষকের মূর্তি নহে। উনি বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তবে বণিকবৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। উনি শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করেন নাই। উনি শাসক শক্তির সশস্ত্র পশুবলকে নিরস্ত্র জনতার আত্মবল দ্বারা প্রতিহত করতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং শত্রুর হৃদয়ে বিবেকবোধ জাগ্রত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সকল জটিল এবং সাধারণ মানুষের বোধ ও বুদ্ধির অগম্য কিছু রণকৌশল প্রয়োগের দ্বারা তিনি ভীত সন্ত্রস্ত পৃথিবীর বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের মনে দুর্নিবার সাহস সঞ্চারের উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি এই যুগে এই বার্তাটি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন; মা ভৈঃ মা ভৈঃ এবং মা হিংসীঃ মা হিংসীঃ । ভয় করিও না, হিংসাও না। অভয় এবং অহিংসা এই বিচিত্র মানুষটির পদযাত্রার পাথেয়। উহাকে মূর্খ ও শিশুরা ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই। মহারাজ নিত্যকালের ঐ পথিকদের ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় অপরাধ। উনি সকলের কলুষ আপনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন এবং মৃত্যুকালে এক বিচিত্র ধ্বনি উচ্চরণ করিয়াছিলেন—হা রাম। যাহার অর্থ ধনবান, ক্ষমতাবান বা বিদ্বানরা বুঝিতে পারে নাই। ইহাও তাঁহার অন্যতম অপরাধ। আমাদের সকলকেই উনি বোকা বানাইয়াছেন আমাদের আক্রোশ না মিটিবার হেতু ইহাই। মহারাজ, এই বৎসরটি উঁহার জন্মশত বৎসর। তাই ঘোর রবে হাতুড়ি ছেনি লইয়া আমাদের তরুণ সত্তা ঐ মূর্তিটির উপর ক্রমাগত ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। মহারাজ, আপনি যাহাদিগকে বালক ভাবিতেছেন, উহারা বালক নহে, উহারা গেরিলা।" মুণ্ড আরও বলিতে যাইতেছিল, মহারাজ, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে মুণ্ড, এ যাবত আমি যত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি তন্মধ্যে তোমার কাহিনীই চমৎকারিত্বে তুলনাহীন। তোমাকে বাধা দিলাম, তজ্জন্য দুঃখিত। তুমি শীঘ্র আমার একটি কৌতূহল নিবারণ কর!"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ আজ্ঞা করুন।"

"আক্রমণের দ্বারা যানবাহন ধ্বংস, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ, আসবাবপত্রের বিনাশ সাধন, শিক্ষক অধ্যাপক প্রভৃতির নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ইত্যাদি করিয়া ভাবে চেয়ারম্যানের অভ্রান্ত নির্দেশ পালন করিলাম এবং এই সকল কর্মের দ্বারা অনন্ত পুণ্য অর্জন করিলাম, তাহাদিগকে গেরিলা বলে। মহারাজ—"

মহারাজ শশব্যস্তে বলিলেন, "হে মুণ্ড, তিষ্ঠ তিষ্ঠ। আগে আমাকে বল, চেয়ারম্যান কি?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ বিদেশী শব্দ। বুৎপত্তিগত অর্থ জানি না। এতটুকু জানি, উহা কোনও বস্তু নহে, ব্যক্তির পদমর্যাদাবাচক শব্দ। দেশ ভেদে উহার গুরুত্বের তারতম্য ঘটে। যথা—আমাদের দেশে উহা নৈবিদ্যের উপর কাঁঠালিকদলীবৎ। কিন্তু চীন দেশে এই নামেই মহা ধুন্ধুমার। এই শব্দ তথায় ব্রহ্ম। দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর।"

মহারাজ বলিলেন, "বুঝিলাম। এইবার বল, সংবাদপত্রে মুখ আচ্ছাদন করিয়া যে পুরুষপ্রবরটি বিড়বিড় করিতেছেন, উনি কে?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ, উনি আমাদের দেশের ইন্‌টেলেকচুয়াল।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অর্থ?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ, এই শব্দটিও বিদেশী। এবং কিঞ্চিৎ খটমট। সত্য বলিতে কি উহার সম্যক অর্থ আমার জানা নাই! তবে উহাদের গুণলক্ষণ বলিতেছি, আপনি একটি অর্থ করিয়া

লইবেন! ঈশ্বর উঁহাদের বুদ্ধি দিয়াছেন, বিবেক দিয়েছেন, এবং হৃদয় দিয়াছেন। এবং যেহেতু সেই সঙ্গে চৈতন্য দান করে নাই, সেইহেতু বেচারিগণ ধনী ব্যক্তির হঠাৎ পুত্রের ন্যায় এত সম্পদ এক সঙ্গে হাতে পাইয়া কী যে করিবেন তাহা স্থির করতে না পারিয়া সর্বদাই ফাঁপরে পড়িয়া আছেন। ইঁহাদের ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত বোধ আছে, বেশ প্রখরই আছে। কিন্তু ঈশ্বর এই বোধগুলি তৎসৃষ্ট এত প্রাণী থাকিতে মানুষকে কেনই বা দিলেন, তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়টি কী, ইহারা তাহা জানেন না। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত এই অমূল্য সম্পদরাজির যে আদৌ সদ্ব্যবহার হইতেছে না, কারণ এই সকল সম্পদ ব্যবহার করিতে হইলে কিঞ্চিৎ ঝুঁকি লইতে হয় তাহাতে উঁহারা পরাঙ্মুখ—তাহা অন্তরে ইহারা সতত উপলব্ধি করেন। তাই ইঁহারা আত্মগ্লানিতে সর্বদাই অস্থির। মহারাজ আপনি সেই কারণেই ঐ প্রকার বিলাপ শ্রবণ করিয়াছেন। উঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন কর্তব্যে অবহেলা করিয়া উঁহারা কোনমতে ইহকাল কাটাইয়া দিবেন এবং আমার হাতে নাই ভুবনের ভার—জাতীয় বিলাপের মাধ্যমে ভুবনেশ্বরের মার্জনা লাভ করিয়া পরকালটি পাকা করিবেন। বুদ্ধি, বিবেক এবং হৃদয়ের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও যে জীব, হায়, ইহা বুঝে না যে, অকর্মণ্য দাসের শত সহস্র কাতর কৈফিয়তেও মালিকের মনে করুণার উদ্রেক করা যায় না, মহারাজ তাহার কি কখনও উদ্ধার হয়?"

এইরূপ বলিয়া মুণ্ডটি পিড়িং পিড়িং করিয়া এধারে ওধারে বাতাসের বেগে ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে উহা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া আসিলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুণ্ড, তুমি কে? কেনই বা তুমি এইভাবে বর্তিকাদণ্ডে ঝুলিতেছ? আর কতকালই বা এই ভাবে ঝুলিবে?"

মুণ্ড কহিল, "মহারাজ আমি এই নগরীর প্রকাণ্ডতম মূর্খ। তাই ঝুঁকি লইতে আমার বাধে নাই। আমি একদিন কয়েকটি গেরিলার সাক্ষ্য পাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মহারাজ, আপনি তো ভালই জানেন, প্রশ্ন করা মূর্খেরই স্বভাবধর্ম, সেই স্বভাবধর্ম অনুসারেই বলিয়াছিলাম, ভ্রাতঃ তোমাদিগকে দেখিয়া তো চৈনিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না, তবে তোমরা কেন চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলিতেছ? তবে কি আমাদের দেশ মহান চীনের পদানত হইয়াছে? এই কথা শ্রবণমাত্র তাহারা আমাকে ঘিরিয়া সিদ্ধান্তে আসিল, চেয়ারম্যানের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি একজন শ্রেণীশত্রু এবং চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসাবে আমার মুণ্ডচ্ছেদ অতীব আবশ্যক। তদানুসারে এক কোপে ধড় হইতে আমার মুণ্ডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা এই বর্তিকাদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখিয়া গেল। যাইবার পূর্বে সম্মুখস্থ প্রাচীরপাত্রে অমোঘ অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গেল, ভারতের মাটিতে চীনের চেয়ারম্যানের অবমাননা যে করিবে তাহার ছিন্নমুণ্ড এইভাবে ঝুলিবে। মহারাজ তদবধি আমি এইভাবে ঝুলিতেছি। যাবৎ পঞ্চভূতে গঠিত আমার এই মুণ্ড যে যাবৎকাল পঞ্চভূতে বিলীন না হইবে, তাবৎকাল আমি এই উপাখ্যান জনে জনে শুনাইতে থাকিব।"

অকস্মাৎ দমকা বায়ুর ধাক্কায় মুণ্ডটি ঘুরিয়া গেল। দুলিতে দুলিতে ঝুলিতে ঝুলিতে আমার যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল কেহ কোথাও নাই। ততক্ষণে ঊষার আকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। অগ্নিগোলকের ন্যায় শিশু সূর্যের ভাস্কর মুণ্ড দৃশ্যমান হইয়াছে। বায়ুহিল্লোলে দুলিতে দুলিতে বর্তিকা-দণ্ডস্থিত মুণ্ডটির সহিত গগন-বিহারীর চারিচক্ষের মিলন হইতেই দুই মুণ্ড পরস্পরকে যুগপৎ একবার চোখ মারিল। তারপর মুণ্ডটি একবার নিজের দিকে চাহিয়া মূর্খের মতো বেপরোয়াভাবে হা হা শব্দে হাসিতে থাকিল।

প্রেমঢাকের বোল

সমরেশ বসু

শ্রাবণী'র পাঠকদের জন্য যে কী গল্প লিখবো ভেবে পাচ্ছি না, অথচ লিখবো বলে আসর জাঁকিয়ে বসেছি। যদিও ইচ্ছে থাকলেও, তেমনি নিটোল গল্প আর খুঁজে পাই কোথায়। নিটোল গল্পের রাজ্যে দাবড়ে, তছনছ করে, যখন গল্পের কানাকড়িটিও খুঁজে পাই না, তখন অবিশ্যি পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে ছলাকলা করে থাকি, এবং কখনো কখনো হয়তো বা ছলার জায়গায় কলা-ও মিলে যায়। সে কলা অবিশ্যি কদলী নয়, আর্টের উপলক্ষেই বলছি। কিন্তু ভাগ্যে তা কতটুকুই বা মেলে।

যাই হোক, প্রথমেই স্বীকার করি, জটিল চিন্তা, সূক্ষ্ম ভাবনা, মনস্তত্ত্ব বা গভীর গাঢ় কোন রোমান্টিক প্রেমের গল্প আমার মোটেই আসছে না। আকাশ ভরা মেঘ ছাওয়া এই বর্ষার দিনে রবীন্দ্রনাথের চিরস্মরণীয় সেই 'একরাত্রি'-র মতো গল্প, নির্বাক দুটি মানব-মানবীর মৌন বেদনার হাহাকার, আকাশভরা মেঘ, চারিদিকে প্লাবন—পড়তে পড়তে বুক টনটনিয়ে ওঠা উদাস ব্যথা—না, সেরকম কোন গল্পও আমার মনে আসছে না। যা আসছে তা অনেকটাই রিমঝিম বৃষ্টিতে ছুটির দিনের হালকা মেজাজের আসর জমানো গল্প, তাও অনেকটা আলো কালোর ধন্দে ভরা।

গল্পটা বলার আগে একটি কাহিনী মনে এসেও আসছে না। খুব ছোটবেলায়, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ নিয়ে, ছোট দৈর্ঘ্যের একটি ছায়াছবি যেন দেখেছিলাম। কাহিনী মনে নেই এখন, খুব হেসেছিলাম, মনে আছে। বড় হয়ে আমার এক বন্ধুর মায়ের মুখে একটি গল্প শুনেছিলাম। বর্ধমানের কোন এক গ্রামের তিনি ব্রাহ্মণগিন্নি। তাঁদের বাড়ির পাশে থাকতো এক গোপ দম্পতী। যদিও পেশায় গোপ ছিল না। দরিদ্র কৃষক পরিবার, তাদের গুটিকয় সন্তান। স্বামীটির নাম কেতুচরণ। কিন্তু দম্পতির দাম্পত্য কলহ যেমন উচ্চস্বরে বাজতো, তেমনি কলহটি ছিল প্রায় প্রাত্যহিক। আর কলহ লাগলেই স্বামী ছুটে যেতো বাড়ির পিছনে কল্‌কে ফুলের গাছের কাছে। পটাপট কতগুলো কল্‌কে ফুলের বিচি ছিঁড়ে নিয়ে এসে, হামানদিস্তায় ছেঁচতে বসতো উঠোনের মাঝখানে। উদ্দেশ্য আর কিছু না, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা। কারণ স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা অসহ্য। তখন স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ শোনা যেত এইরকম—

স্ত্রী — হুঁঃ, মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।

স্বামী — পাতালেশ্বর শিবঠাকুর সাক্ষী। আত্মঘাতী হব হব হব।

এই সংলাপের সঙ্গে হামানদিস্তার ঠং ঠং বেজেই চলতো। আবার—

স্ত্রী — হুঁ, অমন তিন সত্যির মুখে আগুন।

স্বামী — শিবঠাকুরের বাবা এলেও ঠেকাতে পারবে না। মরবো মরবো মরবো।

স্ত্রী — ভাতের হাঁড়িতে হাতা নাড়তে নাড়তে আওয়াজ দিতো 'হাড় জুড়োয়'।

স্বামী — বিধবা করবো।

স্ত্রী — শান্তিতে থাকব।

এই সময়েই ব্রাহ্মণগিন্নির আবির্ভাব হতো। জিজ্ঞেস করতেন, 'ও কী করছ কেতু?'

কেতু কাঁদো কাঁদো গলায় বলতো, 'কলকে ফুলের বিচি ছেঁচছি বামুন খুড়ি। বিষ খেয়ে মরবো। ইস্তিরির খোয়ার আর সইতে পারি না।'

কেতুগিন্নিও সমান তালে বাজতো, 'অমন সোয়ামীর খোয়ার থেকে যেন বাঁচি।'

ব্রাহ্মণগিন্নি বলতেন, 'কেতু বৌ, তুই চুপ কর। তা হ্যাঁ বাবা কেতু— সব কিছুরই একটা দিনক্ষণ থাকে। আজ আর বিষ খেও না।'

কেতু — না বামুনখুড়ি, আজ আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। বৌমানুষের এত চোপা?

ব্রাহ্মণগিন্নি — তা ঠিক, তবে এই ভরদুপুরবেলা রান্নাবান্না হয়েছে। এখন খাওয়া-দাওয়া কর। সময় তো আর চলে যাচ্ছে না। নেহাত বিষ খেতে হয়, ওবেলা খেও।

কেতুচরণ চুপ। কিন্তু হামনদিস্তার ঠং ঠং বেজে চলেছে। ব্রাহ্মণগিন্নি আর একটু অনুনয় করে বলতেন, 'ওভাবে কি মুখের ভাত ফেলে যেতে আছে? অন্ন বলে কথা।'

তখন হামনদিস্তার ঠং ঠংও থামতো। কেতু হতাশ স্বরে বলতো, 'বলছো বামুন খুড়ি?'

ব্রাহ্মণগিন্নি — বলছি বৈকি বাবা। এখন ওসব তুলে রেখে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসো।

আমার বন্ধুর মা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণগিন্নির কাছে এ গল্পটা যে কতোবার শুনেছি। শুনে জিজ্ঞেস করতাম, 'মাসীমা, তারপর?'

মাসীমা বলতেন, 'তারপরে আবার কী। ঝগড়ার খোয়ারি কাটাবার জন্য, সাঁঝবেলায় দুজনের হাসি আর কলকলানি শুনে, আমাদেরই লজ্জা করতো। প্রেম ঢাকের বোল্ কখন কী তালে বাজে কেউ বলতে পারে না।'

এই গল্পের ভূমিকার পরে যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আমি শুনেছি। এবং ঘটনার সঙ্গে নিজেও একটু জড়িয়ে পড়েছিলাম।

ঘটনাস্থল ছোট একটি মফঃস্বল শহর। রাত্রি দশটা বেড়ে গিয়েছে। ঝুপঝুপ বৃষ্টি। এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো। বাড়ির কুকুরটির সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। ভৃত্য গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখি, আমার এক বন্ধু মাখন এসে উপস্থিত, যদিও সে আমাকে দাদা বলে ডাকে। জামা ট্রাউজার ভেজা। উসকো খুসকো চুলও ভেজা। পায়ের স্যাণ্ডেলে কাদা। চোখে অসহায় উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

মাখন এতোই বিমর্ষ, প্রথমে কোন কথাই বলতে পারলো না। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

মাখন বিমর্ষ মুখে, ক্ষীণস্বরে বললো, 'তা ঘটেছে।'

'কী ঘটেছে?'

মাখন যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে বললো, 'কী আবার যা ঘটে থাকে।'

বলেই আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। ওর এই ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলাম, আর কিছুই না, ওর স্ত্রী মালতীর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঝগড়া করে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম,

'মালতীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?'

মাখন যেন হাতাশায় আরো বেশি ভেঙে পড়লো। সোফায় এলিয়ে পড়ে বললো, 'আর পারি না।'

একদম না পারার ঘটনা মাখনের জীবনে এতো ঘটেছে যে আমি তেমন বিচলিত বোধ করলাম না। তার আগে মাখন সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ দিয়ে নেওয়া যাক। জুটমিলে ও একটা ভালো চাকরিই করে। বছর আটেক আগে মালতীকে প্রেম করেই বিয়ে করেছে। সম্প্রতি একটি বাড়ি করেছে, এবং বাড়ির দলিলটি মালতীর নামে আছে।

মাখন একহারা রোগা রোগা, কিন্তু স্বাস্থ্যটি ভালো। ওর মুখের ভাবটা সব সময়েই চিন্তিত, অসহায়, উদ্বিগ্ন এবং সব সময়েই যেন ব্যস্ত। সেই তুলনায় মালতী মোটমুটি দেখতে ভালোই। একটা আলগা চটক আছে। কথাবার্তা আচার আচরণে একটু খরো বলা যায়। ওদের এখন দুটি সন্তান। বড়োটি মেয়ে, ছোটটি ছেলে। মেয়েটি মাখনেরই ভক্ত বেশি, ছেলেটি মা ন্যাওটা।

যাই হোক, মাখন-মালতীর ঝগড়ার কথাতেই আসা যাক। কী নিয়ে যে প্রায়ই ওদের ঝগড়া লাগে, তা আমরা তো দূরের কথা, ওরা নিজেরাই সঠিক জানে কী না সন্দেহ। কিন্তু মাখন মালতীর ঝগড়া লেগেই আছে। একটা কারণ, সম্ভবতঃ মাখনের বাড়ির সামনেই, ওর শ্বশুরবাড়িটা থাকার জন্য। মাখন প্রায়ই বলে, 'এই কানের কাছে কানাইয়ের বাসা, এটাই আমাকে জ্বালালে।'

ওর ধারণা, ওর শ্যালক শ্যালিকারা সব সময়েই ওর বিরুদ্ধে মালতীকে রাগিয়ে রাখে! কথাটা যে সবটা সত্যি না, তা আমরা ভালোই জানি। মাখনের শ্যালক-শ্যালিকারা সেরকম মানুষ না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কী ঘটেছে?'

মাখন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আদতে কী ঘটেছে তা এখন আর মনে করতেই পারছি না। তবে কিছু একটা নিয়ে খিটির মিটির লেগেছিল।'

আমিও সেটা জানি, মাখনের এখন আর ওসব খেয়াল নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা এই বৃষ্টি মাথায় করে, এত রাত্রে বাইরে বেরিয়েছ কেন?'

মাখন একটু মাথা নেড়ে, করুণ স্বরে বললো, 'কিছুক্ষণ আগে ক্লাবে তাস খেলে বাড়ি গিয়েছিলাম। মালু আমার মুখের ওপর কোলাপসিবল গেটে তালা বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'আবার এমুখো কেন? সব তো ঘুচেই গেছে। এখন যেখানে খুশি সেখানে যাও।' বলে লাইট অফ করে অন্ধকার করে দিল। আমারও রাগ হল। এখানে চলে এলাম।'

আমি একটু বিরক্তিভাবে বললাম, 'তার মানে কি? মালতী শুধু শুধু ওরকম করবে কেন? তুমি কী করেছ?'

মাখন উদাস বিষণ্ণ চোখে খানিকক্ষণ আমার বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপরে সনিশ্বাসে বললো, 'দুপুরে যখন ঝগড়া হয় তখন বলেছিলাম, ওকে আমি ডিভোর্স করবো।'

গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

মাখন বললো, 'তারপরে বিকেলবেলা মিল থেকে ফেরার সময়, কোম্পানীর একটা ছাপানো চার্জশীট ফর্ম নিয়ে মালতীর সামনে ধরে বললাম, "এই নাও ডিভোর্সের কাগজ, এতে

সই করে দাও।" তুমি তো জানো, ও তেমন লেখাপড়া জানে না। কাগজটা হাতে নিয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। মনে হল, মালার তখন কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু আমি কিছু না বলে, জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুতে চলে গেলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলাম, আমার চা আর খাবার টেবিলে রাখা। মেয়ে এসে বললো, "বাবা, মা রান্না ঘরে বসে কাঁদছে। তুমি কি মাকে বকেছ?" আমি কোনো জবাব না দিয়ে, মেয়ের মুখে একটা খাবার পুরে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, ওষুধ ধরেছে। এতদিনে মালুকে একটু ঘায়েল করা গেছে। আমি চা জলখাবার খেয়ে ক্লাবে চলে গেলাম। সত্যি বলতে কি মনটা বেশ খুশি খুশিই ছিল।'

মাখন থামলো। আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, আর ভাবছি চার্জশীটের ফর্মকে ডিভোর্সের দলিল বলে চালানোর কূট বুদ্ধির কথা।

মাখন বললো, 'তারপর খেলে-টেলে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরেছি। মালতী যেন মুখিয়েই ছিল। আমি যেতেই আমার মুখের ওপর সেই কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "নাও, তোমার বিয়ে ভাঙার কাগজে সই করে দিয়েছি।" কাগজটা নিয়ে আমি ঢুকতে গেলাম, তখনই দরজায় তালা দিয়ে—বলতে গেলে তাড়িয়েই দিল।"

আমি হাসবো না রাগবো বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মালতী কি সই করেছে নাকি।'

মাখন পকেট থেকে ভেজা ভেজা দোমড়ানো একটা কাগজ বের করে দিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি চার্জশীটের ছাপানো ফর্ম। তার নিচে, মালতীর বাংলা হস্তাক্ষরে সই, 'মালতী দেবী'। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি ধারণা, মালতী এটা ডিভোর্সের কাগজ ভেবেই সই করেছে?"

মাখন বললো, 'সেই ভেবেই তো আমার মাথাটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মালু তো পরিষ্কার বলেই দিল, "সব তো ঘুচেই গেছে।" তার মানে কী?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'তা এখন কী করবে?'

মাখন অতি অসহায়ভাবে বললো, 'তুমি দাদা আমাকে একটু ঘরে তুলে দিয়ে এস।'

এরকম একটা আর্ত প্রার্থনাই আমি আশা করেছিলাম। তা ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। ভৃত্যকে ছাতা দিতে বললাম। ছাতা নিয়ে সাইকেল রিকশায় চেপে মাখনের বাড়ি গেলাম। তখনো সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবছি, কার খোয়ারি কে ভাঙছে, মাখনের বাড়ি পৌঁছে রিকশাকে অপেক্ষা করতে বলে দরজায় গিয়ে মালতীর নাম ধরে ডাকলাম। এক ডাকেই সাড়া পেয়ে বুঝলাম, সে জেগেই ছিল। আলোও জ্বললো। মালতী কিন্তু খুব ব্যস্ত না। খুব গম্ভীর এবং শীর্ণ। দেখলেই বোঝা যায়, খায়নি। গেটের তালা খুলে দিয়ে বললো, 'কী ব্যাপার, আপনি এত রাত্রে? আসুন।'

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মাখন নেই। অন্ধকারে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমি অনুনয়ের স্বরে বললাম, 'বুঝতেই পারছো, কেন এসেছি। আর ঝগড়াঝাটি করে কী হবে ভাই, মিটমাট করে নাও। মাখনকে ঘরে ডেকে নাও।'

মালতী গম্ভীর মুখে বললো, 'কেন, ও তো আমাকে ডাইভোর্স করেছে, জানেন না? আমি তো কাগজে সই করে দিয়েছি।'

আমি হেসে বললাম, 'দূর পাগল, ওটা কী ডিভোর্সের কাগজ নাকি? ওটা তো—।'

মালতী বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'জানি, ওটা মিলের একটা বাজে কাগজ। কত্তো মুরোদ জানা আছে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করে জানলে মিলের বাজে কাগজ?'

মালতী বললো 'কেন, বাবার বাড়ি গিয়ে আমার দাদাকে দেখালাম। দাদাই বলে দিল।'

সঙ্গে সঙ্গে মাখনের গর্জন শোনা গেল, 'ওই, ওই জন্য বলি, কানের কাছে কানাইয়ের বাসা। তা না হলে তোমার মুরোদ হত ওই কাগজে সই করা?'

মালতী তেড়ে উঠলো, 'তোমারই কী মুরোদ ছিল, আসল কাগজ এনে দেওয়া? মিথ্যুক প্রবঞ্চক।'

মাখন আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, আমি হুকুমের স্বরে বললাম, 'এই মাখন, ঢোকো ভেতরে ঢোকো। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'

মাখন মালতী দু জনেই কয়েক পলক চুপচাপ। মালতী মাখনকে আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে বললো, 'বৃষ্টিতে ভিজে আবার ন্যাকামি করছে। তারপরে সারারাত্তির আমাকে গরম তেল মালিশ করতে হবে। ঢুকবে কী না বলো।'

মাখন একবার আমাকে দেখলো। তারপরে কিছু না বলে ভেজা বেড়ালের মতো ভিতরে ঢুকে গেল। আমি মালতীর দিকে তাকালাম। ওর চোখে হাসি চিক্‌চিক্ করছে, ঠোঁটের কোণেও। আমিও হেসে বললাম, 'চলি।'

মালতী বললো, 'একটু বসবেন না?'

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'সেটা কি এখন উচিত হবে?'

মালতী মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠলো। আমি বিদায় নিলাম। আর ভাবলাম, প্রেমের ঢাকে কখন যে কী বোল্ বাজে কে জানে!

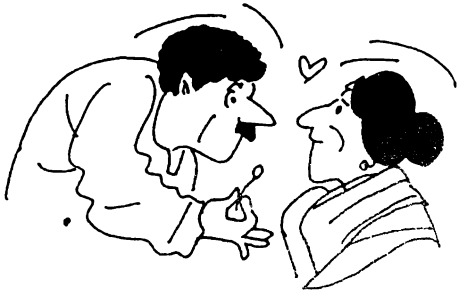

অনবরত অবিশ্বাস্য

মহাশ্বেতা দেবী

অনবরত বাগচী বললেন—হ্যাঁ, একটা হীরের আংটি দিয়ে আমি একটি বাঘ, একটি সাপ ও একটি গণ্ডারকে মেরে ছিলাম। কিন্তু সে কথা শোনার আগে আপনাদের জানতে হবে বুড়ো অ্যানসন সাহেব উনিশশো পঞ্চান্ন সালের মিস মিচিগানকে বিয়ে করলেন কেন। আমরা অনবরত বাগচীর সব কথা বিশ্বাস করতে সচেষ্ট হলাম।

অনবরত বাগচী বললেন ডরোথী পাকার পঞ্চান্ন সালে সুন্দরীদের কম্পিটিশনে মিস মিচিগান হয়েছিলেন। অ্যানসন্ দেন্সন মিচিগান স্টেট থেকে সুন্দরীদের খরচ-খরচা দিয়ে পাবলিসিটি দিয়েছিল। হলিউড ঘুরে এজেন্টের কাছে ধর্ণা দিয়ে ডরোথী যখন হয়রান, তখন অ্যানসন্‌কে বিয়ে করে বসল, কিছুদিন বৌকে হীরে দিয়ে মুড়ে রেখে রেখে হঠাৎ দেখা গেল অ্যানসনের কারবার ফেল। শেষ কালে তেল কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে এদেশে উপস্থিত। লোকটার ঘোর সন্দেহ বাতিক। মালিকের হাঁটুতে বসে ডরোথী বিয়ার খাচ্ছে এই দেখেই সে মালিককে বোতল ছুঁড়ে মারল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে জলডুবিতে কেন সে জলডুবির একস্ হাইনেস-এর সঙ্গে ঘুরছিল, সে কথা যদি জানতে চান তাহলে আপনাদের জানতে হবে জলডুবির মাটিতে তেল কেমন করে পাওয়া গেল।

জেনে রাখুন জলডুবি থেকে একশো মাইল উত্তরে তখন তেল কোম্পানী আর ভারত সরকার পেট্রোল খুঁজে পেয়েছে। জলডুবির মহারাজের তখন জলে ডোবার অবস্থা। অ্যানসন্ জেনসনকে হাতি চড়িয়ে তিনি নিয়ে এলেন। মেমসাহেবকে তাঁবু দিয়ে হারেম বানিয়ে দিলেন। অ্যানসন্ মাটি শুঁকে টুকে বললে—ইওর হাইনেস, এর তলায় পেট্রোল টুবটুব করছে। তুমি অবস্থা ফিরিয়ে ফেলবে। আমি তোমাকে সব ব্যবস্থা করে দেব। আমায় কি দেবে বল?

জলডুবির মহারাজ মোটা টাকা কুবল করে বসলেন। তারপর অ্যান্সন গমবুট পরে কুলী কামীন আর জিওলজিস্ট নিয়ে জলডুবির মাটি ঠুকরে বেড়াত লাগল। এমনি করে তিন মাস কাটল।

তেল আর মেলে না। অ্যান্সন—রাগের চোটে গোঁফ উপড়ে ফেলল। গাঁয়ের পুরনো বুড়োরা বলতে লাগল—তেল আর কি একটা আশ্চর্য জিনিস! আগে আগে আমরা মাটিতে তীর ছুঁড়তাম। অমনি পিচকিরি দিয়ে তেল উঠতে থাকত। সে সব জায়গা রাজামশাই কেনার দরে খুড়তুতো ভাইকে বেচে দিল। এখন খুড়তুতো ভাই তার জমি থেকে লাল হয়ে গেছে। মহারাজা আঙুল চুসছেন। সন্ধ্যেবেলা অ্যানসন্ তাঁবুতে ফিরে ডরোথির সাথে ব্যবস্থা করে ডরোথী বলে—বুড়ো, তুই আমার টাকা দে। আমি দেশে চলে যাই। টাকা না পেলে সব গয়নাগাঁটি

মহারাজকে বেচে দেব।

অ্যানসন্ বলে—ডার্লিং অমন সর্বনাশ করো না। মহারাজ রোজ যাতে দু'জন পাকা চোরকে ডরোথীর বাংলোতে পাঠান। তারা সারা গায়ে সরষের তেল মেখে চুরি করতে ঢোকে। অ্যানসন্ রোজই তাদের জাপটে ধরে তারা পিছলে পালিয়ে যায়। ডরোথী মনের সুখে ঘুমায়। গয়নাগুলো সে কোমরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। অ্যানসন্‌কেও সে বিশ্বাস করে না। অ্যানসন্ রোজ সকালে মহারাজকে বলে লোক দুটোকে গন্ধ তেল মাখতে বলো। নইলে গ্রীজ। সরষের তেলের গন্ধ ভেরি ব্যাড। মহারাজ বললেন—হোয়াট নন্‌সেন্স। আমার ক্ষেতের সরষের তেল! অ্যানসন্ বলে—ভেরি গুড্ ফ্রয়েড্ বিজ্ঞ। নো গুড্ ফর থিবস্। এই রকম সময়ে আমি গিয়ে পৌঁছলাম। আমি গিয়ে পৌঁছলাম কমিশনার কারিয়াপ্পার চিঠি পেয়ে। কেননা ততদিনে, জলডুবির বাঘটি সতেরোটি সুন্দরী মেয়েকে মেরেছে। আঠারো নম্বর সুন্দরী মেয়ে বলতে ডরোথী জেন্‌সন্। অতএব বাঘটাকে মারার জন্যে আমারই ডাক পড়লো।

অনবরত বাগচি নস্যি নিয়ে বাঘের এই প্রেমিক-প্রেমিক অথচ হিংস্র-হিংস্র চরিত্রটি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন—বাঘটার সুন্দরী মেয়েদের উপর দুর্বলতা ছিল। সে পুরুষদের ধরতো না। কালো কুচ্ছিত মেয়েদের ছুঁয়ে দেখতো না। কারিয়াপ্পার শাশুড়ীকে যখন ধরে নিয়ে গেল, মনের আনন্দে কারিয়াপ্পা অফিস ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু উল্টেপাল্টে রং দেখেটেখে বাঘটা মিসেস আয়ারকে ঠিক সন্ধ্যেবেলা পৌঁছে দিয়ে গেল। মহারাজ তার চার নম্বর বৌকে রং মাখিয়ে-টাখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জিভ দিয়ে চেটে তাঁর আসল রং দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে বাঘটা প্যালেসের দোতলায় এসে মহিলাকে বসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি দেখেন তাঁর তিন সতীন আর স্বামী মিলে আনন্দে সিদ্ধির শরবত খাচ্ছেন। দেখে রাগের চোটে রাজবাড়ির খাস রাধুনি-বৌকে নিয়ে তিনি বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। রাঁধুনীর বৌটির ওপর মহারাজের নেক নজর ছিল। বলতে নেই তার রং-টংগুলোও দিব্যি ছিল। বাঘটা তাকে নিয়ে লুফতে লুফতে চলে গেল। মনের দুঃখে মহারাজ তিনদিন বাড়ি এলেন না। মাচায় বসে বসে দেশী মদ খেলেন। কিন্তু সে সব কথা অবান্তর।

আমি অনুধাবন করে বুঝলাম, বাঘটার মধ্যে প্রথমটা প্রেমিক চরিত্রটা প্রবল থাকে। সে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের সামনে নিজে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পাল্টে নানা রকম ভাবে নিজের আকুলতা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অ্যানসনের স্বচক্ষে দেখা। তারপর, সেই সব লাফঝাঁপ করতে করতে যখন ক্ষিদে পেয়ে যায়, তখন, একমাত্র তখনই হয়তো—কিন্তু সে সব কথাও থাক।

আমি যখন জলডুবি পৌঁছলাম, তখন বিকেল হয়েছে। ফরেস্ট-বাংলার সামনে ফোয়ারার ধারে, কলাপাতা রঙের ঝালোর দেওয়া, সামলা, আর ফুলের মালা পরে ডরোথী একলা বসেছিল।

আমি টুপি খুলে বললাম—সুন্দরী, তোমাকে রক্ষা করবার জন্যেই আমি এসেছি। আমি বাগচী—দি গ্রেট হান্টার। বলে ডরোথী আমার দিকে চাইল। তৎক্ষণাৎ আপনাদের বোধ হয় না বললেও চলবে, আমরা দুজনে প্রেমে পড়ে গেলাম।

ডরোথী আমায় বলল—অ্যানসনের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে আমি জংলী হয়ে গেলাম, পেট্রলিয়ম-এর কথাটা রাজাকে কেন বলছে অ্যানসন্, আমি জানি। আসলে অ্যানসনের হাতে

একটাও পয়সা নেই। আমি যেতে চাইলে সে আমায় বাধা দিচ্ছে। তাছাড়া সে আমাকে একটা ভীষণ চক্রান্তের কথা বলল। সে বলল, এখন তাকে নিয়ে অ্যানসনের ভীষণ মুশকিল। অ্যানসন্ চেষ্টা করছে জলডুবির মানুষখেকোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একেবারে ডরোথীর সামনে হাজির করতে। আমি বললাম, তাতে ওর স্বার্থ কি? ডরোথী বলল, বুঝতে পারছ না? আমাকে বাঘটা ধরে নিয়ে যাবে। আমার গয়নাগুলো নিয়ে ও সহজেই পালাতে পারবে। কেননা রাজা আর বেশি দিন আমাদের এভাবে রাখতে পারবে না। আমি বললাম—আমাকে তলব করে আনবার প্রয়োজন কি ছিল?

ডরোথী বলল, আহ্, তাও বুঝতে পারছ না? গয়নাগুলো তো আমার কাছেই থাকে। আমাকে বাঘটা মারবে, তুমি মারবে বাঘটাকে। গয়নাগুলো পাবে অ্যানসন্। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।

আমি আর ডরোথী প্ল্যান করলাম ডরোথীকে সামনে বসিয়ে আমি বাঘটাকে ডেকে এনে মারব। তারপর অ্যানসন্ আর রাজাকে বেঁধে রেখে জিপ নিয়ে পালাব দূরে। এরোড্রাম থেকে প্লেন নেব কলকাতা হয়ে সোজা আমেরিকা তারপরে আমি আর ডরোথী কোন সমুদ্রের ধারে গিয়ে হোটেল খুলব।

—টাকা পাবে কোথায়?

ডরোথী বলল—আমার গয়নাগুলো তো কলকাতায় বেচব না। স্টেটস্-এ গিয়ে বেচব। রাজাকে যখন তুমি বাঁধবে দেখবে ওর কোমরে ট্রেজারীর সমস্ত টাকা বাঁধা আছে, ওকি রানীদের বিশ্বাস করে?

সব জলের মতো সহজ তরল বোধ হল। তাই, অ্যানসন্ যখন এল, তাকে আমি সহজভাবে অভ্যর্থনা করতে পারলাম।

এবং সেই রাতেই, অ্যানসনের অনুমতি নিয়ে আমি আর ডরোথী জঙ্গলে গেলাম।

বাঘ এল না। জঙ্গলে জোঁক ছিল, বিছে ছিল। হাজার হাজার কাঠ পিঁপড়ের বাসা ছিল। তবু, সময় বৃথা নষ্ট না করে আমরা ঘুরে ঘুরে বাঘের খোঁজ করলাম। বাঘ এলো না।

এদিকে সকলের মেজাজের মিটার তখন ধাপে ধাপে উঠেছে ডরোথী আর অ্যানসন্ দিন রাত ঝগড়া করছে। রাজার ভাব গতিক বোঝা যায় না। তবে অ্যানসন্ আমাকে বলেছে—জিপটা নিয়ে আমি তুমি আর ডরোথী তিনজনেই পালাই চল।

আমি কিছু বলছি না।

এমনি সময় ডরোথী বলল—দেখ আর দেরী করে লাভ নেই। একসঙ্গে সবগুলো সম্ভব হবে না। আমি আর তুমি পালাই চলো। আপাততঃ কমিশনারের কাছে পালাব। সে নিশ্চয় আমাদের একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। তাই ঠিক করলাম। রাত যখন একটা হবে, ডরোথী আসবে। স্কুটার চড়ে চল্লিশ মাইল পালান আমার কাছে কিচ্ছু না।

আমি জলডুবির মহারাজার বিখ্যাত লোকটির পাশে গিয়ে বসলাম। রাইফেলটা পাশে রেখেছি। মনের মধ্যে একটা বিষণ্ণতার ভাব। বাঘ মারতে এলাম। বাঘ উধাও। বাঘিনী নিয়ে পালাচ্ছি আমি, এটা যেন ঠিক বীর শিকারীর কোডে পড়ছে না। মিলছে না।

একটা বাজতে পাঁচ। হঠাৎ পায়ের কাছে, জলের নিচে একটা শব্দ একটা আলোড়ন। মশায়, মহারাজার পোষা কুমিরটার ঘোলাটে চোখ দুটো আমি সামনে দেখতে পেলাম।

কুমিরটাকে মারা আমার পক্ষে অত্যন্ত সোজা। কিন্তু আমি চিন্তা করতে লাগলাম, মহারাজার পোষা কুমীর, তাকে মারবার কি কোন অধিকার আছে আমার? ঘাড়ের কাছে কে যেন নিঃশ্বাস ফেলল। তখন ঘাড় ফিরিয়ে আমি যা দেখলাম, তাতে আমার রক্তও ঠাণ্ডা হতে থাকল। আমার ঘাড়ের কাছে ভালোবেসে নিঃশ্বাস ফেলছে একটা সাপ। ঐ সব জলা জায়গা ছাড়া বুঝি গোখরোর অমন বেয়াড়া সাইজ হয় না। আর সবচেয়ে আপত্তিকর কথা হলো, সাপটা আমার দিকে চাইছে না। সে আমার ওপাশে যার দিকে চেয়ে আছে চেহারা থেকে বুঝতে আর দেরি হল না, সেই হল জলডুবির সেই বিখ্যাত বাঘ। যে আমাকে এখানে টেনে এনেছে। যাকে না পেয়ে আজ আমি এইখানে, এই অবস্থায় বসে আছি।

আমি আমার ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। আমি স্মরণ করতে লাগলাম ভারতীয় বাঘ শিকারীদের ভগবান কুমুদ চৌধুরীকে এবং জিম করবেটকে। আমি প্রার্থনা করলাম এবং মনশ্চক্ষে দেখলাম করবেট তাঁর গোঁফ, তার প্রিয় কুকুর রবিনকে। চৌধুরী মশায়ের চেহারাও স্মরণ করলাম। আমি অনতিবিলম্বে তাঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছি, একথা ভাবতে অসুবিধা হল না।

বাঘটা অনেক দিন কোন শিকার পায়নি।

সাপটা নিঃসন্দেহে ভালোবেসে একটা ছোবল দেবে। কুমিরটা অতি সহজে আমাকে হজম করতে পারবে।

তখন আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম। এবং যারা ছোটদের গল্প লেখে, তাদের কাছে ক্ষমা চাইলাম, আমি অপরাধ করেছি। তারা যখন শিকারীদের ডাঙায় বাঘ এবং জলে কুমীর-এর মধ্যে বসিয়েছে, আমি তাদের মুণ্ডপাত করেছি। আজ এই অন্তিম সময়ে আমায় বলতে হল, যে তারা সত্যদ্রষ্টা, তারা ভুল করেনি। আমি চোখ বুজতে চাইলাম। চোখ বুজতে পারলাম না। তখন সমস্ত দৃশ্যটায় একটা চমৎকার ব্যালে নৃত্যের কম্পোজিসন এসেছে।

কুমীর এগোচ্ছে। এক-দুই-তিন চার সাপটা দুলছে। পাঁচ-ছয় সাত-আট ....বাঘটা ল্যাজ নাড়ছে। নয়-দশ-এগারো-বারো....

আর নয়। এবার একটা কিছু হোক। আমার সমস্ত নার্ভগুলো চেঁচিয়ে উঠল।

একটা কিছু হল।

ডরোথী এবং অ্যানসন্ এবং রাজা একসঙ্গে এলো। আমি শুনলাম ডরোথী বলছে—সমস্ত গয়নাগুলো ঝুটো? জাল? তুমি সেগুলো কলকাতায় বেচে দিয়েছ? আমাকে ঠকিয়েছ? আমি বাগটীর বন্দুক দিয়ে তোমাকে.....

অ্যানসন্ বলছে—ডরোথী সব ঝুটো। সব জাল। কিন্তু আংটিটা সত্যি। ওটা তোমার আঙুল থেকে আমি খুলতে পারিনি। তাছাড়া, ঐ আংটিটার হীরেটা ভীষণ দামী।

ডরোথী—আমি বিশ্বাস করি না বলে ডরোথী সাপটার ল্যাজ মাড়িয়ে দিল, দিয়ে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল।

ডরোথী নয় বাঘটা।

দীর্ঘ দিন পরে সুন্দরী একটা মেয়েকে দেখে বাঘটা যেভাবে উল্লাসে চীৎকার করল, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না।

আমার, শ্রোতারা তখন গল্পের এই ধরনের না বলে না কয়ে বিপজ্জনক মোড় নেওয়ায় ধাক্কায় প্রায় ধরাশায়ী হয়েছে।

অনবরত বাগচী বললেন, 'ডরোথী আংটিটা খুলতে চেষ্টা করেছে। বাঘটা লাফ দিচ্ছে। সাপটা ঝুঁকে পড়ছে। কুমীরটা হাঁ করছে। ডরোথী আংটিটা খুলল। আংটিটা ছুঁড়ল। মশায়, মেয়েরা যখন বুঝতে পারে পুরুষেরা তাদের ঝুটো গয়না দিয়ে ঠকিয়েছে, তখন তারা সাপের ল্যাজে পা দিয়ে বাঘের দিকে ছুটে যেতে দেবে এ আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। এবং আমার রাইফেলটা তখনই ছুটে গেল। আমি স্বচক্ষে দেখলাম আমার রাইফেলের গুলি বাতাস থেকে ডরোথীর আংটিটা লুফে নিয়ে নিদারুন ভেলোসিটিতে মাটি ফুটো করে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাজা, অ্যানসন্ ডরোথী সবাই ঐক্যতানে চেঁচিয়ে উঠল। আমি চোখ বুঁজলাম।

তারপর?

তারপর? মশাইয়েরা কল্পনা খাটান, মগজের পরিধি বিস্তার করুন। কেননা, নইলে এ দৃশ্যের উপসংহার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। সাপটা ছোবল দিয়েছিল বাঘটাকে। বাঘটা সাপটার মাথায় কামড়ে বিষের জ্বালায় মরতে মরতে লেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। কুমিরটা সাপ ও বাঘটাকে একসাথে গিলতে গিয়ে যেভাবে মরলো, তার ডাক্তারী নাম হলো অ্যাফিক্সিআ অর্থাৎ গলায় ফাঁস লাগা। অর্থাৎ গলায় সবটা আটকে দম বন্ধ হয়ে অতি বেদনাদায়ক মৃত্যু। তারপর?

—তখন আমাদের চোখের সামনে হীরের আংটির ফুটো দিয়ে, মাটির তলা থেকে পিচকিরি দিয়ে তেল উঠছে। হীরের ধাক্কা কি কম? খাঁটি হীরের ধাক্কায় জলডুবির নরম মাটি ফুটো। এবং সঙ্গে সঙ্গে তেলের আত্মপ্রকাশ। সেই তো দেখে রাজা অ্যানসনকে জাপটে আদর করছে। ডরোথী অ্যানসন্‌কে বলছে—ডার্লিং। কেননা, ডরোথী সেই তখনই তেলের ফোয়ারার মধ্যে অনেক হীরের আংটি, অনেক বাচ্চা দেবে এই ছলকানি দেখতে পাচ্ছে। আমি যে সেখানেই আছি, আমি যে একটা মানুষ, সে দিকে ডরোথী একবারও তাকালো না।

তিনি অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন। একটি গল্পের ঘায়ে আমাদের মূহ্যমান রেখে তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে দেখলাম, তিনি ছাতি নিচ্ছেন। তিনি সিগারেটের টিন পকেটে রাখছেন। আমরা শুনলাম—"ডরোথী এবং অ্যানসন দেনসন এমন গরমকালে সুইজারল্যান্ড যায়। মোটরে চড়ে বিলেতে যায় তেহেরান হয়ে। মশায়রা, মেয়েরা বিশ্বাস করবেন না। এ আমার জীবন দিয়ে শেখা এক নির্মম অভিজ্ঞতা।"

ছাতাটা খুলতে খুলতে তিনি বললেন—'বিদায়।'

আমরাও বললাম, 'বিদায়'।

আমাদের গলায় কোন উত্তাপ ছিল না। কেন না, আমি আমার ছাতাটাকে বিদায় জানালাম। রাজেনবাবু বিদায় জানালেন তার সিগারেটের টিনটিকে।

আমরা বুঝলাম, ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোন দিন দেখা হবে না।

গুরুতর কিছু নয়

হিমানীশ গোস্বামী

ই স কী করেছিস রে! নায়কের নাম শিবনারায়ণ। নায়ক শিবনারায়ণ কখনো হতে পারে? সীতারাম ভুরু কুঁচকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারে আমার দিকে।

'হতে পারে না? আমি বলি। কেন নামটা খারাপ কি? আমার দু-পাঁচজন সুপরিচিত ব্যক্তির নাম শিবনারায়ণ। তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কেবল প্রতিষ্ঠিত নয়, সু-প্রতিষ্ঠিতও বটে।'

'উহুঁ! আমার বন্ধু সীতারাম বলে, ও-সব নাম আজকাল আর চলে না। ও-সব বিদঘুটে নাম। কেন নায়কের নাম দু অক্ষরে করা যায় না?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই করা যায়। রঘু নামটা কেমন লাগে তোর?'

'মন্দ নয়।' সীতারাম বলে। 'রঘু নামটা বেশ ভাল। ছোট হলেও লঘু নয়। অমান্য করা যায় না। বেশ, তাহলে শিবনারায়ণের জায়গায় রঘুই করে দে। শিবও করতে পারিস।'

'শিব?'

'মন্দ কি।' সীতারাম বলে, 'একটা দুশো পাতার বই থেকে হাজার তিনেক নারায়ণ কাটলেই চলবে। সময় বেঁচে যাবে অনেকটাই, যেটা ছাপানো বইয়ের পক্ষে হয়তো অত জরুরি নয়, কিন্তু টিভি-র পক্ষে দারুণ প্রয়োজনীয়। ধরা যাক একটা পুরো বছরের সিরিয়ালে সপ্তাহে ত্রিশবার শিবনারায়ণ কথাটা উচ্চারিত হবে, তাতে ধরা যাক সময় লাগবে পঁচিশ সেকেণ্ডে ছত্রিশবার হিসেবে.....।'

'পঁচিশ সেকেণ্ডে ছত্রিশবার হিসেবে, মানে?' আমি প্রশ্ন করি।

সীতারাম আমার দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতেই বোধহয় তাকায়। সে বলে, 'এসব হিসেবের ব্যাপার। অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে শিবনারায়ণ কথাটা ছত্রিশবার বলতে লাগে পঁচিশ সেকেণ্ড। সপ্তাহে গড়ে ছত্রিশবার হবে পনেরশ'বার বলতে লাগে হাজার একচল্লিশ সেকেণ্ড। অর্থাৎ প্রায় সতের মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ড লাগে। এদিকে নামটি ছোট করায়, বেঁচে যাচ্ছে বছরে প্রায় বারো মিনিট। এখন ধর টিভির প্রাইম টাইমে.....।

প্রাইম টাইম কি হে? ওটা প্রাইম মিনিস্টার টাইম হবে বোধ হয়? যেভাবে প্রধানমন্ত্রী ঘন ঘন টিভির কাঁচের উপর হানা দেন তাতে প্রাইম মিনিস্টার টাইমই হবে।

'তুমি একটা অজাড়ুত!' সীতারাম বলে। 'টিভি-র প্রাইম টাইম কথাটা শুনিসনি কখনও?'

'শুনবো কোত্থেকে?'

'তা বটে।' সীতারাম সহানুভূতির সুরে বলে, 'আজকাল কেউ কথা শোনে না, সব সময়েই লোকেরা কেবলি বলে চলেছে, বকে চলেছে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা তোকে বুঝিয়ে বলি, 'এই

যে প্রায় কোটিখানেক টিভি আমাদের দেশের গৃহস্থালীর ঘরে ঢুকে গেছে, সেই টিভির সামনে বসে থাকার লোকসংখ্যা যে সময় সবচেয়ে বেশি হয় সেই সময়টিকে বলে প্রাইম টাইম। তোর প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'তবে কথাটা তেমন মিথ্যেও নয়।' আমি ভাবতে ভাবতে বলি, 'প্রাইম মিনিস্টারকে দেখবার জন্য তো কোটি কোটি লোক টিভির সামনে বসে থাকে, অতএব প্রাইম মিনিস্টার টাইম আর প্রাইম টাইম একইরকম হল না?'

সীতারাম বলে, 'তা সে হিসেবে কথাটা ঠিক। কিন্তু টিভি কতৃপক্ষ তো সর্বদা প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান দেখাতে পারে না, তাই বাধ্য হয়েই রোজ কিছু কিছু অন্য অনুষ্ঠানও দেখান। দেখা গেছে, রবিবার সন্ধেয়, তা তুমি যে হিন্দি ফিল্‌মই দেখাও না কেন তার সামনে বিপুল সংখ্যক শিশু, নারী, বৃদ্ধ, বালক, নাবালক, নাবৃদ্ধ, যুবক, নাযুবক, নাশিশু প্রত্যেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এখন ঐ সময় যদি দশ সেকেণ্ড তুমি তোমার সাবান বেচতে চেয়ে বিজ্ঞাপন দাও, নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে যুবতীরা যদি বলে কেনো কেনো কেনো, এই সাবান কেনো, তাহলে তোমাকে দিতে হবে পঁচিশ হাজার টাকা, ক্যাশ ডাউন! কিংবা বোধহয় আরও বেশি, ঠিক জানি না।'

'পঁ-পঁ-পঁচিশ হাজার টাকা, দশ সেকেণ্ডে?' কথাটা বলতে বলতে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তাতেই প্রায় ষোল সেকেণ্ড লেগে যায়। প্রাইম টাইমের রেটে যার দাম চল্লিশ হাজারেরও বেশি। সাংঘাতিক ব্যাপার!

'তার মানে,' সীতারাম বলে, 'তার মানে বারো মিনিটে কত হয় হিসেব করেছিস? আঠারো লক্ষ টাকা।'

সীতারাম বলে আর বাঘের মতো দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করতে থাকে। আমি বলি, আঠারো লক্ষ টাকা! সে যে অগাধ জলের মতো সম্পত্তি। উঃ কেবল শিবনারায়ণ থেকে শিব করলেই যদি এত টাকা বেঁচে যায় তাহলে ওর উপাধিটাও রায়চৌধুরী থেকে রায় কিংবা সেন করে দেয়া দরকার।

'উঁহুঁ উঁহুঁ, সেন নয়। সেন কভু নয়। আমাদের দেশে ঝামেলা কি কম? সেন চলবে না। বরং রায় হতে পারে।' সীতারাম রায় দেয়।

'কেন, সেন নয় কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'মাস্ মিডিয়ার ব্যাপার স্যাপার তো তোমার জানা নেই।' সীতারাম বলে, 'সেখানে সেনসেশনাল কোনও কিছু চলবে না।'

'তা সেনই তো কেবল, তাতে ক্ষতিটা কার? ইনসেন্ হলেও না হয় একটা কথা ছিল। আমি একটু ক্ষুব্ধভাবে বলি। আমারই লেখা উপন্যাসের নায়কের নাম আমিই পছন্দ করতে পারব না?'

'শুধু সেনে কোনও অসুবিধে ছিল না।' সীতারাম বলে, 'এর সঙ্গে ঐ শিব কথাটা দেওয়া যাবে না একেবারেই। বোম্বাইওয়ালারা কেউ কেউ এই ব্যাপারে তাণ্ডব শুরু করতে পারে তো। ঢাকঢাক গুড়গুড় করার দরকার কি! আমাতে তোমাতে কথা, তৃতীয় কারুর কর্ণগোচর হচ্ছে না তো। বোম্বাইয়ের কেউ কেউ—বুঝলি তো কারা?'

'উঁহু!' আমি হতাশভাবে বলি।

'শিবসেনা রে, শিবসেনা!' সীতারাম বলে, 'শুনেছিস তাদের নাম এবং কীর্তিকলাপ? ওরা যখন দেখবে টিভির নায়কের নাম শিব সেন, ওরা ধরেই নেবে ওটা ওদের বিরুদ্ধে লেখা। ঐ

এক ঝামেলা হয়েছে এই মাস্ মিডিয়া কারবারে। যাই করো না কেন লোকেদের মধ্যে বেশ কিছু লোক ধরে নেয় এটা কোনও ব্যক্তির ব্যাপার নয়, ব্যক্তির নাম করে তাদের উপর আক্রমণ হানা হচ্ছে।'

'তা আক্রমণ কোথায় হল?' আমি বলি, 'শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী লোকটি তো খারাপ নয়। উচ্চশিক্ষিত, আদর্শবান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘুষখোরদের স্বরূপ উদঘাটন করে, এক মন্ত্রীর দেড় হাজার বিঘে গোপন জমির সন্ধান করে সেটা নিয়ে গণ আন্দোলন করে। এক চোরাবাজারীর গোপন কারবার ফাঁস করতে গিয়ে তার বিধবা মেয়ে নিরুপমাকে নিরুপায় হয়ে বিয়ে করতে চেষ্টা করে, কিন্তু দু'বছরের চেষ্টাতেও অভীষ্ট পূরণ না হওয়ায় সে ছাদ থেকে লাফিয়ে মরতে যায়, কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ভূমিকম্প আর সমুদ্রের উচ্ছ্বাস একসঙ্গে শুরু হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে একটি জঙ্গলে যেখানে ঘুষখোর পুলিশের অফিসার এবং একজন দুশ্চরিত্র এম এল এ শিবনারায়ণকে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করছিল। ঐ ভূমিকম্পে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয় না, সমুদ্রের জলে সমস্ত বদমায়েস, এম এল এ, চোরাকারবারী ইত্যাদি ভেসে যায়, কেবল বেঁচে থাকে শিবনারায়ণ আর নিরুপমা। দৃশ্যের পর দৃশ্য উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চকরতা.....।'

সীতারাম বলে, 'উত্তেজনা আর রোমাঞ্চকরতা আছে বলেই তো করতালিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে এই আসমুদ্র হিমাচলের সৎ নাগরিকবৃন্দের ঘর। কোটি কোটি লোক লেখককে জানাবে অভিনন্দন! তবে কি না মিডিয়ার খাতিরে এই গল্পের কিছু পরিবর্তন করা দরকার। বুঝলি, তোর দেওয়া নাম 'আর্তনাদ' ছাপা বইয়ের পক্ষে মন্দ নয়। হয়ত ভালই। কিন্তু বুঝলি তো ব্যাপারটা তো মাস্ মিডিয়া। ভেবে দেখ হিমাচল প্রদেশের সাধু থেকে কোঙ্কনের অনূঢ়া কন্যা সকলেই প্রতি সপ্তাহে সিরিয়াল দেখতে বসে থাকবে। এ তো আর বই নয় যে যার ইচ্ছে হল সে কিনল বা কিনল না, যার ইচ্ছে হল সে পড়ল বা পড়ল না, দুশো পাঁচশো লোকের ব্যাপার, এ বাবা সিরিয়াল—আগেই বলেছি রবিবারের প্রাইম টাইমে যেমন হিন্দি ছবি, একটা বোধ হয়, শনিবারের এক প্রাইম টাইমের জন্য কথাবার্তা চলছে। এক কোটি টিভি, গড়ে সাতজন লোক, অর্থাৎ সাত কোটি লোক তোর লেখা গল্প প্রত্যক্ষ করছে। এখানে আর্তনাদ নাম শুনেই অনেকে দেখার ব্যাপারে ইতস্তত করবে। কেউ কেউ হয়তো টিভি বন্ধ করে দেবে। বাস্ তার সংখ্যা যদি শতকরা দশও হয় তাহলে স্পনসরের যে মাল সেটার বিক্রি যতখানি হওয়ার কথা তার চাইতে মোটামুটি শতকরা দশভাগ কমে যাবে, হুঁ হুঁ বাবা, এসব ব্যাপার আয়ত্ত করার জন্য অনেক কাঠখড় বাঁধতে হয়।'

'কাঠখড় পোড়াতে হয় এইটেই তুই বলতে চাস তো?'

'উঁহুঁ!' সীতারাম বলে, 'ওসব কথা এখন শিকেয় তুলতে হবে। এককালে কাঠ-খড় পোড়ানোর একটা ব্যাপার ছিল বটে, তাতে কারুর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হত না, হলেও কেউ অত সচেতন ছিল না। এখন লোকেরা সচেতনতার পরাকাষ্ঠায় উঠে গেছে, এখন কাষ্ঠ বল খড় বল দুম করে পোড়ান যাবে না।'

'কেন?' আমি বলি।

'কেন নয়?' সীতারাম বলে, 'এখন আবার দেখতে হবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, কি হচ্ছে না। তা কাঠখড় পোড়ালে ভারতের বনজ সম্পদের যে ক্ষতি হয় তার আর চারা থাকে না। তার

উপর কাষ্ঠ এবং খড়ের ধোঁয়ায় পরিবেশও দূষিত হয়।'

আমি ভাবতে থাকি নাচার হয়েই। তারপর বলি, 'কেন চারা দু-একটা পুঁতে দিলেই হয় বন-মহোৎসবের কোনও এক মহালগ্নে! তাহলেই চারা থাকবে।'

সীতারাম বলল, 'তোর মাথায় কী যেন আছে। গোবরই হবে!'

আমি বলি, 'তা যদি হয় তো ভালই মাল আছে রে! গোবর হচ্ছে জৈব-সার। তার উপর যদি এটা পচাস তাহলে হবে জৈব-গ্যাস, আর যদি শুকোস তাহলে হবে ঘুঁটে! যাই হক তুই আমার মাথায় গোবরের কথা বলছিস সেটা নিন্দার্থেই তো?'

সীতারাম বলল, 'বুঝেছিস সেটা? যাক তাহলে তোর মাথায় পুরো গোবর নেই। এখন আসল কথায় আসা যাক।'

'আসল কথা?' আমি প্রশ্ন করি। 'আসল কথাটা আমার আর মনে পড়তে চায় না সহজে। কী যেন ব্যাপার নিয়ে সব শুরু হয়েছিল? এঃ এর মধ্যেই ভুলে গেলাম?'

সীতারাম আমার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকায়। বলে, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিস?'

আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম।

সীতারাম বলল, 'তা ভোলার কথাই, কেন না ব্যাপারটা ঠিকমত আমি বুঝিয়ে বলিনি। তোর একটা গল্প, যার নাম আর্তনাদ, তার কথা হচ্ছিল। ওটাকে একটা স্পষ্ট প্রস্তাব হিসেবে আমরা, মানে আমাদের সংস্থা মাস্-কভার—আমরা তিন পার্টনার মিলে যেটা করেছি আর কি উপযুক্ত স্পন্সরের কাছে পেশ করছি, তারপর স্পন্সরের ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেটিকে আবার দূরদর্শনের সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর কাছেও পেশ করতে হবে। এই দুটি ছাড়পত্র পেলেই বলা যাবে সফল অভিযান।'

'অভিযানের পর নগদ কত আসবে তোদের?'

এবারে গদগদ হয় সীতারাম। বলে সে, 'অনেক টাকারে ভাই, অনেক টাকা। যদি গল্পটা টেনেটুনে বাহান্নটা এপিসোডে ভাগ করা যায় আর এক একটা এপিসোডের জন্য পাই তিন লাখ, খরচ হয় এক লাখ, ঘুষ—এই যাঃ, এই কথাটা একেবারেই ব্যবহার করতে চাইনি আমি, আসল কথাটা হবে অন্যান্য খরচ এপিসোড প্রতি কুড়ি হাজার, পাবলিসিটি এবং ওভারহেড লাখ দশেক। তাহলে বেশ চমৎকারই হাতে থাকবে আমাদের মাস্-কভার-এর।'

'আর লেখক? মানে আমার ভাগে মাস-কাবারে কত থাকবে?'

সীতারাম একটু হাসে। বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, লেখকের কথাও ভাবা হয় বৈকি! তবে শেষের দিকেই তাঁদের হিসেব মেলাতে হয়। তা ধর তোর ঐ বই থেকে যা পেয়েছিস তার পরিমাণ কত?'

আমি একটু বাড়িয়েই বলি, 'দশ হাজার!'

সীতারাম বলে, 'তা ঐ অত পরিশ্রম করে যা পেয়েছিস আমাদের কাছ থেকে তার ডবল পাবি, কেবল একটা কাগজের তলায় একটা সই করলেই!'

আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। বলি, 'যাক আমার লেখাটা তাহলে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যাবে। মানে সাত কোটি লোক সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস দেখে যাবে আর আমার নাম ছড়াতেই থাকবে!'

সীতারাম বলে, 'তবে আর বলছি কি? গল্প অবশ্য যার-তার একটা হলেই চলত, কিন্তু

তোরটাই বেছে নিলাম আমি, কেন না গল্পের তো আর কিছু শেষ পর্যন্ত থাকে না!'

'শেষ পর্যন্ত কিছু থাকে না?' আমি বলি, 'গল্পের শেষ পর্যন্ত কিছু থাকে না? এতেও আমার মৃদু উত্তেজনা থামে না, ক্রমশ যেন তা চড়াইয়ের দিকে এগুতে থাকে। 'কি বললি, গল্পের শেষ পর্যন্ত কিছু থাকে না?'

সীতারামকে একটু হতভম্ব দেখায়। কি বলবে ভেবে পায় না যেন। তারপর একটু গুছিয়ে নেয় নিজেকে। বলে, 'শোন একটা কথা। গল্প লেখা আর নাটকের মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তা তো জানিস। দুটো দু'রকমের পাত্র। একটা যদি হয় গেলাস, অন্যটা হল গিয়ে কাপ। ভেতরে মাল একই, কিন্তু দুটোর উপলব্ধি আলাদা। আবার ঐ একই জল যদি মদিরাপাত্রে রাখিস তাহলে মনে হবে ঐ জলই মদিরা। মানে, ব্যাপারটা হল এই যে, নাটক এবং ছবির মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। আবার ঐ একই নাটক নিয়ে দুশো পরিচালক দুশো ছবি করলেও প্রতিটি হবে আলাদা। ওটাই হল জীবন, বাস্তব—এ থেকে সরে আসা যায় না। গল্প তো লেখা অবস্থায় লাইনের পর লাইন—ওর আর বদল করা যায় না, করলে একমাত্র লেখকেরই তা করা উচিত, কিন্তু যখনই তাকে অন্য পাত্রে ঢালছ অর্থাৎ পাত্রস্থ করছ তখন সে গল্পকে পাত্রের মতই হতে হবে। তাই, গল্প তো আর ঠিক যেমনটি ছিল, সিনেমায় তো তা থাকবে না। কিভাবে শুরু হবে, কে বা কারা অভিনয় করবেন, কে ছবি তুলবেন, তিনি ঠিক কি কি দেখাবেন সেটা আর তখন গল্পলেখকের আওতায় থাকে না, থাকা উচিতও নয়; যেমন ধর একটা বিমান মাটিতে যখন, তখন একরকম, আর সেটা যখন আকাশে তখন আর একরকম—দু জায়গায় দুটো নিয়ম।'

'বুঝলাম।' আমি বলি, 'আমার গল্পটা তাহলে আর আমার গল্প থাকছে না!'

'দুঃখের কিছু নেই রে।' সীতারাম বলে, 'এ দুঃখ সমস্ত লেখকের পক্ষেই খাটে। তুই তো কোন ছার—কথাটা ভাল অর্থেই ব্যবহার করছি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বার্নাড শ, ক্রনিন কেউই এই দুঃখের হাত এড়াতে পারেননি। এবার তোকে বলি, কিভাবে তোর গল্পটাকে কিছু কিছু বদলাতে হবে।'

'আমার আপত্তি থাকলে?'

'তোর মত প্রকাশ নিশ্চয় করবি। তবে কিনা ভাল কথা বলছি, ওসব মতপ্রকাশ যতটা না করিস ততটাই স্বর্ণীয়।'

'স্বর্ণীয়?' আমি মৃদু-স্বরে বলি।

সীতারাম বলল, 'স্বর্ণ থেকে স্বর্ণীয়—কেন হঠাৎ কথাটা আচমকা লাগছে? আস্তে আস্তে সয়ে যাবে। যাই হোক, এবারে শোন্—তোর গল্পটার প্লট মোটামুটি, সহজ কথায় সরল বাক্যে এই—তুই নিজে একটু আগে যা বলেছিস তা লিখে নিয়েছি, আবার তোকেই পড়ে শোনাই। শিবনারায়ণ রায়চৌধুরী উচ্চশিক্ষিত, আদর্শবান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘুষখোরদের স্বরূপ উদঘাটন করে, এক মন্ত্রীর দেড় হাজার বিঘে গোপন জমির সন্ধান করে, সেটা নিয়ে গণ-আন্দোলন করে। এক চোরাবাজারীর গোপন কারবার ফাঁস করতে গিয়ে তার বিধবা মেয়ে নিরুপমাকে নিরুপায় হয়ে বিয়ে করতে চেষ্টা করে। পরে বাপের অত্যাচারে প্রথমে মদ খেয়ে নিজেকে শেষ করার চেষ্টা করে, কিন্তু দু-বছরের চেষ্টাতেও তার অভীষ্ট পূরণ না হওয়ায় সে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে যায় কিন্তু ঠিক ঐ সময়ে ভূমিকম্প আর সমুদ্রের উচ্ছ্বাস একসঙ্গে শুরু হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে একটি জঙ্গলে যেখানে

পুলিশের একজন ঘুষখোর অফিসার এবং একজন দুশ্চরিত্র এম এল এ শিবনারায়ণকে গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করছিল—ঐ ভূমিকম্পের ফলে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হয় না, সমুদ্রের জলে সমস্ত বদমায়েস পুলিশ, এম এল এ, চোরাবাজারী ইত্যাদি ভেসে যায়, কেবল বেঁচে থাকে শিবনারায়ণ আর নিরুপমা.....।'

সীতারাম থামে, একটু জল খায়। বলে, 'গল্পটা দারুণ চমৎকার। এর মধ্যে নিরুপমার মদ টানার দু'বছর সবচেয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করেছে আমাদের। তবে কি না ভাই, এক ঝামেলা আছে রে। ভাল কোনও চরিত্র মদ টানছে সেটা দেখানো যায় না একেবারে। তার উপরে নিরুপমা একজন ভদ্রঘরের মেয়ে। তাকে দিয়ে অতখানি মদ টানানো একেবারেই চলবে না।'

আমি বললাম, 'নিরুপমা মদ টানবে না? বলিস কি তুই অ্যাঁ? তাহলে সে কী টানবে?'

সীতারাম বলল, 'কেন , জল কিংবা নিম্বুপানি!'

আমি বেঁকে বসি। বলি, 'দ্যাখ সীতারাম তোর কি কিছুমাত্র বুদ্ধি হবে না রে? একটি মেয়ে যদি চোরাবাজারী বাপের অত্যাচারে নিজেকে শেষ করে দিতে চেষ্টা করে তাহলে সে কি জলপান করবে না কি নিম্বুপানি ধরবে?'

সীতারাম বলল, 'চোরাবাজারী বাপই তো থাকবে না গল্পে। ওটাও একটু বদলাতে হবে।'

'মানে?' আমার প্রশ্ন এবং বিস্ময়ে একই সঙ্গে লেপ্টে যায়।

'মানে মাস্-মিডিয়ার ব্যাপার। প্রথম কথা হল সুকন্যা, সুপুত্র, সুবাপ, সুমাতা ইত্যাদিদের পক্ষে টিভিতে মদ টানা নিষিদ্ধ। মদ টানতে পারে খুব বদমায়েস চরিত্রের কেউ। এখন আমরা ধরে নিচ্ছি নিরুপমা একজন সুকন্যা। এই সুকন্যাকে দিয়ে জল টানাতে পারো, আখের রস টানাতে পারো, সোডা ওয়াটার টানাতে পারো, বাতাবি লেবুর রস টানাতে পারো, তরমুজের রসও মোটামুটি টানানো যায়, যায় না তা নয়—কিন্তু নেশার কোন তারল্যের প্রতি তার টান থাকবে না, থাকতে পারে না।'

'মাস্-মিডিয়া?' আমি বলি, 'কিছু কিছু চলচ্চিত্রেও তো দেখি তরল পদার্থের প্রতি টান, তা চলচ্চিত্রও তো মাস্-মিডিয়াম?'

'চলচ্চিত্রে চলতে পারে তা।' সীতারাম বলে, 'কিন্তু বাবা, টিভি হল একে মাস-মিডিয়াম তদুপরি একেবারে সরকারি। তাও যে সে হুটকো রাজ্য সরকার নয়, একেবারে কেন্দ্রীয় সরকার! কেন্দ্রীয় সরকারি আইন-কানুন যদি একটু অমান্য করেছ কি তোকে কেঁদিয়ে ছাড়বে। তাঁদের অনেক সাবধান হয়ে পদক্ষেপ করতে হয়, যদিও, দুঃখের বিষয়, তাঁরা বিনা কারণেই অনেক সময় হস্তক্ষেপ করেন।'

আমি বলি, 'তা যদি ওরা একটু কষ্ট করে মস্তকক্ষেপ কিংবা মস্তিস্কক্ষেপ করতেন তাহলে বুঝতে পারতেন লেখকের স্বাধীনতার অধিকারকে তাঁরা খর্ব করছেন!'

'না রে, অত সহজ কারবার নয়।' সীতারাম বলে, 'ভেবে দেখ এই আমাদের মহাভারতের কথা। এই মহাভারতের আশী কোটি লোক সর্বদা গিজ গিজ করছে। তাদের মধ্যে মহান মহান সমস্ত ব্যক্তি ধর্ম সব থিক্‌থিক করছে। এদের সবারই খোদ ভাগ্যবিধাতা ভারত সরকার। ভারত সরকারের কতকগুলি ঘোষিত নীতি আছে, সংবিধান আছে, লোকসভা আছে, বাণিজ্য সভা আছে, আরও কত-শত সভা আছে, কত পথ আছে, কত পন্থা আছে, কত রাজ্য আছে, কত পন্থী আছে। এসবেরও কথা সমূহ বিবেচনা করা বিশেষ দরকার। আবার কিছু কিছু অঘোষিত নীতিও

আছে, সেগুলি ঘোষিত নয়, সেগুলি বুঝে সুঝে সামলে সুমলে চলতে হয়, যেমন ধর রাস্তার গর্ত! কোনও সরকারি হিসাব-পুস্তকে রাস্তার গর্তের সাক্ষাৎ পাওয়া দুরূহ হলেও সেগুলি জলজ্যান্তরূপে সুরূহ, এখন যদি তুই এগুলিকে যেহেতু পুস্তকে লেখা নেই বলে অমান্য করতে চাস তাহলে নিজেরই পায়ের কিংবা মাথার কিংবা পুরো শরীরেরই বারোটা বেজে যাবে! অতএব সাধু অসাধু সিকি-সাধু সিকি-অসাধু প্রত্যেকেই সাবধান! তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম, তোর গল্প থেকে নিরুপমার মদ টানা বাদ যাচ্ছে। এর বদলে সে কি টানবে সেটা পরিচালক ঠিক করে নেবেন, কিংবা আমাদের স্ক্রিপ্ট রাইটার স্থির করবেন। লেখকের স্বাধীনতা অবশ্যই চিরকাল ছিল এবং থাকবেও। তার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতেই পারে না এই মহাভারতে, তবে কিনা ঐ একটু আধটু যা ব্যতিক্রম, মেনে নিতেই হবে। অতঃপর আরও একটা বদলের কথা বলতে হয়, আসা করি তোর মত পাওয়া যাবে।'

'আরও একটা বদল?' আমার প্রশ্ন, 'গুরুতর কিছু নয় তো?'

'একদম গুরুতর নয়। ঐ তোর নায়ক শিবনারায়ণ—ও লোকটি দারুণ আদর্শবান। ঠিক আছে। ওরকম একটু পাগলাটে লোক থাকা ভাল, খুব হাসির খোরাক জোটাবে, কিন্তু ঐ যে বললি, গল্পেও পড়েছি, লোকটি বড়ই ইয়ে হে। মানে, ঘুষখোরদের স্বরূপ উদঘাটন করে কথাটায় একটা সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানা হয়।'

'কোন সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানা হয়?' আমি বলি।

সীতারাম বলে, 'কেন, ঘুষখোর সম্প্রদায়ের উপর! আমাদের এই মাস-মিডিয়ামের বিশেষ আইনে রয়েছে, কোন সম্প্রদায়ের স্বরূপ উদঘাটন করা চলবে না। উঁহুঁ! কোনও প্রকারেই নয়।'

'ঘুষখোর সম্প্রদায়কে তাহলে সমর্থন করতে হবে?'

'সমর্থনের কথা কে বলেছে তোকে? নিন্দে করা চলবে না। ঘুষখোর সম্প্রদায় হচ্ছে আবার লঘু সম্প্রদায়—এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যে-সব অবিচার চলছে সেটাই কত খারাপ, তার উপর তাঁদের স্বরূপ উদঘাটন? রাম কহ! এখন ঐ লোকটিকে দেখাতে হবে—ঐ লোকটির মানে তোর গল্পের প্রধান চরিত্র শিবনারায়ণকে দেখাতে হবে সে আন্দোলন করছে, যেমন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের ঘুড়ি ওড়ানোর অধিকার, কিংবা খুনে বাঘকে হত্যা করার অধিকারের মতো নিরাপদ কিছু। উঁহুঁ খুনে বাঘকেও হত্যা করা চলবে না—উঁহুঁ অন্য কিছু ভাবতে হবে। বন্যপ্রাণীদের আদর করার অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলতে পারে। কিন্তু তাও চলবে না রে, আসল কথা হল আন্দোলনটাই বড় বিশ্রী ব্যাপার, কেন না এই সুখের মহাভারতে আন্দোলন কথাটা আসেই বা কোত্থেকে? আন্দোলন কথাটা উচ্চারিত হলেই এটা ধরে নিতে হয় যে দেশে অন্যায় কিছু আছে, আর সেটাই তো মহাভারত টিভিতে দেখানো যাবে না!'

আরও একটা কথা মনে পড়ল। সীতারাম বলল, 'আরও একটু বদলের দরকার হবে রে। ঘাবড়াস না—দুনিয়াই তো বদলে যাচ্ছে না কি? শুনিসনি মহর্ষি মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, আজ ডাল খালি, কাল ফুলে যায় ভরে....? কিংবা কার্ডিনাল রিশলু বলেছিলেন এইসা দিন নেহি রহেগা, তার মানে তো স্পষ্ট। একটু আধটু তো বদলাবেই সব। তুইও তো শিশুটি নোস। এইবার সেই বদলের একটু আভাস দিই?'

আমি চুপ করে থেকেই সম্মতি দিই। সীতারাম বলতে থাকে, 'আরও একটা কথা বাদ দিতে হবে। মানে পুরো একটা চরিত্রই বাদ ফেলতে হবে। আমাদের দেশের মন্ত্রীর গোপনে দেড় হাজার

বিঘে নতুন জমির সন্ধান পায়—এটা খুবই অন্যায় কথা। আমাদের দেশের মন্ত্রীরা যেহেতু সংখ্যালঘু—জনসংখ্যার লাখে একটিও নয়, অতএব এখানেও তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু করা চলবে না, আন্দোলন তো নয়ই।'

'তারপর? আমি একটু বঙ্কিম ঢঙে বলি। সীতারাম তাতে খুব খুশি হয়। ধরে নেয় আমার সম্মতি রয়েছে পুরো। সে বলে, আরও সামান্য দু-চারটে ইয়ে আছে। ধর গিয়ে ঐ চোরাবাজারীর কথা—নায়ক তার কর্মে হস্তক্ষেপ করতে যায়, এটাও করা যাবে না। এটা হবে সংবিধানবিরোধী।'

'সংবিধানবিরোধী?' আমি আঁতকে উঠি। 'চোরাবাজারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সংবিধান-বিরোধী? ও বুঝেছি, তুই বলবি চোরাবাজারী হল সংখ্যালঘু, অতএব....।'

'সে তো বটেই।' সীতারাম বলে, 'সংখ্যালঘুদের অত লঘু করে দেখা যায় না। তবে এক্ষেত্রে সংবিধানবিরোধী বলছি এই কারণে যে, যে কোনও ব্যক্তির কাজ করবার স্বাধীনতায় কেউই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।'

'যদি কাজটা বেআইনি হয়?'

'সে তো দেশের পুলিস, আদালত, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এঁরা সব ঠিক করবেন। একজন লোক চোরাকারবার করছে বলেই ধরে নিতে হবে যে সে বেআইনি কাজ করছে? দেশের আইনকে তাহলে অবজ্ঞা করা হয় না?'

'হয় বুঝি?' আমার প্রশ্ন।

'হয়।' সীতারাম বলে, 'একশো বার হয়, হাজার বার হয়।'

'তাহলে বাদ দে।' আমি বলি, 'কী আর করা যায়। কুড়ি হাজার টাকা হুট করে পাওয়ার জন্য ওটা বাদ দেওয়া যায়। তবে এর জন্য যদি আরও দু-চার হাজারের ব্যবস্থা করিস তাহলে মন্দ হয় না।'

সীতারাম বলে, 'দাঁড়া না একবার মনোনীত হক স্ক্রিপ্ট, তারপর নিশ্চয় দু-পাঁচ হাজার বাড়ানো যাবে। এর পর আর একটা পয়েন্ট আছে। নিরুপমাকে বিধবা করেছিস কেন? যদিও আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ মোটামুটি চালু, মানে চলে আর কি, কিন্তু যাঁরা দর্শক তাঁরা তাঁদের সামনে এমন একটি মেয়েকে দেখতে চান না যার একবার বিয়ে হয়েছিল। তখনই দর্শকের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে স্বামী কে ছিল, স্বামী মরেছে কি না, মরলে পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় মরেছে কি না, দুর্ঘটনায় মরেছে কি না, নিরুপমা তার স্বামীকে মেরেছে কি না. কিংবা স্ত্রীর অত্যাচারে সে মরেছে কি না—মাস-মিডিয়ার সবচেয়ে বড় নীতি হল কোনও প্রশ্ন, বিশেষ করে গুরুতর প্রশ্ন যেন দর্শকের মনে, মাথায় বা অন্যত্র না আসে। বিধবাকে বাদ দিয়ে ওখানে কুমারী করলে গল্পের হেরফের হবে না।'

'বেশ। আমি বলি, তারপর?'

'বাপের অত্যাচারে মেয়েটি আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করল, ওর বদলে করতে হবে, মানে করলে ভাল হয় যে বাপের আদরে আত্মঘাতি হবার চেষ্টা করল। বাপের অত্যাচার চলছে অথচ পুলিস কিছু করছে না কেন এটা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষ থেকেই সতেরো-আঠারো বার ওয়াক-আউট হতে পারে।'

'বেশ তো!' আমি বলি, 'তারপর?'

সীতারাম বলল, 'আর সব বিশদ ব্যাপার, সে সব আমরা ঠিক করে নেব। মোটামুটি আমি

যা বললাম তা মেনে নিচ্ছিস তো? এই সামান্য পরিবর্তনে তোর নিশ্চয় আপত্তি নেই? অবশ্য আরও একটা পরিবর্তন করতে হবে, ঐ দুশ্চরিত্র এম এল এ-র চরিত্রকে ভাল করে দিতে হবে।'

আমি এবারে আমার মনের কথা খুলে বলি। বলি, 'দেখ আমি একজন সাহিত্যিক, তা মোটামুটি দুস্থ হলেও নুন আনতে পান্তা ফুরোয় না। কিন্তু আমার গল্পে এতগুলি গুরুতর পরিবর্তন ঘটাতে রাজি নই। আমার গেল কুড়ি হাজার টাকা, তা যাক্। কিছু মনে করিস না।'

সীতারাম স্তব্ধ হয়ে যায়। বলে, 'বহু সাহিত্যিককে দেখেছি, কিন্তু তোর মতো এরকম স্টুপিড...না কথাটা আমি বলিনি রে, ওটা আমার রাগের ভাষা, আসলে তুই কিছুই করতে পারবি না এই জীবনে.....।'

আমি বলি, দ্যাখ, 'আমার একটা আত্মসম্মান আছে তো। অতএব আমার গল্প নিতে হয় তো একটু আধটু বদল করতে পারো, কিন্তু সবটা বলদ মানে খোল-নলচে বদলানো আমি মেনে নিতে পারব না। ব্যাস্ এই আমার শেষ কথা।'

'একেবারে শেষ কথা?' সীতারাম করুণ দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে।

'একেবারে।' আমি জানাই।

সীতারাম তার ফাইল-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে আহত শেয়ালের মতো আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমিও দরজা বন্ধ করে কম দুঃখিত হয়ে বসি না। অনেক টাকার একটা সম্ভবনা বিনষ্ট হওয়া এই বাজারে কম ক্ষতিকর নয়।

এইখানেই গল্পটি খতম হয়ে যেতে পারত। কিন্তু গল্পের কয়েক লাইন তখনও বাকি ছিল, সেটা আমি বুঝতে পারিনি তখনও। এই শেষ লাইনগুলো এই—

সাতদিন পর সীতারাম টেলিফোন করে আমাকে। বলা বাহুল্য, আমি সে টেলিফোনে কথা বলতে পারি না, কেননা হ্যালো বলতেই কেটে যায়। অতঃপর সে আমার বাড়িতেই এসে হাজির হয় অতি উল্লাসিতভাবে। সে বলে, তোর সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি। সামান্য একটা বদল করছি, আর সব ঠিক থাকছে। মানে, নিরুপমাকে কুমারী করতেই হচ্ছে, ওটা একটা তোকে মেনে নিতেই হবে। আর মাত্র একটা বদল বুঝলি? শিবনারায়ণের নামটাও বদলাতে হবে—আগেই বলেছি, কিন্তু এই মানুষটিকে সুস্থ রাখা চলবে না। লোকটি পাগল, বদ্ধ পাগল—এটাই দেখাতে হবে, এবং সেটা গোড়া থেকেই তাহলেই একটা হাসির ব্যাপার দাঁড়িয়ে যাবে, এবং ট্র্যাজেডি গল্প পাবলিক নেয় না, কিন্তু এটা একেবারে লুফে নেবে! পাগল দেখলেই লোকে হাসবে—বাকিটা ঠিক থাকবে। কেমন, রাজি তো? এই সামান্য একটু বদলে রাজি হয়ে যা মাইরি!

আর কি, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি!

আকারন্ত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জগনমামা বললেন, তাহলে বাবা ঝন্টু, ততক্ষণ তুমি মামীমার সঙ্গে গল্পসল্প করো। আমি ঝটপট বাজারটা সেরে আসি।

বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে ডাকলেন, কই গো! ছাতিটা দাও বরং। এই সাতকালেই রোদ্দুরটা বড় চড়ে গেছে।

জগনমামার মাথায় এমন প্রকাণ্ড টাক আমি আশা করিনি। এতকাল পরে, ওঁকে দেখে খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। চেহারার কী দারুণ অদলবদল না ঘটে গেছে! রোগা খটখটে চেহারার মানুষ ছিলেন। এখন বিশাল পিপে হয়ে উঠেছেন। মুখের এমন প্রশান্ত হাসিও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এই মফস্বল শহরে এখন ওঁর উকিল হিসেবে বেজায় নামডাকও হয়েছে এবং তার কারণ সম্ভবত ওঁর চেহারার এই ভোলবদল। আগে এই শুঁটকে চেহারার আর খিটখিটে মেজাজের জন্যে মক্কেল যেমন জুটত না, তেমনি হাকিমরাও নাকি ওঁকে এজলাসে দেখলে চটে যেতেন। অবশ্যি, সবই শোনা কথা।

এও শোনা কথা যে জগনমামার স্ত্রী আত্মহত্যাই করেছিলেন। কৌশলে কলেরায় মৃত্যু বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। উকিলমানুষদের তো পেটে-পেটে বুদ্ধি।

বলে রাখা ভাল, জগনমামা কস্মিনকালে আমার মামাকুলের কেউ নন। ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যান। পাড়াগাঁয়ে সম্পত্তি রাখার নানা ঝামেলা। মামলা-মোকদ্দমার দায় সামলাতে হ'ত তাই মাকেই। সেই সুবাদে এই উকিল ভদ্রলোক মায়ের দাদা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবে পেতাম না, জগনবাবুর মতো উকিল কেন ধরেছিলেন মা! তখন আরও কত জাঁদরেল উকিল এ শহরে তো ছিল! মামলায় হেরে গেলেও দেখতাম, মা ফের এই ভদ্রলোকের কাছে এসে পড়েছেন।

হয়ত এটাই মানুষের অভ্যাস। চেনাজানা ডাক্তারের হাতে মরতেও রাজি যেমন, তেমনি উকিল-মোক্তারের বেলাও তাই। এখন মা নেই। আমি বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরেছি। আমি সেই একই অভ্যাসে এসে জুটেছি জগন উকিলের দরজায়। মামলায় হার-জিত ভবিষ্যতের কথা, —ছোটবেলা থেকে যাঁকে মামা বলে জানি, তার কাছে এসে দাঁড়ালে মনের জোর ভীষণ বেড়ে যায়।

তবে তার চেয়ে বড় কথা, জগনমামার এখন নাকি নামডাক হয়েছে। কাজেই আমার মনের জোর অনেক বেশি করেই বেড়েছে। আজ রোববার। আজকের দিন ও রাত্তিরটা জগনমামার বাড়ি কুটুম্বিতা এবং শলাপরামর্শ করা যাবে বলেই আসা। আগামীকাল ফার্স্ট আওয়ারে কেস

ঠোকা যাবে।

বুঝতে পারছিলাম, জগনমামা আবার বিয়ে করেছেন কবে। কিন্তু অবাক হচ্ছিলাম নতুন মামীমা একবারও ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না দেখে। ভেতরের বারান্দায় একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। জগনমামা ওপাশের কিচেন থেকে চা বয়ে এনেছেন। চায়ের খালি কাপপ্লেট উনি নিজেই রেখে এসেছেন। মামীমার পাত্তা নেই। জগনমামা ওঁর উদ্দেশে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু কোনো সাড়া আসছে না।

তাই ভাবছিলাম, একটা দাম্পত্যকলহ-গোছের কিছু ঘটে থাকবে। নাকি মামীমা ঠাকুরঘরে পুজোয় বসে আছেন?

জগনমামা ছাতি চাইলেন। তবু মামীমার সাড়া এল না। তখন জগনমামা মুখে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে উঠোন থেকে বারান্দায় উঠলেন। তারপর ছাতির খোঁজে ঘরে ঢুকলেন। ঘর থেকে ওঁর চাপা গলায় কতাবার্তা শুনতে পেলাম। একটু পরে বেরিয়ে এলেন ছাতি হাতে। মুখে প্রশান্ত হাসি। বললেন, তাহলে গল্পসল্প করো তোমরা। আমি ঝটপট ফিরব।

উনি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওদিকটায় আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শর্টকার্ট পায়ে চলার পথ অছে। গিয়ে উঠেছে বাজারের চওড়া রাস্তায়। এদিকটা একেবারে নিরিবিলি নিঝুম জায়গা। আশেপাশে বাড়ি বিশেষ নেই। গঙ্গার ধারে শহরের একান্তে এই বাড়িটার বয়স প্রাচীন। একটু তফাতে হাসপাতাল এলাকা। অন্যদিকটায় গঙ্গার পাড়ে বনদফতরের যত্নে সাজানো ঘন বন। ভাঙন আটকাতেই ওই নিরামিষ জঙ্গল। জগনমামার ভাষায় নৈমিষ্যারণ্য।

বাড়ি একেবারে চুপচাপ। গ্রীষ্মের এই সাতসকালে গঙ্গার দিক থেকে একটা হাওয়া এল শনশনিয়ে। হাওয়াটা খিড়কির দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে ঠাঁই ঠাঁই করে ঘুরতে থাকল। তারপর পাঁচিলের ধারে জবা ও শিউলির ঝোপ হুলুস্থুল করে পটাপট কিছু হলুদ পাতা ছিঁড়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। এই সময় আমার মনে পড়ল, যেদিকে গেল, সেদিকটায় শ্মশানবট এবং একটু পরে সেই উঁচু বটগাছের মাথায় ঝাঁকুনি লাগল।

কিছু করার না থাকলে আমার উদ্ভট সব অনুভূতি জাগে। হঠাৎ মনে পড়ল ছোটবেলায় দেখা মামীমা অর্থাৎ জগনবাবুর প্রথম স্ত্রীর কথা। আত্মহত্যা করলে মানুষ নাকি ভূত হয়। এমন নিরিবিলি বাড়িতে ভূতের পক্ষে হামলা করা ভারি সহজ। পুরনো মামীমার ভূত নতুন মামীকে জ্বালায় না?

কে জানে কেন, এ বাড়িতে রাতে থাকতে হবে ভাবতেই এবার অস্বস্তি লাগল। ভূতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভূতের ভয় আমার বেজায়-রকমের।

একটু কাশলাম। ভেতরের ঘর একেবারে চুপচাপ। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হঠাৎ নতুন মামীমা এলে লজ্জা পাব। আরও একবার কাশলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। দরজার দিকে তাকিয়ে আধআধ গলায় বললাম, মামীমা! আমি একটু ঘুরে আসি। শুনছেন? মামীমা!

কিন্তু সাড়া এল না। অদ্ভুত মহিলা তো! উঠোনে গিয়েও সাড়া পাব ভাবলাম। না পেয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগাছার জঙ্গলে ঢুকলাম। সিগারেট টানতে থাকলাম। জগনমামা বলছিলেন, সবসময় খালি তোদের গল্প করি। তোর মায়ের মতো মহীয়সী মেয়ে আর হয় না। আর তুই—কটুকুন ছিলি জানিস বাবা ঝন্টু? এই এ্যাটুকুন। আর কী ভীতু, কী ভীতু!

এতসব যদি শুনে থাকেন ভদ্রমহিলা, তাহলে আমাকে দেখার জন্যে বেরুলেন না কেন—কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না।

সিগারেট শেষ করে বাড়ি ঢুকে চমকে উঠলাম। কোত্থেকে একটা নেড়ি কুকুর ঢুকে পড়েছে যে! বারান্দায় গিয়ে ভেতরের ঘরের পর্দার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, মামীমা! কুকুর ঢুকছে! কুকুর!

তবু সাড়া নেই দেখে দৌড়ে গেলাম। কুকুরটা ঘরে ঢুকে পড়েছিল। লাথি খেয়ে কেঁউ করে উঠল এবং ডিগবাজি খেতে খেতে উঠোনে গিয়ে পড়ল। লেজ গুটিয়ে পালাল।

পর্দা তুলে উঁকি মেরে ডাকলাম, মামীমা! কিন্তু ঘর ফাঁকা! কেউ নেই। সেকেলে পালঙ্কের ওপর জগনমামার লুঙি পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলের দিকে তাকালাম! একগুচ্ছের স্নোপাউডার ইত্যাদি যথারীতি সাজানো। ওপাশে আলনায় কয়েকটা শাড়ি ও সায়া পর্যন্ত! সেগুলো অত ময়লা কেন ভেবে পেলাম না।

কিন্তু ঘরে একটা মেয়েলি গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। আবছা মনে হল, নতুন মামীমার বয়স নিশ্চয় জগনমামার তুলনায় ঢের কম। মেয়েলি গন্ধটা কি চুলের? স্নানের পর মেয়েদের চুলের এমন গন্ধ হয়। একটু লজ্জা পেলাম। এভাবে এঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। ভদ্রমহিলা ওপাশে কোথাও আছেন। এসে গেলে অপ্রস্তুতের একশেষ হব।

বেরিয়ে আসার আগে ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছবিটার দিকে চোখ পড়ল। পুরুষ ও মহিলার ছবি পাশাপাশি। কিন্তু চিনতে পারলাম না। শুধু দেখলাম, যুবতী মহিলাটি কেমন চোখে তাকিয়ে হাসছেন।

ঠিক এইসময় বাইরে জগনমামার সাড়া পেলাম। বহুভাগ্য দুটো গলদা পেলাম, বুঝলে? মোটে দুটো। যাক্ গে, এতেই হবে। আর ইয়ে, শোনো—দুঃচ্ছাই। ভুলে গেলাম যে!

ঝটপট বেরিয়ে গিয়ে দেখলাম, জগনমামা সদর দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন। বগলে ছাতি। একহাতে বাজার ভর্তি থলে। বললেন, এ অসময়ে ওদের বাড়ি না গেলে চলত না? ঝটপট ফিরে এস তাহলে। অবশ্যি আজ রোববার। বেলা করেই খাওয়া যাবে।

নতুন মামীমা তাহলে কিচেনে ছিলেন!

ঘুরে আমাকে দেখে জগনমামা একগাল হেসে বললেন, এই যে ঝন্টু! আলাপ হল মামীমার সঙ্গে? গল্পের রাজা। থুড়ি রানী! রানী! আর তুমি তো বরাবর ভূতের গল্প শুনতে ভালবাসতিস! এখন অবশ্যি বড় হয়েছ। তাহলেও মন্দ লাগবে না! কী বলো!

বলে চোখ নাচালেন। রাত্তিরে শুনবে'খন।

নতুন মামীমাকে তখন পর্যন্ত চোখে না দেখলেও বুঝতে পরেছিলাম, ভদ্রমহিলা খুব শান্ত ও চাপা স্বভাবের। কথাবার্তা বলেন হয়ত অতি সামান্য। যেটুকু বলেন, তাও যেন ভীষণ আস্তে গলার ভেতর। তাছাড়া বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপে হয়ত সংকোচ বোধ করেন, অথবা আদপে পছন্দই করেন না।

বাইরের ঘরে জগনমামার ওকালতির আপিস। আজ ছুটির দিন বলে বুঝি ওঁর মুহুরিবাবু আসেননি। সেই ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাইরে রোদ বেড়েছে। এখনই লু হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চারপাশে শুধু গাছপালার শনশন আর গঙ্গায় নাইতে যাওয়ার সরু গলিপথে ধুলোবালি আবর্জনার ঝড় বইছে শোঁ শোঁ করে। ভেতরে থেকে জগনমামার কথাবার্তার

আওয়াজ ভেসে আসছে। নতুন মামীমার সঙ্গে অনর্গল কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা ভারি অদ্ভুত বলব। সম্ভবত শুনেই যাচ্ছেন মুখ বুজে।

আর কৌতূহল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হল। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। জগনমামা কিচেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেবিলে তরকারি কুটছেন এবং কথা বলছেন। কিচেনের দরজা সামনাসামনি। ভেতরে কেরোসিন কুকার জ্বলছে। রান্না হচ্ছে। কিন্তু নতুন মামীমাকে দেখা যাচ্ছে না।

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে জগনমামা হেসে বললেন, এস বাবাজী। তোমার মামীমাকে বলছিলাম, ঝন্টু তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে। বিশুদ্ধ জল-বায়ু আর নির্ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষ হয়েছে। এ ভূতের জায়গায় অখাদ্য কি ওর রুচবে?

বলেই ভেতরের সেই ঘরের দিকে তাকালেন। তোমার অত কেন লজ্জা বলো তো? ঝন্টু বলতে গেলে আমার আপন ভাগনে। এস। কই? বেশ, এসো না। ফিরে গিয়ে তোমারই বদনাম করবে! অচেনা তো নয়। সেই ছোট্ট বয়সে কতবার দেখেছে। বড় হয়েছে বলে লজ্জা! আশ্চর্য!

আপনমনে ফের গজগজ করতে থাকলেন। তোমার এই একরোখামিই যত সর্বনাশের গোড়া।

আমি হকচকিয়ে গেছি ততক্ষণে। ছোট্ট বয়সে কতবার দেখেছ—এর মানে কী? তাহলে কি নতুন মামীমা আমার চেনাজানা কোনো মহিলা? জগনমামার হাবভাব দেখে কোনো কথা জিগ্যেস করতে সাহস হল না। বুঝলাম, আমার খুব পরিচিত মহিলাকেই বিয়ে করেছেন জগনমামা। এত পরিচিত যে মুখোমুখি হলে নিশ্চয় দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। তাই উনি দেখা দিচ্ছেন না। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। খুঁজেই পেলাম না তেমন কে হতে পারেন নতুন মামীমা?

দুপুরে খাবার সময়ও উনি এলেন না। জগনমামার মুখ গম্ভীর। সেটা খুবই স্বাভাবিক। টেবিলে সব সাজানো ছিল। দুজনে চুপচাপ খেলাম। খাওয়া হলে জগনমামা বললেন, ও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে নাও। সাড়ে পাঁচটার আগে উঠো না। গরম কমলে বরং ঘুরে এসো গঙ্গার ধারে।

লম্বা হয়ে গেল ঘুমটা। উঠে দেখি, টেবিলে চা ঢাকা আছে। নতুন মামীমা এসে দিয়ে গেছেন কি? বোধ হয় জগনমামাই। বাড়ির ভেতর চুপচাপ। চা জুড়িয়ে গিয়েছিল। কল্পনা করলাম, নতুন মামীমাই চা রেখে গেছেন এবং আশ্চর্য, সেই মিষ্টি মেয়েলি গন্ধটা অবিকল টের পেলাম।

দরজা ভেজিয়ে গলিরাস্তায় গঙ্গার ধারে ঘুরতে গেলাম। ঘণ্টা দুই পরে যখন ফিরে এলাম, তখন এদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। লোডশেডিং। দরজা বন্ধ থাকবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কড়া নেড়ে সাড়া না পেয়ে ঠেলতেই দেখি, তেমনি খোলা। ভেতরে ঢুকে ডাকলাম, জগনমামা!

সাড়া এল, আয় ঝন্টু! এখানে আয়।

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন জগনমামা কালো মূর্তিটি হয়ে। আলো নেই বাড়িতে। বললাম, আলো জ্বালেননি যে?

জগনমামা বললেন, অন্ধকার ভাল লাগে। আয়, এখানে আয়। কী গো! এখন তো ঝন্টু তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না—এবার কথা বলবে না কী? অ ঝন্টু, মামীমার সঙ্গে কথা বল্।

ডাকলাম, মামীমা! তারপর টের পেলাম অন্ধকার উঠোনে আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি শুধু আমি আর জগনমামা। হঠাৎ কেমন গা ছমছম করে উঠল। বললাম, জগনমামা! মামীমা কই?

এই তো দেখতে পাচ্ছিস না? জগনমামা অস্বাভাবিক গলায় বললেন। কই গো, ঝন্টুকে ছুঁয়ে দাও তো! আহা, দাও না'বাবা! বলতে গেলে আপন ভাগনে—ছোটবেলায় কত আদর করেছ!

হিহি করে অদ্ভুত হাসি হেসে জগনমামা আমার একটা হাত টেনে অন্য হাতে অন্ধকারে অদৃশ্য মামীমার হাত টানার ভঙ্গি করতেই আমার মাথা ঘুরে গেল এবং আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এক লাফে বারান্দা এবং বারান্দা থেকে বাইরের ঘরে তারপর ব্যাগ-ট্যাগের কথা ভুলে দড়াম করে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়লাম।

মাসদুয়েক পরে একদিন শহরে গেছি। ব্যাগটা নিয়ে আসতে তো বটেই—জগনমামার অবস্থা দেখতেও তীব্র কৌতূহল হল। নিরিবিলি জায়গায় পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িটা দেখে একটু গা ছমছম করল। কিন্তু দিনদুপুরে আশা করি আর ভূতের ভয়টা পাবে না।

দরজায় কড়া নাড়ার পর খুলল। খুলতেই আমার বুকের ভেতর রক্ত চড়াৎ করে উঠল। হাসিখুশি মিষ্টি চেহারার সুন্দরী মহিলা দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। সেই হাসিমুখে বলেছেন, কাকে চাই—অমনি আমি পিছিয়ে এসেছি। প্রায় এক লাফ দিয়েই।

ইনিই যে সেই নিরাকার মামীমা—যাঁর সঙ্গে জগনমামা অনর্গল কথা বলতেন এবং যিনি আত্মহত্যা করে মারা যান, তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন? ভুল হয়েছে বলে আমি হনহন করে চলে এলাম। পা টলছিল। একবারও পিছু ফেরার সাহস হল না। নিরাকার আকার ধরলেই সমস্যা।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া রহস্যময়। তবে এটুকু মনে পড়ছে, পেছনে জগনমামার যেন চিৎকার শুনেছিলাম—ঝন্টু! ও ঝন্টু! চলে যাচ্ছিস কেন? তোর নতুন মামীমার সঙ্গে আলাপ করে যা!

কানের ভুল হতেও তো পারে। 'নতুন' শব্দটা কি সত্যি শুনেছিলাম?

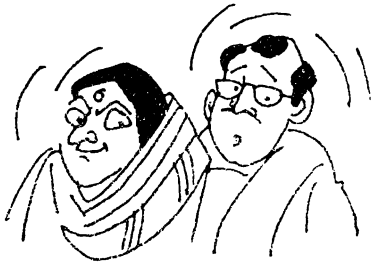

ফুল আঁকা রুমাল

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সারারাত ধুনি জ্বলে লাটু সান্যালের চটিতে। কেউ বলে স্যাণ্ডেল-বাবার চটি। তা, চটি বা হোটেল বা সরাইখানা যাই বলা যাক না কেন, নীল ঝোরা থেকে মামুদপুর কোলিয়ারি পর্যন্ত জি.টি রোডের ওপর ঐ একটাই মাত্র গা ছেড়ে দেওয়ার জায়গা। রুটি তরকা মাংস দিন রাত যে কোন সময়ই পাঁচ মিনিটের অর্ডারে মাল রেডি। উনুন জ্বলছে তো জ্বলছেই, সেই কবে একবার আয়োজন করে আগুন ধরানো হয়ছিল, আর নেভান হয়নি। লাটু বলে মহাশ্মশান। যেদিন শালা আমি টেঁসে যাব, সেদিন নিভবে।

একথা বলার পিছনে ওর খানিকটা আক্ষেপ আছে। দু-দুবার ও বিয়ে করেছে, দু-দুবারই বউ পালিয়েছে। দ্বিতীয়বার যেটা পালাল সেটা হয়ত এখনো বেঁচে আছে, ও হদিশ জানে না, আর প্রথমবারেরটা মরেছে কলেরায়।

একদিন তো বমি করল, ব্যস শেষ।

এরপর আর সাহস হয়নি লাটুর ফের একটা বিয়ে করে। ওসব শালা এণ্ডি পেণ্ডি ঝামেলায় আর কে যায়। বেশ আছে। খাও দাও পয়সা জমাও, আর কি চাই। জীবনটা দেখতে দেখতে কেটে যাবে! ওর বন্ধু-বান্ধবও দুজন একজন করে টেঁসতে শুরু করেছে, ও-ও একদিন যাবে। ফুরিয়ে যাবে খেলা।

রুটি তরকা মাংস ছাড়াও দিশী বিলিতী পানীয়ও আছে। ওসব এ লাইনে না রেখে উপায় নেই। প্রথম দিকে যখন দোকান বসাল লাটু, তখন খদ্দেরের মর্জি বুঝে অন্য উপকরণেরও যোগান দিত। তাতে ঝুট ঝামেলারও কামাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত পুলিশী হজ্জুতের জন্য ওসব পাট চুকিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বয়সও হয়েছে। সব বয়সে সব কিছু মানায়ও না। লাটু সান্যালের এখন সাফ কথা, খানাপিনা করো, চৌপায়া আছে ঘুমোও, শুয়ে থাকো যেমন মর্জি, কিন্তু নো হুজ্জুতি।

কিন্তু তবু যে কিছু কিছু ঝামেলা হয় না এমন নয়। খুচখাচ এটা সেটা লেগেই থাকে। রক্ষে, লাটু সান্যাল বহুকাল নিজেই ছিল ড্রাইভার। হিল্লি-দিল্লী কলকাতা রাতের পর রাত লরি চালাবার অভিজ্ঞতা আছে ওর। লরি চালিয়েছে বলেই জি.টি. রোডের ড্রাইভারদের মর্জি ওর জানা। ড্রাইভারের মেজাজ রেখে কীভাবে চলতে হয় তা ও জানে। তবু তেমন কিছু বেগরফাই দেখলে লাটু ডাক পাড়ে, কালা, ঘুমুলি?

কালা দোকানেরই কর্মচারি। কিন্তু বাড়তি পয়সা দিয়ে ওকে পুষতে হয় লাটু সান্যালের। লোকটা ঘুষি দিয়ে ডাব ফাটাতে পারে, দাঁত দিয়ে লোহা বাঁকাতে পারে। কাজ কিছু করল না

করল মাথা ঘামায় না লাটু সান্যাল, কিন্তু দরকার হলে ওকেই ডেকে ঝামেলা মেটায়।

আসলে লাটু যৌবনকালে, এ সব কাজ নিজেই করতে পারত, এখন নির্ভর করার জন্য লোক-খুঁজে নিয়েছে এখন 'সেরেফ' দিনগত পাপক্ষয়।

এখন আর পয়সারও অভাব নেই লাটুর। কালা মাঝে মাঝে লাটুর মেজাজ ভাল থাকলে রসিকতা করে, হ্যাঁ গো স্যাণ্ডেল-বাবা, একটা কথা বলব?

—বল না। আমার কাছে বলতে আর কিন্তু কি।

—বয়স তো হল, সর্বাঙ্গ দিয়ে এখন তো ঝুরঝুর করে টাকা গড়ায়, তা—

লাটু খিচ খিচ করে ওঠে, শালা রসিকতা করছিস! আমাকে টাকার গাছ বলছিস? কালা হাসে, টাকা তুমি ঢের জমিয়ে রেখেছ, তা কি মিথ্যে?

—এই শালা, জুতিয়ে মুখ ভাঙব, আমার খরচ জানিস?

কালা হাসে, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, না হয় তোমার টাকাকড়ি কিচ্ছু নেই। আর একথা ঠিক টাকাকড়ি আজ আছে বলে কাল নেই। কিন্তু স্যাণ্ডেল-বাবা, ওপারে যখন যাবে তখন কি কৈফেয়ত দেবে?

—কিসের কৈফেয়ত? লাটুর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। মৃত্যুর পরে সত্যি সত্যিই ধর্মরাজার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিনা কে বলবে।

—বারে, কৈফেয়ত দিতে হবে না। সংসারধর্ম যে করলে না তার কৈফেয়ত দিতে হবে না? প্রসঙ্গটা আর বেশি দূর গড়াতে পারে না, একটা গাড়ি এসে চটির সামনে দাঁড়াতেই কালাকে এগিয়ে যেতে হয়।

লাটু সান্যাল যেন সেই মুহূর্তের মতো রক্ষা পায়। রক্ষা পায় বটে কিন্তু মনের গভীরে কোথায় যেন একটা মহা শূন্যতা খাঁ খাঁ করে ওঠে। জীবনটা শালা বৃথাই গেল। জন্মালাম, টাকা পয়সাও রোজগার করলাম, একদিন মরেও যাব, কিন্তু প্রেম ভালবাসার আস্বাদ যে কী তা আর পাওয়া হল না।

ভীষণ আক্ষেপ হল ওর প্রথম বউ মালার ওপরে। কপাল ছাড়া কী! দুম করে বউটা মরে গেল। দ্বিতীয় বউটার নাম ছিল পাখি। পাখির মতই ডানা মেলে উড়তে চাইত, একদিন উড়েও গেল। পাখিকে বশে রাখার জন্য ও কি সত্যি সত্যি খুব অত্যাচার করত! দু-একদিন যে পাখিকে ও মারধোর না করেছে এমন নয়, কিন্তু স্ত্রীকে ভালবাসত বলেই না ও গায়ে হাত তুলতে পেরেছিল। পাখি বুঝল না, প্রতিশোধ নেবার জন্য সত্যি সত্যি একদিন উড়ে গেল।

যাক শালা, যে যা ভাল বুঝেছে, করেছে। লাটু সান্যাল স্যাণ্ডেলবাবু হয়েই বাকি দিনগুলো রগড়াতে রগড়াতে কাটিয়ে দেবে।

আর সেই তাকে ও কাটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন—

ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা। কালা দিন দুয়েকের ছুটি করে মামুদপুর গেছে। দিন দুয়েক বলে গেলে ও সাতদিন কাটিয়ে আসে। কেন মামুদপুর থেকে ও আসতে চায় না লাটু সান্যাল বোঝে। মামুদপুরে রেণ্ডিপাড়ায় ওর যাতায়াত আছে। চাই কী ওখানেই হয়তো ও পড়ে থাকবে! লাটু আপত্তি করে না, যা বেটা, তোর ধর্ম তোর কাছে।

লাটু সান্যাল চটির বাইরে চৌপায়ায় বসে কোলের ওপর প্লেট রেখে পেঁয়াজ কাটছিল। পরনে একটা চেক লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জামা। মাথার ওপরে খোলা আকাশ।

গরমের দিন বলেই, আকাশটা বড় ভাল লাগছিল। ও দিকে হোটেলের ছোকরা দুটো তখন কাজে ব্যস্ত। শেডের নিচে চৌপায়ায় চার পাঁচজন লোক ঘুমুচ্ছে। ওদের মধ্যে দুজনকে ডেকে দিতে হবে ভোর চারটেয়। বাকিগুলি কখন উঠবে, কখন যাবে কে জানে।

এমন সময় হালকা বাদামী রঙের একটা অ্যামবাসাডার এসে ঘ্যাচাং করে চটির সামনে দাঁড়াল। লাটু উঠে দাঁড়াল, এক হাতে ছুরি, অন্য হাতে পেঁয়াজ। কেমন একটু কৌতূহল জাগল লাটুর। এত রাতে ভারী ভারী লরি ছাড়া হালকা গাড়ি খুব একটা বেশি চলে না। তেমন জরুরি দরকার না থাকলে কেউ এত রাতে জি. টি. রোডে অ্যামবাসাডার চালায় না। এগিয়ে গেল।

আরো বিস্ময় বাড়ল ওর, গাড়ির ড্রাইভার একজন মহিলা, বাঙালী বলেই মনে হয়। পরনে হালকা একটা শাড়ি, কচি বয়েস।

মহিলাটি সত্যি সত্যি একা কিনা প্রথমে বুঝতে পারেনি ও। গাড়ির গায়ে গায়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল সহযাত্রী একজন পুরুষ, মাল টেনে পাশেই গড়িয়ে আছে।

মেয়েটির হাত তখনো ষ্টিয়ারিংয়ে। লাটুর দিকে তাকাল, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন? লাটু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চমকে উঠেছিল, এ মুখের সঙ্গে মালার মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে। গোল ডিমের মতো মুখের গড়ন, রংটাও ধবধবে নয়, একটু মাজা। সব চেয়ে বেশি মিল মেয়েটার চুল বাঁধার ভঙ্গিতে। মেয়েটির বয়স অনুমান করার চেষ্টা করল ও, তিরিশের ওপরে নয় নিশ্চয়। মালা যখন মারা যায় তখন ওর বয়স ছিল সাতাশ।

—কী হল, জল খাওয়াতে পারেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পারব না কেন, আসুন না, বিশ্রাম করুন। এই রবি, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয় তো!

মেয়েটি চারপাশে তাকাল, কেমন শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। ওদিকে শেডের নিচে কয়েকজন ঘুমুচ্ছে। চটির সামনে খোলা আকাশের নিচে কয়েকটা চৌপায়া পাতা, খালি। চটিতে ঝাঁ ঝাঁ করে একটা হ্যাজাক জ্বলছে।

—কি কি খাবার পাওয়া যায় আপনাদের এখানে? মেয়েটি লাটুর দিকে তাকাল। বেশ চটপটে কথা বলতে পারে মেয়েটি।

লাটু বলল—ভাত, ডাল, তরকা, রুটি, মাংস, ডিমও আছে। তা ছাড়া—

—মাংস! কি মাংস? মুরগী হবে?

লাটু বলল—রান্না করা নেই। আধ ঘণ্টা বসলে রান্না করে দিতে পারি।

মেয়েটি এবার পাশের লোকটিকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল, এই সু, এই, কিছু খাবে?

লোকটা অনড়।

লাটু বলল—দেখুন না এত বিশ্রীভাবে খেল, জোর করে ওর হাত থেকে স্টিয়ারিং কেড়ে নিয়েছিলাম বলে তবু অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি। নইলে কালই কাগজে বেরুত, মোটর দুর্ঘটনায় দুজন নিহত।

—ওকে নিয়ে এই রাতে কিন্তু আপনার মোটর ড্রাইভ করা উচিত হয়নি।

—কেন?

—না, কেন মানে! লাটুর কথা জড়িয়ে গেল, পরে সামলাবার চেষ্টা করে বলল—জি.টি

রোড রাতে খুব ভাল নয়। কত রকমের ঘটনা ঘটতে পারে। তা ছাড়া আপনি একা।

মেয়েটি বলল—ধানবাদ থেকে আমরা যখন বেরিয়েছি তখন বিকেল পাঁচটা।

রাতে যে কোথাও খেয়ে নেব তারও সময় পাই নি।

রবি জল নিয়ে এল।

মেয়েটি জলের গ্লাস নেবার আগে গাড়ির দরজা খুলে নিচে নামল। পুরো গ্লাসের জল দিয়েই দু হাত ধুয়ে ফেলল, আর এক গ্লাস হবে?

লাটু চোখ ফেরাতে পারছিল না। হুবহু মালা। এত মিল হয় কি করে! মালাই যেন বেঁচে উঠে এত রাতে এখানে এসে হাজির হয়েছে।

—আসুন না। কোন ভয় নেই, বিশ্রাম করুন, খাওয়া দাওয়া করুন, পরে যাবেন।

মেয়েটি আবার গাড়ির দিকে তাকাল—ওকে বরং গাড়ি থেকে বের করে একটা খাটে শুইয়ে দিন।

হঠাৎ বুকের ভেতর যেন ডানা ঝাপটিয়ে উঠল লাটু সান্যালের। বলল—দাঁড়ান, ওপাশে ঘর আছে, নতুন চাদর বিছিয়ে রেডি করে দিই।

—না না, ঘরে নয়। মেয়েটি বাধা দিল। এখানে এই খোলা আকাশের নিচে বাইরেই ভাল। তা ছাড়া রাতও তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

লাটু কেমন অবাক হল, ঘর পেলে লোকে বর্তে যায়, আর এরা পেয়েও নিতে চাইছে না। বলল—ঘরটা কিন্তু ভাল। তা ছাড়া ওর জন্য আমরা ভাড়াও নিই না।

মেয়েটি বলল—কতক্ষণই বা থাকব। এর জন্য আবার—

লাটু সান্যাল দোকানের ছোকরাদুটোকে নিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে টেনে বার করল ভদ্রলোককে। নেশায় এমন ঘোর হয়ে আছে যে মাথায় ডাণ্ডা মারলেও বোধ হয় জাগবে না।

লোকটাকে তুলে এনে ওরা বাইরেই একটা খাটে শুইয়ে দিল। বাব্বা, ঘুমুলে কি মানুষের ওজন বাড়ে! কালার কথা মনে পড়ল। কালা থাকলে একাই লোকটাকে তুলে আনতে পারত।

মেয়েটি গাড়িটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে লক করে ফিরে এল। লোকটার খাটের পাশে বসল। আর ততক্ষণে শেডের ভেতর থেকে একটা চেয়ার টেনে আনল লাটু। বসুন, এখানে বসুন।

—আহা হা, আপনি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছেন। মেয়েটি চেয়ারে বসল।

লাটু বলল—না না, ব্যস্ততা কি, এ তো আমাদের কাজ। দেখছেন না সারারাত জেগে থাকি কেবল আপনাদের সেবা করার জন্য। কি খাবেন বলুন। মাংস বানাতে বলব?

মেয়েটি বলল—মাথা খারাপ, এত রাতে খেয়ে তারপর মরি আর কি! বরং দুধ কম করে এক কাপ চা খাওয়ান। আর বিস্কুট টিস্কুট যদি থাকে—

লাটু সান্যালও আবার চৌপায়ায় উঠে বসল। পেঁয়াজের থালা ধরিয়ে দিল রবির হাতে। ওদিকে সাঁ সাঁ করে পর পর কয়েকটা লরি পার হয়ে গেল।

এত জোরে পার হল যেন বাতাস এসে ওদের গায়ে লাগল।

—দেখছেন তো কি চালায়!

মেয়েটি তখনো লরিগুলোর দিকে তাকিয়েছিল। লরির পেছনের লাল বিন্দু বিন্দু আলো দূর থেকে মিলিয়ে গেল।

মেয়েটি ঘাড় ফেরাল, হুবহু মালা। এত মিল হয় কি করে দু'জনের। লাটু সান্যালের ইচ্ছে হল মেয়েটার নাম জেনে নেয়। কিন্তু জানতে চাওয়াটা কি উচিত হবে। হয়তো অন্য কিছু ভাববে।

আর একটা লরি আসছে টের পেল ওরা। এবার আসছে উল্টো দিক থেকে। লাটু মেয়েটার দিকে আবার তাকাল, একটা প্রশ্ন করব? কিছু মনে করবেন না তো? মেয়েটি কৌতুকে তাকাল কি প্রশ্ন?

—আপনাকে আমার খুব চেনা চেনা লাগছে। আপনার নাম বলবেন?

মেয়েটি হেসে উঠল, চেনা চেনা লাগছে বুঝি, ভাল। এবার চা-টা নিয়ে আসুন, অনেকক্ষণ তো হল।

লাটু কেমন মিইয়ে গেল। হাঁক পাড়ল, এই রবি, চা কি হল! শালাদের একটা কাজ দিয়েও ভরসা পাই না। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি দেখছি।

—না, না, আপনি বসুন। সারারাত বুঝি এভাবে জেগে কাটান আপনি? ঘুমোন না?

লাটু আবার গলে জল হয়ে গেল। ঘুমোই না বললে ভুল হবে। ভোরের দিকে ঘণ্টা তিন-চার ঘুমিয়ে নিই। নিজে সবকিছু দেখাশোনা না করলে বুঝতেই তো পারছেন।

মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লাটুকে—এ বয়সে এসব পোষায় না। আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

লাটুর মনে হল, এমন করে জীবনে ওকে কেউ কোনদিন প্রশ্ন করেনি। বলল—না, কেউ নেই।

—স্ত্রী?

—না। মরে গেছে। আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—মরে গেছে! মেয়েটা কেমন আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লাটু। সে অনেক দিন আগে হঠাৎ অসুখ হল, মরে গেল।

মেয়েটা কিছুক্ষণ থমকে রইল। তারপর আবার সহজ গলায় প্রশ্ন করল, তাহলে আর এত কষ্ট করেন কেন এই বয়সে। সংসারে আর কে আছে আপনার?

—সংসার বলতে আমার এই চটিখানা। এই চৌপায়াগুলি, ঐ টিনের সেডটা আর ওখানকার ঐ ক্যাশবাক্সটা, আর যে কজন কাজ করে মাইনে নেয়, তারা।

মেয়েটা অদ্ভুত চোখে তাকাল, ভারি অদ্ভুত তো! তা আর একটা বিয়ে করে নিলেই তো পারতেন।

লাটুর আর বলতে সাহস হল না ওর দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা। ম্লানভাবে একটু হাসল। জানেন, আমার স্ত্রীর নাম ছিল মালা। একটা কথা বলব—রাগ করবেন না তো। না, থাক, না বলাই ভাল।

—আহা, বলুন না। রাগ করবো কেন? বলুন।

লাটু বলল—মালার চেহারা অবিকল আপনারই মতো ছিল। খিল খিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, ছিল বুঝি? এত খারাপ দেখতে!

—খারাপ! আপনি খারাপ দেখতে!

—নই তো কী!

এমন সময় চা নিয়ে এল রবি। একটা ডিসে গোটা চারেক বিস্কুট।

—ও তো তাই বলে। ঘুমন্ত লোকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল মেয়েটি।

একটা লরি এসে চটির সামনে দাঁড়াল। উঠে পড়তে হল লাটুকে।

লরি থেকে নামল দুজন লোক। লাটু ওদের শেডের ধারে নিয়ে এল। মেয়েটাকে কৌতুকে দেখতে দেখতে লোকদুটো শেডের মধ্যেই চৌপায়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

ঘড়ির দিকে তাকাল লাটু। সাড়ে তিন। রাতটা যেন তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চারপাশ ফরসা হতে শুরু করবে। পাখি ডেকে উঠবে। ওরা অ্যাম্বাসাডার চালিয়ে আবার চলে যাবে।

আবার মেয়েটার কাছে ফিরে এল লাটু। আমি খারাপ ভাল বুঝি না। আপনি হয়ত বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু আমার স্ত্রী যদি বেঁচে থাকত লোকে আপনাদের যমজ বোন বলত।

মেয়েটি আবার হেসে উঠল, ভারি মজা তো। এই সু—লোকটাকে আবার ধাক্কা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করল, এই সু—শুনছ! কী ঘুম রে বাবা!

—থাক না, ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক না। ঘুম থেকে উঠলেই তো আবার গাড়ি চালাতে হবে। কতদূর যাবেন আপনারা?

মেয়েটি বলল, অনেক দূর। রাস্তাটা যেখানে শেষ হবে, সেখানে।

—বলতে আপত্তি থাকলে অবশ্য বলবেন না। আমারও জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি। নেহাত আপনাকে দেখলাম বলেই জিজ্ঞেস করলাম।

মেয়েটি বলল, বিশ্বাস না করলে আর কী করতে পারি বলুন। রাস্তাটার একটা শেষ নিশ্চয় আছে, মানে কলকাতায় যাব আমরা। হাসল।

আবার একটা লরি হু হু করে পার হয়ে গেল। পাহাড়প্রমাণ মাল চাপান রয়েছে লরিটায়। লাটু বলল, আমার স্ত্রীও কলকাতারই মেয়ে ছিল। থাকত বেলেঘাটায়।

মেয়েটি বলল, না, মিলল না, আমি কিন্তু কোন কালেই বেলেঘাটার মেয়ে নই। কোনদিন যাইও নি ওখানে। হাসল।

কেমন গুটিয়ে গেল লাটু। মেয়েটার ঘাড়ের দিকে, চুল বাঁধার ভঙ্গিতেই যেন মিলটা হুবহু। আহা, সত্যি সত্যি যদি মালা আজ বেঁচে থাকত। এই বয়সে যা জমিয়েছে লাটু তার একটা খরচ করার জায়গা পেত ও। মালাকে সাজাত। মালাকে সারাক্ষণ আগলে আগলে গভীর সুখে বুঁদ হয়ে কাটিয়ে দিত।

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লাটু।

—কি হল! প্রশ্ন করল মেয়েটি।

—না, কিছু না। উত্তর করল লাটু।

আর এমন সময় আবার একটা লরি। চটির কাছে এমন জোরে হর্ন বাজাল যে কানের পর্দা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। দুহাতে কানে চাপা দিল মেয়েটা, মাগো—

লরিটা দাঁড়াল না, বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ দেখা গেল অচৈতন্য লোকটা পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে উঠেছে।

মেয়েটি বলল, বাব্বা, আর যদি তোমার সঙ্গে বেরোই।

—অ্যাঁ। ঝটপট উঠে বসল লোকটি। এখানে কী!

—এখানে কেন, তুমিই তো বলবে। তখন অত করে বারণ করলাম, খেয়ো না, খেয়ো না। লোকটা উঠে দাঁড়াল, চার পাশে তাকাল। তারপর লাটুর দিকে চোখ পড়ায়, প্রশ্ন করল, চা হবে?

—হ্যাঁ স্যার। লাটু উঠে গেল রান্নাঘরের দিকে।

রাগে আর ক্ষোভে গা হাত পা কেমন শিথিল হয়ে এল। শালা, বেশ তো ঘুমুচ্ছিলি।

মুরগী ডেকে উঠল। ঘড়িটে চারটে দশ। শেডের লোকদুটোকে ডেকে দিতে হবে। দুনিয়াকে এখনই জাগিয়ে দিতে হবে। ওদিকে আর একটা লরি এসে দাঁড়িয়েছে। দু তিনটে লোক নেমে পড়েছে তা থেকে।

সারা চটি আবার সরগরম হয়ে উঠল।

আরো আধঘণ্টাখানেক কেটে গেল। নির্জীবভাবে ক্যাস বাক্সের কাছে বসে রইল লাটু সান্যাল। চারপাশ ফর্সা হয়ে আসছে। পাখির শব্দ ভেসে আসছে। অন্যদিন হলে এ সময় ঘুমুতে যায় লাটু। আজ চোখের ঘুম যেন ফুরিয়ে গেছে। কী হবে ঘুমিয়ে। ঘুমিয়ে বা জেগে কোন কিছুতেই প্রাণ নেই। কেমন একটা অস্বস্তি সারা শরীরে যেন জড়িয়ে ধরল ওর।

—কী হল? কী ভাবছেন?

হঠাৎ আবার চমকে উঠল লাটু সান্যাল। এ্যাঁ!

—আমরা চলে যাচ্ছি। কত হয়েছে বলুন।

লাটু দেখল, সেই মাতাল লোকটা গাড়িতে স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে বসে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

শালার চোখদুটো যদি গেলে দেওয়া যেত।

—কী হল? বলুন।

—এ্যাঁ, হ্যাঁ, দিন যা ইচ্ছে দিন!

—যা ইচ্ছে কেন! যা হয়েছে তাই দেব।

—দিন, দু টাকাই দিন। নির্বিকারভাবে বলল লাটু।

ব্যাগ থেকে দুটো টাকা বার করে এগিয়ে দিল মেয়েটি। তারপর গলা নামিয়ে বলল, শুনছেন, যাই তাহলে।

মেয়েটি আর দাঁড়াল না। সোজা এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

হুবহু মিল। চোখ ফেরাতে পারল না লাটু। হুবহু, ভাবা যায় না।

গাড়িটা স্টার্ট নিতেই উঠে বাইরে এল লাটু সান্যাল। গাড়িটা ধোঁয়া উড়িয়ে চলেও গেল। চারপাশ তখন বেশ ফর্সা।

লাটু হঠাৎ চমকে উঠল, আরে এটা কী। এখানেই তো মেয়েটা বসেছিল।

লাটু উত্তেজনায় এগিয়ে এল। একটা রুমাল পড়ে আছে। ধবধবে সাদা রুমাল। ইস,ভুল করে ফেলে গেল বোধ হয়।

রুমালটা হাতে তুলে নিল লাটু। ফুল আঁকা ভারি সুন্দর। আর এ কাগজটা কিসের। মোটা এক টুকরো কাগজ জড়ান রয়েছে রুমালে।

তাড়াতাড়ি কাগজটাকে খুলল, গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, আমিও মালা।

স্ট্যাচুর মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লাটু সান্যাল ওরফে স্যাণ্ডেল। ঝর-ঝর করে চোখ দিয়ে জল নেমে এল।

আজব টিকিট

শঙ্কর

বিভিন্ন ব্যাধির মতো এ-সংসারে ব্যাচেলর দু'রকমের। যাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম এবং বিবাহের তর সইছে না, তারা 'অ্যাকিউট' এবং বহুদিন ব্যাচেলর থেকে-থেকে যাঁদের সহ্য হয়ে গিয়েছে এবং বিবাহবন্ধনে এখন বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, তাঁরা 'ক্রনিক' ব্যাচেলর। এই কাহিনীর নায়ক ইন্দুমাধব শ্যাম দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়েন।

ইন্দুমাধব সরকারি অফিসে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। অফিসার না-হলেও ননগেজেটেড পে-স্কেলের সর্ব্বোচ্চ মাইনে ড্র করছেন এবং ভাগ্য ভাল থাকলে পঞ্চাশের সীমান্তরেখা অতিক্রম করার আগেই গেজেটেড অ্যাসিসটেন্ট ডিরেকটর হবেন।

ইন্দুমাধব সংসারবন্ধনে ধরা না-পড়েও বেশ সংসারী। সব কিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত। বলাবাহুল্য ইন্দুমাধবের নিজস্ব বাটী এবং ব্যাংকের সর্বোত্তম সুদে কিছুটা স্থায়ী আমানত আছে।

ব্যাচেলর ইন্দুমাধবের নামটা তাঁরই এক বন্ধু গোপনে জীবনলাল চ্যাটার্জিকে দিয়েছিলেন। জীবনলাল চ্যাটার্জির বিস্তারিত পরিচয় এখন জানতে চাইবেন না। বিশেষ ব্যবসায়িক কারণে, খরচখরচা বাদ দিয়ে মাসের শেষে যাঁদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এমন কিছু সচ্ছল লোকের তালিকা ওঁর প্রয়োজন। এ-সংসারে এ ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া এখন বেশ শক্ত। মাথা চুলকে-চুলকে সাহিত্যিক নির্মোক রায় যখন কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না, তখন তাঁর গৃহিণী মালিনী বললেন, "তোমার বন্ধু ইন্দুমাধব শ্যামের ঠিকানাটা দাও না!" ইন্দুমাধবকে তো ঠিক সংসারী লোক বলা চলে না—সংসারে থেকেও সে সন্ন্যাসী। কিন্তু জীবনলাল চ্যাটার্জি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এর পরে জীবন চ্যাটার্জির সঙ্গে যখন নির্মোক রায়ের দেখা হয়েছে তখন তিনি বলেছেন, "ইন্দুমাধব শ্যাম আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। এর প্রতিদান যদি না দিই তো আমার নাম জীবন চাটুজ্যে নয়। আমার সব ভাল কিন্তু অপমান সহ্য করতে পারি না।" সামান্য ব্যাপার, একজন ভদ্রলোক বিজনেসের জন্য আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছেন—বিজনেস করবেন কিনা সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু ভদ্র নম্র ব্যবহার অবশ্যই আপনার কাছে প্রত্যাশা করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্দুমাধব শ্যাম জবরদস্ত কায়দায় জীবনলালকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছেন। জীবনলালের প্রস্তাবে তাঁর নাকি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—প্রয়োজনও নেই। জীবনলাল তখন থেকেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছেন এবং তা লক্ষ্য করে সাহিত্যিক নির্মোক রায় ও তাঁর স্ত্রী মালিনী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এই ইন্দুমাধবকে আজ সকাল থেকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। ছুটির দিনে সকালবেলায়

মধ্যবিত্ত সংসারে অর্থনৈতিক কারণে নানা খিটিমিটি লাগে, পারিবারিক দুশ্চিন্তা অবশ্যই দেখা দিতে পারে, কিন্তু সংসার অরণ্যের একমাত্র সিংহ ইন্দুমাধবের মুখে কেন চিন্তার ছায়া?

চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং বহুপ্রচারিত সংবাদপত্রের কল্যাণে এখন গল্প-উপন্যাসে কেউ নায়কের সবিস্তারিত পরিচয় পাঠের ধৈর্য রাখেন না। বর্ণনা শুরু হলেই পাতা বাড়িয়ে দাম বাড়ানোর অভিযোগে আক্রান্ত হন লেখক। তবু ইন্দুমাধবের সামান্য পরিচয় বিশেষ প্রয়োজন যাতে তার ভাবমূর্তিটি পাঠকের হৃদয়ে মোটামুটি স্পষ্ট থাকে। এক নজরে ইন্দুমাধব এই রকম।

বয়স	৪৬ (অফিস খাতায় ৪৩)
রঙ	বাদামী
উচ্চতা	৫ ফুট ৫ (....সে মি)
চোখের রঙ	কালো
ওজন	৬৭ কেজি
নাসিকা	সামান্য চাপা
কাঁধ	বেশ ঢালু
চুল	: পাতলা, তবে যত্নের সঙ্গে চিরুনি ব্যবহার করলে টাক এখনও ঢাকা যায়।
চামড়া	ঈষৎ তৈলাক্তভাব
বিশেষ লক্ষণ	অল্প উত্তেজনায় নাকের ডগা সামান্য ঘামে।
চশমা	মোটা ব্রাউন শেল ফ্রেম
শরীর	মজবুত—মাঝে মাঝে, সর্দিতে ভোগেন
প্রিয় খাদ্য	পার্সে মাছের ঝোল ও সরু চালের ভাত
পছন্দ	সিনেমা ও গানের আসর
ভীতি	নারীসান্নিধ্য
স্বভাব	শান্ত, গুছনো ও সাবধানী

নিতান্ত প্রিয়জন : অতীতে মাতাঠাকুরানী, বর্তমানে কেউ নয়।

কোনরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চান না বলেই ইন্দুমাধব দারপরিগ্রহ করেননি। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রযোজ্য হলেও কোন পুরুষের পক্ষে তা মঙ্গলকারক নয়। ইন্দুমাধবের দৃঢ় ধারণা, এদেশে পুরুষের স্বাধীনতা মধ্যরাতের বাসরসজ্জাতেই বিসর্জিত হয়।

এই ধরনের মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা মনোবলের অধিকারী হন এবং ইন্দুমাধব শ্যাম অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই দৃঢ়চেতা ইন্দুমাধব বেশ চিন্তিত হয়ে রয়েছেন। ব্যাপারটা যতই ভাবছেন ততই তিনি দিশেহারা হয়ে পড়ছেন এবং কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

এ-অবস্থায় নির্ভরযোগ্য কারুর কাছে গোপন পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু প্রিয়বন্ধু লেখক নির্মোক রায়ের কাছে যাওয়া ঠিক কিনা ইন্দুমাধব বুঝতে পারছেন না। নির্মোক অবশ্যই সারা জীবন তাঁর বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সমস্যা তার স্ত্রী মালিনী। নির্মোক এই রমণীরত্নের কাছে কিছুই গোপন রাখেন না এবং এই বয়সে ইন্দুমাধব মধ্যবয়সিনী মহিলামহলের গবেষণা ও কৌতূহলের বিষয়বস্তু হতে প্রস্তুত নন।

আজকের সমস্যাটি এইরকম—প্রভাতের চা-পর্ব শেষ করে ইংরিজী পত্রিকার ষোলোটি পৃষ্ঠা

পুঙ্খানুরূপে পাঠ করেছিলেন ইন্দুমাধব, এমন সময় ভৃত্য মধুসূদন মণ্ডল খামটি টেবিলের উপর রাখলো। গতকালই খামটি ডাকবাক্সে পড়েছিল মধুসূদন তা উদ্ধার করতে ভুলে গিয়েছিল। সাধারণতঃ চিঠিপত্র এলে ইন্দুমাধব খুশী হন, প্রতিটি চিঠির উত্তর লেখেন সযত্নে কিন্তু আজ মেজাজ অন্যরকম। টাইপ-করা খামে ইন্দুমাধবের নাম-ঠিকানা লেখা, ভিতরে কোন চিঠি নেই—শুধু একটি ফাংশনের টিকিট।

ফাংশনটি ভাল জায়গায়, শীতাতপ গীতানুষ্ঠান—বিনা পয়সায় এই টিকিট পেলে সকলেরই আনন্দিত হবার কথা, কিন্তু ইন্দুমাধবের মুখমণ্ডল ক্রমশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠতে লাগলো।

সৌজন্য টিকিটটি বারবার দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব, তারপর একবার টিকিটটি টুকরো টুকরো করে সমস্ত সমস্যা সমাধানের কথাও ভাবলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজের হাত দুটিও বিদ্রোহ করলো, মনের নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও তারা টিকিট ক্ষতবিক্ষত করতে পারলো না।

আপনারা যাহা সন্দেহ করছেন ইন্দুমাধব কোন মানসিক রোগে আক্রান্ত তাঁরা অকারণে সুস্থ সতেজ ইন্দুমাধবের প্রতি অবিচার করছেন। ইন্দুমাধবের দেহে বর্তমানে কোনোরকম ব্যাধি নেই।

সামান্য একখানি ফাংশনের টিকিট—এর মধ্যে কী এমন বিপদের ইঙ্গিত থাকতে পারে? কিন্তু ভৃত্য মধুসূদন লক্ষ্য করলো বাবুর নাকের ডগায় শিশিরবিন্দুর মতো ঘাম জমতে শুরু করেছে।

ইন্দুমাধব আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা শুরু করলেন।

ব্যাপারটা এইরকম—সপ্তাহকয়েক আগে অফিসের ডাকে ইন্দুমাধব অকস্মাৎ একখানি টিকিট পেয়েছিলেন। ফাংশনটি খুবই ভাল, কাগজে যথেষ্ট বিজ্ঞাপনও হয়েছে, বাঘা বাঘা শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন। ইন্দুমাধব ভাবলেন, অফিস থেকে অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—তাদেরই কেউ দ্রুত বিল নিষ্পত্তির আশায় খোদ ইন্দুমাধবকে স্মরণে রেখেছেন।

ইন্দুমাধব সরল মনেই বিখ্যাত হলের ১৩এ সীটটি যথাসময়ে অধিকার করে বসেছিলেন। হলে তিলধারণের জায়গা নেই, কিন্তু পাশের ১৩বি সীটটি তখনও খালি। ইন্দুমাধব তাঁর অফিস অ্যাটাচি কেসটি ওই খালি সীটে বসিয়ে রেখেছিলেন। গান শুরু হয়ে যাবার পরে ১৩বি সীটের অধিষ্ঠাত্রী হাজির হলেন। অন্ধকারে শাড়ির রঙ তখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আকারে বিপুলা এই মহিলা প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভিতরে ঢুকলেন এবং একটু রুক্ষ স্বরেই ইন্দুমাধবকে ব্যাগ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন। সামান্য ব্যাপার, মিষ্টি করে বললেই হতো, পৃথিবীতে কোন হলে নিজের ব্যাগ রাখবার জন্যে আর একটা সীট খালি পাওয়া যায়? কিন্তু এই মহিলার স্বরে ইন্দুমাধবের জন্য একটুও কোমলতা নেই।

স্বভাবতঃ উগ্র মেজাজের ইন্দুমাধব একবার ভাবলেন বলেন, গান শুরু হয়ে যাবার পরে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ কেন? দেরি হলে প্রথম বিরতি পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করাই নিয়মসঙ্গত। কিন্তু সে-কথা এই জবরদস্ত মহিলাকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না।

প্রেক্ষাগৃহের নিবিড় অন্ধকারে ইন্দুমাধবের চোখ তেমন কার্যকরী না-হলেও নাসিকার মাধ্যমে তিনি বিশেষ একটি মূল্যবান সেন্টের গন্ধ পেলেন। সুগন্ধের মাত্রা নারীসান্নিধ্যে অনভিজ্ঞ ইন্দুমাধবের পক্ষে একটু অধিক।

সেন্টের উৎস কয়েক মিনিটের মধ্যে অন্য হাঙ্গামা বাধালেন—দন্ত থলিকা থেকে পেটমোটা চিপসের সুবৃহৎ প্যাকেট বার করে মুচমুচ শুরু করলেন। সুরেলা গানের সময় কোনরকম বাড়তি আওয়াজ ইন্দুমাধবের পক্ষে প্রীতিপদ নয়। দু'একবার আড়চোখে পাশের দিকে তাকালেন

ইন্দুমাধব এই আশায় যে পাশের মহিলা পরিস্থিতি বুঝে সাবধান হবেন, কিন্তু অন্ধকারে ইন্দুমাধবের তির্যকদৃষ্টি বোধহয় পাশের সীটের নজরে পড়লো না।

প্রথম বিরতি পর্যন্ত মুখ বুজে সহ্য করলেন ইন্দুমাধব—গানের আসরে চীনাবাদাম, পপকর্ন ও পোটাটো চিপসের নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কলকাতা কর্পোরেশন কতৃপক্ষকে লিখবেন তিনি। আলো জ্বলবার পরে মুচমুচে আলুভাজার মড়মড়ে শব্দ বেড়ে গেল। বিরক্ত ইন্দুমাধব এইসময় টয়েলেটের দিকে অগ্রসর হলেন।

ইন্দুমাধব অদৃশ্য হওয়া মাত্রই অকুস্থলে উপস্থিত হলেন ছোটখাট সাইজের জীবনলাল চ্যাটার্জি । ১৩বি সীটের এই মহিলা অপরিচিতা নয়। কুমারী সুহাসিনী সেন—কেন্দ্রীয় অফিসে হেড অ্যাসিসটেন্টরূপে সগৌরবে সরকারী কার্য পরিচালনা করছেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর নাম বাঘিনী সেন। বাঘিনী সেনের ব্যক্তিগত খবরাখবর এইরকম

পিতার নাম : স্বর্গত সুধীর সেন।

উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন

বয়স ৪৩ (অফিস খাতায় ৪৩ ১/২)

বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম

চোখ পদ্মালোচনা

দাঁত উজ্জ্বল মুক্তোর মতো

চশমা সোনার ফ্রেম

ওজন বাষট্টি কিলো

চিনে নেবার চিহ্ন : বাঁ গালে একটি টিপসাইজের তিল

বেশবাশ : হাল্কা ফিকে নীল রঙের টাঙাইল

অলঙ্কার গলায় হায়দ্রাবাদী মুক্তোর মালা। হাতে ইউনিক গোল্ডের কাঁকন—চোরডাকাত দুষ্ট লোকের ভীষণ ভয়।

স্বভাব মিষ্ট—কিন্তু অপমানিত হলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না।

ভীতি অপরিচিচ পুরুষ

পছন্দ গানের ফাংশন

নিতান্ত প্রিয়জন এই মুহূর্তে কেউ নয়। মাঝে-মাঝে শুধু নির্মোক রায়ের স্ত্রী মালিনীর সঙ্গে গল্প করেন। সুহাসিনী দেবী দেখলেন একটি লোক তার কাছে এসে পড়েছে। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে—একবার যেন বান্ধবী মালিনীর চিঠি নিয়ে কী একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব এনেছিল। সুহাসিনী দেবী লোকটিকে পত্রপাঠ বিদায় করেছিলেন—"প্রপোজাল পাঠাবার লোক পেলেন না। তেতাল্লিশ বছরের সংসার না-করা মেয়ে—ওসব ছাইভস্ম নিয়ে আমি কী করবো? আমাদের তো ভবিষ্যৎ নেই। কে ওসব খাবে?"

লোকটা নাছোড়বান্দা এখনও বোধহয় আশা ছাড়েনি—এখনও মাঝে মাঝে চিঠি পাঠিয়ে যাচ্ছে। তার বক্তব্য, পৃথিবীতে এখন একটিও মানুষ নেই যে ভবিষ্যৎকে অবহেলা করতে পারে।

দু'জনে চোখাচোখি হতেই জীবনলাল গদগদ হয়ে এগিয়ে এলেন। পরবর্তী সংলাপ এইরকম

জীবনলাল : নমস্কার। আরে আপনি?

সুহাসিনী আর বলবেন না। হঠাৎ অফিসে কে একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাঠালো।

অমুক সেন আর তমুক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শোনবার ইচ্ছা হয় প্রায়ই—কিন্তু আগে এসে লাইন লাগিয়ে টিকিট কাটার হাঙ্গামা সহ্য করতে পারি না। তাই হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম, শুধু কে যে টিকিট পাঠালো বুঝলাম না।

জীবনলাল ওটা তো সামান্য ব্যাপার—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? আপনার অফিসের কত লোক কত প্রতিষ্ঠানে জড়িয়ে আছে।

সুহাসিনী : আপনিও ফাংশনের ভক্ত?

জীবনলাল : ঠিক ভক্ত নয়—কিন্তু যে-লাইনে আছি তাতে না-এসে উপায় নেই। ফিউচার খদ্দেরদের হাতের কাছে পাওয়া যায়।

সুহাসিনী (হাস্য) : আপনি এক একটা কথা যা বলেন!

জীবনলাল গান কেমন শুনছেন? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

সুহাসিনী (ফোঁস করে উঠলেন) অসুবিধে হবার তো কথা ছিল না। এমন সুন্দর হল্, এমন চমৎকার সীট, এমন নামকরা আর্টিস্ট। কিন্তু কপালদোষে বাঁ দিকের সীটের লোকটি—যেন আমার ইস্কুলের হেডমিষ্ট্রেস এসেছেন। দুটো পোটাটো চিপস খাচ্ছিলাম—দুপুরে টিফিন হয়নি। এমনভাবে তাকালো যেন ক্লাস থেকে বের করে দেবে।

জীবনলাল (খালি সীটের নম্বরটি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন) সে কি! এরকম তো হবার কথা নয়। পাবলিক হল্—এখানে যার যা খুশী তাই করবে।

সুহাসিনী রাগের আসল কারণটা ওঁর হাতব্যাগ—ভেবেছিলেন ব্যাগটি আমার সীটে রেখে সিংগল টিকিটে ডবল সীট উপভোগ করবেন।

জীবনলাল (সভয়ে) আপনার সঙ্গে কোন বচসা হয়েছে নাকি?

সুহাসিনী হয়নি এখনও—হলে উনিই আফশোস করবেন। আমরা পাঞ্জাবের প্রবাসী বাঙালী। আমরা ভাঙি তো মচকাই না। কোন অচেনা পুরুষকে আমি তোয়াক্কা করি না।

জীবনলাল এ তো বেশ মুশকিলে পড়া গেল! আপনি কী সীট বদলাবেন আমার সঙ্গে?

সুহাসিনী মোটেই না! তা হলে তো লোকটা আরও আস্কারা পেয়ে যাবে। আমি যাই—আরও কিছু পোটাটো চিপস কিনে আনি।

সুহাসিনী দেবী ঝকঝকে টাঙ্গাইল শাড়িটি সামলে নিয়ে হলের বাইরে চলে গেলেন। আর তার পরের মিনিটেই ইন্দুমাধব নিজের সীটে ফিরে এলেন।

প্রতিশোধের আগুন মনের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছে, তবুও ইন্দুমাধবকে দেখে জীবনলাল ব্যবসায়িক কারণে একগাল হেসে ফেললেন।

ইন্দুমাধব জীবনবাবু, আপনারও গান বাজনার শখ? সারাদিন বিজনেসের পিছনে ঘুরেও রসকস থাকে আপনাদের?

জীবনলাল (জিভ কেটে) ফাংশনগুলো আমাদের লক্ষ্মী—কত লোক এখনও আমাদের কোম্পানির স্কীমের সুযোগ পায় নি তা চোখের সামনে দেখতে পাই, ভরসা বেড়ে যায়। যাক, আপনার কোন অসুবিধে.....

ইন্দুমাধব সৌজন্য টিকিটে গান শুনতে এসেছি—কোন হাঙ্গামার কথা নয়—কিন্তু ব্যাচেলরের পোড়াকপাল—পাশের জাঁদরেল মহিলাটির স্বামীর কথা ভাবছি আমি।

জীবনলাল স্বামীর কথা ভাববার সুযোগ নেই! আমি ওঁকে একটু চিনি—মিস সুহাসিনী

সেন। কনফার্মড্ হেড অ্যাসিসটেন্ট, গভরমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া....এবার বোধহয় সিলেকশন গ্রেড পাচ্ছেন....

ইন্দুমাধব : সারাক্ষণ মুড়মুড়—যেন আমাকে খাটো করবার জন্যে....

জীবনলাল একে রোজগেরে, তায় আইবুড়ো মহিলা—একটু গোঁ হয়....আপনি বরং...। জীবনলাল এবার সীট পাল্টাবার প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। ইন্দুমাধব জানালেন এখন সরে গেলে ভাববে হেরে পালিয়েছে—হেরে যাওয়াটা আমাদের বাজে-শিবপুরের শ্যামদের অভিধানে নেই।

ফাংশনের শেষে ইন্দুমাধবের দর্শন মেলেনি। কিন্তু বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে জীবনলাল ও সুহাসিনীর দেখা হয়ে গিয়েছে। সুহাসিনীর মুখে তখন বিজয়ীনির দম্ভ—দেড় প্যাকেট পেটমোটা চীপস চর্বন করেছেন, কেউ বাধা দিতে পারে নি!

সুহাসিনী এতো পোটাটো চিপস হোল লাইফে খাইনি! ভদ্রলোককে শিক্ষা দেওয়া গিয়েছে এই যা! সেকেণ্ড হাফে দু'একবার আড়চোখে তাকিয়ে ভদ্রলোক ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। তাই যখন কণিকার গান শুরু হল তখন কমপ্যাশনেট গ্রাউণ্ডে পোটাটো চিপস চেবানো বন্ধ রাখলাম।

বিজয়িনী সুহাসিনী এবার হেসে ফেললেন আজ বাড়ি গিয়ে ভদ্রলোক বউ ঝি-এর ওপর একচোট নেবেন। মেজাজখানা যা হয়ে থাকবে।

জীবনলাল একটু ভুল হয়ে গেল, সুহাসিনী দেবী। ওঁকে একটু চিনি আমি। উনি অফিস সুপার ইন্দুমাধব শ্যাম, চিরকুমার। অরিজিন্যাল বাজে-শিবপুরের, এখন চেতলায় নিজস্ব বাটী নির্মাণ করেছেন। সব ভাল, খুব গুছনো লোক, কিন্তু নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন চিন্তা নেই—ওই ইনকাম লেভেলে মাত্র দু'হাজার টাকার বীমা, ভাবা যায় না! ভাল প্রপোজাল দিতে গিয়ে বিতাড়িত হলাম—ব্যাচেলরদের নাকি লাইফ রিস্ক নেই।

বাড়িতে এসে ইন্দুমাধব প্রেক্ষাগৃহের অপ্রিয় অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছেন। বন্ধু নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনাও করেছেন। "এদেশে মেয়েরা কালে কালে কী হচ্ছে?" নির্মোকের স্ত্রী মালিনী বলেছেন, "এ আপনাদের কী অন্যায়! বাইরে বেরিয়ে নিজের ইচ্ছামতো এক প্যাকেট পোটাটো চিপস খাবে মেয়েরা তাতেও আপত্তি!"

"খাবার স্থানকালপাত্র ভেদ আছে," বলতে গেলেন বিরক্ত ইন্দুমাধব।

সাহিত্যিক নির্মোক বললেন, "অন্য দেশ হলে প্রচণ্ড রাগের পর হয়তো ওই প্যাকেট থেকে তোমাকে চিপস ভাগ করে খেতে দেখা যেতো। কিন্তু, ইন্দুমাধব, তোমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানি—ব্যাপারটা কল্পনা করাও সম্ভব নয়।"

ইন্দুমাধব কিন্তু নরম হলেন না, পরের দিনই সংবাদপত্রে চিঠি পাঠালেন ফাংশনে সিগারটের সঙ্গে পোটাটো চিপসের বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্যে।

চিঠিটা যথাসময়ে প্রকাশিত হল এবং দু'একদিনের মধ্যে একটি তপ্ত প্রতিবাদপত্রও প্রকাশিত হল। পোটাটো চীপসকে সমর্থনের পর, পুরুষদের ব্যাগ নিয়ে বক্রোক্তি—ফাংশনে এখন পুরুষদের সঙ্গে প্রায়ই যা দেখা যায় তা হল সুবিশাল ট্রাংক—অ্যাটচি কেস নয়! ঝাড়া-হাত-পা হয়ে আসরে এলে ক্ষতি কী? পত্রলেখিকা: সুহাসিনী সেন।

প্রসঙ্গের অবতারণা হলে নির্মোক রায় বললেন: সামান্য ব্যাপারে এত উত্তেজিত হবার

প্রয়োজন নেই। ট্রামে বাসে বা কোন সদনে কারও পাশে পুনর্বার বসার সম্ভাবনা ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন। সুতরাং একবার কার সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে তা নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাথা ঘামানোর মানে হয় না।

নির্মোক রায় ম্যাথামেটিক্সের ছাত্র—যা বলেছে ঠিকই বলেছে। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে ইন্দুমাধব যখন অফিস সেলে আবার টিকিট পেলেন তখন কোনরকম চিন্তিত হলেন না। এবারে অন্য হল—বিষয় একটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্য। এই নাটকটি বেশ কয়েকবার দেখেছেন ইন্দুমাধব, কিন্তু বিনামূল্যে আবার দেখবার লোভ দমন করতে পারলেন না।

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হল-এ নিজের আসনটি খুঁজে পেয়ে বসতে গিয়ে ইন্দুমাধবের মাথা ঘুরে গেল। পাশের সীটেই কাকে দেখছেন তিনি? সেই মহিলাটি না? যে-মহিলা সেদিন ওইভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজটা নষ্ট করে দিল, ইন্দুমাধবের বক্রদৃষ্টিকে তোয়াক্কা করল না। শাড়ির রঙ পাল্টেছে—আজ একখানা ময়ূরকণ্ঠী রঙের কটকী তাঁত পরেছেন এই মহিলা। কিন্তু সেন্টের গন্ধটা যে একই তা বুঝতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এক মুহূর্ত সময় লাগলো না। বিরক্ত ইন্দুমাধব আড়চোখে খোঁজ করতে লাগলেন আজও মহিলার কোলে পোটাটো চীপসের কোন প্যাকেট আছে কিনা। ও-পক্ষ থেকেও বোধ হয় পর্যবেক্ষণ চলছিল, কারণ দুটি তির্যক দৃষ্টি হঠাৎ মাঝপথে হেড-অন সংঘর্ষ বাধিয়ে বসলো!

স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন ইন্দুমাধব—আজ পোটাটো চীপস বা চীনেবাদাম কিছুই নেই। তার বদলে দু'টাকা দামের একটি প্রোগ্রাম বই কটকী শাড়ির উপর চুপচাপ শুয়ে আছে।

কিন্তু ইন্দুমাধবের মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। কী করে ওয়ান-ইন-এ মিলিয়ন অঘটন ঘটলো? এর পিছনে কি কোন রহস্য আছে? না ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়? এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, বিভিন্ন রহস্যকাহিনী গোগ্রাসে গেলবার অভ্যেস আছে ইন্দুমাধবের।

আর সুহাসিনী দেবীর অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়—কুসুমিকা কর নামক এক মহিলা পুলিশ এস-আই-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখ্যতা। কলকাতার দুষ্ট পুরুষসমাজের নারীনিগ্রহের নানা সুপরিকল্পিত কাহিনী কুসুমিকার মাধ্যমে সুহাসিনীর সুপরিচিত। এই মুহূর্তে সুহাসিনীর মনে একটিমাত্র প্রশ্ন কেমনভাবে এই দুর্বিনীত পুরুষটি আজ আবার ঠিক পাশের সীটটি সংগ্রহ করলো? কুসুমিকা, তুমি এখন কোথায়? কুসুমিকা এখন কাছে থাকলে সুহাসিনী একটু স্বস্তিবোধ করতেন।

হল-এ তিল ধারণের জায়গা নেই। এক হাজার লোক তো হাতের গোড়ায় রয়েছে, সুতরাং ভয় কী? নারীর আর্তস্বরে সাড়া দিতে কলকাতার নাগরিকের তুলনা নেই—এ কথা বহুবার বহু জায়গায় লক্ষ্য করেছেন কুসুমিকা। সুতরাং কিছুতেই ভয় পেয়ে নিজেকে আরও দুর্বল করবেন না সুহাসিনী।

ইন্দুমাধব শুধু অঙ্কের দিক থেকে একই নারীর পাশে, একই মাসের মধ্যে, আসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে নিরন্তর বিবেচনা করে চলেছেন। না, 'ল অফ প্রোব্যাবিলিটি ছাড়াও অন্য কোন অঘটন হয়তো কাজ করেছে। এ-বিষয়ে অনুসন্ধান এমন কিছু কঠিন নয়—কারণ রহস্যের অন্যপ্রান্ত তো পাশের সীটেই অবস্থান করছেন।

ইন্দুমাধব ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, এ-টিকিট আপনি কোথায় পেলেন?"

সামান্য প্রশ্নের উত্তরে এবার বিস্ফোরণের পালা। পুলিস সাব-ইনসপেকটর কুসুমিকা অপরিচিত পুরুষ বিতাড়নের যে গোপন শিক্ষাটি দিয়েছেন তার প্রথম কথাই হল : কোনরকম পাত্তা দেবে না। প্রথম সুযোগেই রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করতে হবে।

সুহাসিনী প্রবল আক্রোশে গোলাবর্ষণ করলেন, "তাতে আপনার দরকার?" নড়েচড়ে বসতে গিয়ে তাঁর কোলের প্রোগ্রাম-পুস্তিকা হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইন্দুমাধব এক মুহূর্তে অসহায়ভাবে বসে রইলেন। যা অপমান হবার তা তো হয়েছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা যেভাবে তাকাচ্ছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে বইটি পড়ে যাওয়ার জন্য ইন্দুমাধবকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষী সাব্যস্ত করছেন। ইন্দুমাধব এবার ঝুঁকে বইটি সীটের তলা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে অঘটন ঘটালেন। তাঁর চশমাটি ছিটকে পড়লো। ফ্রেমটা যে এতো লুজ হয়ে পড়েছে তা খেয়াল ছিল না। সুহাসিনীর বইটি যদিও উঠে এলো, কিন্তু ইন্দুমাধবের চশমার খোঁজ নেই। ঠিক সেই সময় প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত আলো নিভে গেল।

এমন বেখাপ্পা অবস্থায় ইন্দুমাধব কখনও পড়েন নি। বিরক্তিতে সমস্ত দেহ জ্বলছিল, কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে মধুর নারীকণ্ঠ শোনা গেল, "ভাববেন না। একটু অপেক্ষা করুন, চশমা পেয়ে যাবেন।"

বেচারা ইন্দুমাধব চশমা ছাড়া অসহায়। "আমি যে কিছুই দেখতে পাই না।" করুণভাবে স্বীকার করলেন।

ইন্দুমাধবের কাতরোক্তিতে তৎক্ষণাৎ ফল হল। পট করে পাশের সীটের সঙ্গিনীর হাতে ছোট্ট একটি টর্চ জ্বলে উঠলো এবং অচিরেই সেই টর্চ ইন্দুমাধবের হাতে সরে এলো এবং সুহাসিনী ঝুঁকে পড়ে অক্ষত অবস্থায় ইন্দুমাধবের চশমা উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন।

চশমা ফিরে পেয়েই খুশী ইন্দুমাধব। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে—আর কোন অপ্রিয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে চান না তিনি।

একটু পরেই পাশের সীটে আবার হাতব্যাগ খোলার শব্দ—সেলাফোন প্যাকেটে পোটাটো চীপস-এর সরব উপস্থিতি ইন্দুমাধবকে নিরাশায় ভরিয়ে তুললো। কিন্তু কাকে বিরক্তি দেখাবেন ইন্দুমাধব?

বিরতির সময় দ্বিগুণ আওয়াজ করে সুহাসিনী আলুভাজা সেবন করে চলেছে। মেজাজটা হাল্কা করবার জন্যে একবার হলের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

কী আশ্চর্য! আজও আবার জীবনলাল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "আপনি কি কোনো ফাংশন বাদ দেবেন না?" জিজ্ঞেস করলেন ইন্দুমাধব।

বিনয়ে বিগলিত জীবনলাল বললেন, "এক একজনের এক একটা বাতিক থেকে যায়—বুঝতেই পারছেন।"

ইন্দুমাধবের সঙ্গে পুনর্বার অন্তরঙ্গ হবার এই সুযোগটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন জীবনলাল। "লাইফের রিস্ক সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা, মিস্টার শ্যাম?" শান্ত ও দার্শনিকভাবে প্রশ্ন করলেন জীবনলাল।

ইন্দুমাধব ঝটিতি উত্তর দিলেন, "ফোগলার যেমন দাঁত তোলার ভয় নেই, বন্ধ্যার যেমন পুত্রশোকের দুশ্চিন্তা নেই, তেমনি ব্যাচেলারের লাইফ রিস্ক নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ভগবান প্রত্যেক অভাগাকে কিছু স্পেসাল সুবিধে দিয়েছেন, বুঝলেন মিস্টার চ্যাটার্জি।"

কোনরকম তথ্যের মধ্যে গেলেন না ঝানু সেলসম্যান জীবনলাল। "কেমন দেখছেন?" শুধু কথার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

শুধু দেখছি, গান কানে আসছে না—শুনছি কেবল পোটাটো চীপস্ চেবানোর শব্দ। ওই জিনসিটা নিষিদ্ধ না-হলে এদেশে গান-বাজনার উন্নতি হবে না!

একখানা সিগারেট শেষ করে ইন্দুমাধব যখন নিজের সীটে ফিরলেন তখন পোটাটো চীপসের প্যাকেট শেষ। পাশের সীটে প্রায় শ্মশানের নীরবতা। চশমাটা চোখ থেকে খুলে আলোর দিকে ধরে দেখতে লাগলেন ইন্দুমাধব।

বেচারার চশমাটা ফাটল কিনা কে জানে। একটু মায়া হচ্ছে সুহাসিনীর।

চশমা পরীক্ষায় ব্যস্ত ইন্দুমাধবের এবার বিস্মিত হবার পালা। নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। পাশের সীটের দুর্বিনীতা মহিলা বলছেন, "আপনি যেন কী জানতে চাইছিলেন তখন?"

অভিমানাহত ইন্দুমাধব চুপ করেই রইলেন। সরল মনে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তরে ঝাঁঝালো কথা শুনেছেন।

প্রশ্ন রিপিট করতে হল না। সুহাসিনী বললেন, "কিনিনি—আপিসে ডাকে ফ্রি পেয়েছি।"

"এ্যাঁ। আমারও তো একই অবস্থা। অফিসের ঠিকানায় কমপ্লিমেন্টারি এসেছে।"

"কী আশ্চর্য! কোন্ আপিস?"

প্রশ্নের উত্তরে ইন্দুমাধব গড় গড় করে সব বলে গেলেন এবং তার পরিবর্তে পাশের সীট থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ পেলেন।

"আপনার চশমার কিছু হয়নি তো?" সুহাসিনীর প্রশ্ন।

"হলেও কিছু এসে যায় না—পাল্টাবার সময় হয়েছে," ইন্দুমাধব তখনকার মতো পরিস্থিতি রক্ষা করলেন

শোয়ের শেষে বাড়ি ফেরার পথে জীবনলালের মনে হল ওঁদের দু'জনকে একই সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে মিনিবাসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখলেন।

দু'সপ্তাহ যায় নি। আবার একটি বিখ্যাত হলের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট ডাকে আসছে। ইন্দুমাধব রীতিমত চিন্তিত। বন্ধুবল নির্মোক রায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না করে পারলেন না। "এ-রকম ভূতুড়ে ব্যাপারে কখনও পড়েছো? একই লোকের পাশে একবার নয় দু'বার তোমার সীট পড়েছে?"

নির্মোক রায় বাস্তববাদী গল্পলেখক। বললেন, "একটা পর্যন্ত চান্স মিটিং গল্পে সহ্য করা যায়—কিন্তু তার থেকে বেশি সাক্ষাৎকার এখন হিন্দী সিনেমাতেও সাহস করছে না।"

"কিন্তু চান্স ছাড়া আর কী? পরপর দু'বার দুটো বিভিন্ন হলে দুটো আলাদা শোতে একই পার্টির পাশে আমার সীট পড়লো। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্স! কিন্তু আবার একটা টিকিট এসেছে। আবার যদি.....আমার ভয় হচ্ছে....."

"অযথা বাজে ভাবনাচিন্তা করছো," সাহস দিলেন নির্মোক রায়। "স্ট্যাটিসটিকস-এর ফর্মুলা অনুযায়ী ওয়ান-ইন-এ-বিলিয়ন এমন হতে পারে না।"

হতে পারে না বটে, কিন্তু কেন জানি না মনোবল পাচ্ছেন না ইন্দুমাধব। ইন্দুমাধব এখন বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শের ওপর নির্ভর করবেন না। মনে সন্দেহ থাকলে টিকিটটা ছিঁড়ে ফেললেই

পাট চুকে যায়। কিন্তু প্রাণে ধরে তাও পেরে উঠছেন না ব্যাচেলর ইন্দুমাধব। পরিবর্তে আর একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে যাচ্ছে।

সেই অনুযায়ী ইন্দুমাধব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং রবীন্দ্রসদনের অ্যাডভান্স বুকিং কাউন্টার থেকে একখানা সিংগল টিকিট কেটে নিলেন। কমদামের এই টিকিটে সীট নম্বর অন্য টিকিট থেকে বেশ দূরে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দুমাধব!

নির্ধারিত সন্ধ্যায় একটু দেরিতেই রবীন্দ্রসদনে এলেন ইন্দুমাধব শ্যাম। ডবল টিকিটে সিংগল প্রবেশ, ওয়ার্লড হিসট্রিতে এই প্রথম—কিন্তু উপায় কী?

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ওয়ানন ইন এ বিলিয়ন চান্স—কিন্তু ওইটুকু চান্স নেবেন না ইন্দুমাধব। পয়সা খরচ করা টিকিটে নতুন সীটে বসে ইন্দুমাধব ছটফট করছেন, ইচ্ছে একবার গিয়ে পঞ্চম রোয়ের 'ডি' মার্কা সীটখানা দেখে আসেন—এবং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন পাশের সীটে কে বসে আছেন।

অন্ধকার হবো-হবো। ইন্দুমাধব আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। পিছনের সীট থেকে বেরিয়ে গুটি-গুটি সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। পঞ্চম রো-তে এসে পড়েছেন ইন্দুমাধব—যা সন্দেহ করেছেন! দু'খানি সীট পাশাপাশি খালি পড়ে রয়েছে। সমস্ত সীটে লোক, শুধু দু'খানা পাশাপাশি সীট খাঁ খাঁ করছে!

যা ভয় পেয়েছিলেন তাহলে তাই, আলাদা টিকিট কেটে তাহলে ভালই করেছেন ইন্দুমাধব। কিন্তু মনের মধ্যে তবু কীরকম একটু মুচড়ে উঠলো। ইন্দুমাধবের সীটখানা না হয় খালি থাকুক, কিন্তু পাশের সীটখানা খালি কেন?

কী হল ওখানে? কী হতে পারে? ওই ভদ্রমহিলা কি ইচ্ছে করেই একই ভয় পেয়ে আজ এলেন না? না দ্বিতীয় আসন খালি থাকাটা নেহাতই কাকতালীয়। রহস্যসন্ধানে অপারগ ইন্দুমাধব ধীরে ধীরে নিজের আসনের দিকে ফিরে চললেন।

একটু পরে জীবলাল চ্যাটার্জিকেও পাঁচ নম্বর সারির কাছাকাছি দেখা গেল। যেন কিছুই জানেন না এইভাবে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পাশাপাশি দু'খানা সীট খালি দেখে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এমন তো কথা ছিল না। একটু আগেই তো সুহাসিনী সেনকে বেশ সাজগোজ করেই বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন তিনি।

জীবনলালেন মুখ শুকনো দেখে হলের অন্যপ্রান্তে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? ওরকম মুখ বেজার কেন? পকেট-টকেট মারা গেল নাকি?" বিরক্ত জীবনলাল মিনতি করলেন, "এখন জ্বালিও না ভাই—রুজি-রোজগারের ব্যাপার। খুবই চিন্তায় আছি।"

জীবনলাল পঞ্চম সারি থেকে বিদায় নেবার একটু পরেই সুহাসিনী দেবী পা টিপে টিপে সেখানে হাজির হলেন। লেডি এস আই কুসুমিকার পরামর্শমতো সুহাসিনী অন্য একটি টিকিট কেটে অন্যত্র বসেছেন। কিন্তু কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ হয়ে একবার পঞ্চম সারিটি দেখতে এসেছেন। সুহাসিনীর সীট খালি থাকবেই, কিন্তু পাশের সীটটাও খাঁ খাঁ করছে দেখে হঠাৎ সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা হা-হা করে উঠলো।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গিয়েছে। ইন্দুমাধব আজ মন দিয়েই নজরুলগীতি শুনছেন। কোথাও কোন বাধা নেই—কিন্তু অস্বস্তি বাড়ছে ইন্দুমাধবের। মনে হচ্ছে পোটাটো চীপসের একটু-আধটু আওয়াজ থাকলে খুব একটা কিছু অসুবিধে হতো না। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, একটু পরে

মানসকর্ণে ইন্দুমাধব শুনতে লাগলেন—কে যেন তাঁর ঠিক পাশে বসেই কুড়মুড় কুড়মুড় করে মুচমুচে আলুভাজা চিবোচ্ছে।

বিরক্তভাবে তাকাতে গিয়ে ইন্দুমাধব দেখলেন কাছকাছি কোথাও আলুভাজা নেই—সব শ্রোতাই গানে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

চোদ্দ নম্বর সারিতে বসে-থাকা সুহাসিনী সেন-এর বিব্রত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই আজ। দু'পাশেই দুই মধ্যবয়সিনী মহিলা—তাঁরা একমনে গান শুনছেন। সুহাসিনী তখন মানসনেত্রে শুধু পাঁচ নম্বর সারির দু'খানা শূন্য আসন দেখতে পাচ্ছেন আর ভাবছেন, দ্বিতীয় আসনটিতে কে অনুপস্থিত আজ?

ঝোঁকের বশে ব্যাগের মধ্যে আজও এক প্যাকেট চীপস রেখেছিলেন সুহাসিনী—কেউ কোন কাজে বাধা দিলে সুহাসিনীর মেজাজ ঠিক থাকে না, সেই কাজটা করবার জন্য গোঁ বেড়ে যায়। কিন্তু এখন মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে সুহাসিনীর—কী ভেবে পোটাটো চীপসের প্যাকেটটা টুক করে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপরও মাথাটা কেমন করছে, গানের একটা কলিও মাথায় ঢুকছে না।

এদিকে ইন্দুমাধবও শান্তিতে সীটে বসতে পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যেই পা টিপে টিপে হলের বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটা সিগারেট ফুঁকলেন, ভেণ্ডারকে দেখে হাঁক পাড়লেন। তারপর হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একুশ নম্বর সারির কাছে উপস্থিত হলেন ইন্দুমাধব। কিন্তু ওঁর পা দুটো ওই সারিতে ঢুকতেই রাজী হল না। ইন্দুমাধব পা টিপে-টিপে অন্ধকারের মধ্যে পাঁচ নম্বর সারির দিকে এগিয়ে গেলেন—নম্বরটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ফাইভ 'ডি'। পাশের সীটে কেউ আসুক না আসুক যে কোন সময়ে ফাইভ ডি-তে বসবার অধিকার তাঁর আছে।

অন্ধকারের মধ্যে সীটটি সবেমাত্র অধিকার করেছেন ইন্দুমাধব। হঠাৎ বুঝতে পারলেন পাশের সীটটি খালি নেই। অন্ধকারের মধ্যে কিছু আন্দাজ করা প্রয়োজন হল না—চেনা সেন্টের গন্ধ নাসিকারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ইতিমধ্যেই মস্তিস্কে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে।

সুহাসিনী একটু আগেই কোন্ এক দুর্নিবার আকর্ষণে পাঁচ নম্বর সারিতেই উঠে এসেছেন। পোটাটো চীপসের প্যাকেটটা মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গিয়েছে।

সুহাসিনীর মনে হল, পাশের ভদ্রলোকের হাতে কী যেন মাঝে মাঝে খড় খড় করে উঠছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এবার সুহাসিনীর অবাক হবার পালা। সুহাসিনী বুঝলেন, ভদ্রলোক আপন মনে একটা পোটাটো চীপসের প্যাকেটকে অত্যন্ত সাবধানে আদর করছেন।

ওদিকে স্টেজে তখন প্রেমময় গীতিনাট্য দারুণ জমে উঠেছে। সুহাসিনী জানেন, ইন্দুমাধববাবু কিছুতেই আজ প্রথম কথা বলবেন না। ফিসফিস করে সুহাসিনী প্রশ্ন করলেন, "এতো দেরিতে?"

মুগ্ধ ইন্দুমাধব মিষ্টি করে খুব লজ্জার সঙ্গে বললেন, "এই একটু দেরি হয়ে গেল।" যেন দেরি করে এসে তিনি সত্যিই ভীষণ অপরাধ করেছেন।

উসখুস উসখুস করছেন ইন্দুমাধব শ্যাম। কিছু একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন। বোকার মতো তিনি একবার বলে বসলেন, "আপনার পোটেটো চীপস?"

বেশ রাগ হচ্ছে সুহাসিনীর। সত্যি কথাটা কিছুতেই তিনি প্রাণ খুলে বলতে পারবেন না। সুহাসিনী বললেন, "হাতেই ছিল, অন্ধকারে ঢুকতে গিয়ে ধাক্কা গেলে পড়ে গেল।"

"পড়ে গেছে তো কী হয়েছে! এই নিন, আর একটা" এই বলে পটাটো চীপসের নতুন প্যাকেটটা ইন্দুমাধব এগিয়ে দিলেন নির্বাক নিস্তব্ধ সুহাসিনী সেনের দিকে।

এর পরের ঘটনা সামান্য। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দুমাধব শ্যাম ও সুহাসিনী সেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে নিজেদের তালিকাভুক্ত করেছেন। সব সমাধান হয়ে গিয়েছে শুধু ওই কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের রহস্যটুকু ছাড়া।

বন্ধুবর নির্মোক রায়ের মতে ওটা নিতান্তই আকস্মিক—ভবিতব্যের ইচ্ছা। কিন্তু লেডি এস আই কুসুমিকা কর-এর সন্দেহ অন্য—তার ধারণা ইন্দুমাধব অবশ্যই সুহাসিনীকে অন্য কোথাও দেখেছিলেন এবং সব জেনেশুনেই এই যুগল কমপ্লিমেন্টারি সীটের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

নববিবাহিতা সহধর্মিণীর সন্দেহ যখন তুঙ্গে এবং স্বয়ং ইন্দুমাধব শ্যাম যখন নিজেই রহস্য উন্মোচনে অসমর্থ সেই সময় জীবনলাল চ্যাটার্জি চেতলার বাড়িতে আবির্ভূত হলেন।

জীবনলালকে দেখে ইন্দুমাধব একটু বিরক্ত হতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একগাল হেসে জীবনলাল বললেন, "লাভের সঙ্গে সারাজীবন" এই তো আমাদের কোম্পানির পলিসি।"

"মানে?" বিরক্ত ইন্দুমাধব তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।

মাথা চুলকে জীবনলাল উত্তর দিলেন, "মানে আর কি—উইথ প্রফিট হোল লাইফ! পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে পলিসির কথা আপনার ভাবাই উচিত নয়।"

ইন্দুমাধব পত্রপাঠ জীবনলালকে বিতাড়নের চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সেই সময় সীমান্তে মোটা সিঁদুর লাগিয়ে সুহাসিনীর প্রবেশ। "আরে জীবনবাবু যে! সেই তো রবীন্দ্রসদনে দেখা হল।"

কোন কথা শুনলেন না সুহাসিনী শ্যাম। মিষ্টিমুখ না করিয়ে আজ ছাড়বেন না জীবনলালকে।

চেতলার বিখ্যাত চমচম এগিয়ে দিতে দিতে মৃদু হেসে বললেন, "আপনাকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার হতে পারে। আমার বান্ধবী পুলিসের কুসুমিকা কর অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছে। আমার সন্দেহ মিস্টার শ্যাম আগে কোথাও আমাকে দেখেছিলেন এবং তার পরেই হল-এ পাশাপাশি সীট....."

বেচারা ইন্দুমাধব দুর্বল প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাত্তা পেলেন না। জীবনলালকে সুহাসিনী শ্যাম বললেন, "কুসুমিকা হয়তো আপনার স্টেটমেন্টও নেবে।"

জীবনলাল এবার করজোড়ে রহস্য উন্মোচন করে বললেন, "মিস্টার শ্যামকে আপনি অযথা শাস্তি দেবেন না। মিস্টার শ্যাম যেদিন আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনই কাগজে পড়লাম—জাপানে বীমা কোম্পানির এজেন্টরা হেভি ইনসিওরের লোভে গোপনে ঘটকালী করে। গোঁ চেপে গেল।....মিস্টার শ্যামের ক্ষেত্রে কোন গোপন রহস্য নেই—পাশাপাশি সীট দেখে ফাংশনের টিকিটগুলো আমিই পাঠিয়েছি—উপায় ছিল না—বিজনেসের লোভে.....

মুখ লাল করে ইন্দুমাধব রেগেমেগে জীবনলালকে আবার বাড়ি থেকে বিদায় করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুহাসিনী শ্যাম হুঙ্কার ছাড়লেন, "ওর কোন কথায় কান দেবেন না, জীবনবাবু—বাড়ি ওর একার নয়। আপনি প্রপোজাল ফর্ম লিখে ফেলুন—উইথ প্রফিট হোল লাইফ।"

বকরাক্ষস

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়াশোনার ব্যাপারটা আমাদের এখনও কিছু তেমন ঠিকঠাক হয়নি। দেশ ছেড়ে আসার সময় আমার কিছু বই সম্বল ছিল। যে ইতিহাস, ভূগোল অঙ্ক সব ক্লাসেই চলবে এমন ভেবে বাবা পাকাপাকিভাবে বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। দুটো একটা বের করে নিতে বলেছেন। বাবার ধারণা ঠিকঠাক হয়ে বসতে না পারলে পড়াশোনায় মন বসবে না আমার।

বিউগিল বাজলেই বুঝতে পারতাম পাঁচটা বাজে। সকাল হয়ে গেছে। ব্যারাকে ফল-ইনের সময়। এবারে দূরে মানুষজন দেখতে পাব বলে, বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম আমরা। বাছারি ঘরটার টিনগুলি বাইরে টানা। ছায়া পড়লে বারান্দা হয়ে যায়। ঘরটার একমাত্র দরজা কেচার বেড়া। একটা তেলতেলে বাঁশের খুঁটি—দরজাটা তুলে রাখার জন্য ঠ্যাকার কাজ করে। এক পাশে ছোট্ট বেড়া দিয়ে মাকে ঘরের সংলগ্ন রান্নাঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোবরে লেপা উনুনের পাশে আছে বড়ো একঠা মেটে হাঁড়ি। কাঁঠালের বিচি ভরা। সকালের জলখাবার গোনাগুনতি কটা কাঁঠালের বিচি ভাজা। কারো ভাগে একটা কম হতে পারত না, বেশি হতে পারত না। বাবা কখনও ছেলেমানুষের মতো হাত পেতে বলতেন বেশ খেতে। আর দুটো দাও না।

মা নির্বিকার। এমন উদাসীন মা, একটা আর কথা বলত না বাবার সঙ্গে। বাবা ভয়ে ভয়ে উঠে যেতেন।

তখন বাদশাহী সড়কের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত পুলিসেরা। কখনও ডবল মার্চ, কখনও কুইক মার্চ করে তারা যাচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হত, বড় হলে আর স্টেশনমাস্টার হয়ে কাজ নেই। বরং পুলিশ হব। বাবা বলেছেন, এতে খুব উন্নতি। খুব বড় সাহেব-সুবো হতে বাধে না। কাজ দেখাতে পারলে দারোগা পর্যন্ত হওয়া যায়। কোনো হাবিলদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাকতেন, ঠাকুরমশাই আছেন। বাবার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হত। এবং কথাবার্তা শেষে বাবাকে মনে হত খুব অসহায়। এমন অবিষয়ী মানুষের জন্য বোধহয় লোকটারও করুণা হত। বলত, কি ঠাকুরমশাই, মরতে আর জায়গা পেলেন না। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাস করতে চলে এলেন।

বাবা কিছুতেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত দমে যেতেন না। কারণ দমে গেলেই মা বাবাকে পেয়ে বসবে। কোথায় কি কথাবার্তা হয় মার কান খাড়া করে শোনার অভ্যাস।—লোকটা কি বলল গো। সুতরাং বাবা বিচলিত হতেন না শেষ পর্যন্ত। খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বলতেন, মাটি, বুঝলে না, একবার সব আগাছা সাফ করতে পারলে দেখবে ফসল। জমি জুড়ে শুধু ধান। শীতের দিনে কলাই। সামনের জমিটাতে আম, জাম, লিচুর গাছ লাগিয়ে দেব। বড় হলে কত ফল। কত

পাখপাখালি দেখবে তখন উড়ে আসবে। জমির ধানে সমবৎসর চলে গেলে দুটো একটা বাতাবি লেবুর গাছ লাগিয়ে দেব ভাবছি। এমন জমি মানুষ পতিত ফেলে রাখে।

আসল কথা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না। বাবা খবর পেলেন মানু কাকা বহরমপুরে থাকে। বাবার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। খবর পেয়েই লটবহর নিয়ে রওনা। এবং কোন দ্বিধা না করে পরম আত্মীয়ের মতো ভাই-এর বাড়িতে উঠে পড়লেন। আমাদের সেই কাকাটি বাবাকে দেখে একেবারে হতবাক। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন খবর না দিয়ে কেউ কখনও আসে! দেশে অবশ্য খুবই যাওয়া-আসা ছিল। কাকার মা এবং ভাইবোনেরা ঠাকুরদা ঠাকুমা বেঁচে থাকতে বর্ষায় দু-চার হপ্তা বেড়িয়ে যে না গেছে তাও না। সংসারে কোন অভাব ছিল না বলে বাবা কিছুতেই তার পিসিকে এবং ভাই বোনেদের যেতে দিত না। সেই সুবাদে খবর পেয়েই সোজা সেখানে উঠে বললেন, চলে এলাম মানু। দেশ থেকে যা এনেছি শেষ। শোনলাম তুই এখানে আছিস। তুই যখন আছিস তখন আর ভাবনা কি। কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে। কি বলিস!

কাকা ঢোক গিলে বললেন, তা হয়ে যাবে।

ক'দিন যেতে না যেতেই কাকীমার গঞ্জনা শুরু হয়ে গেল। কাকা সারাটা দিন বাড়ি থাকে না। অফিসে থাকে। বাবা চুপচাপ বসে থাকেন মাদুরে। আগে তবু একটা চেষ্টা ছিল, এখানে এসে ওঠার পর বাবা ক'দিনেই কেমন ভালমানুষ হয়ে গেছিলেন।

কাকা একদিন বলল, সরকারী ক্যাম্পে উঠে যান দাদা। ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া মন্দ না। আমাদের অফিসের বড়বাবুর ভাই ক্যাম্পে চলে গেছে।

অভাব অনটনের কথা বোধহয় পাড়তে যাচ্ছিল, বাবা বললেন, ক্যাম্পে কোন জাত বিচার নেই। আমি উঠি কি করে। তার চেয়ে এদিকে কোথাও পূজোআর্চা করে যদি থেকে যেতে পারতাম। তোর বৌদির তাই ইচ্ছা।

অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বাবার পৃথিবীটা কবেই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। মানুকাকারও বিড়ম্বনা। তাঁর ছেলেমেয়েরা আমার বয়সী, শহুরে মানুষ। পরিচয় দিতে কিছুটা কুণ্ঠাবোধ হওয়া স্বাভাবিক। এবং আমার মা কেমন সেই প্রথম মনে হল বাবাকে ডেকে গোপনে কিছু বলল। বাবা বললেন তাই বুঝি। এবং পরদিনই বাবা মানুকাকার সঙ্গে কোথায় গেলেন। ফিরলেন রাত করে। বাবা ফিরেই বললেন, সব ঠিক হয়ে গেল, আর তোমাদের ভাবনা নেই।

সলতে জ্বালাবার শেষ তেলটুকু গোপনে এতদিন কি করে এত কষ্টের মধ্যেও সঞ্চয় করে রেখেছিল মা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য জমি এবং যথার্থ বনভূমিতে হাজির হয়ে মার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল—তাই বলে শেষ পর্যন্ত এখানে!

বাবা বলেছিলেন, একেবারে জলের দরে জমি। একশ টাকায় কত জমি দেখ। তা তোমার পুরো একশও ছিল না। মানু কিছু দিয়েছে। জমির শেষ কোথায়, সীমানা কোথায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাবা উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে চারটে গাছ দেখিয়ে বললেন, এই তোমাদের সীমানা। এ জায়গা তোমাদের।

বনের ভেতর সেই বড় চারটে গাছ সব ক'টাই শিরিষ। এবং লম্বা বরাবর আর যা আছে মাঝখানে, তার মালিক আমার বাবা। বাবা বনটার পাশে গ্রীকরাজাদের মতো দণ্ডায়মান ছিলেন। যেন বনটা রাজা পুরুর মতো বশ্যতা স্বীকার করতে চাইছে না। বাবা বললেন, এখানেই জঙ্গল সাফ করে তোমাদের আবাস তৈরি হবে। আগাছা জঙ্গল সাফ করে বুঝতে হবে কতটা জমি শেষ

পর্যন্ত পাওয়া গেল। রাজবাড়ির আমলারা তো বেজায় খুশী। বলেছে বনটায় লোকবসতি দেখলেই জমির দর বাড়বে; এবং যা বললেন, তাতে মনে হয়েছিল, টাকা না দিলেও প্রথম আবাস করার দুঃসাহসের জন্য মিনি-মাগনায় জমিটা পাওয়া যেত।

সুতরাং জঙ্গলের দরে জমি—একটা অদূরে গাছ দেখে বোঝা যাচ্ছিল জমির সীমানাটা কোথায় শেষ। জঙ্গল সাফ করে শেষ পর্যন্ত কবে সেখানে পৌঁছান যাবে সেটা বাবার ঈশ্বরই একমাত্র বলতে পারেন। বরং জমি না বলে বন বলা ভাল। বাঘের নিবাস ছিল এবং যে দুটো-একটা এখনও নেই কে বলবে। বাবা যতই সাহসী হোন, অদূরে পুলিস ব্যারাক না থাকলে এখানে বাড়িঘর করার সাহস পেতেন না। সব বাবলা গাছ, নানা রকমের সব লতা, কাঁটা, ঝোপ, কোথাও কোথাও সব মরা গাছের গুঁড়ি, ভাঙা ইঁটের ডাঁই। যত সাফ করে এগোনো যাচ্ছে, তত সব আবিষ্কার করা যাচ্ছে। হেস্টিংসের আমলের কুঠিবাড়িও বনের ভেতর মিলে যেতে পারে—কিংবা নগর-টগর ছিল—এখন শুধু তার ধ্বংসাবশেষ। বাবা সারাদিন কোদাল কুপিয়ে আগাছা তুলছেন, সঙ্গে আমি এবং পিলু। আর ঠুং করে কোদলে শব্দ হলেই বাবা খুব সচকিত হয়ে উঠতেন। বুঝি আছে কোথাও কোন গুপ্তধন। তিনি ঝুঁকে বসতেন, কোদাল মেরে সেই ইষ্টকখণ্ডের নাড়িসুদ্ধ টেনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—ইষ্টকখণ্ড, না আসলে স্বর্ণপিণ্ড—রহুকাল মাটির নিচে পড়ে থাকায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সবই দৌড়ে আসত। মা পর্যন্ত। মার মুখের কাছে নিয়ে বলতেন, কি মনে হয়। কেমন শক্ত দেখ। পাথর। পাথর আসবে কোত্থেকে। মা কিছু না বলা পর্যন্ত ফেলে দিতে পারতেন না।

মা বলত, আর কি মন হয়! আমাদের কপাল খুলবে ভালই হয়েছে।

বাবা অভয় দিয়ে বলতেন, পেয়ে যাব। ঠিক পেয়ে যাব। বুঝলে এটা কাশিমবাজার কুঠির কাছাকাছি জায়গা। একসময় খুব বড় নগর ছিল এখানে। কলকাতা শহর আর কত বড়, তার চেয়ে বড় শহর ছিল। মানুষজন, কুঠির সাহেবরা, পৃথিবীর সোনাদানা সব লুটেপুটে এখানে এনেই জড় করেছিল। বড় সদাগর, বেনে কি না ছিল। কত নীলকুঠির ধনরত্ন এখানে সেখানে মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক পেয়ে যাব।

একদিন ছোট দুটো শালগাছের চারা আবিষ্কার করা গেল। বাবা বললেন, থাক, বড় হলে কাজে লাগবে।

সারাদিনে বাপ বেটা মিলে পাঁচ-সাত হাত জমি সাফ করে ওঠা যেত না। আর মাঝে-মধ্যেই বাবার রহস্যময় অন্তর্ধান তো লেগেই আছে। তখন আমার পিলুর ছুটি। পিলু এখন এই বনভূমির ছোটখাট একজন সামন্ত রাজা। আর আমি হচ্ছি তার দাদা।

কত রকমের যে লতাপাতা! আশ্চর্য লাল নীল ফুল বনের গভীরে ফুটে আছে। জঙ্গলের ভেতরে অদ্ভুত বড় বড় সব গিরগিটি, গোসাপ, বেজি। একটু সমতল জায়গায়, যেখানে বেশ উপত্যকার মতো মনে হয় ঢুকে গেলে, দেখা গেল দুরন্ত খরগোসেরা ছুটছে। আমাদের মটরশুঁটি গাছগুলোর ডগা রাখা যাচ্ছে না। কারা খায় বোঝাও যাচ্ছে না। সজারু এসে খেতে পারে—পিলু বলেছিল। বাবা বলেছিলেন, সজারু ডগা খায় না। মূল খায়। এবং এক সময় খরগোসের খবর প্রথম পিলুই এনে দিয়েছিল বাবাকে।

বাবা বললেন, খরগোসের মাংস খুব সুস্বাদু। কখনো খেয়েছ? আমরা কি খাই নাখাই বাবার চেয়ে আর কে ভাল জানে! তবু তাঁর এমনধারা প্রশ্ন ছিল। যেন আমরা কত কিছু তাঁকে না দিয়ে

খেয়ে নিচ্ছি।

বাবা আরও বললেন, সজারুর মাংস খেতেও বেশ। তবে একটা দিন মাটির নিচে রাখতে হয়। তা না হলে গন্ধ যায় না।

বাবার রহস্যময় অন্তর্ধানের সময় আমরা একেবারে শুধু বনআলু খেয়ে দিন কাটাই সেটা বোধহয় তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। সঙ্গে মাংসের ঝালঝোল, বেশ জমবে তবে। আর বাবাও নিশ্চিন্তে দুটো দিন দেরি করে ফেললে, কিছু আসবে যাবে না। ঐসব ব্যাপারে বাবা পিলুকে যতটা গুরুত্ব দিত, আমাকে তার সিকি দিত না। এবং একবার বাবা না থাকায় পিলু ঠিক দুটো খরগোস শিকার করে চলে এল। মা বলল, করেছিস কি। এমন সুন্দর দুটো খরগোসকে মেরে ফেললি!

পিলু খুব মুষড়ে পড়ল। বলল, বাবা যে বলেছেন খরগোসের মাংস খেতে বেশ।

—তোমার বাবা এবার আরও কি তোমাদের খেতে বলবেন কে জানে।

পিলু খুব একটা অপরাধ করে ফেলেছে—কি করা যায়। মা কিছুতে রাঁধতে রাজী হচ্ছে না। অগত্যা এ-সব ক্ষেত্রে সে আমারই শরণাপন্ন হতে পছন্দ করে। মায়া তো উল্টে-পাল্টে দেখে ওকে তুলে ফেলল। এবং আমিই বললাম, ঠিক আছে, তোমরা কেউ খাবে না। আমি, পিলু খাব। এবং যখন কেটেকুটে থালায় রাখা হল, হলুদ বেটে মাখা হল, সামান্য আদা বাটা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে বেশ সুঘ্রাণ তৈরী হয়ে গেল, তখন মা বলল, দাও রেঁধে দিচ্ছি। তোমরা তো বেশ দেশ ছেড়ে এসে এক-একজন 'বকরাক্ষস' হয়ে গেছ। এখন যা পাবে তাই খাবে।

কিছু চাল ছিল ঘরে, মা দুটো ভাতও ফুটিয়ে দিল। এবং খেতে বসে দেখা গেল, কেউ বাদ গেল না। মা নিজেও বড় তৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলল শেষটুকু। বলল, খেতে তো বেশ। তোর বাবা এলে আবার দুটো ধরে আনবি তো।

বাবা বাড়ি থাকলে ঝোপজঙ্গল কেটে রাখা আমাদের কাজ। এবং টেনে আনা, অথবা কোন ঝোপজঙ্গল টেনে আনতে না পারলে রেখে দেওয়া। শুকোলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। কতসব গাছের গুঁড়ি আর ইঁটের চাতাল। কোন ঢিবি আবিষ্কার করলেই বাবা গুপ্তধনের গন্ধ পেতেন। সহজে হাত দিতেন না। মনে হত বুঝি ঢিবিটা আছে থাক। সময় মতো খুঁড়ে ধনরত্ন তোলা যাবে।

জঙ্গল কাটতে কাটতেই বাবা কখনও চেঁচিয়ে বলতেন, ওদিকে না। এদিকে চলে এস। তেনারা পড়ে আছেন।

তেনারা কে এবং কি রকমের আমাদের এতদিনে বেশ ভাল জানা হয়ে গেছে। বলতাম, কোথায় বাবা?

ঐ দেখ। আলিসান ভুজঙ্গ। এতটুকু ভয় ভীতি নেই। পিলুটার ছিল আবার খুব বাড়াবাড়ি। সে লাঠি তুলে তেড়ে গেলে বাবা বলতেন, তোমার তো কোন অনিষ্ট করেনি। কেন মারতে যাচ্ছ।

এতবড় আলিসান ভুজঙ্গ দেখে আমাদের হৃৎকম্প দেখা দিত। বাবা কিন্তু নির্বিকার। কাজ করে যাচ্ছেন।

বিরুদ্ধ পক্ষ

প্রফুল্ল রায়

মাঝারি মাপের ফ্ল্যাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার পর পোপটলাল পারেখ বললেন, 'কি পছন্দ তো?'

মাস চারেক আগে এক বিরাট মাল্টিন্যাশানাল ফার্মে চাকরি পেয়ে বম্বে এসেছি। এখানে আসার পর বাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বম্বে শহরে আকাশের তারা খসিয়ে আনাটা বাড়ি পাওয়ার চাইতে ঢের সহজ ব্যাপার।

চারটে মাস আমি একটা গেস্ট হাউসে আছি। এখানে এই বম্বে শহরে সাতটায় সানরাইজ। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই সাড়ে আটটা বেজে যায়। সাড়ে ন'টায় অফিসে অ্যাটেনডেন্স। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে সাবার্বন ট্রেনের দম-আটকানো ভিড়ে নিজেকে গুঁজে দিয়ে চলে যাই প্রপার বম্বেতে।

সাড়ে ন'টা থেকে একটানা সাড়ে বারটা পর্যন্ত অফিসে আর মাথা তুলতে পারি না। ঘাড় গুঁজে ফাইলের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। তারপর একঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক। উদিপি সিন্ধি কি ইরানি হোটেলে দুপুরের খাওয়াটা সেরে দেড়টায় আবার ব্যাক বে রিক্লামেসনের বাইশতলা বিশাল স্কাইস্ক্রেপারে গিয়ে ঢুকি। ওখানেই আমার অফিস। দেড়টায় ঢুকবার পর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাকি পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকে না, অগুনতি ফাইল বিরাট হাঁ করে আমাকে তার ভেতর পুরে নেয়।

পাঁচটার পর অফিস ছুটি হলে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। বাবা মা আর দুটো ছোট ভাই কলকাতায় রয়েছে। দু'বছর হল বাবা রিটায়ার করেছেন। ছোট ভাই দুটো বি-কম পাস করে বসে আছে। এই অবস্থায় বম্বেতে গেস্ট হাউসে থেকে নিজের খরচ চালিয়ে আবার কলকাতার সংসার টানা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একটা বাড়ি-টাড়ি পেলে সবাইকে নিয়ে আসা যায়। তাতে খরচটা আমার মাপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারব। তাছাড়া সিন্ধি কি উদিপি হোটেলে খেয়ে পেটের বারটা বেজে যাচ্ছে। মা এলে পাকস্থলীটাকে অন্তত রক্ষা করা যাবে।

কিন্তু বম্বে শহরে বাড়ি কোথায়? প্রপার বম্বের তো প্রশ্নই ওঠে না। চার মাস ধরে গোটা আউটস্কার্ট চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু এক কামরার একটা ঘরও খুঁজে বার করতে পারিনি।

ঘর কি পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু কীভাবে যায়, বার শ মাইল দূরের কলকাতা থেকে আসা আমার মতো একটা নতুন ছেলের পক্ষে তা জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ির ব্যাপারে কিছুই করতে না পেরে পোপটলাল পারেখকে ধরেছি।

আমি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করি পোপটলাল সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট। মধ্যবয়সী এই গুজরাটি ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে অত্যন্ত হৃদয়বান। আমি যেদিন এই অফিসে রিপোর্ট করলাম

সেদিন থেকেই তাঁর স্নেহের উষ্ণতা অনুভব করে আসছি।

পোপটলাল বম্বে শহরের অন্ধিসন্ধি সব চেনেন। তিনিই খোঁজাখুঁজি করে লোক লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রপার বম্বে থেকে বার-চোদ্দ কিলোমিটার দূরে সান্তাক্রুজ ইস্টে একটা পাঁচতলা বাড়ির একেবারে মাথায় একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট বার করেছেন। আর সেটাই তিনি আমাকে এই মুহূর্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো শেষ করলেন।

ফ্ল্যাটটায় দু-খানা বড় বেডরুম, একটা হল, তাছাড়া আলাদা কিচেন, বাথরুম, ইত্যাদি ইত্যাদি তো রয়েছেই। সব চাইতে সুবিধাজনক যেটা তা হল সাবার্বন ট্রেনের স্টেশনটা বাড়ির গায়েই, দু'মিনিট হাঁটলেই ঘোড় বন্দর রোডে গিয়ে প্রপার বম্বের এক্সপ্রেস বাস পাওয়া যায়। এর চাইতে ভাল বাড়ি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

বাড়িটা পোপটলাল পারেখের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়র, তাঁর নাম ভরতরাম ঢোলাকিয়া। তিনিও এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

আমি পোপটলালকে বললাম, 'হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে। কত ভাড়া দিতে হবে?'

'আড়াই শ! তবে—'

'কী?'

'পাঁচ হাজার টাকা পাগড়ি (সেলামী) দিতে হবে।'

ভরতরাম হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'মানে বুঝতে পারছেন, বাড়িভাড়া দিয়ে আমাকে খেতে হয়। নইলে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে এসেছেন, বুঝি পাগড়িটা নেওয়া উচিত না—'

পাগড়ি ছাড়া বম্বেতে এক ইঞ্চি জায়গা পাওয়া যায় না। যে ফ্ল্যাটটা এইমাত্র দেখলাম কম করে তার পাগড়ি দেওয়া উচিত পনের হাজার টাকা। পোপটলাল পারেখের খাতিরে পাঁচ হাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এর চাইতে সস্তায় খুঁজতে গেলে বম্বে শহরে এ জন্মে আর বাড়ি মিলবে না। বললাম, 'ঠিক আছে, পাঁচ হাজারই দেব।'

কথাবার্তা পাকা করে আমরা তিনজন ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়েই পোপাটলাল আর ভরতরাম সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কেননা এই পাঁচতলা বাড়িটার প্রত্যেক ফ্লোরে দুটো করে মুখোমুখি ফ্ল্যাট। আর এই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল উল্টোদিকের ফ্ল্যাটটা থেকে মাধুরী বেরিয়ে আসছে।

তিন বছর পর মাধুরীকে কলকাতা থেকে বার শ মাইল দূরে আরব সাগরের পাড়ের এই শহরে দেখব, কে ভাবতে পেরেছিল! অবাক বিস্ময়ে পলকহীন তাকিয়ে রইলাম।

মাধুরীও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার চোখেও অগাধ বিস্ময়। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর সে-ই প্রথম বলল, 'সঞ্জীবদা না?'

মাধুরীর বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ খুব ফর্সাও না, আবার কালোও না। দুয়ের মাঝামাঝি। মসৃণ ত্বক। লম্বাটে মুখ। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বাদামী সিল্কের মতো চুল, ভাসা ভাসা মাঝারি চোখ মেলে দেওয়া পাখির ডানার মতো টানা টানা ভুরু, পাতলা ফুরফুরে নাক। পরনে প্রিন্ট করা নাইলেক্স শাড়ি আর স্লীভলেস ব্লাউজ, পায়ে উঁচু হীলের স্লিপার।

তিন বছর আগে কলকাতায় থাকতে মাধুরী ছিল বেশ মোটাসোটা, তুলতুলে নরম চর্বি দিয়ে তখন তার শরীরটা তৈরি। বাজে চর্বি ঝরে গিয়ে এই তিন বছরে তার চেহারায় ঝকঝকে ইস্পাতের ভাব এসেছে, একেবারে স্ট্রীমলাইনড যেন।

তার চেহারার মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য আকর্ষণ ছিল। সেটা এই তিন বছরে অনেক

বেড়েছে। মাধুরীর চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি এখানে!'

মাধুরী বলল, 'আমরা তো এখানেই থাকি।'

'ওই ফ্ল্যাটটায়?'

'হ্যাঁ।'

পোপটলালরা সিঁড়ি ভেঙে চারতলার ল্যাণ্ডিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওখান থেকেই পোপটলাল গলা তুলে বললেন, 'কী হল চ্যাটার্জি, যাবে না?'

একটু চমকে উঠলাম। মাধুরীকে দেখার পর পোপটলালদের কথা খেয়াল ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'আপনারা নামতে থাকুন। আমি আসছি।'

চোখের কোণ দিয়ে মাধুরীকে দেখিয়ে পোপটলাল বললেন, 'চেনাশোনা বুঝি?'

'হ্যাঁ।' আস্তে ঘাড় কাত করলাম।

পোপটলাল আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, ভরতরামকে সঙ্গে করে নেমে গেলেন।

মাধুরী এবার বলল, 'তুমি এখানে কি করে সঞ্জীবদা?'

কী উদ্দেশ্যে এই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসেছি মাধুরীকে জানিয়ে দিলাম।

মাধুরী অবাক হয়ে বলল, 'তুমি তা হলে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছ!'

'হ্যাঁ।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই মাধুরীর মা আর ছোট বোন সুব্রতা, ওদের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর মা বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে মাধু?' বলতে বলতেই আমার ওপর তাঁর চোখ এসে পড়ল, 'কে, সঞ্জীব নাকি?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম, তারপর দু-পা এগিয়ে মাধুরীর মাকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। এসে, ভেতরে এসো—'

বললাম, 'আজ আর যাব না মাসিমা, এক্ষুণি আমাকে ব্যাক বে রিক্লামেসনে দৌড়াতে হবে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তোমাকে বোম্বাইতে দেখব ভাবতে পারিনি।'

'আমি এখানে একটা চাকরি নিয়ে এসেছি মাসিমা।'

'ও মা, তাই নাকি? কদ্দিন আগে এসেছ?'

'মাস চারেক।'

'ওই দেখ, আমরা কিচ্ছু জানি না। জানবই বা কোত্থেকে? কলকাতা থেকে আসার পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগও নেই। দেখাসাক্ষাৎও নেই।'

মাধুরী এই সময় বলে উঠল, 'জানো মা, সঞ্জীবদা ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিচ্ছে।'

মাধুরীর মা বললেন, 'তাই নাকি? বাঃ খুব ভাল। আবার একজায়গায় থাকা যাবে।'

মাধুরীর বোন সুব্রতার বয়স সতের-আঠার। সে হঠাৎ রগড়ের গলায় বলে উঠল, 'আবার মজাসে ঝগড়া শুরু করা যাবে।' মাধুরীর মা আর আমি, দু'জনেই ভীষণ অস্বস্তি বোধ করলাম।

মাধুরীর মা ধমকের গলায় সুব্রতাকে বললেন, 'বাঁদর মেয়ে চুপ কর।'

মাধুরী কিন্তু এতটুকু বিব্রত হয় নি। সে ঠোঁট কামড়ে হাসতে লাগল।

তোমার মা-বাবা কেমন আছেন?

বললাম, 'ভাল।'

'ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছ, ওঁদের নিয়ে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, মাসিমা।'

'তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

এরপর বাড়ির অন্য সবাই কে কেমন আছে, কে কী করছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাসিমা। সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, 'আজ যাই মাসিমা।'

'এসো।'

মাধুরীও আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নেমে এল। নামার সময়ই ও ওদের বাড়ির তিন বছরের সব কথা তিন মিনিটে জানিয়ে দিয়েছে। মাধুরীর বাবা হরিনারায়ণবাবু এখনও কাস্টমসে চাকরি করছেন, তবে এটাই তাঁর রিটায়ারমেন্টের বছর। মাধুরী কলকাতা থেকে বি-এ পাস করে এসেছিল। এখানে সে এল-আই-সি'তে একটা চাকরি পেয়েছে। সুব্রতা অফিস সেক্রেটারিশিপ পড়ছে। ওর কোন ভাই-টাই নেই।

কথায় কথায় দু'জনে সান্তাক্রুজ স্টেশনে চলে এসেছিলাম। মাধুরী আন্ধেরীতে যাবে। ওখানকার জোনাল অফিসে সে কাজ করে। আর আমি যাব তার উল্টোদিকে চার্চ গেট স্টেশনে।

টিকিট কেটে ওভারব্রিজ পেরিয়ে আমি এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যখন নেমে যাচ্ছি তখন মাধুরী বলল, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো সঞ্জীবদা—'

বললাম, 'আচ্ছা।'

'সুব্রতা যা বলল তাই করব কিন্তু।'

'ঝগড়া তো?'

'হ্যাঁ। তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে করে এমন অভ্যাস হয়েছিল যে ওটা ছাড়া এই তিন বছরে ভীষণ অসুবিধা হয়েছে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তিন বছর ইন্টারভ্যালের পর নতুন এনার্জি নিয়ে আবার শুরু করতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।' বলেই হাসতে হাসতে ওভারব্রিজ ধরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেল মাধুরী। ওখান থেকেই আন্ধেরির ট্রেন ধরবে সে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নেমে চার্চগেটের ট্রেনে উঠে প্রপার বম্বের দিকে যেতে যেতে দিত বছর আগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

কলকাতায় শ্যামবাজারের কাছে একটা জিলিপির প্যাঁচের মতো গলির শেষ মাথায় মাধুরীরা আর আমরা একই বাড়িতে থাকতাম। বাড়িটা যে কোন আদ্যিকালের কে জানে। খুব সম্ভব জব চার্ণক নিজের হাতে ওটার ভিত পুঁতেছিলেন। সূর্য উত্তরায়ণে না গেলে ও বাড়িতে এক কণা রোদ ঢুকত না। ক'টা মাস বাদ দিলে বাড়িটা ছিল চির প্রদোষের রাজ্য। অবশ্য ছাদে গেলে খানিকটা রোদ পাওয়া যেত। গরম কালটা তবু এক রকম। শীত পড়লে মেঝে থেকে সর্বক্ষণ বরফের মতো হিম উঠতে থাকত। তাছাড়া বাড়ির ইলেকট্রিকের লাইনগুলো পুরনো ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল. যখন তখন আলো নিভে যেত, ফ্যান বন্ধ হ'ত। জলের কলেরও সেই অবস্থা।

জল, কল, রোদ, ইলেকট্রিসিটি, এসব নিয়ে মাধুরীদের সঙ্গে প্রায় রোজই আমাদের খিটিমিটি লেগে থাকত। একেক দিন ঝগড়াটা সকালে শুরু হয়ে ক্লাসিক গানের আলাপ তান এব বিস্তারের মতো সারাদিনই চলতে থাকত। ওদের পক্ষের মূল গাইয়ে ছিল মাধুরী নিজে, আর সঙ্গে সঙ্গত ধরতেন ওর মা, সুব্রতা আর ওর বাবা। আমাদের পক্ষের আসল আর্টিস্ট আমি নিজে। আমার সঙ্গে বাড়ির আর সবাই সঙ্গত ধরত।

বেশির ভাগ দিনই যুদ্ধটা হ'ত জলকল নিয়ে। তখন আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। স্না

করতে নিচের তলায় নেমে দেখি, চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই। আমি চিৎকার করে বলতাম, 'এটা কিরকম হল মাধুরী, তোমাদের কী এতটুকু কনসিডারেশন থাকতে নেই?'

মাধুরী তখন কলেজে বি-এ পড়ছে। আমার গলা পেয়েই সে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসত। বলত, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই, সবটুকু জল তোমরা শেষ করে দিলে। আমি এখন কী করে চান করি?'

'তোমার কি ধারণা আমরা সাহারা মরুভূমি থেকে এসেছি, সব সময় চৌবাচ্চার জল আর কল নিয়ে পড়ে আছি?'

'সাহারা থেকে এসেছ, না চেরাপুঞ্জি থেকে তা আমাদের জানাবার দরকার নেই। আমরা স্নানের সময় দু'বালতি জল পেলেই খুশি হব।'

'তোমরা জল পাবে কি পাবে না, তার কৈফিয়েৎ কি আমাদের দিতে হবে?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে। তোমরা নিচে থাকো। চৌবাচ্চার জল কোথায় যায়, তোমরা ছাড়া ওপর থেকে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'অত সন্দেহ হলে চৌবাচ্চার কাছে সারাদিন পাহারা দিলেই পার।'

আমাদের চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যেই মাধুরীর মা, বাবা আর সুব্রতা বেরিয়ে আসত। ওপরের বারান্দায় আমার বাবা আর ভাইরা রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে যেত। দু'পক্ষের আর্মি মবিলাইজেসনের পর কোরাসে যে চিৎকার শুরু হ'ত তাতে শ্যামবাজারের সেই গলির মাথা থেকে যাবতীয় কাক চিল চড়ুই আর শালিক পালিয়ে যেত।

শুধু কলের বা চৌবাচ্চার জল নিয়ে না, ছাদের ভাগভাগি, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট বড় সব ব্যাপারে রোজই ওপরে-নিচে যুদ্ধের দামামা বেজে যেত।

ঝগড়া ছাড়া ওদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হ'ত না। দেখা হলেই দু'পক্ষ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

এইভাবে মাধুরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পুরো দশটা বছর কেটে গেছে। তারপর একদিন ওর বাবা বদলি হয়ে বম্বে চলে গেলেন। নিচের তলাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বাড়িওয়ালা তারপর আর ওটা ভাড়া দেয় নি। তার গেঞ্জির কল ছিল, নিচের তলায় গো-ডাউন করেছে। মাধুরী চলে যাবার পর বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। ঝগড়া নেই, চিৎকার নেই। কাকেরা চড়ুইয়েরা আবার ফিরে আসতে শুরু করেছিল। টানা দশ বছর যুদ্ধের পর শান্তি নামলেও কেমন সব কিছু ফাঁকা লাগতে শুরু করেছিল।

মাধুরীরা চলে যাবার পর দশ বছরের সেই অভ্যেসটায় দারুণ একটা ধাক্কা লেগেছিল।

মা বলতেন, 'মাধুরীরা ছিল, সময়টা বেশ কেটে যেত। এখন আর ভাল লাগে না।'

বাবা এবং ভাইরাও সে কথা বলত। আসলে দিনরাত একটানা দশ বছর যুদ্ধ করলেও তলায় তলায় কোথায় যেন একটা টানও ছিল। মাধুরীরা চলে যাবার পর সেটা টের পাওয়া গেছে।

যাই হোক, সময় তো আর হাঁটু গেড়ে বসে থাকে না। সেটা চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে বাবা রিটায়ার করেছেন, ভাইরা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বসে আছে। আমি এম-কম পাস করে আচমকা একটা চাকরি পেয়ে বম্বে চলে গেছি। আর কি আশ্চর্য, এতকাল পর আবার মাধুরীদের সঙ্গে দেখা হল। কলকাতার মতো এবার আর ওপরে-নিচে নয়, একেবারে মুখোমুখি থাকতে হবে।

পরের দিন পোপটলালের আত্মীয়টিকে পাগড়ি এবং ভাড়ার টাকা দিয়ে ফ্ল্যাটটা নিয়ে

নিলাম! তারপর একটা মাসও কাটল না। মা বাবা ভাইদের কলকাতা থেকে নিয়ে এলাম। ওরা মাধুরীদের দেখে অবাক। কি অদ্ভুত কাণ্ড, মা বাবা আর ভাইরা মাধুরীদের এত কাছে পেয়েও যুদ্ধ ঘোষণা করল না। শুধু বলল, 'যাক্ বাবা, এক ঘর চেনা-জানা মানুষ পেয়ে বাঁচলাম।'

তারপর দেখা যেতে লাগল, আমার মা-বাবা মাধুরীর মা-বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে গীতাপাঠ শুনতে যাচ্ছেন। আর আমরা অর্থাৎ মাধুরী, সুব্রতা আমি আর দুই ভাই তপু এবং তনু কোন ছুটির দিনে চলে যেতাম পুণা, কখনও এলিফ্যান্টা কেভে, কখনও জুহু বীচে, কখনও বা দু-তিন দিনের জন্য গোয়ায় কি অজন্তা-ইলোরায়।

তা ছাড়া যদিও মাধুরী এবং আমার অফিস বম্বে শহরের দক্ষিণে এবং উত্তরে, একেবারে পরস্পরের উল্টোদিকে, তবু ইচ্ছে থাকলে কী না হয়! ছুটির পর আগে থেকে একটা জায়গায় ঠিক করে আমরা দেখা করি।

মাধুরী বলে, 'দেখ, এভাবে ঠিক জমছে না।'

ওর কথা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করি, 'কিভাবে?'

'এই ঝগড়া-ঝাঁটি না করে জাস্ট লাইক গুড নেবারস আমরা যে আছি, এতে কোন চার্ম নেই। কলকাতায় দশ বছর ঝগড়া করে করে হ্যাবিট এরকম হয়ে গেছে যে—'

'ঠিক বলেছ। লোকসভায় অপজিসন না থাকলে সেসান জমে না।'

'ওয়ারটা ডিক্লেয়ার করব কী নিয়ে? কল জল, ইলেকট্রিসিটি মিটার, সবই তো আলাদা।'

'তাই তো।'

ভেবে বললাম, 'এক কাজ কর। ঝগড়ার কোন সাবজেক্ট বার করা যায় কিনা সেটা খুঁজে বার কর। আমিও বার করতে পারি কিনা দেখি।'

মাধুরী বলল, 'ঠিক আছে।'

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার মতো কোন বিষয়বস্তু খুঁজে বার করতে পারিনি আমরা। তবে আমার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে।

একদিন ছুটির পর বাস স্ট্যাণ্ডে সমুদ্রের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'দেখ মাধুরী তুমি যদি হেল্‌প্ কর, ঝগড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

মাধুরী দু'চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল, 'কী সাহায্য চাও?'

বললাম, 'যদি সাহস দাও বলব।'

'দিলাম সাহস।'

'তুমি এক ফ্ল্যাটে থাক, আমি আরেক ফ্ল্যাটে। কল জল ইলেকট্রিসিটি কিছুই কমন নয়। যদি পার্মানেণ্টলি আমাদের ফ্ল্যাটে আস তা হলে মানে কাছাকাছি থাকলে ঝগড়া কি আর একটা বাঁধানো যাবে না?'

থমকে গেল মাধুরী। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তার ফর্সা মুখে ধীরে ধীরে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কুট করে চিমটি কাটল সে। তারপর আবছা ফিসফিসে গলায় বলল, 'এই মতলব।' তার চোখে জোনাকির মতো হাসি ঝিকমিক করতে লাগল।

আমি দু'হাত জোড় করে বললাম, 'এছাড়া আর কোন উপায় নেই। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে আমি বাঁচব না। বল রাজী কিনা?'

একটু চুপ করে থেকে মাধুরী বলল, 'রাজী।' বলেই কুট করে দ্বিতীয় চিমটিটি কাটল।

অতিথি

আনন্দ বাগচী

সপ্তাহের ছ'টা দিনই যেন জকিবাহন রেসের ঘোড়া। খবরের কাগজ চায়ের পেয়ালা সেফটিরেজার আর বাজারের থলে হাতে নিতে নিতেই সকালের কাটপিস শেষ। তারপর গরম ভাতের থালায় নাকখৎ দিয়ে উঠেই টিফিনের কৌটো হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়, এবং সন্ধে উতরে নাভিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বাড়ি ফেরা। রেলের টাইমটেবলের মতো এই টাইট ছকের মধ্যে আর আলস্যবিলাসের কোন সুযোগ নেই।

তাই ছুটির দিন আর রবিবারগুলো একেবারেই ঢিলেঢালা আর অন্যরকম করে নিয়েছে মলয়। বেলা করে বিছানা ছাড়ার আগে এক খামচা আয়েস করে নেয়। বেড-টি খায়, ফের পাশবালিশ আঁকড়ে শোয়। অজন্তা হালকা করে রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিয়ে ব্রেকফাস্টের যোগাড়ে কিচেনে ঢোকে। পাড়াটা নিরিবিলি, বাড়িটাও চুপচাপ, নির্জন। ছেলেটা রামকৃষ্ণ মিশনের ইস্কুলে, বেলুড়ে। মলয়ের ছোট পরিবার তাই আরও ছোট। বউ আর বই আর এই রেকর্ড প্লেয়ারের বাইরে বলতে গেলে মলয় নির্বান্ধব। আড্ডা নেই, তাসফাসের নেশা নেই, বলতে গেলে চা-সিগারেটের বাইরে অন্য ধরতাই নেই। অর্থাৎ সুর পর্যন্তই তার দৌড়, সুরা নয়।

সানাই কি সেতার থেকে সুরের ঝরনা বইতে থাকে আর সেই শিহরণ-তোলা স্রোতের মধ্যে মসৃণ নুড়ির মতো অর্ধমগ্ন মলয় গা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। আজও তাই ছিল, হঠাৎ একটা ইংরেজী ড্যান্স মিউজিক সব তাল কেটে দিল। বিরক্ত মলয় প্রথমে ভেবেছিল পাড়ায় কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে বুঝি লাউড স্পিকারের ধুন্ধুমার শুরু হয়। লাগাতার অষ্টপ্রহর চলবে।

জানলা বন্ধ করে দেবার জন্যে অজন্তাকে ডাকতে যাচ্ছিল এমন সময় অজন্তাই দুম দুম করে দাপিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর সশব্দে জানলা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, 'কী রকম শয়তানী দেখলে?'

মলয়ের মৌতাত চটকে গিয়েছিল। বিছানার ওপর উঠে বসে বলল, 'কী হয়েছে?'

'কালা তো নও, কী হয়েছে বুঝতে পারছ না? তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে স্টিরিও এসে গেছে নিচের তলায়। ঠিক নিচের জানলায় বসানো হয়েছে শয়তানী করে।'

মলয় বুঝতে পারল নিচের তলা এবার সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করল। এতদিন ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল দু তরফে। রেষারেষি, পাল্লাপাল্লি, অসহযোগ, কথা বন্ধ। আড়ালে আবডালে নিন্দেমন্দ কটুকাটব্য। নিচের তলা থেকে ওপরের তলায় মনি-অর্ডারে ভাড়া আসে, তার জবাবে ওপর থেকে নিচে রেজিস্ট্রি ডাকে রসিদ যায়।

অথচ প্রথম দিকে এরকম ছিল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই ওঁরা বাড়ি দেখতে এসেছিলেন

কোন এক রোববার সকালে। দেখেই মন হয়েছিল ভদ্র ছিমছাম পরিবার। শিক্ষিত। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করেন। একজন খবরের কাগজের অফিসে, অন্যজন এক নামকরা গার্লস কলেজে। একমাত্র মেয়েকে শান্তিনিকেতনে রেখে পড়াচ্ছেন। মিল শুধু এইটুকুই নয়, দুই গৃহিণীই দুজনকে চিনতে পেরে গেছেন দেখামাত্রই। কলেজে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছেন, তবে যাকে বলে বন্ধুত্ব তা ছিল না, এবার হল।

সেলামী অ্যাডভান্স দূরে থাক, স্কয়্যার ফুট হিসেবে ধরলে যে ফ্ল্যাটের ভাড়া বারো শ' টাকা হেসেখেলে আসতো, তাকেই অজন্তার অনুরোধে সাতশোয় নামাতে হল। থ্রিরুম ফ্ল্যাট, ডবল বাথ আর ডাইনিং স্পেস, ঝকঝকে মোজাইক টাইলস বসানো মেঝে। সাতশো টাকায় আজকাল ভাবাই যায় না। মলয় গাঁইগুঁই করেছিল। অজন্তাই আগ বাড়িয়ে ওকালতি করেছিল ও তরফের হয়ে। 'না না, কল্পনারা ওর বেশি দিতে পারবে না, মেয়ের জন্যেই মাস মাস এক কাঁড়ি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। তার ওপর শ্বশুড়বাড়িতেও দিতে হয়। নিজেদের দিয়ে বুঝতে পার, তাও তো তোমার পিছুটান নেই। বাবার সুবাদে বাড়িখানা পেয়েছ, ভাড়া লাগে না।'

'কিন্তু আজকের বাজারে—' মলয় একটা ক্ষীণ আপত্তি জানাতে গিয়েছিল কিন্তু অজন্তা তাকে থামিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে।

'না না, কোন কিন্তু ফিন্তু নয়। টাকাটাই সব নয়, মনের মতন ভাড়াটে পাওয়াই বড় কথা। এরকম নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার চাইলেই তো আর পাবে না। তার ওপর কল্পনা আমার বন্ধু, আমি বন্ধুকে ফিরিয়ে দিতে পারব না। কুশলবাবু আবার রাইটার, বাজারে নামডাক আছে। এতে আমাদের প্রেসটিজ বাড়বে বই কমবে না।'

মলয় আর কথা বাড়ায়নি। সে শান্তিপ্রিয় মানুষ। চেনাজানার মধ্যে হলে এক হিসেবে ভালই, কিছুটা বল ভরসা পাওয়া যায়। তা ছাড়া, অজন্তা একা একা থাকে, তার একজন মনের মত সঙ্গীও হল। কল্পনা সুন্দরী, চেহারার মধ্যে একটা চোরা টানও আছে। ভাবভঙ্গি, চাউনি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। কুশলবাবু মানুষটাকেও বেশ ঠাণ্ডা মেজাজেরই মনে হয়েছিল।

দুই সখীতে গলাগলি হতে বেশি সময় লাগেনি। আসা-যাওয়া, গল্পগুজব, এক সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার, মার্কেটিং চলছিল ভালই। রান্না বিনিময়, বই আদানপ্রদানও হচ্ছিল। দুই কর্তা অবশ্য ভদ্রতা আর সৌজন্য বিনিময়ের বেশি এগোয়নি।

প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে আর প্রকৃতির নিয়মে মিশে হঠাৎ একদিন ঘনিষ্ঠতায় চিড় খেল। স্পষ্ট করে কারণটা ঠিক ধরা গেল না। তবে পরস্পরের সম্পর্কে উচ্ছ্বাস থেমে গেল। মেয়েদের সপ্তপদী বোধহয় এরকমই শর্ট জার্নি। বিউটি পারলার অবধি এগিয়েই থমকে গেল। চুল ছাঁটা, খোপা বাঁধা, ভুরু কামাইয়ের পর ক্রমশ সমালোচনা কানে আসতে লাগল। একপক্ষ বলল, দেমাকী, অন্যপক্ষ বলল স্বভাব ভাল নয়। দুপক্ষই বোধ হয় নিজের নিজের স্বামী সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হয়ে পড়ল। আসলে ঠাণ্ডা লড়াইটা প্রথমে বাইরে থেকে ধরা যায় না। ফ্রিজ ফার্নিচার ওয়াশিং মেশিন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দাবার গজ বোড়ের মতো জায়গা বদলাতে লাগলো; ওপরে এটা আসে তো নিচে ওটা। তারপর কথা বন্ধ, ঝি ভাঙানী, কথা চালাচালি। মেয়েদের পেট আলগা কিন্তু চোখ আলগা না। পরস্পরের হাঁড়ির খবর তদ্দিনে হাতানো হয়ে গেছে। দু তরফই বেপর্দা। পুরুষরাও শেষ পর্যন্ত আর নিরপেক্ষ থাকতে পারল না। রক্তের সম্পর্কও মানুষ ভুলে যায় কিন্তু বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক ভোলা অসম্ভব।

'কী?' অজন্তা গলায় পাঁচফোড়ন ঝাঁজ মেশায়, 'কী মশাই, একেবারে যে নির্বাক হয়ে গেলে। তোমার সুন্দরীর আস্পর্দা একবার দেখলে!'

মলয় মুচকি হেসে বলল, 'কী যে বল! আমার সুন্দরী তো জলজ্যান্ত আমার সামনেই দাঁড়িয়ে।'

'থাক আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। তোমার মিচকে স্বভাব, ডুবে ডুবে জল খাওয়া, বুঝতে আমার থোড়াই বাকি আছে। এক কথায় যখন সাতশোতে রাজী হয়ে গেলে তখনই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

'আমি? যাঃ!'

'আমাকে রাগিও না, আমি সব লক্ষ্য করছি।'

মলয় অজন্তার দর্শনশক্তি সম্পর্কে আর ঘাঁটালো না। কী খুঁড়তে কী বেরিয়ে পড়বে কে জানে। আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু এর পালটা দাওয়াই ভাবতে তো কিছু সময় লাগবে। কেউ যদি কারো ঘরে স্টিরিও বাজায় কিংবা অষ্টপ্রহরের জন্যে কীর্তনীয়া ভাড়া করে আনে, আমরা হুট করে কিছু করতে পারি না। আইন এখন ভাড়াটেদের টেনে চলে।'

কথাগুলো বলে মলয় আর অপেক্ষা করে না, বাথরুমের নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকে যায়। তারপর দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে শুনতে পায় অজন্তার দ্রুত ডাইরেক্ট অ্যাকশন নেওয়ার শব্দ। ঘরের মেঝের টাইলস না ভাঙে শেষ পর্যন্ত। কারণ হামান দিস্তেয় যেভাবে মুগুর চালাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সে কেবল মশলা নয়, প্রতিপক্ষকেও পিষছে। শব্দতত্ত্ব ঠিক ঠিক বিচার করলে কে জানে হয়তো সে নিজেও তার পাল্লার বাইরে নয়। ঝি নিকেশ হবার পর মলয় নিজে থেকেই মিক্সার কিনে দিয়েছে। কিন্তু সে যন্তর ফেলে যখন—

এ দিয়ে ভেবে অবশ্য লাভ কোন লাভ নেই। আজকের ব্রেকফাস্ট একটু ট্রাবল দেবেই। বাথরুম থেকে সোজা বসবার ঘরে চলে এল। ব্যালকনির ওপর ক্যালেণ্ডারের মতো করে পাকানো সুতলি-বাঁধা খবরের কাগজের ক্ষেপণাস্ত্র সশব্দে ভূমিষ্ঠ হল সেই সময়। ইংরেজী বাংলা দুটো কাগজ আসে রবিবারে কিন্তু সত্যি বলতে কি একখানাই পুরো পড়ে ওঠা হয় না কোন দিন। কাগজ নিয়ে ফিরে এসে সোফায় বসলো। কিন্তু বাংলা কাগজের পৃষ্ঠা খুলেই মন হল যেন অশুচি কিছু দেখে ফেলেছে। রবিবারের পাতাটি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলল। যার বই এত দিন রুদ্ধনিঃশ্বাসে গিলছে, অফিস লাইব্রেরীতে কিনিয়ে ছেড়েছে, এমনকি অস্বীকার করে লাভ নেই, লেখকের স্বহস্তাক্ষরে উপহার দেওয়া গণ্ডাখানেক বই পেয়ে মৃদু রোমাঞ্চও অনুভব করেছে—সেই কুশলকল্যাণ মিত্তিরের প্রায় একপাতা-জোড়া গল্প বেরিয়েছে দেখে সে রীতিমত অসুখীই হল।

একটু পরে অজন্তা ব্রেকফাস্টের ট্রে সাজিয়ে ঘরে এলো, মুখে বিজয়িনীর হাসি। বলল, 'ডোজটা কি রকম মন্ত্রের মতো কাজ করেছে দেখলে তো! হামানদিস্তে নিয়ে রাতে আর একচক্কর বসবো।'

মলয় এতক্ষণ নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল, অন্যমনস্কভাবে খবরের কাগজের হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে বেড়াচ্ছিল, তাই খেয়াল করেনি। নিচের তলার স্টিরিও আচমকাই বন্ধ হয়ে গেছে। সুরের তাণ্ডব, কানের পর্দা-কাঁপানো অসুরের মতো গলা স্তব্ধ। ভাবা যায় না।

'তুমি ভানুমতীর খেল দেখালে অজন্তা। সত্যি তোমার বুদ্ধি আর হাতযশ আছে।'

অজন্তা খুশি হয়ে বলল, 'খাও, খাবারগুলো, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দেখো না ওদের আমিই ঠাণ্ডা করে দেব। ওরা ভেবেছে কি!'

কিন্তু ওরা কি ভেবেছে সেটা ছাপার অক্ষরে জানা গেল একটু পরেই। অজন্তা খুব দ্রুত পড়ুয়া। থান ইঁটের মতো এক একখানা বই সাবাড় করে দেয় এক এক দিনে। রবিবারের পৃষ্ঠাটা ও খুলে ফেলেছিল টোস্ট খেতে খেতে। চায়ে চুমুক দিয়ে অজন্তা আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখেছ! দেখেছ! লোকটার সাহস দিনকে দিন কোথায় পৌঁছেছে! আমি ওকে মানহানির মামলায় ফাঁসিয়ে লেখকগিরি যদি না...রাস্কেল, ইডিয়েট, ফুল! তোমার সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে কি সব লিখেছে দেখো।'

বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠল মলয়ের। চরিত্রফরিত্র নিয়ে কিছু টীকাটিপ্পনী কেটেছে কিনা কে জানে। হয়তো কল্পনার সঙ্গে তার....ফ্যাকাশে মুখে মলয় তাকালো অজন্তার দিকে। তারপর মাথা দোলালো, 'ওই ট্র্যাশ রাবিশ পড়ার প্রবৃত্তি আমার নেই, ফেলে দাও।'

'ফেলে দেব কি বলছ! এটাই আমাদের ডকুমেণ্ট, কাগজে-কলমে প্রমাণ। গপ্পোটা তোমার পড়া দরকার, কোন কোন পয়েণ্টে ঝোলানো যায় একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো।'

গল্পের নামটাই রীতিমত আপত্তিজনক মনে হল মলয়ের কাছে। গল্পটা পড়ার পর পিত্তি জ্বলে গেল। কাহিনীটা যে তাদের নিয়েই ফেঁদেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কিছু সত্য আছে যা অপরের চোখ দিয়ে দেখলে চমকে যেতে হয়। মলয় চমকে চমকে উঠছিল। তাদের স্বামী-স্ত্রীর এমন কিছু গোপন কথা কুশল মিত্তিরটা ফাঁস করে দিয়েছে যে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিল সে থেকে থেকে। এই সব ঘটনা কুশল জানলো কি করে আশ্চর্য! এমন হতে পারে যে কাকতালীয় মিল। কিন্তু এরকম অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখে কেমন সন্দেহ হয়। তাদের প্রাক্-বিবাহ প্রেমের ইতিহাস এমন খুঁটিনাটিতে জানলো কি করে লোকটা? গল্পের নাম দিয়েছে স্ত্রৈণ। সরাসরি যেন মলয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছে।

গল্প শেষ করে দুম করে বসে থাকল মলয়। এই কুশল লোকটা মহা শয়তান। পরের কেচ্ছা গেয়ে যারা বড় হয় তারা কি মানুষ? এ বাড়িতে ঢুকেছিল ছুঁচ হয়ে, এখন সেই ছুঁচ হয়ে উঠেছে ফাল, কিন্তু বেরোনোর কোন লক্ষণ নেই। বাড়ির একতলায় গেড়ে বসে আছে শূলের মতো মাথা উঁচিয়ে। সামান্য নড়াচড়া করলেই অধোদেশে যন্ত্রণা, অথচ সে যন্ত্রণা গোপনে হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

অজন্তা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। গল্পটা পড়ার পরেও কোন মন্তব্য করল না দেখে অস্বস্তিবোধ করল। জিজ্ঞেস করল, 'কী, আমাদের নিয়েই তো? তবে?'

মলয় মাথা নেড়ে বলল, 'তবে বলে কিছু রাখেনি। কৌশলে আইন বাঁচিয়ে লিখেছে, আমরা কিছু করতে পারবো না!'

অজন্তা অনেকক্ষণ মুষড়ে থেকে শেষে বলল, 'তা হলে ওদের উঠে যাবার নোটিশ দাও।'

মলয় এবার মুচকি হাসল, 'তোমাকে স্টাণ্ট দেব বলে গোপন রেখেছিলাম। নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে।'

'যাঁ! বলো কি!'

'রাতে টিভিতে হিন্দী নাচগানের ফাঁকে ফাঁকে আবার নিচের তলার কথাই হচ্ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। অজন্তা মুখ ভার করে বলল, 'লোকটা এত অসভ্য তোমাকে কি বলব। হ্যাংলার মতো

ড্যাবা ড্যাবা চোখে এমন তাকিয়ে থাকতো যে ইচ্ছে হত দুচোখ গেলে দিই।'

মলয় রীতিমত অবাক হয়ে বলল, 'তাই?'

অজন্তার অভিযোগ তখনো ফুরোয়নি। সে নিজের মনেই বলে চলল, 'আবার লিখেছে কিনা আমার ব্যবহারেই এ বাড়িতে আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব কেউ আসে না। আমি নাকি কিপ্টে, হিংসুক, কাউকে পাঁচ মিনিটের বেশি সইতে পারি না। পারি না যদি, তাহলে তোর বউ ক'মাস ধরে এই ফ্ল্যাটে ডেরা বেঁধেছিল কি করে? আমার পয়সায় তো দিব্যি সিনেমা থিয়েটার দেখলো, চাইনিজ সাঁটালো। লজ্জা করল না এতবড় মিথ্যে কথা বলতে লিখতে!

এই সব গূঢ় তথ্য মলয়ের জানা ছিল না তো! একদিন বিউটি পারলারে পর্যন্ত ....যাকগে সেসব কথা। আসলে ওদের বাড়ির অত লোকজন আসে সেই গুমরে মরছে। লোক কেন আসে তাকি বুঝি না, নাকি আমি কানা, আমার চোখে পড়ে না। লেখকমশাই ভাবছে ওরই অন্ধ ভক্ত, অ্যাডমায়ারার সবাই। আসলে—'

কথা শেষ হল না, ডোরবেল বেজে উঠলো দুজনকেই চমকে দিয়ে। এই অসময়ে তাদের কাছে আবার কে এলো!

দরজা খুলে কেমন হতবম্ব হয়ে গেল মলয়। প্রথমে মন হয়েছিল একটা ছোটখাট বাহিনী, কিন্তু না। সাকুল্যে তিনটি প্রাণী। দেড়জন আর এক কুচি, অঙ্কের হিসেবে। বিশাল দশাসই এক ভদ্রলোক, ছফুট ছাড়িয়ে হাইট আর তার হাঁটুর কাছে লিলিপুটের মতো দেখাচ্ছে এমন একটি শিশু। শিশু না বালক ঠিক ধরা যায় না। পিছনে ঠিক ডবল-হাফ অর্ধাঙ্গিনী। নীচ থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ট্রাঙ্ক সুটকেস হোল্ডঅল মাথায় কুলি। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ভদ্রলোক মলয়কে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মেঘ-ডাকা গলায় হেসে উঠলেন। হা হা করে।

'কথা ইজ কথা! এসে গেলাম।'

কে এলো, কোথায় এলো কোথায় এল কিছুই মাথায় ঢুকছিল না মলয়ের। সব ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে যেমন ছিল, তেমনি থাকল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে। তার বেবাক বিহ্বল ভাব দেখে ভদ্রলোক ভুরু কোঁচকালেন, 'কী, চেনা যাচ্ছে না? আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি। ছেলেবেলার বন্ধুকে কি কেউ ভুলতে পারে! তবে চেহারার অনেক হেরফের হয়েছে।'

বিদ্যুৎচমকের মতো মলয়ের মাথায় একটা নাম খেলে গেল। শচীন ওরফে হাবুল নয়তো! অনেকদিন থেকেই, উভয়পক্ষে চিঠি চালাচালি হয়ে আসছে অনিয়মিত। হাবুল একবার আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিল। মলয় তাকে আসতে লিখেছে প্রায় প্রতি চিঠিতেই। কতকাল বাংলাদেশ-ছাড়া হয়ে আছে প্রবাসী হাবুল। দেশ-দেশোয়ালীদের একবার দেখে যাক নিজের চোখে। কিন্তু হাবুলের আর অবকাশ হয় না। মিলিটারি সার্ভিসে আছে। আজ কানপুর, কাল কাশ্মীর করে তার দিন গেল। কিন্তু হাবুলকে চিনতে পারল না। ইস্কুলের সেই নিচের ক্লাস থেকেই ছাড়াছাড়ি। ওর বাবা বিলাসপুরে বদলি হয়ে যাবার পর দুজনেরই খুব কষ্ট হয়েছিল। ওই বয়সে প্রাণের বন্ধুকে ছেড়ে থাকা খুব শক্ত।

'কী রে, দরজায়ই দাঁড় করিয়ে রাখবি? বন্ধু বলে চেনা যদি নাই যায়, ভদ্রলোক বলেও কি সন্দেহ হচ্ছে?'

মলয় লজ্জিত হয়ে বলল, 'এসো ভেতরে এসো, হাবুল না? মনে পড়েচে!'

হাবুল কুলীকে বামাল ভেতরে নিয়ে আসতে আসতে বলল, 'হোয়ট ইজ ইন এ নেম! হাবুলই হই আর হরেকৃষ্ণই হই মনে পড়াটাই বড় কথা। তবে এখনো মুখের আড় ভাঙেনি। তোর, তুমি-তুমি করছিস!'

মলয় সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে হাসল, তারপর বলল, 'সেটা আমার মুখের দোষ না তোর চেহারার, বুঝে দেখ। অমন রাণাপ্রতাপ-মার্কা চেহারা করেছিস যে মুখ দিয়ে তুমি কেন, আপনি যে বেরিয়ে যায়নি এই তোর ভাগ্যি। ওগো শুনছো, দেখ কে এসেছে।'

মলয়ের ওগো বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ কাছেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ শুনছিল। এবার সেই মুখ্য ভূমিকা নিল। বহুকালের পরিচিতের মতো এগিয়ে এসে বলল, 'আসুন আসুন, আমরা তো আপনাদের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আসুন ভাই'—হাবুলের স্ত্রী ওকে রিসিভ করতে এগিয়ে গেল, 'আমি অজন্তা। বাঃ দিব্যি তো পুতুলের মতো ফুটফুটে ছেলেটি আপনার। এই একটিই বুঝি?'

ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'না, ওর দিদি আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

বলেই ছেলের পিঠে একটা খোঁচা মারলেন, চোখের রিমোট কনট্রোলে কাজ হল না দেখে।

'চাচী, নমস্তে।' বলেই ছেলেটা মলয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। সেই সঙ্গে আরো একটা কাজ করল যেটা কেবল বোধহয় মলয়ই দেখতে পেল। দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। একবার মনে হল কি জানি ভুল দেখেছে। ওইটুকু একরত্তি ছেলে কি অমন ফিচেল হাসি হেসে চোখের শাটার টিপতে পারে?

ছেলের মা নিজের ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, 'জানেন ভাই, নিজের ছেলে বলে বলছি না, খুব স্মার্ট হয়েছে, চোখেমুখে কথা বলে। একটু রেস্টলেস, তবে দুরন্ত না। আর কি সুন্দর যে রিসাইট করে কি বলব। কত ইংরেজী আর হিন্দী কবিতা যে—'

হাবুল অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'হবে হবে, ওরা কেউ তো আর বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারছে না।'

ছেলেবেলার বন্ধুরা এই রকমই হয়ে থাকে হয়তো। তিরিশ বছর পরে দেখা হলেও একটু আড়ষ্টতা থাকে না। হাবুল ঘরে ঢোকার পরের মুহূর্ত থেকেই জমিয়ে নিল। যে কেউ দেখলে ভাবতো এট হাবুলেরই নিজের বাড়ি, এখানে হাবুলই একমাত্র কথক, এ সংসার হাবুলরাই চালাচ্ছে। মলয় আর অজন্তা নিমিত্ত মাত্র। হাবুল আর তার গিন্নীর ইচ্ছেই তামিল করে চলেছে যেন। হাবুলের মতো এত আন্তরিক, আত্মপরজ্ঞানশূন্য সরল চরিত্র জীবনে এই প্রথম দেখল তারা।

মলয় আর অজন্তাকে বলতে গেলে কিছুই করতে হয়নি। আদর-আপ্যায়নের জন্য থেমে থাকেনি হাবুলরা। নিজের ঘর-সংসার মনে করে তারা শোবার ঘর দখল করে বসেছে। মলয়রা চলে এসেছে গেস্টরুমের সোফাকাম বেডে। রান্নার ব্যাপারটা, বাজারের ফর্দটা, খাবার পরিবেশনের দায়িত্বটা ওরাই নিয়েছে। মলয় শুধু বাজার করছে, আর অজন্তা কাজের লোক না আসার দরুন বাসন মাজছে। বাকি সময়টা বেকার। যদিও অফিস কামাই হচ্ছে মলয়ের। বন্ধুকে এতকাল পরে পেয়েছে হাবুল। হাতছাড়া করতে মোটেই রাজী নয়। মলয় তার সঙ্গী, তার শ্রোতা। পান-অভ্যেস যদিও তার নেই তবু সন্ধ্যেবেলায় এক গ্লাস র-জল নিয়ে সঙ্গ দিতে হয়। এই প্রচণ্ড আমুদে মানুষটার আদুরে চড়চাপড় খেয়ে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তবলচির মতো ঠিক সময় ঠিক জায়গায় হুঁ হাঁ দিতে হয়। দিন তিনেকের মধ্যেই গুটি পাঁচেক কবিতা ফাটা রেকর্ডের মতো

বারবার শুনতে শুনতে আর বাহবা দিতে দিতে গায়ে অ্যালার্জির র‍্যাস বেরিয়ে গেল দুজনের। বিচ্ছু ছেলেটাকে আর কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। পর্দা বেয়ে উঠতে গিয়ে পেলমেন্ট ভেঙে, সোফার স্প্রিং দাবিয়ে, ড্রেসিং টেবল আর পুতুলের আলমারি তছনছ করে বাড়িটাকে জগন্নাথক্ষেত্র বানিয়ে ছেড়েছে। ভদ্রতাবশত মা বাবার সামনে ছেলেকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। তারা পুত্রস্নেহে অন্ধ, ছেলের বালখিল্যতায় 'ছিঃ সোনা, দুষ্টু করে না' বলে হেসে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছে। মরীয়া হয়ে মলয় বার দুই গোপন আদর জানাতে গিয়ে হাতে কামড় আর গালে আঁচড় খেয়েছে। পেপার ওয়েট ফেলে অজন্তার পায়ের বুড়ো আঙুল থেঁতলে দিয়ে ছেলেটা এখন এই মুহূর্তে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে খেলছে।

এদিকে হাবুলরা কতদিন এখানে থাকবে কিছুই বলছে না। ভরসা করে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। দুজনই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চোখের কোলে কালি পড়েছে। চোখের সামনে একে একে সব যাচ্ছে ভেঙে তুবড়ে তছনছ হয়ে। রক্ত আর টাকা দুইই যেভাবে জল হয়ে যাচ্ছে তাতে আর বেশিদিন টানা যাবে না।

হঠাৎ এমন সময় আবার কলিং বেল বেজে উঠল।

মলয় টলতে টলতে উঠে দরজা খুলে দিতেই কুশল তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল।

'স্ট্রেঞ্জ!' কুশল মলয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা কিরকম মানুষ মশাই? আমার বন্ধুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ধরে রেখেছে! ছিঃ ছিঃ! লজ্জা হওয়া উচিত!'

মলয় আর সহ্য করতে পারল না, গলা চড়িয়ে বলল, 'গাঁজা ফাঁজা টেনে এসেচেন নাকি? ইয়র্কির একটা সীমা থাকা উচিত।'

'থামুন। আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করব। এই হরেকৃষ্ণ, কী ব্যাপার রে তোর! মাথাফাতার গোলমাল হয়ে গেছে নাকি! টেলিগ্রাম করলি আসছিস বলে, আর এসে উঠলি এই গোয়ালে!'

হাবুল ওরফে হরেকৃষ্ণর তখন নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি কে বাবা?'

'আমি কুশল, কুশল মিত্র!'

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকল হাবুল, 'অ্যাঁ, তাই তো! তাই এসে ইস্তক খটকা লাগছিল। টেলিগ্রাম পৌঁছায়নি যখন তখনই বোঝা উচিত ছিল। ভাবলাম কি জানি, কুশলের চেহারা এই বিশ বছরে বোধহয় এই রকমই হয়ে গিয়ে থাকবে। স্যরি ম্যাডাম, স্যরি ফ্রেণ্ড, অনেক ট্রাবল দিয়ে গেলাম আপনাদের। চলি।'

ওরা নিজেদের মালপত্র নিয়ে নিচে নেমে গেল।

মলয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওঃ এরকম ভুল হয় মানুষের! মনে হচ্ছে এতক্ষণ বুঝি একটা দুঃস্বপ্নই দেখছিলাম।'

'ভুল না হাতি।' অজন্তা আক্রোশে ফুঁসে উঠল, 'সব গটআপ ব্যাপার, সাজানো। আমাদের হেনস্তা করে গেল আর কি! কম শয়তানী বুদ্ধি নাকি ওদের! একদিন আমার কাছে শুনেছিল, তোমার এক ছেলেবেলার বন্ধু শিগগিরই বেড়াতে আসবে বাইরে থেকে, সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে গেল।'

মলয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, এবার ওই বংশখণ্ডকে ওরা সামলে দেখুক কেমন লাগে।'

রানি ও অবিনাশ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অবিনাশের চেহারাটা এমনিতেই বেশ লম্বা, পা ফাঁক করে দাঁড়ালে অনেকটা বড় ছায়া পড়ে। কিন্তু ছায়াটা একটু বেশি লম্বা—রাস্তা পেরিয়ে গেছে। সকাল সাড়ে দশটা বাজে, এখন সকলরেই ছায়া ছোট-ছোট, আর একটু বাদেই বিন্দু হয়ে যাবে—অথচ অবিনাশের ছায়াটা এমন বিচ্ছিরি লম্বা হল কি করে? রাত্তিরের দিকে পিছন থেকে আলো পড়লে ছায়া আপনি লম্বা হয়ে যায়, অনেক সময় অতিকায়, পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত, কিন্তু এখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে। অবিনাশ এদিক ওদিক তাকিয়ে আলাদা কোন আলোর খোঁজ করলো; কিছুই নেই, তা হলে কি করে এত বড় ছায়া—পিচের রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের গ্যাসপোস্ট পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার মাথা যাই হোক ও নিয়ে আর অবিনাশ ব্যস্ত হল না, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ফাবিষ্কার যত বেশি হচ্ছে—ততই অলৌকিকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—সে ভাবলে।

ভারী ভারী বাসগুলো তার ছায়ার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক ব্যস্ত মানুষ, রিক্‌শা—এমনকি ঠেলাগড়িও চলে যাচ্ছে তার ছায়ার বা কাঁধের ছায়া মাড়িয়েই—যাই হোক্, ব্যথা তো আর লাগছে না, তবু অবিনাশ কয়েকবার সরে সরে দাঁড়ালো।

প্রজাপতিরঙা ছোটো ছোটো মেয়েরা স্কুল ছুটির পর বেরিয়ে আসছে—অবিনাশ দ্রুত চোখ চালিয়ে দিচ্ছে ওদের মধ্যে একবার করে না, সর্দারণীরা এখনো বেরোয়নি, মেয়েদের সাইজ ক্রমশ বড় হচ্ছে, কচি কচি মেয়েদের পর এখন আসছে ডাঁসা মেয়েরা। ওয়ান-টু থেকে ক্লাস নাইন টেনের মেয়েদেরও ছুটি হয়ে গেল, এমনকি দু একটা মেয়ের চেহারা দেখে তখন আর ছাত্রী কি মাস্টারণী বোঝা যায় না। তবে, চশমা-পরা কালো ঠোঁটে দু'জন শিক্ষয়িত্রী না হয়ে যায় না। এমনও হতে পারে রানি স্কুলে আসেনি। অথবা অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কতদিন আগেকার শোনা খবরে এসেছে অবিনাশ, অথবা রানি হয়তো এখন আর চাকরি-টাকরি করে না। ওর স্বামীর এতদিনে যথেষ্ট পদোন্নতি হবার কথা। অফিসারদের বউদের কি আর মাস্টারি করলে মানায়। কিন্তু অবিনাশ শেষপর্যন্ত দেখে যাবে। আর ক'মিনিট—এর পরেই তো দুপুরের ছেলেদের স্কুল শুরু হয়ে যায়—সুতরাং আর বেশিক্ষণ নিশ্চিত ভিতরে বসে থাকবে না রানি, যদি স্কুলে এসে থাকে।

প্রথমে যেমন জাহাজের মাস্তুলটুকু শুধু দেখা যায়, তেমনি দূরে অবিনাশ দেখতে পেল রঙিন প্যারাসোল একটি সুটৌল হাত—মুখখানা দেখতে না পেলেও অবিনাশ চিনতে পেরেছে—ঐ হাঁটার ভঙ্গিটা তার খুব চেনা। হুঁ, এখনও বেশ শৌখিন আছে দেখছি, চমৎকার কায়দায় শাড়িটা পরেছে, ফুলহাতা মিড-ভিকটোরিয়ান ব্লাউজ, শান্তিনিকেতনের চটি। ইস্কুলে কাজ করলে তো

এসব শখ বেশিদিন থাকে না। দিদিমণি দিদিমণি দেখাচ্ছে না যা হোক। তবে একটু মোটা হয়েছে ঠিকই।

অবিনাশ এগিয়ে গেল না। আর একটা সিগারেট ধরালো। আগে চোখাচোখি হোক না। আধঘণ্টার ওপর অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে, লোকেরা কি তাকে লক্ষ্য করছে? পাড়ার ছোঁড়ারা না আবার দেখে ফেলে দেয় যাক গে, বাসে উঠে পড়বে না তো টপ্ করে।

রানি কিন্তু এদিকে তাকালো না। ছাতা বন্ধ না করে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। সুতরাং অবিনাশই গিয়ে গিয়ে ঘুরে কোন কথা না বলে ওর সামনে দাঁড়ালো। বললো, চিনতে পারো?

'একি তুমি?' রানি যেন খুব বেশি অবাক হয়নি। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তাতেই অবিনাশের হাত চেপে ধরলো। 'এতদিনে মনে পড়লো অভাগিনীকে? একটু দায়ামায়া নেই শরীরে তোমার? মেয়েটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে একটা খবরও নিলে না।'

'সত্যি কতদিন পর তোমাকে দেখলুম, রানি।'

'পাঁচ বছর আট মাস।' অবিনাশ চমৎকৃত হয়ে গেল। রানি কী প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস গুনছে নাকি? টপ করে মুখে যা এল বলে দিল, পরে মিলিয়ে দেখতে হবে। শেষ কবে দেখা হয়েছিল, সেই আলিপুরের ট্রামে, না শশাঙ্কর বিয়ের সময় না,—যাক্‌গে যাক্। রানি ওর বাহু ছুঁয়ে আছে, অবিনাশেরও ইচ্ছা করলো রানির কাঁধে হাত রাখে কিন্তু এইভাবে রাস্তায় ওর ছাত্রী ফাত্রী বোধ হয় দেখে অবাক হবে। থাক্। 'তুমি কেমন আছো রানি?'

'ভালো নেই, তোমার জন্যে সব সময় মন কেমন করে।' বলেই রানি হেসে ফেললো। তারপর হাসতে হাসতেই দুষ্টুমির হাসি গোপন করতে না পেরে, বললো, 'বিশ্বাস হল না তো?' সত্যিই কিন্তু হেসে ফেললো, 'কি হবে, তোমার জন্য মন খুব কেমন করে।'

'থাক্ আর ইয়ারকি করতে হবে না। শরীরটা নষ্ট করলে কেন? এরকম মোটা হতে হয়? কি সুন্দর ফিগার ছিল তোমার, এখন এত বড় বড়—এই অসভ্যতা করো না, লোকে শুনতে পাবে কি হবে, আর এই পোড়া শরীরের দিকে নজর দিয়ে আর তো আমার কেউ স্তুতি করার লোক নেই। আমি ঘরের বউ।'

'কেন স্কুলের সেক্রেটারী? তিনি বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেতে ডাকেন না? কিংবা পাড়ার ছেলেরা স্বামীর বন্ধু অথবা পাশের ফ্ল্যাটের কোনো সঙ্গীতরসিক স্তাবক নিশ্চিত এখনও অসংখ্য।'

'না'—রানি ম্লান গলায় বললো, 'আবিসিনিয়ার রাজকুমার ছাড়া আমার রূপের প্রশংসা আর কেউ করেনি।'

এটা একটা পুরানো ঠাট্টা। রানির চেহারাটা ছেলেবেলায় ছিল ভারী সুন্দর, খুব কোঁকড়ানো চুল আর ফর্সা রঙের জন্য ওকে অনেকটা রানি এলিজাবেথের (প্রথম) মতই দেখাতো। ওর নাম আসলে প্রতিমা কিন্তু সবাই রানি বলেই ডাকে। কিন্তু অবিনাশকে কোনক্রমেই রাজা বা রাজকুমার বলা যেত না ছেলেবেলা থেকেই। ওর চেহারাটা চোয়াড়ে, কাঠখোট্টা, রং বেশ কালো। তাই রানি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো আহা, 'সব রাজকুমারই কি সুন্দর হয় নাকি? আফ্রিকার রাজকুমাররা যত বড় রাজার ছেলেই হোক না কেনো, কুচ্ছিৎ তো হবেই; আর তুমি আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার।'

রানি জিজ্ঞেস করলো, 'এখন কি চাকরি-টাকরি করছো?'

'কিছু না। বিদেশে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে আবার বেকার।'

'ফিরলে কেন?'

'আমি বিদেশে গিয়েছিলুম, তুমি জানতে?'

'জানতুম না? সব খবর রাখি। দেখা না হলে কি হয়। ফিরলে কেন এত তাড়াতাড়ি?'

'তোমার জন্য মন কেমন করছিল।' দুজনেই আবার হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ, রানি বললো, 'জানো আমার এখন সাড়ে তিনশো—চারশো টাকা রোজগার। আমাকে বিয়ে করলে এখন তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতুম, কি আমাকে বিয়ে না করার জন্য এখন তোমার অনুতাপ হয় না?'

'মোটেই না, খুব বেঁচে গেছি। প্রথম প্রথম, তুমি যখন হুঁৎকোটাকে বিয়ে করলে, প্রথম দু'তিন মাস বিষম কষ্ট হয়েছিল। মনে হতো, অবিশ্বাসিনী ছলনাময়ী নারী, বুক ফেটে যেত। মনে হতো এই রকম, তারপর বুঝতে পারলুম খুব বেঁচে গেছি। ওফ্ বন্ধুবান্ধবদের তো সব মেয়েই দেখছি—বিয়ে করে এক একজন লেধরস্ হয়ে যাচ্ছে। কি রকম বোকা বোকা মুখ হচ্ছে এক একজনের। আমি কত খোলা হাত পা আছি—যখন খুশি বাড়ি ফিরতে পারি, জামার তলায় গেঞ্জি পরলে ক্ষতি নেই, পকেটে পয়সা থাকলে যে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারি।'

'কি নিষ্ঠুর, বাবা। অন্ততঃ মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমার জন্য কষ্ট হয় তোমার!'

'মিথ্যে কথা বলার কি আর বয়স আছে? বুড়ো হয়ে গেলুম প্রায়, আমার বয়েস বত্রিশ, তোমারও তো আটাশ। নাকি আরও বেশি, তখন বয়েস ভাঁড়িয়েছিলে।'

'এখন সে সন্দেহ হচ্ছে কেন?'

'বাঃ, পাঁচ বছরে যদি কারুকে দশ বছরের বুড়ি হতে দেখি, তবে সন্দেহ হবে না!'

'যাঃ, মিথ্যে, মোটেই দশ বছর নয়! দু বছর ভাঁড়িয়েছিলুম এখন আমার তিরিশ। আর প্রেম করা—বাহাদুরি তো জানি, লাজুক কোথাকার এখনও নিশ্চয়ই মেয়েদের গায়ে হাত দিতে হাত কাঁপে, আমিই তো তোমাকে প্রথম সিডিউস করেছিলুম, তাওকি ভয়—'

'সেদিন আর নেই, বিদেশে অন্তত শ'খানেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি।'

'ওসব বীরত্ব আমার কাছে দেখাতে হবে না। আমার চেয়ে আর কেউ বেশি চেনে না তোমাকে।'

একটু থেমে রইলো দু'জনেই—অবিনাশ রানির শরীরে চোখ ঘোরায়। রানি আড়-চোখে তা লক্ষ্য করে হাসে।

'সত্যিই বুড়ি হয়ে গেলুম, ইস্কুলে যখন মাস্টারণী সেজে বসে থাকি গম্ভীর হয়ে, এক সময় কি রকম হাসি পায়, জীবন কাটিয়ে দেওয়া তাহলে এত সহজ! কালকে জানো—একটা মজার ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস টেনের মেয়েরা একটা কাগজ গোপনে চালাচালি করছিল, আমি ধরে ফেললুম, প্রেমপত্র। একজন লিখেছে বাকীরা সেটা কপি করে নিচ্ছে, খুব বকুনি দিলুম, আসলে কিন্তু মনে মনে মুক্ মুক্ হাসছিলুম বেশ লিখেছে, আমারও কপি করে নিতে ইচ্ছা করছিল, এক জায়গায় কি লিখেছে জানো, 'তোমার জন্য আমার বুকের মধ্যে ব্যথা করে, যেন অসম্ভবই জ্বর হয় আমার।' কিরকম অসভ্যতা! আমাদের সময়ে আমরা লিখতুম 'হৃদয়।'

এখনকার মেয়েরা লেখে 'বুক'। একটু দুঃখও হল আমার, আর কেউ নেই যাতে আমি আজ আর প্রেমপত্র পাঠাতে পারি।'

'কেন আমার ঠিকানা জানতে না?'

'ইস্! শেম কম নয়! জানো চিঠিতে একটা রবীন্দ্রনাথের কোটেশন পর্যন্ত দেয়নি, তবে বদলে কোন আধুনিক কবির, কি জানি তোমারই হয় তো!'

'কেন আমার কবিতা চেনো না? পড়োনা বুঝি আজকাল?'

'যা তা রাবিশ লিখছো তো এখন। কে পড়বে ওসব।'

'তোমার স্কুলের দু'একটা কচি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না।'

'ফাজলামি করতে হবে না! বাড়ির দিকে হাটে—রানি।'

'তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা ছিল।'

'সে দরকারে এ যে নেই। ঢের বেলা হল তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে। আজ গেলে, আমার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলবে কে?'

'ও, এবার বুঝি রাগ হল।'

'নারে, পাগলা, সত্যি বাড়ি যেতে হবে, এগারোটায় ঝি চলে যাবে—তারপর ছেলেটাকে ঠেকাতে হবে না!'

'দ্যম মুকি চালাকি করিস্ না। এতদিন পর দেখা হল অমনি বাড়ি আর বাড়ি? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিও তোর সঙ্গে বাড়িতে যাই।'

'অত খাতির নয়, আমার ও ছুটি নিয়ে বাড়িতে আছে—দেবে গলা ধাক্কা।'

'তবে চল্ কোন চায়ের দোকানে বসি, সত্যি একটা খুব দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'আবার তুই—তোকারি শুরু করেছিস?'

'তুই-ই তো প্রথম আরম্ভ করলি, তোর ছেলের কি নাম রেখেছিস?'

'তোর নামে নয়। ভাবছি অবিনাশ নাম দিয়ে একটা বাচ্চা কুকুর পুষবো, সব সময় বুকে জড়িয়ে থাকব তাকে।'

'রানি তোকে খুব জরুরি একটা কথা বলতে এসেছিলুম।'

'কোন দরকার নেই।'

'সত্যি, একটা বিশেষ কথা আছে।'

'না, অবি, কেন এসেছিস এতদিন পরে? কেন ভেঙে-চুরে দিতে এসেছিস? বেশ তো আছি সংসার পেতে, চাকরি করছি, স্বামী-পুত্র নিয়ে, ছেলেবেলার পুতুল খেলার মতো বৌ-বৌ খেলছি। তুই চাস, সব টান্ মেরে ফেলে দিই আবার? কিন্তু তুই তো পাগল, তুই তো আমার পাশে থাকবি জানি। কেন এসেছিস আমার সর্বনাশ করতে। তুই যা।'

'নারে, আমি এসেছি মাত্র একদিনের জন্য। শুধু একদিনের জন্য। শুধু একদিন। চল্ কোথাও গিয়ে একটু বসে কথা বলি।'

'উপায় নেই যে। সবাই ব্যস্ত হবে। খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। এত দেরী করে তো কোনদিন ফিরি না। ঐ বাস্টায় উঠি।'

'একটু দাঁড়া। আচ্ছা মনে কর খুব ট্রাফিক জ্যাম। বাসে উঠব কোনক্রমে উপায় নেই। তা হলে কি করবি? দেরি তো হতোই।'

'তা হলে হেঁটেই যেতাম।'

'আচ্ছা চল্, হেঁটেই যাই! এতটুকু সময়ে তোকে একটা কথা বলি। এখনো শীত যায় নি,

রোদ্দুরের তাপ নেই।'

অবিনাশ এতোক্ষণ লক্ষ্য করেনি যে, রানি ওর ছায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুতঃ সূর্য এখন মাথার কাছে এসেছে। স্বাভাবিক এবং ছোট হয়ে গেছে অবিনাশের ছায়া। অবিনাশ ঘুরে এসে রানির ছায়ার ওপরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে বেশ আরাম পেল।

রাস্তায় লোকজন অনেক কমে গেছে। কোথায় পরের বাড়ি জলের দরে নিলাম হচ্ছে। অধিকাংশ লোক সেখানেই ছুটে যাচ্ছে সন্দেহ কি? দু'জনে দু'জনের ছায়া সরিয়ে হাঁটতে লাগল।

রানি ওর রঙ্গিন ছাতাটা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। অবিনাশ ওর সুন্দর কারুকাজ করা হাত ব্যাগটা টেনে নিয়ে বললো, 'দেখি কি আছে?' ঠোঁট উল্টে রানি বললো, 'কিছুই নেই। কি আর থাকবে? —বাড়ি থেকে স্কুল আর ইস্কুল থেকে বাড়ি যাই। ক'টা খুচরো পয়সা আছে।'

'ভেবেছিলুম, কটা টাকা চুরি করবো।'

'এক সময় তো অনেক চুরি করেছ বাবু।'

'তা সত্যি। অনেক টাকা নিয়েছি তোর থেকে; রানি।'

'কেন আজ দেরী করিয়ে দিলি, এতক্ষণে কবে বাড়ি পৌঁছে যেতুম।'

'সত্যিই তোর ইচ্ছা করছে না আমার সঙ্গে থাকতে? এক সময় তো আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করতি।'

'ছেলেবেলায় ওরকম হয়। আগে তো বৃষ্টির জন্যও ছটফট করতুম। এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে।'

অবিনাশ হঠাৎ গম্ভীর গলায় ডাকলো, 'রানি।'

রানি তক্ষুণি জল কুলকুচি করার মতো হেসে বললো, 'এবার বুঝি বোকা বলে প্রেমের কথা শুরু করবি? খবরদার। এখন আর কচি খুকিটি নই যে ভোলাতে পারবে।'

'কবেই বা তোকে ভোলাতে পেরেছি। ছেলেবেলা থেকেই তো পাকা একটি। প্রেমের কথা তো আমাকে শিখিয়েছিস। তোর ওপরের ঠোঁটে পাতলা পাতলা ঘাম জমেছে। খুব ইচ্ছে করছে একটা চুমু খাই।'

'এতক্ষণ কথা বলছি অথচ একটাও চুমু খাইনি তোকে—এর আগে কখনও হয়েছে?'

'তবে আর কি রাস্তার মধ্যেই শুরু করো। হাজারটা ক্যামেরায় ছবি উঠুক।'

'ঐ জন্যই তো বলছিলুম কোথাও গিয়ে বসি।'

'ইস্, কোথাও বসলেও যেন দিতাম আর কি? এখন থেকে কোথাও বসলে আমরা বসবো টেবিলের দু'পাশে।'

'দেখিস চেষ্টা করে। তোর স্বামী যখন থাকবে না, দুপুরে একদিন বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো।'

'শাশুড়ি থাকে।'

'থাকুক। শাশুড়ি যেদিন গঙ্গা স্নান করতে যাবে, আমি তক্‌কে তক্‌কে থাকবো।'

'আমি দরজায় খিল দিয়ে থাকি। খুলবো না। কেন খুলব? তুই আমার কে?'

'আমি জলের পাইপ বেয়ে উঠবো।'

'কেন? তুই আমার কে?'

'আমি তোর সর্বস্ব রে। দেখি মুখখানা।'

'তুই আমাকে একেবারে গ্রাহ্যই করিস্ না রানি। আমি বিলেতে ঘুরে এলুম। হাজার হোক, আমি এখন একটা বিলেত ফেরত।'

'ওরকম বিলেত ফেরত গণ্ডায় গণ্ডায় রাস্তায় ঘুরছে। তুই আমাকে এতদিন পর বিলেত দেখিয়ে ইমপ্রেস করতে এসেছিস। কি অধঃপতন তোর!'

'রাস্তা থেকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে যাবো।'

'চেষ্টা করে দেখিস। আমার গায়ে এখনও জোর আছে। তাছাড়া এমন চেঁচাবো যে রাস্তায় হাজারটা লোক এসে গাট্টা মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবে। বেশ হবে।'

'ওসব লোক ফোক আমাকে দেখাস নি। আমি অবিনাশ মিত্তির, ছেলেবেলা থেকেই গুণ্ডা। একটা গাড়ি নিয়ে এসে চলতি রাস্তা থেকে তোকে টেনে তুলে নিয়ে যাবো।'

'নিয়ে গিয়ে কি করবি?'

'তোর পায়ের তলায় মুখ ঘষবো।'

রানি হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, 'এখুনি ঘষ না, এই যে দাঁড়িয়েছি। লোক দেখুক, কোন ক্ষতি নেই।'

'তারপর তোর মুখ ঘষাবো আমার পায়ে।'

'তার দরকার নেই। তোর ঐ কুচ্ছিৎ পা-জোড়া সব সময় রাখা আছে আমার বুকের মধ্যে।'

'ও, তা হলে রানি সান্যালও রোমান্টিক হতে জানে।'

'সান্যাল নয় রায় চৌধুরী এখন। পরস্ত্রী এখন, মনে থাকে না বুঝি।'

'বাঃ পরস্ত্রী। আয় না রানি, আমরা লুকিয়ে অবৈধ প্রেম করি। পরকিয়া প্রেম খুব ফার্স্টক্লাস জিনিস।'

'অবৈধ প্রেমই যদি করবো, তবে পুরনো প্রেমিকের সঙ্গেই কেন? আমি বুঝি নতুন একজন জোগাড় করতে পারি না?'

'করেছিস নাকি এর মধ্যেই।' অবিনাশ রানির ছাতায় একটা খোঁচা খেলো। ছাতার বাঁটের নিচে কাদা ছিল। অবিনাশের জামায় একটা গোল দাগ পড়লো। অবিনাশ সে দাগটা তোলার বিন্দু মাত্র চেষ্টা না করে আর একটা সিগারেট ধরালো। তাতেই খুশি ছড়িয়ে পড়লো রানির মুখে। ঈশ্বরের রাজত্বে কে কিসে খুশি হয় বোঝা যায় না? খুশী হয়ে রানি বলল, 'আজকাল এত বেশি সিগারেট খাস কেন?'

'তুই খাবি নাকি! আগে তো দু'একটা খেয়েছিস্।'

'হ্যাঁ, আমি পরপুরুষের সঙ্গে দিনের বেলায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাস্তা দিয়ে যাই, তাহলে আর আমার বাকী থাকে কি?'

অবিনাশ একটু চুপ করে রইল, তাকিয়ে দেখলো ওদের ছায়া-টায়া কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছে, এমন বিশ্রী রাস্তা—কোথাও একটা গাছ পর্যন্ত নেই, যে ছায়া পড়বে। নিছক রোদ্দুর, কোনখানে ছায়া নেই, সিগারেটে জোরে টান দিয়ে অবিনাশ বললো, 'সত্যি রানি, আমরা অনেক দূরে সরে গেছি—অথচ মাত্র ছ'সাত বছর। তোর মুখ থেকে 'পরপুরুষ' শব্দটা কি রকম অদ্ভুত শোনালো, যেন একটা বিদেশি শব্দ, যেন আমি এক লৌহমানব, হাতে তলোয়ার নিয়ে তোর পাশে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ, মনে আছে, প্রতিদিন সকালে—তুই যখন কলেজে যেতি—'

'থাক পুরানো কথা। আমি ভালো আছি অবিনাশ।'

'আমিও খুব ভালো আছি। বিশ্বাস কর আমি কোন দুঃখের কথা বলতে আসিনি।'

রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে। ব্রীজের ওপর দিয়েও হাঁটা পথ আছে, নিচে দিয়েও আছে একটি সরু কাঠের রাস্তা, ওরা নিচে দিয়েই গেল, রেলিং ধরে দাঁড়ালো দু'জনে নোংরা জলে অল্প স্রোত—অবিনাশ ওর সিগারেটের টুকরোটা ফেললো জলে, ব্রীজের নিচে দিয়ে ভেসে গেলো। রানি একেবারে জল ভালোবাসে না, অবিনাশ রানিকেই পৃথিবীতে একমাত্র মেয়ে জানে জলের প্রতি যার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। যেমন রানি এক্ষুণি ঐ জলে থুতু ফেললো।

রানি বললো, 'এইবার শুনি কি দরকারটা? কি এমন দরকার আমার কাছে? ইস্ কত বেলা হয়ে গেল যে!'

অবিনাশ জানতো রানি এইবার ও কথা বলবেই। কিন্তু অবিনাশ দ্বিধা করছে, ঠিক কি রকমভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না। রানি ওর দিকে দুটো সম্পূর্ণ চোখ তুলে বললো, 'কী?'

'তোকে একটা কথা বলবো রানি. তুই কিন্তু কিছু মনে করতে পারবিনা, দূরে সরে গেলেও আমি তোর সেই অবিনাশই আছি।'

'অত ভনিতার দরকার কি? কি চাই বল্ না।'

'রানি তোর বুকে সেই তিলটা আছে এখনও।'

'হুঁ, ওর খুব একা একা লাগছে—তাই পাশে আর একটা নতুন তিল উঠেছে, থাক্ বাজে কথা—দরকারী কথাটা কী? কি চাইতে এসেছিস এতদিন পর?'

'মুক্তি। এক কথায় বলতে গেলে—'

'সে আবার কি? তুইও আমাকে মুক্তি দিয়েছিস আমিও তোকে দিয়েছি। বন্ধন আর কোথায়?'

'সে রকম নয়, তুই আমার শরীরকে মুক্তি দিস নি। আমার মন ছাড়া পেয়ে গেছে, কিন্তু—'

রানি অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। এই প্রথম অবিনাশের একটা কথা সে বুঝতে পারলো না। সেই জন্যই বোধহয় অবিনাশের সারা মুখটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কোন সংকেত নেই, অবিনাশ আবার বললো, বেশ থেমে থেমে ঠাণ্ডা গলায়, 'তোর কথা ভুলে থাকার পর আমি বেশ কয়েকটা মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি, আর ইয়ে, মানে শুয়েছিও কয়েক জনের সঙ্গে—কোথাও তৃপ্তি পাইনি জানিস, সব সময় মনে হয়েছে, সত্যিকারের রহস্য যেন তোর শরীরেই লুকিয়ে আছে, তোর শরীর তো আমি জানি না।'

'এবার বাড়ি যাই।'

'না, না, শোন্, আমার পক্ষে খুব জরুরি কথা। আমার জীবন মরণ সমস্যা, আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে তোর সঙ্গে তোর কথা, হাসি, পাগলামি, শরীরের গন্ধ—অর্থাৎ যা কিছু ফেমেনিন্—তার স্বাদ আমি তোর কাছেই পেয়েছি, তোকে মনে হতো একটা রহস্যের সিন্দুক, তোকে চুমো খেয়েছি, তোর জামার বোতাম খুলে মুখ চেপে ধরেছি—কি অসম্ভব উথাল পাথাল করতো তখন মাথার মধ্যে। ছেলেবেলায় সক্কলেরই যা হয় আর কি, কিন্তু কোন দিন তোর সঙ্গে শুইনি, সাহস পাইনি, ভাবতুম অতখানি আমার সইবে না। ঐ অসম্ভব মাধুর্য আমাকে পাগল করে দেবে। আমি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবো, এই সব আর কি, এখন দেখ কতো বদলে গেছি, চোয়ালের কাছে শক্ত ছাপ পড়েছে, প্রেম-ফ্রেম মুছে গেছে মন থেকে, মদ খেতে শিখেছি খুব,

মেয়েদের এখন অন্যভাবে চাই। হঠাৎ মেয়েদের জানতে দিতে চাইনা ওদের কাছ থেকে আমি কতখানি পাচ্ছি—খুব গোপনে ওদের একদম বুঝতে না দিয়ে—আমার যেটুকু বিষয় দরকার আমাকে নিতেই হবে। ওরা ভাববে বুঝি সাধারণ কাণ্ড কারখানাই হচ্ছে। আসলে কাক যেমন কোকিলের ছানাকে পালন করে না জেনে তেমনি মেয়েরা সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের শরীরটা পুষে রাখে। কিছুই মানে বোঝে না শরীরের। আমি চাই ওরা না জেনে আমাকে একটা দুর্লভ জিনিস দিয়ে যাবে—। ওদের কোনদিন বলবো না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমি সম্পূর্ণ পাচ্ছি না কখনো—সব সময় মনে হয় কিছু বাকি থেকে যাচ্ছে, একটা সম্পূর্ণ মেয়েকে কখনও পাইনি। তখনই তোর কথা মনে পড়ে। তোর কতো-কিই তো আমি জানি—প্রায় গোটা জীবন—কিন্তু আমি তোর সম্পূর্ণ শরীর জানি না। তাই মনে হয়, সমস্ত রহস্য বা তৃপ্তি লেগে আছে তোর শরীরে, আমার জীবনের প্রথম নারীর কাছে। মানে, তুই কিছু মনে করছিস না তো—আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি এ কথা বললুম বলে। তুই-ও তো তোর স্বামীর সঙ্গে শুয়েছিস—আমি কি আর কিছু মনে করছি। তুই নিশ্চয় আশা করিসনি—আমি সারা জীবন তোর বিরহে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকবো।'

'বয়ে গেছে আমার মনে করতে, যাক্ এসব প্রলাপ শুনে আমার লাভ কি! কি করবো?'

'তুই বুঝতে পারছিস না রানি? তোর উচিত আমাকে সাহায্য করা।'

'কি রকম সাহায্য? আমার কাছে চাইছিস?'

'একটি দিন।'

'তার মানে?'

'আমি তোর সঙ্গে একবার।'

'তাতে কি লাভ হবে?'

'আমি নিসন্দেহ হতে চাই যে—আসলে তুইও খুব সাধারণ। অন্য মেয়েদেরই মতো। তোর শরীরেও কোন আলাদা রহস্য নেই। তোকে হারিয়ে অন্য মেয়েকে পেলেও আমি আসলে একটি সম্পূর্ণ মেয়েকেই পাবো। আর বেশি কিছু পাবার নেই।' রানি হঠাৎ চোখ দুটো খুব নীচু করলো, যেন ওর চোখ দুটো একেবারে ঢুকে গেলো মুখমণ্ডলের মধ্যে, কপালের নিচে আর কিছু নেই, সাদা, সেই রকম ভাবেই বলল, 'অসভ্য ইতর কোথাকার।'

অবিনাশ বিষম অবাক হয়ে গেলো। একটু দ্বিধা করে আলতো ভাবে রানির কাঁধে একটা হাত রেখে বললো, 'একি রানি, তুই রাগ করছিস? আমি কিন্তু তোকে আঘাত করার জন্য বলিনি। আসলে, ভেবে দ্যাখ, আমরা দু'জনেই তো খুব সাধারণ। অন্যদেরই মতো। আমি শুধু নিঃসংশয় হতে চাই।'

রানি ফুঁসে উঠে বললো, 'না, আমি সাধারণ নই। আমি অসাধারণ।'

'এটা তো ছেলেমানুষী। আমাদের এতো বয়স হল, এখন তো আমরা জানি। তোকে না পেলে আমি সবটুকু রহস্য পাবো না—একি সম্ভব নাকি!'

'হ্যাঁ তাই। তুই যেখানেই যা—তৃপ্তি পাবি না। তোর প্রাণ একটা কৌটোয় পোরা ভ্রমরের মতো আমার কাছেই থাকবে। আমি তোকে মুক্তি দেবো না।'

'ওসব কিছু না রানি। জীবন অন্য রকম। মানুষ বিষম ভুলে যেতে পারে। অনেক বদলে যেতে পারে। তুই একবার—'

'তারপর আমার কি হবে? একজন মাত্র মানুষের কাছেও আমি অসাধারণ থাকবো না? অবি তোকেও তো সম্পূর্ণ পাইনি। একদিন পেয়ে যদি দেখি, তুইও সাধারণ, আমার স্বামীর মতো—তা হলে আর আমার জীবনে কি রইলো? তোকে দেখলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজ প্রথম দেখে বিষম রক্ত ছলাৎ করে উঠলো। যদি দেখি, তুইও তাহলে, আমার এই চাকরি করা স্বামীর সংসার, ছেলে মানুষ করা—সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে না? আমার আর কি থাকবে তা হলে? আমার একটিও না দেখা স্বপ্ন থাকবে না, একজনের কাছে অন্ততঃ রানি হয়ে থাকবো না? আমার জীবনে থাকবে না একজন না দেখা রাজকুমার? আমার আবিসিনিয়ার রাজকুমার। না, অবি, আমি সব কিছু জানতে চাই না। তুই দূর হয়ে যা।'

'কিন্তু জানাই তো ভালো। নিশ্চিত হবার মতো এমন তৃপ্তি আর নেই। জীবন শেষ করার আগে জেনে যেতে হবে, আমার কি কি প্রাপ্য ছিল। রহস্যের ভাবনায় কাটানো খুব কুচ্ছিৎ।'

'তুই আর আমার সামনে আসিস্ না। কোনদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোন ভয়ই আর থাকে না। তাহলেই তোকে আমি চিরকাল ভালোবাসতে পারবো।'

'তুই ভুল করছিস। ওকে ভালোবাসা বলে না। কি দরকার ভালোবাসার। ভালোবাসা ছাড়াও জীবন খুব সুন্দর কেটে যেতে পারে। বড় কথা হলো জানা। যদি তোকে—'

'আমি তোকে আর সহ্য করতে পারছি না, অবিনাশ। তুই আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা। তোর চোখে আমি ফের পাগলামি দেখতে পাচ্ছি। তোর জন্য আমার মায়া হয়।'

পাশ দিয়ে যে সমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না, এমন শান্ত ভাবে কথা বলে রানি। কিন্তু ওর মুখের একটি সামান্য রেখা দেখেও বোঝা যায়, ও দাঁড়িয়ে আছে ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতো।

অবিনাশ সত্যি সত্যি বুঝতে পারছে না, হঠাৎ রানি কেন এমন রাগ করলো। রানির ওপর জোর ছিল বলে। কত হুকুম করেছে এক সময়। ওর কথায় রানি একবার একহাত চুল কেটে ফেলেছিল নিজের। কলেজের মাইনের টাকা দিয়ে দিয়েছে অবিনাশকে। আজ একটা সামান্য কথায়—

অবিনাশ বলল, 'আমি ঝোঁকের মাথায় বলছি না, রানি। অনেক ভেবে চিন্তে এসেছি। আমরা দূরে সরে গেছি, কিন্তু আমাদের শারীরিক মুক্তি হয় নি। তোর সংসার আমি নষ্ট করতে চাই না মোটেই। আমাদের জীবন আলাদা হয়ে গেছে—আমরা দূরে দূরেই থাকবো। কিন্তু তার আগে—'

হঠাৎ অবিনাশ দেখলো রানি চলতে শুরু করেছে। পিছন ফিরলো না, কেন ও একাই চলে যাবে। কি ভেবে অবিনাশ ওকে ডাকতে গিয়েও ডাকলো না। মনে মনে আন্তরিকভাবে বিদায় জানালো রানিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে আর একটা সিগারেট ধরালো। একা একা কিছু না ভেবে সিগারেট শেষ করলো। সত্যি সেটুকু সময় ওর কিছু মনে পড়ল না, রানির কথাতো নয়ই, সম্পূর্ণ সাদা মন ও নিচে ময়লা জলের স্রোত দেখলো। তারপর একটি ট্রামের টিকিট পাকিয়ে কান খুঁচতে খুঁচতে রানির জন্য হঠাৎ ও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো, আমি কি রানিকে অপমান করলুম? আমি তা মোটেই চাইনি। আসলে, যত বয়স বাড়ছে, ততই ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছি। আবার পাঁচ বছর বাদে রানিকে সেই কথাটা বুঝিয়ে বলা যায় কিনা অবিনাশ পরে ভেবে দেখবে।

পেয়ালা পিরিচ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার একটা সোয়েটার ছিল। কারুর স্নেহের হাতের বোনা নয়। নিরস দোকান থেকে কেনা। সেই সোয়েটার আমাকে ছাত্র জীবনের শেষ-ভাগ থেকে চাকুরে জীবনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত শীতের আশ্রয় দিয়েছিল। তারপর স্ত্রীযোগে সোয়েটার বিয়োগ হল। প্রথম দিকে স্ত্রীরা দু-এক বছর বড় মধুর ব্যবহার করে থাকেন। অঙ্গে বৌভাতের রাতে পাওয়া কখনও নীল শাড়ি, কখনও লাল শাড়ি। এলো চুলে ফুলশয্যা আর গায়ে হলুদের তত্ত্বে পাওয়া গন্ধ তেলের সুবাস। কপালে আঁকা যত্নের গোল টিপ। মুখে মৃদু শুনচো সম্বোধন। স্বামীরাও তখন পায়ে পায়ে ঘুরতে থাকে পোষা বেড়ালের মতো। ডাকের সে কি বাহার। সোহাগে জরজর, হ্যাগা। স্ত্রী আমার সেই পাটকেল রঙের সোয়েটারটিকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করল। এ আবার মানুষে গায়ে দেয়! যেন এতকাল আমি জানোয়ার ছিলুম, বিবাহের পর মনুষ্য পদবাচ্য হয়েছি। (বছর চারেক পরে অবশ্য আমি আবার জানোয়ার হয়ে গেছি। এখন উঠতে-বসতে শুনি, জানোয়ারের হাতে পড়ে জীবনটা গেল। তার মানে স্বামী পুরনো হলেই জানোয়ার হয়ে যায়। যেমন চমড়া পাকা হলে জুতো হয়।)

প্রথমে আলমারির এক কোণে, তারপর আলমারির পেছনে, সব শেষে সেই সোয়েটার এসে পড়ল কয়লার গাদায়। অবশেষে সেটির মালিক হল আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তার স্বামী। আর আমার স্ত্রী নস্যি রঙের উলের জমিতে হলুদ রঙের সাপ খেলিয়ে বেশ আহামরি গোছের একটি বুক খোলা সোয়েটার বুনে দিলে। মেডেন সং-এর মত মেডেন সোয়েটার। সেই প্রথম আর সেই শেষ। অমন পাপ কর্ম সে আর দ্বিতীয়বার করেনি। (পুরনো স্বামীর মতো পাপী ব্যক্তি পুলিসের খাতাতেও নেই। ছুপা রুস্তম।)

বছর ঘুরতেই খোকা। আবার বছর ঘুরতেই খুকী। স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেল। জননীর অনেক যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার অংশীদার হয়েই জীবন কাটাতে হবে। সুখের সীমানা বড় সঙ্কীর্ণ। সেই স্ত্রী এখনও সোয়েটার বোনে তবে আমার নয়, ছেলেমেয়ের। ইতিমধ্যে তার নিজস্ব জগৎও বেশ বড় হয়েছে। হাঁকডাক বেড়েছে, ঠাকুরপো-টাকুরপোও গোটাকতক জুটেছে। তাদের জন্যও মাঝে মাঝে সোয়েটার বোনার সময় করে নিতে পেরেছে। আমি ত ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর। আমার স্বাদ কমে গেছে। আমার বাহবার তেমন দাম নেই। আমি খুশি হলেই বা কি অখুশি হলেই বা কি, (স্বামীরা আসলে ক্লীবলিঙ্গ। সামান্য আস্কারায় নিজেদের পুংলিঙ্গ ভেবে আস্ফালন প্রকাশ করে যথাস্থানে যথোচিত ঠোক্কর খেয়ে একপাশে চিত হয়ে পড়ে। অনেকটা বিরাট আকৃতির গুবরে পোকার মতো। ঘরে ঢুকে জেট-প্লেনের মতো সগর্জনে খুব উড়ছে। ভীতু ভাবছে না জানি কি মাল। যার আয়তন আর আওয়াজ এত সাংঘাতিক তার কামড় নিশ্চয় মারাত্মক হবে। কিন্তু যে

জানে সে জানে। উড়তে উড়তে এক সময় দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়বে আর একবার চিত হলেই ভোলা মহেশ্বর। পড়ে পড়ে সারা রাত শুঁড় নাড়বে। সকালে চিত থেকে সোজা করে দাও গোঁ-গোঁ করে উড়ে বাইরে চলে যাবে। বিবাহিত মানুষের সঙ্গে অসাধারণ মিল। বাড়ি ঢুকল গোঁ-গোঁ করতে করতে। স্ত্রী ছাড়া সকলেই তটস্থ। ঠ্যাকাস করে পয়লা ধাক্কাতেই ফ্ল্যাট। বাবু চিত হয়ে রইলেন। সকালে ঝ্যাটা দিয়ে উপুড় করে দাও। সামনে এককাপ চা ধর। তারপর দেখ বাজার, দোকান সব ঠিকঠাক। ন'টার সময় উড়তে উড়তে কর্মস্থলে। অত বড় ক্ষমতাশালী মহাদেব। তাঁকে চিত করে সেই যে একবার মা কালী বুকে উঠে দাঁড়ালেন আজও তিনি সেইভাবেই পড়ে আছেন আর উঠতে হল না।)

মানুষের জ্ঞানোদয় হলে তার আর কোনও দুঃখ থাকে না। আমারও নেই। প্রত্যাশাই দুঃখের মূল কারণ। আমি মূলোচ্ছেদ করে দিব্যি আছি। আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আর কিছু আশা করি না। আমি জানি সকালের কুয়াশার মতই স্ত্রীর প্রেম ক্ষণস্থায়ী। (শুনেছি জাপানে এক ধরনের বিষাক্ত মাছ পাওয়া যায়। সেই বিষ বের করে যাঁরা রাঁধতে পারেন তাঁরা জানেন এর চেয়ে সুস্বাদু মাছ আর দ্বিতীয় নেই। স্ত্রীও অনেকটা সেই রকম। বিষ বের করে যাঁরা নাড়াচাড়া করার কৌশল জানেন তাঁরা বলেন, ধনধনা ধন ধনা, এ-ধন যার ঘরে নেই তার কিসের ধিনতাধিনা।) সংসারে থাকবে ভারবাহী বলদের মতো। সৃষ্টিরক্ষার জন্যে ঈশ্বর তোমাকে ফাঁদে ফেলবেনই। তোমার নিজেরও কিছু মুখ্যুমি থাকবে। সব মিলিয়ে ন্যাজে গোবরে হয়ে জীবন কাটাতে হবে।

সবই যখন জানি তখন একটা সোয়েটার নিয়ে এত ধানাইপানাই কেন? মানুষের ভ্রম হয়, মতিভ্রম হয়। আমার মতিভ্রম হয়েছিল। হাঁড়ির একটা চাল তুলে টিপে দেখে সব চালের অবস্থা বুঝেও বুঝিনি। একটু স্নেহটেহ, প্রেমট্রেম খুঁজতে আবার ছিপ ফেলেছিলুম। আমার মনে হয়েছিল জীবনটা অনেকটা কম্বিনেশন তালার মতো। ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় নম্বরে নম্বর মিলে যাবে। এই মহিলাটির সঙ্গে মিল হয়নি, কুছ পরোয়া নেই। কম্বিনেশান মেলাতে পারিনি, তাই সংসারের ফটকে টাম্বলার তালার মতো গোমড়া মুখে ঝুলতেই থাকবে সারা জীবন। থাকুক। কত কিছুই তো খোলে না জীবনে। সংসারে কত শিশি থাকে যার ঢাকনা খোলা যায় না। আড়প্যাঁচ হয়ে পড়ে থাকে। গরম জলে চুবিয়ে, আগুনের ছেঁকা দিয়েও খোলা যায় না। বিজ্ঞানীরা বলে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড। ভুল হতে হতে এক সময় মিলে যাবে। স্ত্রীরা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলের মাশুল। মুষল বিশেষ। সংসারের মোহ-মুদ্গর। বিবাহের পরই বোঝা যায় এ-তালার চাবি আমার হাতে নেই। আমি হলাম অন্য তালার চাবি।

সেই তালাটি যে অফিসে আমার চেয়ারের তিনটি চেয়ার পরে এতকাল বসে বসে ফাইল নাড়তেন তা কি আমি জানতুম! (বিবাহ না করিলে মানুষের দৃষ্টি খোলে না) পৃথিবীতে স্ত্রী-নিগৃহীত স্বামী যেমন আছে তেমনি স্বামী-নিগৃহীত স্ত্রীও আছেন। বিধাতার কৌতুকে সবলে দুর্বলেই জোড় বাঁধে। কদাচিৎ সবলে সবলে মোলাকাত যে হয় না তা নয়। পাড়ায় এই রকমের দম্পতি দু-একটি দেখা যায়, শোনাও যায়। শোনা যাবে না কেন, তাঁরা এতই সরব এবং রোষযুক্ত যে তাঁদের সৌরভ যোজন বিস্তৃত। যাই হোক এ রকম হাম ভি মিলিটারি তোম ভি মিলিটারি গোছের মিলন বিধাতার হাত ফসকেই বেরিয়ে যায়। (আমি মাঝ নদীতে একবার একটা নৌকা দেখেছিলুম। হাল, দাঁড় ফেলে দুই মাঝিতে পাটাতনে দাঁড়িয়ে মল্লযুদ্ধ করছে। নৌকা ভেসে

চলেছে স্রোতের টানে। জীবনও ত তাই। হাল ধরি আর না ধরি ভাসতে ভাসতে ঠিক চলে যায় মৃত্যু-মোহনায়।)

তা সেই শান্ত চেহারার, মিষ্ট স্বভাবের মহিলাটির সঙ্গে সামান্য উসখুসেই একটা হৃদ্যতা জন্মে গেল। জন্মাতেই পারে। এক পালকের পাখি এক জায়গায় জড় হয়। আমার ত কোন দোষ ছিল না। আমার স্ত্রীর উপেক্ষাতেই আমার বিপথে গমন। এ ত জানা কথাই, ছেলেমেয়েরা স্নেহ ভালবাসা না পেলেই কুসঙ্গে চলে যায়। আমি স্বামী হলেও ছেলে ত, আর যার সঙ্গে আমার ভাব ভালবাসা সে অন্যের স্ত্রী হলেও মেয়ে ত। এ যুক্তি জজেও মানবে। আর দু'জনেই ঘা খাওয়া প্রাণী। তা ছাড়া 'ঘৃত-শাস্ত্রে' বলেছে—অগ্নি সমীপে ঘৃতের অবস্থানে অগ্নি উদ্দীপিত হয়। পুরুষ আর নারী সেই অগ্নি ও ঘৃত। কে অগ্নি, কে ঘৃত তা জানি না। শাস্ত্র বাক্যে সাবধান না হয়ে কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষ দহনশীল দাহ্যবস্তু দুটিকে এত পাশাপাশি রাখলেন কেন? দোষ আমার নয়। দোষ যখন আমার নয় বিবেক তখন মুক্ত। বেশ করেছি ভাব করেছি। কার তাতে কি। (কার বাপের কি?—বললে, শ্বশুর মশাইকে বোঝায়। নিগৃহীত স্বামী হলেও আমি অভদ্র নই) নিজের স্ত্রীর যখন সময় নেই, মেজাজ নেই, তখন অন্যের বাতিল স্ত্রীর সঙ্গে ভাব বিনিময়ের দোষ কিছু নেই। (সমাজ এখন অনেক লিবার‍্যাল) কথা বলতে গেলেই সংসারের কথা। হরেক উপদেশ। পিতার কর্তব্য কি? কন্যার বিবাহ। অমুকের তমুক। গুষ্টির পিণ্ডি। মুখ খুলেই মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চুলোচুলি, খুনোখুনি, দক্ষযজ্ঞ। (স্ত্রীরা কত আপনজন ন্যাজে পা পড়লেই বোঝা যায়। স্বরূপ বেরিয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কোন ব্যাটা বলেছে বিবাহবন্ধন জন্মের বন্ধন, সাতপাকে বাঁধা। কিস্যুই তিনি জানতেন না। এলো সুতোয় একতে ঘুড়ি ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে। পান থেকে চুন খসলেই শ্বশুর মহাশয়ের কন্যার অন্য রূপ। কে ওই বামা এলোচুলে! বড় পলকা বন্ধন। ঘাঁটাঘাঁটি না করলে বেশ আছে। ঘাঁটালেই ভীমরুলের চাকে খোঁচা। স্ত্রীর পিরিতি চাকের মধু। চাকেই থাক।) অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্য চেহারা। হাসিহাসি মুখ। উজ্জ্বল চোখ। ডগমগ অবস্থা। (রামকৃষ্ণ বলতেন, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে লড়ে যাবে। লড়ে যাবে বলেননি, সংসার করতে বলেছিলেন। তার মানে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে দাপটে সংসার। আর প্রবাদ আছে, যার শিল নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া) আমি পিতা হতে পারি, বাজার সরকার হতে পারি, মুদ্দোফরাশ হতে পারি, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো হতে পারি, পারি না কেবল স্নেহভাজন স্বামী হতে। শাস্ত্রে আছ যেমন কুকুর তেমন মুগুর, আছে বাঘা ওল বুনো তেঁতুল। সুতরাং এই জাতীয় একস্ট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স-এ আমার অধিকার আছে। আমার বিবেকের সমর্থন আছে! তা ছাড়া পার্শ্ববর্তিনী মহিলাটির সঙ্গে এমন কিছু করছি না যা অসামাজিক।

দু'জনে অবসর সময়ে সুখ দুঃখের আলোচনা করি। কে ক'ঘা খেলুম। কে কেমন আঁচড়ালে। অন্যমনস্ক চীনে বাদাম দাঁতে কাটতে কাটতে দীর্ঘশ্বাস ফেলা। একই চাতালে দাঁড়িয়ে ক্ষত অনুসন্ধান আর লেহন। অনেকটা কুকুরের মতো। কমড়া-কামড়ি, ঝটাপটির পর একপাশে বসে বসে কেমন তারিয়ে তারিয়ে চাটে। এইভাবে মনের দুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে এক ধরনের সান্নিধ্য গড়ে উঠল। দু'জনেরই মন হতে লাগল এ জীবনে যা হবার নয় তাই হলে একটা সুখের সংসার গড়ে উঠত। একটা খুব ভাল প্লট কাঁচা লেখকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। আমরা অফিস ছেড়ে ছুটির পর মাঝে মধ্যে পার্কে গিয়ে পাশাপাশি বসতে শুরু করলাম। একে

বলে সংযত প্রেম। যৌবনের ফোঁসফোঁসানি নেই, আবেগ নেই। টুকটাক কথা, ভাঁড়ে চা, মাঝে মধ্যে একটু দর্শন আলোচনা তার আশেপাশে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতীদের দেখে তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আঁতকে ওঠা। একটু দুটো সিনেমাও হত। সেকেণ্ড হ্যান্ড প্রেমের একটা আলাদা মাধুর্য। কোনও দাবি নেই, বন্ধন নেই, তিক্ততা নেই, এক সময় যে যার চুল্লিতে ফিরে যাও। পরের দিন মিলিয়ে দেখ কে কতটা ঝলসালে।

চলতে চলতে মানুষ কত কি আবিষ্কার করে। হঠাৎ মনে হতে লাগল আমার স্ত্রীর নাকটা ভীষণ ফ্ল্যাট। মুখের অনেকটা জায়গা জুড়ে আনাড়ির হাতে তৈরি সিঙাড়ার খোলের মতো পড়ে আছে। চোখে কোনও বুদ্ধির দীপ্তি নেই। প্যাঁচার মতো গোলগাল। চুলে তেমন চেকনাই নেই। ঘোড়ার বালামচির মতো সোঁটা সোঁটা। হাতের রান্না তেমন ভাল নয়। সব কাজেই অপটু। শরীরে তেমন লাবণ্য নেই। কপালটা আবার উঁচু। (কি করে তখন যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতুম ঈশ্বরই জানেন। তখন বোধ হয় অন্ধ ছিলুম। বেড়ালের চোখ ফোটে দেরিতে।)

রাতে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে মনে হয় পাঁচিলের পাশে শুয়ে আছি। যে কোন কথারই হুঁ আর হাঁ ছাড়া কোনও উত্তর নেই। এক অক্ষরের আলাপন। শরীরে হাত ঠেকলেই খ্যাঁক করে ওঠে। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি স্বামীর পাশে শুয়ে আছে না ভাসুরের পাশে। শোবার সময় ভগবানের নাম নিতে হয়। হে করুণাময়! আমাকে সুনিদ্রার তটে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে চল! সে সব নেই। হঠাৎ অন্ধকারে বলে উঠল, চিনি ফুরালো, কাল সকালের চায়ের মতো পড়ে আছে। চা আনতে হবে। এবারের চায়ে তেমন লিকার ছিল না। তার মানে খরচ বেশি হয়েছে। পরশু তপুর ছেলের অন্নপ্রাশন। কিছু দিতে হবে! কি দেবে? সামনের শনিবার বিকাশের বিয়ে। কি দেবে? অবিরাম দেহি দেহি। যেন ট্যাকশালের পাশে এসে শুয়েছে। সব সময় স্বার্থ। বিছানাটা আলাদা করে নিতে হবে। কি দরকার বাবা! ভুলে কোথাও হাতটাত পড়ে গেলে বড় অপমানিত হতে হয়। কপালে! ভীষণ মাথা ধরেছে। কাঁধে? সংসারের ভার। পেটে বোধ হয় টিউমার। পায়ে গুঁপো। এ জিনিস বিছানায় কেন? ডাক্তারের টেবিলে শোয়া উচিত ছিল।

সোয়েটার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। না সরে আসতে পারিনি। শীত ফিরে ফিরে আসে। এক মাঘে শীত যায় না। প্রথম শীতেই আমার সেই অফিসের মহিলা সুন্দর একটি সোয়েটার উপহার দিলেন। আমরা দুজনে একটা ইংরেজী ছবি দেখলাম। সিনেমা হলে সেই সোয়েটারটা তাঁর কোলে থেকে গরম হয়ে উঠল। নস্যি রঙের উলে নকশার বিনুনি হাত ধরাধরি করে চলেছে। হাতে নিলেই বোঝা যায় দামী উল। হালকা নরম। ছবি দেখতে দেখতে মন খুশীতে নেচে উঠেছিল জয়ের আনন্দে। (মন জয় করার গর্ব। রাজত্ব জয় কোথায় লাগে!) নতুন এক মহাদেশে নৌকো নোঙর ফেলেছে। এক একটি মন অজানা এক একটি মহাদেশ। ইংরেজী বই চলার মাঝে মাঝেই বাংলা গান গুমরে গুমরে উঠছে, আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী!

তারিণী জানতেন, ব্যাটাচ্ছেলে তোর কি হবে। প্যাকেট বগলে বাস্ এক জনে দাঁড়িয়ে আছি। জলদাত্রী, সোয়েটার দাত্রী চলে গেছেন। পরে আমি স্ত্রীর হাতে বোনা তাজমহল সম্পর্কের শুরু ও শেষের উল-ফলক (মর্মর ফলকের মতই হেথায় চিরশায়িত সেই মানুষটির প্রেম। আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে, ঘাড়ে ধরে পিতা গছিয়েছেন। ভুল করে বোনা সোয়েটার ভুল অঙ্গে চেপে বসেছে।) গায়ের সোয়েটার যেন বগলের সোয়েটারকে প্রশ্ন করছে, কোথায়

চল্লে? কেন, তোমার সঙ্গে! তুমি যে ইললিগ্যাল মানিক। ঝাঁটা খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। তুমি কোন উৎস হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়াছ? বাঘের ঘরে কি ঘোগ বাসা বাঁধিতে চলিয়াছে? তুমি ত আমার সতীন হে। একটু ভয় ভয় ভাব যে হচ্ছে না তা নয়। অফিস থেকে সিনেমা, সোয়েটার উপহার, অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে পাশাপাশি বসে থাকা, রেস্তোরাঁ, খানা, এতক্ষণে বেশ ঘোরে ছিলুম। এইবার একা একা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনটা যেন ক্রমশই এলিয়ে পড়ছে! সে শক্তি আর নেই। চোখের আড়ালে আত্মিক অনুসন্ধানে বিপদের ঝুঁকি কম। বামাল বাড়ি ঢুকলে চুলোচুলি ত হবেই। সোয়েটার ত আর আসমান থেকে পড়ে না, ছেলেরাও বোনে না। কোন্ মহিলার এই কীর্তি? কিসের এত খাতির। (যার ওপর দুর্ব্যবহার করা হয় তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়। মার খেতে খেতে পালিয়ে না যায়। অন্য কোথাও ছিটকে গিয়ে আদরে না আমার পাঁঠা। ন্যাজে কাটব, মুড়োয় কাটব।) হঠাৎ তোমাকে কেন সোয়েটার বুনে দেওয়া। যা থাক সজাগ দৃষ্টি ঠিক আছে। (কুস্তিগীর খেটেখুটে, তেল ঢেলে জমি তৈরি করে, তার নিত্য দাপাদাপি করার জন্যে। এর নাম আখড়া। স্বামীরা হল স্ত্রীদের আখড়া। যে যার মতো কুস্তি করবে। অন্যের প্রবেশ নিষেধ।) এমন জিনিস ত আর ফেলে দিতে পারি না। তা এর প্রতিটি বুনোনে ভাললাগা, ভালবাসা। যা হয় হোক সতীন বগলেই বাড়ি ঢুকবো। ঠাণ্ডা লড়াই একদিন গরম লড়াই হবেই। যত তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায় স্নায়ুর পক্ষে ততই ভাল। কি ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মতো না জ্বলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। (অশান্তিটাও এক সময় বিলাস হয়ে দাঁড়ায়। উট যেমন কাঁটা চিবিয়ে রক্তাক্ত হতে ভালবাসে।)

সোয়েটার বগলে বাড়ি ঢোকার দিনটিতে তেমন কিছু হল না। কারণ আমার আসা, আমার ওয়া তেমন কেউ আর কারুর নজরে পড়ে না। সে ছিল প্রথম দিকে। ফিরতে একটু দেরি হলে দূর থেকেই দেখতে পেতুম জানলায় একটি মুখ। আমি পথ চেয়ে রব। বেরোবার সময় ফিসফিসে অনুরোধ, তাড়াতাড়ি ফিরো! বেশি রাত করো না। (আমাদের সেই মঙ্গলা গরুটার মতো। দেশের বাড়িতে দেখেছি। সকালে চরতে বেরলো। জানা আছে বিকেলে ঠিক ফিরে আসবে যেখানেই থাকুক। কোনও চিন্তা নেই। মাঝে কেউ একবার গোয়ালে উঁকি মেরে আসত। মঙ্গলা শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। মঙ্গলা দুধ দিত আমি টাকা দি এই যা তফাৎ।) সুতরাং নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকে প্যান্টের সঙ্গে পরা যাবে। আর তখনই হবে ধুম ধাড়াক্কা। ততদিন সম্পর্কটা আরও বিষিয়ে উঠবে। ফোড়া থেকে কার্বঙ্কল।

শীত এল। যেমন আসে মৃদু আমেজ। প্রথম কয়েকদিন আমার সেই পেটেন্ট সোয়েটার দিয়েই উদ্বোধন করা গেল। ঝলঝলে মাল। রঙ জ্বলে গেছে। যৌবন ঝরে গিয়ে বার্ধক্যের দশা। কাপ্তেনি করার বয়স চলে গেছে বলে মানিয়ে যায়। বছরের পর বছর ধরে শুনে আসছি শীত চলে গেলে ওটাকে আবার খুলে বোনা হবে। যেমন শোনা যায় রামরাজত্ব আবার আসবে। যাই হোক নতুন সোয়েটারের তখনও তেমন প্রয়োজন হল না। মহিলা বললেন, সোয়েটারটা এবার একদিন পরুন। তুলে রেখে রেখে পোকায় যে কেটে দেবে। গিন্নির ভয়ে পরছেন না বুঝি! (পৃথিবীতে কত রকমের ভয়! আরশোলার ভয়, সাপের ভয়, ছোঁয়াচে রোগের ভয়, মাসের শেষে কারুর বিয়ের ভয়, বড়কর্তার ভয়, সবার সেরা গিন্নীর ভয়।)

উপলক্ষ একটা জুটে গেল। আজ অফিসের এক সহকর্মীর বউভাত। সদলে যেতে হবে।

সামান্য মাঞ্জা দিলে ক্ষতি কি? সাদা প্যাণ্টের ওপর নতুন সোয়েটার। যথাস্থানে হাত চলে গেল। কি চাই আমাকে বললেই ত হয়। হাঁটকেপাঁটকে একসা!

'একটা প্যাকেট ছিল।'

'কিসের?'

'সোয়েটারের।'

'ও সোয়েটার! নস্যি নস্যি রঙ। কার সোয়েটার?'

'আমার, আবার কার?'

'কে বুনে দিলে?'

'বউদি।'

'তোমার আবার বৌদি কোথা থেকে এল?'

'তোমার একগাদা ঠাকুরপো থাকতে পারে আর আমার একজন বৌদি থাকতে পারে না!'

'রসের বউদি! তলে তলে আজকাল এইসব হচ্ছে। বুড়ো বয়সে লজ্জা করে না! ছেলেমেয়ে বড় হচ্ছে। মুখ দেখাবে কি করে?'

'তুমি যদি দেখাতে পার আমিও পারব।'

'তার মানে?'

'বুঝে নাও।' আবার আমি আলমারি হাঁটকাতে শুরু করলাম।

'তার মানে আমিও তোমার মতো চরিত্রহীন!'

'যে যেমন অর্থ করে।'

'আচ্ছা-আ।'

আচ্ছকা শব্দটা ধারালো ছুরির মতো হাওয়া কেটে গেল। আলমারির সব কিছু ঠিকঠাক রেখে সোয়েটার খোঁজার ধৈর্য আর নেই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দুমদাম করে সব ফেলতে লাগলুম। রাগে সর্বশরীর জ্বলছে।

'সোয়েটার এখানে নেই।'

'কোন চুলোয় আছে?'

'ভবানীপুরে।'

'ভবানীপুরে?'

'হ্যাঁ ভবানীপুরে। তোমার ছোট শালা পরে চলে গেছে।'

'বাঃ রে শ্বশুরবাড়ি। যেখানে যা পাবে হাতিয়ে নিয়ে চলে যাবে। দেবার মুরোদ নেই, নেবার বেলা শত হস্ত।'

'কি নিয়েছ শুনি! কী-ই বা তুমি দিয়েছ?

'কি নেয় না শুনি! দেওয়া? দেওয়ার অপেক্ষা রাখে? তোমার ওই বাহারের ছোট ভাইটি যেখানে যা পাবে ঝেড়ে নিয়ে চলে যাবে। যেন কর্পোরেশনের মাল রে! এই ত সেদিন একটা জামা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। কি? না জামার রঙটা ভীষণ ভাল। ভীষণ অ্যাপিলিং ইংরেজী শিখেছে, ইংরেজী। আমার আর ভাল কিছু পরে দরকার নেই। ছেঁড়া পরে ঘুরে বেড়াই। আর তুমি একটা গোমুখ্য। বাপের বাড়ি, বাপের বাড়ি করে সারাটা জীবন হেদিয়ে মলে।

'তাই ত বলবে! হ্যাদানোর কি দেখলে? আর তুমি যখন আমার শাড়ি ধরে টানাটানি কর!'

'তোমার শাড়ি? তোমার ত্রিসীমানায় যেতে আমার ঘেন্না করে। আমি জানি, আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে বন ভাল।'

'তা ঠিক। পর ত ভাল হবেই। বাইরে বাইরে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত ফষ্টিনষ্টি। তাদের ত আর অন্য কোনও দায় দায়িত্ব নিতে হবে না। ঘরেরটাকে জিইয়ে রেখে বাইরের এক একটাকে ধরে একটু খেলু খেলু। বাবুর খেলা হচ্ছে। খেলা। হাজারবার তাগাদার পর একটা শাড়ি এল। না পরে তুলে রাখলাম। তারপর যেই একটা বিয়ে এল বাবুর অমনি নাকে কান্না, মাসের শেষ বড় টানাটানি, কি করা যায়, তোমার ওই শাড়িটা নিয়েই এ যাত্রা ম্যানেজ করি। তোমাকে আরও ভাল শাড়ি কিনে দেব। বাস হয়ে গেল। ফুর্তিতে টাকা ওড়ালে সংসারের এই হালই হয়। তোমার রকমসকম দেখে আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। তোমার ত্রিসীমানায়, তোমার কোন কিছুতে থাকতে ইচ্ছা করে না।'

'থাকার দরকার নেই। এসেছি একেলা যাবোও একলা। তোমার ভাইকে এই সোয়েটারটা, এই শালটা, এই জামাটা, এই প্যান্টটা, এই কলারঅলা গেঞ্জিটা দয়া করে নিয়ে যেতে বোলো। আমি সন্ন্যাসী হয়েই দিন কাটাব।'

সব টেনে টেনে, ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিলুম। ভেতরটা বেশ খোলসা হল। কোষ্ঠকাঠিন্যের পরের আনন্দ। অফিসে বেরোবার তাড়া না থাকলে বেশ ভালভাবে লড়া যেত। যাক তবু কিছুটা লণ্ডভণ্ড করা গেছে। (ক্রোধে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। কল্পনার স্বপ্নজগৎ থেকে বাস্তবে বেশ কিছুদিনের জন্যে ফিরে আসা সম্ভব হয়। গণ্ডারের মতো গোঁ গোঁ করে গোঁত্তা মারার জায়গার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। মুহ্যমান ভাব কেটে যায়। কাজে কর্মে মতি আসে।)

অফিসে আমার সেই বান্ধবী বললেন, 'কি হল? কাল যে নতুন সোয়েটার পরার কথা বলায় একেবারে উদোম হয়ে চলে এলেন যে?'

'বাহুল্য বর্জন।' বলতে পারলুম না, যে আপনার সযত্নে বোনা সোয়েটার ভবানীপুরের এক মাল পরে আশুতোষ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে শিকার করছে।

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে? আজ ফিরতে অনেক রাত হবে ত!'

'বিকল্প ব্যবস্থা আছে।'

'সেটা কি?'

'ছিলিম। বিকেলে বেরিয়ে বটতলার বাবাজির কাছে উবু হয়ে বসে দু টান মেরে যাব।'

ঠাণ্ডা লাগার কথা আমার বউও বলেছিল তবে বাঁকা করে। 'ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হবে, সেবা করতে পারব না কিন্তু।' সেবার নমুনা তোমার দেখা আছে। ছেলেবেলায় আমাদের পড়তে বসার মতো। এদিকে তাকাচ্ছি, ওদিকে তাকাচ্ছি কাগজের গোল্লা তৈরি করছি, পেনসিল চিবোচ্ছি। শেষে হাওয়ায় বইয়ের পাতা উড়ছে, পড়ুয়া মাঠে দৌড়াচ্ছে। তোমার সেবা ত তাই। আমার কপাল রইল কপালে। তোমার হাত রইল হাতে। মুখে বারকতক বললে, কপালে হাত বুলিয়ে দেবো? কপালে?

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হল। দশটা-টশটা হবে। শোবার ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। এতদিনের জোড়া খাট সিঙ্গল হয়ে গেছে। ঘরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। শব্দ করলে

প্রতিধ্বনি হচ্ছে। ছেলে আর মেয়ে দুজনেই ঘরে ছিলো। বড়সড় হয়েছে। বুঝতে সুঝতে শিখেছে। মেয়ে বলল, 'কি গো তোমার রাগ কমেছে?'

ছেলে বলল, 'কক ফাইটের ভয়ে রাত করে ফিরলে?'

আরে তাই ত, বেরোবার সময় বলে যেতে ভুলেই গেছি, আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অবাক হয়ে আমাকে ঘরের এপাশে ওপাশে ঘুরতে দেখে ছেলে বললে, 'আর ফাইট করতে পারবে না। মাতাঠাকুরানী আলাদা হয়ে গেছে।'

মেয়ে বললে, 'ফিমেল খাটটা মেল খাটকে ডাইভোর্স করেছে।'

আজকাল ছেলেমেয়েরা কি সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। ভাল ভাল। যত তাড়াতাড়ি বুঝতে টুঝতে শেখে ততই ভাল। আগে যাত্রা শুরু করলে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। জামা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি ব্যাপার তোমরা দুটিতে এখনও এখানে বসে?'

মেয়ে বললে, 'তোমাদের একটু হেল্প করার জন্যে বসে আছি।'

'হেল্প মানে?'

'এখন ত দিন কতক তোমাদের কথা বন্ধ থাকবে তাই আমরা দুজনে দূতের কাজ করব।'

ছেলে বললে, 'একবার দেখে নাও হাতের কাছে সব ঠিকঠাক আছে কি না। আমরা ত জানি না তোমার কি লাগে না লাগে।'

মেয়ে বলল, 'যতটা জানি সব গুছিয়ে রেখেছি। মাকে তোমার এখন কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ আছে। বলে দাও, বাবা কিছু খাবে না।'

ছেলে বললে, 'জানতাম, তুমি আজ খাবে না।' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে 'বাইরে ভাল করে খেয়ে এসেছ ত? তুমি লড়ে যাও আমরা তোমাদের পেছনে আছি।'

ছেলে বললে, 'তা হলে তুমি এক গেলাস জল খেয়ে এবার শুয়ে পড়। বেশ শীত পড়েছে। ওষুধ-টষুধ কিছু খাবে? এ সময় আবার জ্বরে পড়ে হেরে যেও না যেন। প্রত্যেকবার তুমিই হার। এবার কিন্তু জিততে হবে।'

'না ওষুধ-টষুধ লাগবে না। এ ঠাণ্ডায় জ্বর হবে না।'

'তুমি সোয়েটার পরলে না কেন? একটু বোকা আছ। ছোট মামা তোমার কি নেবে? নিয়ে পার পাবে? আমরা আছি না! মামার বাড়ি যাই আর আসার সময় ভাল প্যান্টটা জামাটা, যা পাই বাগিয়ে আনি। তুমিও যেমন! এই ত ও মাসীর দুখানা শাড়ি নিয়ে চলে এসেছে।'

মেয়ে বললে, আর তিনখানা আনতে পারলেই সমান সমান হয়ে যাবে রে দাদা।

ও মায়ের বুঝি পাঁচখানা নিয়ে গেছে? চল তা হলে আর একবার যাই!

মেয়ে এক গেলাস জল এনে চাপা দিয়ে রেখে গেল। মশারি-টশারি বেশ পরিপাটি করে খাটান। ছেলে মাকে বলছে শুনলাম, 'তোমার কিছু বলার আছে মা?'

'আছে। খাবে না যখন আগে বলতে কি হয়েছিল? পয়সা কি সস্তা?'

ছেলে ওঘরথেকে হেঁকে বললে, 'পয়সা কি সস্তা? মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়ার খরচ। পয়সা কি সস্তা?' তারপর মাকে বলছে শুনলুম, 'কি কি খেতে হবে বল, আমরা দুজনে সাবাড় করে দিয়ে যাই। নষ্ট হওয়াটা ঠিক নয় মা। যা বাজার কি বল? ভাগ্যিস আমরা ছিলুম।'

আমাদের কথাই ওদের দিক থেকে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে। জীবনের অংশীদার বেড়ে

গেছে। একা একা আর কিছু করা যাবে না। সব স্বাধীনতা চলে গেছে এমন কি মান অভিমানের স্বাধীনতাও। যাক যা হবার তা হয়েছে। পা পিছলে গেলে পড়ে যেতে হয়। জীবন পিছলে গেলে সংসার স্রোতে ভেতে যেতে হয়। সাঁতার জানলেও কোন লাভ হয় না।

বিছানায় শুয়ে পড়েছি। ছেলেমেয়ে বাইরে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'গুড নাইট!'

'গুড নাইট।'

মেয়ে বললে, 'তোমার আবার একা শুতে ভয় করবে না ত?'

'ভয়ের কি আছে? ভয় করবে কেন?'

ছেলে বললে, 'যদি ভয় করে তাহলে তুমি যেন আবার মায়ের বিছানায় এসে ঢুকো না? আমাদের ঘরে চলে আসবে। কেমন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব হয়েছে। অনেক উপদেশ ঝেড়েছিস, এবার শুয়ে পড়।'

অন্যদিন আলো জ্বেলে বেশি রাত পর্যন্ত পড়ার উপায় থাকে না। আর একজনের চোখে আলো লাগে। সারা দিন কী ভীষণ খাটুনি! ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমাদের সারাদিন ত কোন পরিশ্রম হয় না। অফিসে আমরা আড্ডা মারতে যাই। ফুর্তি করতে যাই। আজ আলো জ্বেলে ইচ্ছে করলে সারা রাত পড়া যায়। জীবন ছোট হয়ে আসছে। বরফের টুকরোর মতো ক্রমশই গলে যাচ্ছে। কত কি পড়ার আছে, জানার আছে। যাবার দিনে পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখে যেতে পারব। কত রকমের খাবার আছে। কত দেশ আছে। কত রকমের জীবন আছে। পিঁপড়ের পিঠে খাওয়ার মতো এক কোণে ধরে একটা ফুটো ফাটা করে সরে পড়া। সেই এক মহিলা, এক কণ্ঠস্বর, এক বাড়ি, এক ঘর, এক রাস্তা, এক অফিস। একই জগতে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে, থাকা আর না থাকার তফাতটাই ভুলে গেছি।

হ্যাঁ, অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে। আজ শুয়েই পড়া যাক। বিছানা ছোট হয়ে গিয়ে ঘরটা বড় হয়ে গেছে। কতটা নতুন জায়গা বেরিয়েছে। আলমারিটা যেন দূরে সরে গেছে। টেবিল আর চেয়ার যেন ছোট দেখাচ্ছে। যে দিকে খুশি ইচ্ছে মতো হাত পা ছুঁড়ছি কারুর গায়ে লাগছে না। অন্ধকারে কোন প্রতিবাদ ভেসে আসছে না। বিছানাটাও কেমন যেন বেশি শীতল মনে হচ্ছে। এতদিনের অভ্যাস, পাশে একটা প্রতিরোধ নিয়ে ঘুমোন! (মেছুনীকে রাজবাড়ির শয্যায় শুতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতেই ঘুম আসে না। শেষে মাঝরাতে আঁশের ঝুড়িটাকে জল ছিটিয়ে মাথার পাশে রেখে তবেই ঘুমোতে পারল।)

ঘুম আর কিছুতেই আসতে চায় না। সারাদিন না খেয়ে আছে। এদিকে আমি একপেট ভাল মন্দ খেয়ে শুয়ে আছি। না, আমি খোশামোদ করে খাওয়াতে পারব না। অসম্ভব। আমার বান্ধবী এখন কি করছে? নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। কার পাশে শুয়েছে? সেই শয়তান লোকটার পাশে? তিনি নাকি অন্য এক মহিলাতে আসক্ত। সে শয়তান, আমি শয়তান, স্ত্রী শয়তান? দেবতারা কোথায় গেল কে জানে? না, পরস্ত্রীর কথা চিন্তা করা উচিত নয়। নির্জন, অন্ধকার ঘরে একা শয্যায় অন্য নারীর চিন্তা আক্ষেপ বাড়িয়ে তোলে। জীবনকে আরও অসহনীয় করে তোলে। অনেক বয়েস হয়েছে। আমার এক বন্ধু বলেছিল, পুণ্য করার জন্য সাহসের দরকার হয় না পাপ করতে গেলে সাহস চাই। জেনুইন লম্পট হওয়া খুব শক্ত। সন্ন্যাসীকে যেমন সব ছাড়তে হয়, লম্পটকেও তেমনি সব ছাড়তে হয়! লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়—আমার বউটাকে ঈশ্বর

যদি একটু সুবুদ্ধি দিতেন। বেশ হত। সব সময় যেন কাঁকড়াবিছের মতো খরখর করে বেড়াচ্ছে।

একটু ঘুম বোধ হয় এসেছিল। কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার পক্ষের রাত! বাইরে পাগলা হাওয়া উঠেছে। মাঝরাতে পৃথিবীটা কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়। নিজের পরিচিত ঘরটাও তখন বিশালে হারিয়ে যেতে চায়। মহাকাশে ড্যাবা ড্যাবা তারা। সমুদ্র থেকে মেঘ উঠছে। চারপাশ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কুকুরের আর্তনাদ। পাশের কোন বাড়িতে রোগের যন্ত্রণায় কেউ ওঁ ওঁ শব্দ করছে। নিঃশব্দে আকাশ গুটিয়ে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। এত অন্ধকার, যেন জানলার বাইরে হাত বাড়ালে হাতে কালো রঙ লেগে যাবে।

ছেলেবেলা থেকেই আমার একটু ভূতের ভয় আছে। একা একা শুতে পারি না। একবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে তিন রাত ঠায় বিছানায় জেগে বসে কাটিয়েছি। এই যে ঘুম ভেঙে গেল আর আসবে না। এইবার একে একে তারা আসবে। হারু গলায় দড়ি দিয়েছিল। সে হারু আসবে এখুনি। নিত্যর মা পুড়ে মরেছিল। সেই কালো, পোড়া কাঠের মতো নিত্যর মা আসবে। বসন্ত খুন হয়েছিল। সে আসবে স্কন্ধকাটা হয়ে। সেই ছেলেটি জলে ভেসে উঠবে। গঙ্গায় যে ভাসছিল প্যাণ্ট জামা পরে উপুড় হয়ে। সবাই আসবে একে একে। শেষে এমন অবস্থা হবে ইচ্ছে হলেও বাথরুমে যাবার সাহস থাকবে না। এতখানি বয়স হল তবু ভূতের ভয় আর গেল না। ইদানীং আবার চোরের ভয় ঢুকেছে। বাইরে সামান্য শব্দ হলেই মনে হচ্ছে কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে

তবু বেশ কিছুক্ষণ মন শক্ত করে বিছানায় পড়ে রইলুম। চোখ বন্ধ। তবু বেশ জানি ঘরে আমি একা নই। অনেকে এসে গেছে। মন আর কোন যুক্তি মানতে চাইছে না। রাত যে অচেনা সত্য মিথ্যা, লৌকিক অলৌকিক সব ঢেকে দিয়েছে। বউয়ের সঙ্গে লড়াই আমি চালাতে পারব না। রাতে আমি বড় অসহায়। নরওয়ে হলে পারতুম, যেখানে ছ মাস দিন ছ মাস রাত। দিনের ছ মাস অন্তত ভূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি। সাবিত্রী সত্যবানকে আগলে রেখেছিল বলে যমেও ছুঁতে পারেনি। স্ত্রী পাশে থাকলে ভূতে করবে কি গো। হাজার চেষ্টা করলেও আমার গলা দিয়ে এখন শব্দ বেরোবে না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরেও কি যেতে পারব। খাটের নীচে কি আছে কে জানে? পা নামালেই যদি টেনে ধরে। ভয়! কিসের ভয় তা জানি না। ভূত আছে কি নেই কেউ স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারবে কি? যার কাছে তার কাছে আছে।

এইবার মনে হচ্ছে খাটের তলায় কে যেন ধীরে ধীরে তালে তালে টোকা মারছে দূরে একটা কুকুর মরা কান্না কাঁদছে। আর নয়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ও সব বান্ধবী-টান্ধবী কেউ কিছু নয়। বউই সব। প্রকৃতির বেগে, ভূতের তাড়ায় মানুষ সব পারে গ্রামা কথাতেই আছে হাগা নেই বাঘার ভয়। পাশের ঘরে কোনও মতে গিয়ে মশারির দড়িমড়ি ছিঁড়ে হুড়মাড় হুড়মাড় করে সেই রাগিণী দেবীর ঘড়ে গিয়ে পড়লুম।

শীতের চেয়ে, ভূতের চেয়েও ঠাণ্ডা গলায় ভেসে এল, 'এলে তাহলে? পারলে না পর্যন্ত?'

'না, পারলুম না?'

'ঘেন্না করছে না?'

'না, ও ছিল কথার কথা। অন্তরের কথা নয়।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ।' মনে হল মাঝরাতে সিনেমার রামকৃষ্ণ কথা বলে উঠলেন।

'এ ঘরে ভীষণ ঠাণ্ডা। উত্তরের ঘর, ড্যাম্প, ও ঘরে চল। রাতের যেটুকু বাকি আছে সেইটুকু অন্তত ঘুমিয়ে নাও।'

এত স্নেহ কোথায় ছিল চকমকি? ঘষা না লাগলে বুঝি আগুন বেরোয় না!

সকালে একেবারে সোনার পাতের মতো রোদ উঠেছে। কোথায় কি? ভূতটুত এখন সব ভাগলবা। গরম গরম চা চলছে। মন আর মেঘলা নেই। বর্ষার পরেই ত শরৎ আসে। বাঁ পাশে বসে আছে ছেলে। সে খুব দুঃখের গলায় বলল, 'এবারেও হেরে গেলে?'

ডানপাশে বসেছে মেয়ে। সে খুব ভারিক্কি চালে লেডি ডাক্তারের গলায় বললে, 'এবারেও ভূতের ভয়?'

ছেলে বললে, 'তা ছাড়া আবার কি?'

মেয়ে বললে, 'তোমাকে পাঁচু ঠাকুরের কাছ থেকে মাদুলি এনে পরিয়ে দিতে হবে।'

ছেলে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমরা এবারে কদিন ঠাণ্ডা থাকবে?'

এর উত্তর আপাতত আমার জানা নেই। তোমাদের যখন বিয়ে হবে তোমরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তবে জীবনের সার কথা মনে হয় এতদিনে বুঝতে পেরেছি। ভাগ্যের চুল্লি থেকে নিশিদিন জোড়ায় জোড়ায় পেয়ালা পিরিচ বেরিয়ে আসছে ডিজাইনে ডিজাইনে মিলিয়ে। একটি গেলে আর একটি খোঁড়া। যার সঙ্গে যা। যেমনটি মিলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ঠুংঠাং করতে করতে একদিন তো ভাঙবেই। তখন অন্যটা পড়ে থাকবে সংসারের এক কোণে অবহেলায়। যতক্ষণ জোড়ে আছে, দাপটে আছে। হাতে হাতে ঘুরছে। জীবনের নির্যাসে ভরা সেই পেয়ালা পিরিচ থেকে জীবনের সুগন্ধ বেরোচ্ছে। কখনও অসাবধানে ছলকে পড়ে গেলেও পিরিচেই জমা থাকছে। একদিন একটা ভাঙবেই। তবে কোন দিন কোনটা আমি জানি না তা তোমাদের বলব কি? ❦

খগেনবাবু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নলতাপুরের বাসে ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ সামনের দিকে খগেনবাবুকে দেখতে পেল দিগম্বর। অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকে উঠল। নলতাপুরের বাসে খগেনবাবু কেন? ইদিকে তো ওনার আসার কথাই নয়। তবে কি এত বছর বাদে খবর হয়েছে।

মেয়েদের সীটে এঁটে বসে আছে জুঁইফুল। সংক্ষেপে জুঁই। জায়গা নিয়ে একটু আগে ক্যাটর ক্যাটর করে ঝগড়া করেছে অন্য সব মেয়েমানুষদের সঙ্গে। তারা বলছে, জায়গা নেই। জুঁই বলছে ঢের জায়গা, চেপে বসলেই হয়। সেই কাজিয়ায় দিগম্বর নাক গলায়নি। জুঁইয়ের গলার জোরের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। পারেও বটে মেয়েটা। সীটে গায়ে গায়ে মেয়েমানুষ বসা, সর্ষে ছড়ালেও পড়বে না এমন অবস্থা। তার মধ্যেই ঠিক ঠেলে গুঁতিয়ে জায়গা করে বসেছে। খুব আরামে না হলেও বসেছে তো। এখন দিব্যি ঘাড় ঘুরিয়ে চলন্ত বাস থেকে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

জুঁইয়ের মুখোমুখি প্রথমে দাঁড়িয়ে ছিল দিগম্বর। প্রাইভেট বাস, কণ্ডাকটর ঠেলে লোক তোলে, যতক্ষণ না বাসের পেট ফাটো-ফাটো হয়। ফলে লোকের চাপে ঠেলা খেতে খেতে অনেকটা সরে এসেছে সে। আরো সর ত, সামনে এক বস্তা গাঁটি কচু থাকায় ঠেকে গেছে। এখান থেকে জুঁই মাত্র হাত তিনেক তফাতে। কিন্তু মাঝখানে বিস্তর কনুই, হাত, মাজা আর মাথার জঙ্গল থাকায় তিন হাতই এখন তিনশ হাত। আর বাসের মধ্যে চতুর্দিকে এমন গণ্ডগোল হচ্ছে যে, খুব চেঁচিয়ে না ডাকলে জুঁই শুনবেও না।

কিন্তু জানান দেওয়াটা একান্ত দরকার। একেবারে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা দাঁড়াল কিনা ব্যাপারটা। আর কেউ নয়, স্বয়ং খগেনবাবুই বাসে সামনের দিকে।

একটু আগে জুঁই যখন চেঁচিয়ে ঝগড়া করছিল তখন তার গলা খগেনবাবুর কানে যায় নি তো। এতদিনে অবশ্য জুঁইয়ের গলার স্বর খগেনবাবুর ভুলে যাওয়ারই কথা। আর বাসের কে না চেঁচাচ্ছিল তখন? অত চেঁচামেচিতে কে কার গলা চিনবে!

সুবিধে এই যে, বাসে একেবারে গন্ধমাদন ভিড়। একটু আগেও দিগম্বর ভিড়ের জন্য কণ্ডাক্টরকে দু কথা শুনিয়েছে, পয়সাটাই চিনলে, মানুষের সুখ দুঃখ বুঝলে না। আমাদের কি গরু-ছাগল পেয়েছো, নাকি তামাকের বস্তা? এখন অবশ্য দিগম্বর মনে মনে বলছে, ভিড় হোক, বাবা, বাসে আরো ভিড় হোক। গাড়ির পেট একেবারে দশমেসে হয়ে যাক।

খগেনবাবুকে দেখেই ঘাড়টা নামিয়ে ফেলেছে দিগম্বর। এখনো সেটা নোয়ানো অবস্থাতেই আছে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে কে যেন হাত ভেরে যাওয়ায় নিজের হাতব্যাগটা আলতো করে

তার কাঁধে রেখেছে। অন্য সময় হলে খেঁকিয়ে উঠত, এখন কিছু বলল না। বরং ব্যাগটার আড়াল থাকায় একরকম স্বস্তি।

কিন্তু স্বস্তিটা বড় ঠুনকো। সানকিডাঙায় বেশ কিছু লোক নেমে যাবে, হত্তুকিগঞ্জে আজ হাটবার—সেখানে তো বাস একেবারে সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা। তবে উঠবেও কিছু সেখান থেকে। কিন্তু তা ওঠানামার ফাঁকেই খগেনবাবু যে পিছনে তাকাবেন না এমন কথা হলফ করে কি বলা যায়? জুঁইকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এদিকে তাকাচ্ছেও না। নতুন-নতুন কারণে অকারণে তাকিয়ে থাকত। পুরনো হওয়ায় এখন আর চোখেই পড়ে না।

ভেবে একটু অভিমান হচ্ছিল দিগম্বরের! এই যে সে ভালমানুষদের চাপে অষ্টাবক্র হয়ে গাঁটি কচুর বস্তায় ঠেকে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যে 'আহা, উহুঁ' করার কে আছে দুনিয়ায়?

কিন্তু অভিমানের সময় নেই। জানান দেওয়াটাই একটা ভীষণ দরকার। গলা তুলে ডাকতে পারছিল না দিগম্বর। খগেনবাবু শুনে ফেলবে। মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জুঁইয়ের প্লাসটিকের চটি পার একটা পা একটু এগিয়ে আছে। চেষ্টা করলে পা বাড়িয়ে জুঁইয়ের পা-টা হয়তো ছোঁয়া যায়।

কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যেই পা তুলেছে অমনি হড়াস করে কচুর বস্তায় বসা লোকটার কোলসই হয়ে গেল দিগম্বর। লোকটু খুন হওয়ার আগে যেমন মানুষে চেঁচায় তেমনি চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে! গেলাম! গেলাম।

দিগম্বর বুঝল, হয়ে গেছে। এই গোলমালে খগেনবাবু নিশ্চয় তাকাবে। সে মুখ তুলে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ! চুপ!

লোকটা কোঁকাতে কোঁকাতেও তেজের সঙ্গে বলে, কেন চুপ করব? চুরি করেছি নাকি? কোথাকার ঢ্যামনা হে তুমি? ওপরের শিক ভাল করে ধরতে পারো না? ইত্যাদি আরো অনেক কথা।

কাঁকলে লেগেছিল দিগম্বরের। গাঁটি কচু যে বাসের ছাদেই ওঠানো উচিত, বাসের ভিতরে নয়, সে কথাটা তুলতে পারত। কিন্তু খগেনবাবুর ভয়ে বলল না কিছু।

ভেবেছিল চেঁচামেচি শুনে সবাই তাকাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল, চারিদিকে হাটুরে গণ্ডগোলে ব্যাপারটা লোকে গ্রাহ্যই করেনি। জুঁইও আচ্ছা লোক বটে। সামনেই এত বড় কাণ্ড ঘটে গেল, একবার তাকাবে তো! তা নয়, জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঠঘাট দেখছে।

বাস থামে। চলে। আবার থামে। দিগম্বরের দু জোড়া চোখ থাকলে ভাল হয়। তবু সাধ্যমতো সে খগেনবাবু আর জুঁইয়ের দিকে নজর রাখে। খগেনবাবুর কপালের বড় আঁচিলটা এখনো দিব্যি আছে। মাথার চুলে বাঁকা টেরি। সেই একপেশে বোতামঘরওয়ালা পাঞ্জাবি। জুঁই কালো রঙের মধ্যেই আরো ঢলঢলে হয়েছে। চোখ দুখানা আগের মতো চঞ্চল নয়। ধীরস্থির।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দিগম্বর। পাপকাজ করলে ধরা পড়ার ভয়ও থাকে বটে। কিন্তু এই হাওড়া জেলার নলতাপুরের বাসে খগেনবাবুর দেখা পাওয়ার কথাই নয়। পেট থেকে একটা ভয়ের ভুড়ভুড়ি গলায় উঠে আসায় দিগম্বর একটা ঢেঁকুর তুলল।

জুঁইয়ের মাথার ওপর দিয়ে কে একজন জানলায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার বগলটা জুঁইয়ের নাকের ডগায়। জুঁই দুর্গন্ধ পাওয়ার মতো নাক কুঁচকে মুখ তুলে বগলবাজকে কি যেন বলল। জয় মা! যদি এবার তাকায়!

তা তাকালও, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে-চ্যাপটা দিগম্বরকে চিনতে পারল বলে মনে হল না। আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বগলবাজ ধমক খেয়ে তার বগল গুটিয়ে নিয়েছে। যত সব মেনীমুখো পুরুষ! বগলটা আর একটু রাখলে আবার তাকাত জুঁই।

সানকিডাঙা! সানকিডাঙা! দিগম্বরের পিলে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কণ্ডাকটর।

বাস থেমেছে। হুড় হুড় করে লোক নামছে। দিগম্বর পাটাতনে উবু হয়ে বসে চোখ বুজে আছে। সর্বনাশ! বাস খালি হয়ে যাবে নাকি! নেমেই যাচ্ছে যে!

উবু হওয়ায় জুঁইয়ের চটির ডগাটা হাতের কাছে পেয়ে গেল সে। ভিড়ও অনেক কমেছে। হাত বাড়িয়ে একবার নাড়ল। কচুওয়ালা বড় বড় চোখে দৃশ্যটা দেখছিল। কিছু বলতে মুখটা ফাঁকও করেছিল বোধহয়। কিন্তু তা দেখার অত সময় নেই দিগম্বরের।

জুঁই পা-টা পট করে টেনে নিয়েই সোজা তাকাল তার দিকে। বলল, ও কি গো?

এমন সুযোগ আর আসবে না। দিগম্বর একটু হামা টেনে মুখটা কাছে নিয়ে বলল, বাসের সুমুখ দিকে খগেনবাবু। তাকিও না বোকার মতো। ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে বোসো।

শুনে কেমনধারা ফ্যাকাশে মেরে গেল জুঁই। দুবার বলতে হল না। ফট করে ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে ফেলল।

সানকিডাঙায় নামল যত, উঠলও তত। আবার ঠাসা-চাপা গন্ধমাদন ভিড়। তবে দিগম্বর বসে ছিল, বসেই রইল। দু একজন হাঁটুর গুঁতো দিয়ে অবশ্য দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিল। বলল, দাঁড়াও! দাঁড়াও! বসলে জায়গা আটকে থাকে। দিগম্বর কাতর মুখে বলল, শরীর খারাপ। বড় বমি আসছে। শুনে লোকজন আর কিছু বলল না, বরং একটু যেন তফাতে চেপে থাকারই চেষ্টা করতে লাগল। কচুওয়ালা মহা ত্যাঁদড়। কিছু আঁচ করে মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চাইছে। দিগম্বর তার দিকে চেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বলল, হত্তুকিগঞ্জের হাটে যাচ্ছো নাকি? কচুওয়ালা দিগম্বরকে পাত্তা না দিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। ছোটলোক আর বলে কাকে।

বসে থেকে চারদিকে বাঁশবনের মতো লোকের পা দেখে দিগম্বর। পা দেখে কে কেমন লোক তা বোঝা যায় না। মুখ দেখে যায়। বেশির ভাগ পা-ই প্যাণ্ট ধুতি পায়জামা আর লুঙ্গিতে ঢাকা। এর ফাঁকফোঁকর দিয়ে অবশ্য জুঁইকে দেখতে পাচ্ছে দিগম্বর। কাণ্ড দেখ! জুঁই গলা টানা দিয়ে ঘোমটা ফাঁক করে সামনের দিকে চাইছে মাঝে মাঝে। মেয়েমানুষ কোনকালে কথা শুনবে না। হাঁ-হাঁ করে ওঠে দিগম্বর, কিন্তু তার কথা জুঁইয়ের কানে যায় না।

বসে আরো কষ্ট। হাঁটু ঝিনঝিন করে এত টাইট মেরে বসে থাকায়। চারদিকে পা, তার ঠেলাও কম নয়। কচুর গাঁটটায় এক হাতে ভর দিতে গিয়েছিল, কচুওয়ালা তেরিয়া হয়ে বলল, ভর দেবে না। কচু থেঁতলে যাবে। দিগম্বর ফোঁস করে ওঠে, আর তুমি বসেছো কচুর ওপর। কচুওয়ালা তার জবাব দিল, আমার কচু। আমি বসব তোমার তাতে কি যায় আসে?

বিপদে পড়লে সবাই মাথায় চড়ে। দিগম্বর আর কথা বাড়ায় না।

কখন যেন একটা মেয়েছেলে নেমে যাওয়ায় জুঁই একটু এগিয়ে এসে বসতে পেরেছে। এখন প্রায় দিগম্বরের মুখোমুখি। হঠাৎ ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা নামিয়ে এনে বলল, কোথায় দেখলে? আমি দেখতে পাচ্ছি না তো।

দিগম্বর দাঁত কিড়মিড় করে। আহা দেখার জন্যে একেবারে আঁকুপাঁকু যে! দু দুটো বউ

পেরিয়েও মেয়েছেলেদের ব্যাপারটা আজও ধাঁধা লাগে দিগম্বরের। কি যে চায় তা ওরাই জানে।

সে চাপা ধমক দিয়ে বলল, আছে আছে। ঘোমটা টেনে চুপ মেরে বসে থাকো। খবরদার তাকাবে না।

কচুওয়ালা সব শুনেছে। ভারী লজ্জা লাগে দিগম্বরের।

ভুল দেখনি তো! জুঁই বলে।

জ্বলজ্যান্ত খগেনবাবু। ভিড় টপকে দেখবে কি করে? দাঁড়ালে দেখা যাবে।

একটু দাঁড়িয়ে দেখব?

আ মোলো! একজন বসা মেয়েমানুষের হাঁটুতে কপালটা ঠুকে গেল দিগম্বরের। বলল, পাগল হলে নাকি?

আহা আমার তো ঘোমটা আছে। দেখব?

মরবে! বলছি, মরবে!

জুঁই আবার সোজা হয়ে বসে। দেখার চেষ্টা করে না ঠিকই। তবে বে-খেয়ালে ঘোমটা অনেক সরে গেছে।

হত্তুকির হাট! হত্তুকির হাট! কণ্ডাকটর গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

খগেনবাবু কোথায় নামবে জানা নেই। কাঁটা হয়ে থাকে দিগম্বর। চারিদিকে পায়ের যে ঘন বাঁশবন ছিল তা এক লহমায় ফাঁকা ফাঁকা হয়ে এল। হত্তুকির হাট জায়গাটা বড় ভয়ের। এখানেই সবচেয়ে বেশি লোক নামে। এমন কি কচুওয়ালা পর্যন্ত তার গাঁট কাঁধে তুলেছে। সামনে একটা আড়াল ছিল। তাও গেল। গাঁট তুলতে তুলতে কচুওয়ালা কটমট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। কিছু লোক আছে কিছুতেই অন্য মানুষকে ভাল চোখে দেখে না।

দিগম্বর চোখ বুজে ভগবানকে বলছিল, খগেনবাবুর যেন এখানেই কাজ থাকে।

বেহায়া মেয়েছেলেটাকে দেখ। ঘোমটা প্রায় খসে পড়েছে। মুখখানা উদোম খোলা। গলা টানা দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ড্যাবা ড্যাবা চোখে লজ্জার মাথা খেয়ে। দিগম্বর জুঁইয়ের কাপড় ধরে টান দিল। চাপা গলায় বলল, বসে পড়ো। বসে পড়ো!

জুঁইয়ের জ্ঞান ফেরে। ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দেয়। তারপর কুঁজো হয়ে দিগম্বরকে বলে, দেখেছি!

দিগম্বর কটমট করে তাকায়। বলে, উদ্ধার করেছো। তোমাকে দেখেছে?

না। এদিকে তাকাচ্ছে না। সঙ্গে কারা আছে বলে মনে হল। তারা বসে আছে বলে দেখা গেল না। আবছা যেন মনে হয়, বউ মতো কেউ। তার সঙ্গে কথা বলছে আর সিগারেট খাচ্ছে। বলেই জুঁই আবার সোজা হয় এবং ফের অবাধ্য হয়ে সামনের দিকে টালুকটুলুক চেয়ে থাকে।

বাসের মাথায় ধমাধম মাল চাপানোর শব্দ হচ্ছে। বিস্তর চেঁচামেচি। কাতারে লোক উঠছে ভিতরে। অনেক ধমক চমক অপমান সয়েও দিগম্বর বসেই থাকে। সামনে বাঁশগেড়ের খাল। পুরোনো পোল দু বছর আগের বানে ভেসে গেছে। নতুন পোল তৈরি হচ্ছে সবে। ফলে বাস ওপারে যায় না। যাত্রীরা একটা বাঁশের সাঁকো পায় হেঁটে পেরিয়ে ওপাশে বাস ধরে। বাঁশগেড়েতে বাস থেকে নামলে কি হবে তাই ভাবে দিগম্বর, আর বিরক্ত চোখে জুঁইয়ের কাণ্ড দেখে! নতুন নতুন যেমন তাকে অপলক চোখে দেখত, এখন ঠিক সেই চোখে সামনের দিকে

চেয়ে খগেনবাবুকে দেখছে! মেয়েছেলেদের কি ভয়ভীতি নেই?

ভিড়টা আবার চেপে আসার পর বুকে আটকানো দম ছাড়ে দিগম্বর। জুঁই এখনো দেখছে। বিরক্তি কেটে এবার একটু মায়া হল দিগম্বরের। জুঁইকে দোষ দেওয়া যায় না। একসময় তো খগেনবাবুরই বিয়ে-করা বউ ছিল জুঁই। চার-পাঁচ বছর সুখে-দুঃখে টানা ঘরও করেছে। তারপর না হয় পালিয়ে এসেছে দিগম্বরের সঙ্গে। তা বলে তো আর সব কিছুই ভুলে যাওয়া যায় না। দিগম্বরের সঙ্গে আছে মাত্র চার বছর, ভুলে যাওয়ার পক্ষে সময়টাও বেশি যায়নি। বাচ্ছা কাচ্চা হয়েছিল না ভাগ্যিস! হলে এতক্ষণে বোধহয় গিয়ে হামলে পড়ত।

জুঁই হঠাৎ আবার নিচু হল। বলল, সঙ্গের জন মেয়েছেলেই বটে, বুঝলে!

হোক না। দিগম্বর তেতো মুখে বলে।

মুখটা দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য। নীল রঙের শাড়ি, জরির পাড়।

তোমাকে দেখে নি তো!

না। দুজনে খুব কথা হচ্ছে।

হোক। তুমি মুখ ঘুরিয়ে থাকো!

পান খেল এইমাত্র। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলতে দেখলাম। মেয়েছেলেটাই পান দিল।

দিকগে। অত দেখো না, ধরা পড়ে যাবে।

জুঁই ভ্রূ কুঁচকে বলে, মেয়েছেলেটা কে বলো তো! বউ নাকি?

কে বলবে! তুমিও যা জানো, আমিও তাই।

খুব বলত, আমি মরে গেলে নাকি আর বিয়ে করবে না।

আহা, তুমি তো আর মরে যাওনি!

মরার চেয়ে কম কি? মেয়েমানুষের কতরকম মরণ আছে, জানো?

জুঁই আবার সোজা হয়।

বাঁশগেড়ে এসে গেল বলে। বসে থেকেও বুঝতে পারে দিগম্বর। এইবার নামতে হবে। ভাবতে শরীর হিম হয়ে আসে। মাঝখানে শুধু পাথরগড়ে একটুখানি থামবে। তা সে পাথরগড়েই থামল বোধহয়। কারা যেন নামল সামনের দরজায়। এখানে বেশি লোক নামেও না, ওঠেও না। তাই নামবার তেমন হৈ-চৈ নেই। তবু বোঝা গেল কারা যেন নামছে। খগেনবাবুই কি?

জুঁইয়ের শাড়ি ধরে আবার একটু টান মারে দিগম্বর। জুঁই নিচু হয়।

কি বলছো?

কারা নামল?

কি করে জানবো? কত লোক নামছে উঠছে। কেন?

ওরা কিনা?

জুঁই ফিক করে এই বিপদের সময়ে একটু হাসেও। বলে না। কর্তা বসার জায়গা পেয়েছেন। এদিকে পিছন ফেরানো। ভয় নেই। মেয়েমানুষটাকে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছি না।

দেখতে

দেখি না কিরকম।

ভালই হবে। খগেনবাবুর মেলা পয়সা। ভাল মেয়েছেলেই পাবে। তুমিও তো খারাপ ছিলে না।

আমি তো কালো।

রংটাই কি সব?

জুঁই মুখ গোমড়া করে বলে, কর্তা অবশ্য কোনদিন কালো বলে নি। বরং বলত, মাজা রংই আমার পছন্দ।

এদিকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো। দিগম্বর জিজ্ঞেস করে।

কি জানি।

আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই তো!

না। তবে শ্বশুরবাড়ি হতে পারে।

দূর। এদিকে বিয়ে হলে সে খবর আমি ঠিক পেতাম।

জুঁইয়ের কথা বলায় মন নেই। আবার সোজা হয়ে বসে দেখছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে প্রায়।

এই করতে করতে বাসটা থেমে এল। কণ্ডাক্টর ছোকরা তেজী গলায় চেঁচাল, বাঁশগেড়ে, বাঁশগেড়ে। বাস আর যাবে না।

ঘচাং করে বাসটা থামতেই হুড়ুম দুড়ুম লোক নামতে থাকে। জুঁই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, দিগম্বর হাত ধরে টেনে বলল, দেখেশুনে! দেখেশুনে!

জুঁই হাঁ করে চাইল দিগম্বরের দিকে, যেন চিনতেই পারছে না। চেয়ে থেকে হঠাৎ যেন চেতন হয়ে বলে উঠল, ফর্সা। খুব ফর্সা। বুঝলে!

কে?

বউটা।

হোক না। তাতে তোমার কি?

জুঁই মাথা নেড়ে বলে, কিছু না। বললাম আর কি।

সাবধানে মাথা তোলে দিগম্বর। ভিড়ের প্রথম চোটটা নেমে গেছে। ধীরেসুস্থে খগেনবাবু উঠল। ফর্সা মেয়েছেলেটাও। খগেনবাবু মেয়েছেলেটার কোল থেকে একটা বছর খানেকের খোকাকে নিজের কোলে নিল। বলল, সাবধানে নেমো।

জুঁই প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠল, খোকাটা দেখেছো! কী সুন্দর নাদুস নুদুস!

আর একটু হলেই খগেনবাবু ফিরে তাকাত। ধুতির খুঁটটা সীটের কোণে আটকে যাওয়ায় সেটা ছাড়াচ্ছিল বলে তাকিয়েও তাকাল না। সেই ফাঁকে পিছনের দরজা দিয়ে জুঁইয়ের হাত ধরে টেনে নেমে পড়ে দিগম্বর। বাসের পিছনে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে খিঁচিয়ে ওঠে, তোমার মতবলখানা কী বলো তো! বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেল নাকি?

জুঁই হাঁ করে দিগম্বরের দিকে তাকায়। মেঘলা আকাশের ফ্যাকাশে আলোয় ওর মুখখানা দেখায় যেন ঘোরের মধ্যে আছে। চিনতে পারছে না দিগম্বরকে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চিনতে পারল যেন। বলল, বিয়েই করেছে তাহলে।

করবে না কেন? দুনিয়ায় কে কার জন্য বসে থাকে?

জুঁই মাথা নেড়ে ভালমানুষের মতো বলে, সে অবশ্য ঠিক কথা।

দিগম্বর উঁকি দিয়ে দেখল বহু মানুষ বাঁশের সাঁকো পেরোতে লাইন দিয়েছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তার মধ্যে খগেনবাবু বা সেই ফর্সা মেয়েছেলেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে ধীরে ধীরে দিগম্বর আর জুঁই এগোয়। দেরি হয়ে গেছে। ওপারের বাসে আর বসার জায়গা পাবে না তারা। কিন্তু সে কথা কেউ ভাবছে না।

সাঁকোটা নড়বড় করে দোলে। মেলা লোকের পায়ের চাপে মড়মড় শব্দ উঠেছে। কখন ভাঙে তার ঠিক নেই। খুব সাবধানে জুঁই আগে, দিগম্বর তার পিছু পিছু সাঁকোতে ওঠে। নিচে ভরা বর্ষার খাল গোঁ-গোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে সাঁকো থরথর করে কাঁপে। সবটাই ভালয় ভালয় পেরিয়ে একেবারে জমিতে পা দেওয়ার মুখে জুঁইয়ের পা ফসকাল।

উরে বাবাঃ! বলে টাল্লা খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সামনের দিকে, কিন্তু গায়ে গায়ে মেলাই লোক, পড়বে কোথায়। তাই পড়ল না জুঁই। একজনের পিঠে ধাক্কা খেয়ে সেই পিঠেই হাতের ভর দিয়ে সোজা হয়ে উঠল।

একটা খোঁকা কেঁদে উঠল, হঠাৎ। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, দেখেশুনে চলবে তো মেয়ে! আর একটু হলেই ছেলেটা ছিটকে পড়ত।

জুঁই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিগম্বরের বুক হিম হয়ে যায়। লোকটা খগেনবাবু। কোত্থেকে যে উদয় হল হঠাৎ!

দুজনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবে তার সাধ্য কি? সাঁকোর সরু মুখে ঠেলাঠেলি দৌড়াদৌড়ি। কে আগে যাবে। তাই দুজনকেই এগোতে হল।

সামনেই খগেনবাবু যাচ্ছে। কোলের খোকাটা চুপ করে চেয়ে দেখছে পিছন বাগে।

জুঁই ফিরে চায়। তেমনি ভ্যাবলা আনমনা মুখ। চোখের দৃষ্টিতে যেন সর পড়েছে। কিছু দেখছে না যেন।

কিছু বলছ?

বললাম, কপালটা ভাল। আমাদের চিনতে পারে নি।

বউটাকে দেখলে ভাল করে?

ও আর দেখব কি? রংটাই যা ফর্সা।

জুঁই মাথা নাড়ে, না মুখটাও সুন্দর।

থ্যাবড়া মুখ। তোমার মতো বড় বড় চোখ নয়।

তুমি তো ভয়ে চামচিকে হয়ে আছো, দেখলে কখন?

দেখেছি।

ছাই দেখেছো।

বউটা সুন্দরীই।

আমার চোখে লাগল না।

জুঁই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা। দেখো ওরা মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে যায়। কাঁচা সরু রাস্তায় লোকের ঠেলাঠেলি। বাসটা সামনেই দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে। তার গায়ে লোক গিয়ে পিঁপড়ের মতো জমাট বাঁধছে।

পথ ছেড়ে দুজনে ঘাসজমিতে সরে দাঁড়ায়। দেখে খগেনবাবু কোলে বাচ্চা আর পিছনে বউ নিয়ে মাঠের পথ ধরে পুবমুখো যাচ্ছে।

দিগম্বর বলল, এ জায়গা হল দীঘরে। পুবে গামছাডোবা। গামছাডোবাতেই যাচ্ছে তাহলে।

জুঁই তেমনি আচ্ছন্ন ঘোর ঘোর চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ আস্তে করে বলল, বেশ দেখাচ্ছে না?

বউ বাচ্চা নিয়ে খগেনবাবু মেঘলা আকাশের নিচে মাঠ পেরিয়ে গামছা ডোবায় যাচ্ছে তাতে সুন্দর দেখানোর কি আছে বোঝে না দিগম্বর।

দেরি করলে চলে না। বাস ছাড়বে এখুনি। নলতাপুরে জুঁইয়ের দেড় বছরের মেয়েটা বড় বউয়ের জিম্মায় আছে। বড় বউ আবার বেশিক্ষণ জুঁইয়ের বাচ্চা রাখতে হলে চেঁচামেচি করে। তার নিজেরই তিনটে।

দিগম্বর তাড়া দেয়, চলো চলো। দেরি হচ্ছে।

আঃ, দাঁড়াও না।

দাঁড়াবো! বলো কি? এরপর সেই সাড়ে সাতটায় লাস্ট বাস।

হোকগে।

তার মানে?

জুঁই কথাটা শুনতে পায় না। সামনে আদিগন্ত-খোলা হা-হা করা মাঠে মেঘলা আলোর মধ্যে খগেনবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছে। সাবধানে আল পেরোচ্ছে। বউয়ের হাতে একটা চামড়ার ছোটো সুটকেস।

কণ্ডাক্টর হাঁকাহাঁকি করছে জোর গলায়, নলতাপুর...নলতাপুর...চরণগঙ্গা।

দিগম্বর চেয়ে দেখে, বাসের বাইরে আর লোক পড়ে নেই। যে যেখানে পেরেছে পড়েছে। ছাদে পর্যন্ত।

জুঁইফুল! কি হচ্ছে শুনি। দিগম্বর একটু আদর মিশিয়ে ডাকে।

জুঁই জবাব দেয় না। তবে বড় বড় চোখে তাকায়। এরকম তাকানো কোন কালে দেখে দিগম্বর। আজই কেমনধারা একটু অন্যরকম দেখছে। ভূতে পেলে বোধহয় এমন হয়।

কিছু বলছ? আবার জিজ্ঞেস করে জুঁই। কিন্তু জবাব শোনার আগেই আবার মাঠের দিকে ফিরে চেয়ে দেখে। ফিসফিস করে বলে, সত্যি বলছ চিনতে পারে নি?

বরাতজোর আর কাকে বলে! চিনলে রক্ষে ছিল না। একসময়ে তো খগেনবাবুর চামচাগিরি করতাম।

কিন্তু চিনল না কেন বলো তো!

ভুলে গেছে। মুখটা ভুলে গেছে।

তা কি হয়! আমি তো ভুলিনি। তবে কর্তা ভোলে কি করে?

দেখেইনি ভাল করে!

ধমকাল কিন্তু। মেয়ে বলে ডাকলো।

শুনেছি তো।

এত কাছ থেকে দেখেও না চেনার কথা তো নয়।

তুমিই বা বেছে বেছে ওর ঘাড়ে পড়তে গেলে কেন?

সে কি ইচ্ছে করে? পড়লাম, উঠে বুঝলাম একেবারে কর্তার পিঠের ওপর....ওঃ, গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখ। কতকাল পর...

কি কতকাল পর?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু এই বলে দিচ্ছি তোমায় মেয়েমানুষটা যত ফর্সাই হোক, কর্তার চোখে ও রং ধরবে না।

তাই বা বলছ কি করে?

বলছি, জানি বলেই। কর্তার পছন্দ মাজা রং।

বিরক্ত হয়ে দিগম্বর বলে, না হয় তাই হল। এবার চলো তো। বাস ভেঁপু দিচ্ছে। কণ্ডাক্টর ঐ হাতছানি দিয়ে ডাকতে লেগেছে, দেখ চেয়ে।

দাঁড়াও না। এ বাসটা ছেড়ে দাও। পরের বাসে যাবো।

উরে বাস! বলো কি। সাড়ে সাতটা পর্যন্ত থাকব কোথায়? জল এলে দীঘরেতে মাথা বাঁচানোর জায়গা নেই!

আমি এখন যাবো না। দেখব।

কি দেখবে?

ওরা কতদূর যায়। একদম মিলিয়ে গেলে তবে যাবো।

কিন্তু বাস যে—

তাহলে তুমি একা যাও। আমি একটু দেখি।

বাস তাদের আসা ছেড়ে দিয়ে অবশেষে ছাড়ে। দিগম্বর অবশ্য যায় না। একটা হাই তুলে গাছতলায় গিয়ে বসে বিড়ি ধরায়।

জুঁই মেঘলা আলোর মাঠের দিকে তেমনি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভালোবাসা-ভালোবাসা

তারাপদ রায়

একটি রাস্তায় পাশাপাশি দুই বাড়িতে দু'টি শিশু থাকে। বালক ও বালিকা। বালকটির বয়েস সাত, বালিকাটির বয়েস ছয়।

যেমন হয়, দু'জনার মধ্যে খুব ভাব, একেবারে যাকে বলে গলায় গলায় ভালোবাসা; এ ওকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না, ও একে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না। রীতিমত বাল্যপ্রণয় বলা যায়।

কিন্তু এ প্রণয়েও একদিন ছেদ পড়লো, এই ভালোবাসায় নেমে এলো যবনিকা। মেয়েটির মা দেখলেন তাঁর কন্যার বালকবন্ধুটি আর তাঁদের বাড়িতে আসে না, এমনকি তাঁর মেয়ে ছেলেটির বাড়িতে গেলেও সে তার সঙ্গে খেলতে আসে না, মোটে পাত্তাই দেয় না।

মেয়েটির মা ব্যাপারটা কি জানার জন্যে নিজ থেকে একদিন গেলেন ছেলেটির বাড়িতে, গিয়ে জানতে চাইলেন, 'খোকা, তুমি আর খুকুর সঙ্গে খেলা করো না কেন?'

খোকা কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। তখন মেয়ের মা ছেলের মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওদের দুজনের মধ্যে এত ভাব ভালোবাসা ছিল, হঠাৎ কি হলো?'

ছেলের মা মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'খোকার বাপ ওকে একটা গিনিপিগ কিনে দিয়েছেন। তারপর থেকে খোকা রাতদিন ঐ গিনিপিগ নিয়ে মেতে আছে। এখন আর ভাব ভালোবাসার সময় কোথায় ওর?'

এই গল্পটি আপাতদৃষ্টিতে যতটা হাল্কা মনে হচ্ছে তা হয়তো নয়। ভালোবাসার বদলে গিনিপিগ নিয়ে শুধু ঐ শিশুটিই নয়, আরো অনেকে খেলা করে।

ভালোবাসার অর্থ একেক জনের কাছে একেক রকম। বছর ষাটের আগের কথা। পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণবর্জিত গ্রামের লোকেরা স্থানীয় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সেবাপুজোর জন্যে কলকাতা থেকে এক ব্রাহ্মণ পূজারীকে মাস মাইনেয় ঠিক করে তাঁদের গ্রামে নিয়ে যান।

বছর খানেক বেশ ভালোই গেলো। তারপর একদিনক দেখা গেলো বামুন ঠাকুর বাক্স প্যাঁটরা গোছাচ্ছেন। তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন।

গ্রামের লোকেরা খুব দুঃখিত হলেন। তাঁরা বললেন, 'ঠাকুর আমরা কি অপরাধ করেছি। আপনার মাইনেপত্র সবই তো আমরা ঠিকঠাক সময়মতো দিয়েছি।'

বামুনঠাকুর বললেন, 'মাইনেপত্রের কথা হচ্ছে না। মাইনে তো সব জায়গাতেই দেয়, তোমরাও দিয়েছো। সে জন্যে যাচ্ছি না। যাচ্ছি ভালোবাসার অভাবে, তোমাদের গাঁয়ে যেটার অভাব, সেটা হলো ঐ ভালোবাসার অভাব।'

ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে এই অভাবিত তথা অপ্রত্যাশিত অভিযোগ শুনে গাঁয়ের মানুষেরা তাজ্জব, রীতিমত হতবাক হয়ে গেলো।

তখন ঠাকুরমশায় প্রাঞ্জল করে বললেন, 'দ্যাখো, তোমরা আমাকে ভালোবাসো না। যদি সত্যি ভালোবাসতে তবে এই এক বছরের মধ্যে শুধু মাইনে ছাড়াও অন্তত কলাটা-মুলোটা, ধুতি-চাদর-সোনা-দানা কিছু অবশ্যই কখনো না কখনো দিতে। তা দাওনি। তারপরে তোমরা নিজেদেরও একদম ভালোবাসো না। যদি বাসতে তাহলে এই এক বছরের মধ্যে অন্তত একটা বিয়ে তো হতো, একটা বাচ্চা তো জন্মাতো, আমি তাহলে বিয়েতে বা অন্নপ্রাশনে পুরুতগিরি করে কিছু পেতাম। কিন্তু তাও হলো না।' ঠাকুরমশায়ের এত কথা বলে দম ফুরিয়ে এসেছিলো কিন্তু তখনো তাঁর কিছু বক্তব্য বাকি ছিল এবং সেটা সবচেয়ে ভয়াবহ।

প্রভূত পরিমাণ অক্সিজেন নাক নিয়ে টেনে নিয়ে অতঃপর ঠাকুরমশায় বললেন, 'আর তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা ভগবানও তোমাদের মোটেই ভালোবাসেন না। যদি সত্যিই ভালোবাসতেন তবে নিশ্চয়ই এই এক বছরের মধ্যে তোমাদের দু'একজনাকে নিজের কাছে টেনে নিতেন। তাহলে অন্তত দু'একটা শ্রাদ্ধে যজমানি করে ধুতি, ছাতা, গরু এসব কিছু কিছু পেতাম।'

যদি এখানে বলা যেত যে আমাদের গল্পের এই ব্রাহ্মণ ভালোবাসাহীনতা নামক এক প্রাচীন অসুখে ভুগছিলেন তাহলে খারাপ হতো না। কিন্তু এটা আসল ভালোবাসার গল্প নয়।

ভালোবাসা নিয়ে নিম্নবঙ্গে একটি চলিত কথা আছে।

'আমার তোমার ভালোবাসা
চামারবাড়ি শুয়োর পোষা।'

কথাটা খুবই নির্মম। খাই-দাইয়ে যত্ন করে শূয়োরকে অনেক ভালোবেসে নাদুসনুদুস নধরকান্তি করা হলো সে শুধু যথাসময়ে কেটে খাওয়ার জন্যে।

এমন ভালো লোকের অভাব নেই যাঁরা মনে করেন সব ভালোবাসাই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক, ভালোবাসা ব্যাপারটা এক রকমের ধান্দা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র। আমরা এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের মধ্যে যেতে চাই না। তার চেয়ে আমরা এতক্ষণে আসল ভালোবাসার গল্পে যাই।

প্রথমেই সেই বহু পুরাতন দাম্পত্য প্রেমের দুটি উপাখ্যান বলি।

এক নম্বর উপাখ্যানটি সবারই পরিচিত। বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে স্বামী ক্লান্ত দেহে ইজিচেয়ারে শুয়ে সকালে তিনবার আগাগোড়া পড়া খবরের কাগজটি আবার উল্টে পাল্টে পড়ছেন। স্ত্রী চায়ের পেয়ালা হাতে পতিদেবতার পাশে এসে বসলেন, স্বামী নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালা গ্রহণ করে ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। বলা বাহুল্য, অফিস থেকে ফেরা ইস্তক তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একটা কথাও বলেননি।

অবশেষে স্ত্রী বললেন, 'ওগো, তুমি আমায় আর আগের মত ভালোবাস না কেন? আগে কত কথা বলতে সাধ-আহ্লাদ, ভালোবাসার কথা, এখন আর কিছুই বলো না। এখন আর আমাকে একটুও পছন্দ করো না।'

এই কথা শুনে স্বামী খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'তোমাকে কে বলেছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি না, পছন্দ করি না। এখনো আমি তোমাকে একইরকম ভালোবাসি, শুধু একটা অনুরোধ, ঘ্যানর-ম্যানর না করে চুপ করে থাকো। দয়া করে আমাকে এখন এই খবরের কাগজটা একটু পড়তে দাও।'

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি কিন্তু এর চেয়েও মর্মান্তিক।

রমেশের সঙ্গে রমেশের স্ত্রীর ঝগড়া হয়েছে। রীতিমত সাংঘাতিক ঝগড়া। চুলোচুলি, মারামারি না হলেও অপর্যাপ্ত গালাগাল করেছে দু'জনা দু'জনকে।

রমেশই ঝগড়াটা শুরু করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে রমেশ পারবে কেন? সে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাড়ি থেকে পলায়ন করলো।

ঝগড়াটা হয়েছিল সকালবেলায়। স্নান-খাওয়া না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল রমেশ। ঐ অস্নাত, অভুক্ত অবস্থাতেই অফিস। তারপরে অফিস ভাঙলো, ততক্ষণে রমেশের মনে অনুশোচনা দেখা দিয়েছে, যেটা পুরুষ মানুষদের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা।

রমেশ নিজের মনে মনে ভাবলো, সকালবেলা ঝগড়াটা আরম্ভ না করাই উচিত ছিল। শুধু শুধু ঝগড়া করে দিনটা নষ্ট হলো। অবেশষে অনুতপ্ত রমেশ বাড়িতে ফোন করলো, তার ধারণা তার স্ত্রীও নিশ্চয় একইরকম অনুতপ্ত বোধ করছে।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। 'হ্যালো' বলার পর ফোনের অপর প্রান্তে স্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠে 'হ্যালো' শুনে রমেশ উৎসাহিত হয়ে বললো, 'আমি রমেশ বলছি। আজ রাতে কি রান্না করছো?'

ওদিক থেকে তিক্ত কণ্ঠে জবাব এলো 'বিষ। রাতের জন্যে বিষ রান্না করছি।' এই সুসংবাদ শুনে রমেশ একটু বিচলিত হলো, তারপর বললো, 'ভালোই তো। তবে একজনের জন্যে রান্না করো। আমি রাতে বাসায় খাবো না, বাইরে খেয়ে নেবো। বাসায় যা রান্না করছো তুমি খেয়ে নিয়ো।'

সবেচেয়ে বেশি ভালোবাসার কথা আছে বাইবেলে। পাতার পর পাতা, সূত্রের পর সূত্র শুধু ভালোবাসা আর ভালোবাসা, একে ভালোবাসা, ওকে ভালোবাসা, তাকে ভালোবাসা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে ভালোবাসায় স্তবকমালার কাছে ওমর খৈয়াম তুচ্ছ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি শিশু।

এই বাইবেলীয় ভালোবাসা নিয়ে জি জি চেস্টারটনের একটা রসিকতা মনে পড়ছে।

চেস্টারটন সাহেব বলেছিলেন যে, 'বাইবেল নির্দেশ দিচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসাতে, আবার বাইবেলেই রয়েছে যে শত্রুদের ভালোবাসো।' এই সূত্রে জি কে চেস্টারটন মন্তব্য করেছিলেন, 'আসলে এই দুই জাতের লোকই এক।' অর্থাৎ প্রতিবেশী মাত্রেই শত্রু। সুতরাং প্রতিবেশীদের ভালোবাসলে শত্রুকেই ভালোবাসা হবে।

বাইবেলজড়িত ভালোবাসার একটি শিশুপাঠ্য গল্পও আছে।

একটি বাচ্চা মেয়েকে তার বাবার এক বন্ধু বাসায় এলেই নানা প্রসঙ্গে খ্যাপাতেন। মেয়েটিও খুব চটে যেত, অবশেষে একদিন খুবই চটে গিয়ে সে তার পিতৃবন্ধুকে যা নয় তাই বললো।

গালাগাল শুনে ভদ্রলোক খুব দুঃখিত হলেন, তারপর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, খুব কঠোরভাবে মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি যখন এই সব খারাপ বলছো, তাহলে তোমাকে আর কখনো ভালোবাসবো না।'

একটুও দমিত না হয়ে মেয়েটি বললো, 'তা হবে না। তোমার আমাকে ভালোবাসতেই হবে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন, 'কেন ভালোবাসতে হবে?'

মেয়েটি বললো, 'কারণ বাইবেল বলেছে যে, যে তোমাকে ঘেন্না করে তাকে ভালোবাসবে। আমি তোমাকে ঘেন্না করি তাই তুমি আমাকে ভালোবাসবে।'

ভালোবাসার সঙ্গে ঘৃণা নাকি যৎকিঞ্চিৎ মেশানো থাকে। শুধু ঘৃণা নয়, কিছু রাগ, কিছু ঈর্ষা, কিছু দুঃখ, কিছু বেদনা নিকষ ভালোবাসার সঙ্গে এই সব খাদ মিশিয়ে আসল ভালোবাসা তৈরি হয়।

ইংরেজ কবি উইলিয়াম কাউপার বলেছিলেন, 'তোমাকে তবুও ভালোবাসি, তোমার সমস্ত দোষ সুদ্ধ ভালোবাসি।'

এর অনেক, অনেক পরে বাংলার শেষ পল্লীকবি লিখেছিলেন,

'আমার এর ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,

আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।'

জসীমউদ্দীনই লিখেছিলেন, 'আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি।' তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিতার, সহজিয়া চিন্তার সার্থক উত্তরসুরী।

কিন্তু ভালোবাসা, বৈষ্ণব কবিতা নয়, সহজিয়া প্রেম নয় তার চেয়ে অনেক জাগতিক, অনেক আলাদা। এই তো সেদিন নবীন যুগের নবীন কবি রহস্যভাবে লিখেছিলাম, 'মনীষার ভালোবাসা মাহুতের মতো ছিল উঁচু।' তার আগে কে জানতো ভালোবাসার একটা উচ্চতা।

কাব্য করে কোনো লাভ হচ্ছে না। ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসা বিষয়ক একটা নিরর্থক গল্প দিয়ে এই অমূল্য নিবন্ধ শেষ করি।

মহানগরীর জনপথে এক সুন্দরী মহিলা একলা হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলেন। যথাসময়ে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা টের পেলেন। কিছুক্ষণ এরকম চলার পর ভদ্রমহিলা দাঁড়ালেন, তারপর ভদ্রলোকের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমাকে অনুসরণ করছেন কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'প্রেম? আপনি আমাকে চেনেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তা হয়েতো চিনি না। আমার এই ভালোবাসা খাঁটি। যাকে বলে একেবারে প্রথম দর্শনে ভালোবাসা।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'ও তাই নাকি। কিন্তু আপনি শুধু শুধু আমার প্রেমে পড়লেন কেন? ঠিক আমার পিছনেই আমার ছোটো বোন আসছে, সে আমার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। আমাকে ভালোবাসার আগে তাকে একটু দেখুন।'

এই কথা শুনে ভদ্রলোক স্বভাবতই থমকে দাঁড়ালেন এবং পিছন ফিরে তাকালেন। দুঃখের বিষয়, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখতে পেলেন না, দেখতে পেলেন এক অত্যন্ত কুৎসিৎদর্শনা রমনীকে।

ততক্ষণে সম্মুখবর্তিনী সুন্দরী অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ভদ্রলোক এক ছুটে তাঁর পাশে গেলেন, অনেকটা দৌড়িয়ে তার কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন, হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রমহিলাকে তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনিই কি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন?'

তখনো হাঁপাচ্ছেন ভদ্রলোক, একটু নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন, 'কি মিথ্যে কথা বলেছি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিথ্যে কথা নয়? যদি আপনি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন তাহলে পিছন ফিরে খুঁজতে গেছেন কেন আমার চেয়ে বেশি সুন্দরীকে?'

পুনশ্চঃ একটি খণ্ড নাটিকা।

প্রেমিকা তুমি আমাকে ভালোবাসো?

প্রেমিক: খুব ভালোবাসি।

প্রেমিকা আমি মারা গেলে তুমি কাঁদবে?

প্রেমিক খুব কাঁদবো।

প্রেমিকা একটু কেঁদে দেখাও না।

প্রেমিক : আগে একটু মরে দেখাও না।

চেয়ার

বুদ্ধদেব গুহ

হুঁসস্ চেয়ারটা এত আন-কমফরটেবল্ যে বলার নয়!

রাজেন সেন সাইড-টেবল থেকে পোরসিলীনের সুদৃশ্য ডাবর তুলে পানের পিক ফেলে জর্দার গন্ধ ছড়ালেন।

তাঁর সামনে তখন গজেন আর রাধু বসেছিল। তারা সমস্বরে বলে উঠল, আরাম পান না বুঝি? বসে?

রাজেন সেন মিচকি হাসলেন একটু।

বললেন, সব কিছুতে বসেই কি আরাম হয়? না সব কিছুতে চড়ে? কি হে?

কথাটার মধ্যে অশালীনতা ছিল। কিন্তু রাজেন সেন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যাক্তি। এমনই একটা পদে তাঁর অধিষ্ঠান যে তিনি যে ভুল বা অন্যায় বা অশালীন কিছু করতে বা বলতে আদৌ পারেন এ ধারণাটাই তাঁর মোসাহেবরাই তাঁর মস্তিস্ক থেকে মুছে দিয়েছে। তাঁর নিজের মনেও এমনই ধারণা জন্মে গেছে অনবধানে যে তাঁর মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ পৃথিবীতে আর দুটি নেই। যে কোনো ব্যাপারেই তাঁর বিচারটাই শেষ বিচার। তাঁর মতটাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মত। তাঁর মত সৎ, মহৎ, পক্ষপাতিত্বহীন ভদ্র ব্যাক্তিও আর নেই; তাঁর নিজের মতো। টেলিভিশানের দৌলতে, যে-বিষয়ে চর্চা করে তাঁর রুজিরোজগার, সে বিষয় ছাড়াও দুনিয়ার তাবৎ বিষয়েই তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য জন্মে গেছে, তাঁর নিজের মতে। সঙ্গীত, সাহিত্য, ফুটবল, ক্রিকেট, শিল্পকলা, কুস্তী এমনকি জুডোও এখন তাঁর 'পাণ্ডিত্যের' বিষয়। কিং ক্যানুটের মতো তিনি যাইই মনে করেন তাইই ধ্রুব ও অভ্রান্ত বলে মনে করেন। তাঁর টেবিলের সামনে তাঁকে ঘিরে বসে-থাকা নিরন্তর স্তবকারী কৃপাপ্রার্থী স্তাবকের দল। তাদের দল বদলায়, বয়স বদলায়; রঙ বদলায় কিন্তু উঁচু চেয়ারে আসীন সেন সাহেব একটুও বদলান না। বদলাননি গত কুড়ি বছরে তাঁর নিজের মতে।

সূর্যও ইদানীং রাজেন সেনের কথাতেই ওঠে এবং ডোবে। রাজেন সেনের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবহিত না থেকেও।

বেচারী সূর্য!

রামু একটা ফাইল নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'কি এটা?'

'বাজেট।'

'রেখে যাও।' বিরক্ত গলায় বললেন সেনসাহেব। অফিসের কাজ ছাড়া আর সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর উৎসাহ। অফিসের কাজ তিনি দয়া করেই করেন।

স্যার! বড়সাহেব বলেছেন এটা আজই দেখে, বিকেলে ওঁকে ফেরত দিতে। খুব জরুরী।

রামু চলে যেতেই ইন্টারকম্ পিঁ-পিঁ করে উঠল।

পূর্ববাংলার সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্কহীন রাজেন সেন ঠাট্টা করে বললেন, হালায় কয় কি?

টেবিলের উল্টোদিকে বসা গজেন আর রাধু সেনসাহেবের গভীর ও বিস্ময়কর সেন্স অফ হিউমার অ্যাপ্রিসিয়েট করে হো হো করে হেসে উঠল। মোসাহেবদের অ্যাপ্রিসিয়েসনের কোনো ডিপ্রিসিয়েশান্ নেই।

সেন্সাহেব ইন্টারকম্-এর সুইচ্ টিপে রিসিভার তুলে নিলেন। এক মুহূর্তে শুনলেন। বললেন, আই সী! ঠিক আছে। বুঝেছি। বলেই, ফোন নামিয়ে রেখে বিরক্ত গলায় ওদের শুনিয়ে বললেন, ফুঃ! বাজেট!

গজেন ও রাধু আবারও হাসল। ওদের মুখের ভাব, রাম-ভক্ত হনুমানের মুখের ভাবের মতই স্থির। উজ্জ্বল প্রশস্তির সুরে বাঁধা তাদের মুখচ্ছবি।

অ্যান্ একসারসাইজ্ ইন আটার ফিউটিলিটি!

সেনসাহেব বললেন।

কি? কেন?

কি আবার? গুজু হালদারের পি এ ফোন করেছিল। এই বাজেট-ফাজেট। প্রতি বছরই তো পরে ভ্যারিয়েশনের ঠেলায় অস্থির। তবে আর এত দামামা-ডংকা কেন? আসলে, বুঝলে, এই ডিক্টেটর কোম্পানীতে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। মালিকের মন যারা রাখতে পারে তারা রাখুক। আমার কোয়ালিফিকেশান আছে। আমি দয়া করে এই চেয়ারে বসে আছি তাই। আমার কিসের কেয়ার?

ইন্টারকম্ আবার পিঁ-পিঁ করল। রিসিভারটা তুলেই রাজেন সেনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল। গলার স্বর চিলের বাচ্চার মত সরু হয়ে গেল। চিঁচিঁ করে বললেন, না, না, কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, পেয়েছি। হ্যাঁ! হ্যাঁ! দরকার হলে রাত দশটা অবধিও থাকব। বাজেট্ তো আর রোজ পাস হবে না। না, না, আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান স্যার। আমরা তো আছিই। আমরা আছি কি করতে?

কথা বলতে বলতে সেনসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে।

ওঁর দিকে তাকিয়ে রাধু আর গজেনের মুখ মুহূর্তে ম্লান হয়ে এল, মোসাহেবীতে সেনসাহেব যে তাদের চেয়েও বড়, তা দেখে। সেনসাহেব উঠে দাঁড়াতে তাঁরাও উঠে দাঁড়ালেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে, নিজেও বসে পড়ে উত্তেজিত মুখে সেনসাহেব বললেন, গুজু হালদার! বলেই বললেন আরে, আমি তো দয়া করেই আছি এখানে। যেখানে স্বাধীন মতামতের দাম নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাম নেই, সেখানে আমার মতো বর্ণ-ফ্রী মানুষ চাকরি করতে পারে না। ভাবছি, কোনো খবরের কাগজে জয়েন করব। সেখানে তো রিপোর্টার সম্পাদকরাই সব। মালিকরা কোনো ব্যাপারেই ইন্টারফেয়ার করেন না। অবাধ, পূর্ণ স্বাধীনতা! এখানে আমি একেবারেই মিস্‌ফিট। আরে এই তো সেদিনই, এস.পি.আই. কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা...

কোথায় স্যার? ক্যালকাটা ক্লাবে?

দুস্‌স্-স্‌স্‌স্। ক্লাব-ফ্ল্যাবে আমি যাই না। ল্যান্সডাউন মার্কেটে গেছি, দেখি উনি কুচোট্যাংরা কিনছেন। আমিও যা ভালোবাসি; উনিও তাই-ই। একেই বলে র‍্যাঁপো, বুয়েচো! না বাবাঃ। বলব না তোমাদের। শেষে পাঁচকান হয়ে যাবে! আমার শত্রুর তো আর অভাব নেই।

আমরা কাউকে বলব না স্যার।

প্রমিস্?

কিন্ডারগার্টেনের ছেলের মতো মুখ করে বললেন।

প্রমিস্।

এই গুজু হালদারের কোম্পানীতে যা পাচ্ছি তার তিন গুণ। প্লাস পার্কস। বুয়েচো? কি বুজলে?

তাইই বলে সত্যিই চলে যাবেন না কি স্যার? আমরা সকলে যে তাহলে রেফ্যুজী হয়ে যাব।

ন্-না-না। তোমাদের ভয় নেই। ডান হাত তুলে অভয় দিলেন। যাবো না। কিন্তু আর কখনও আমার সামনে ঐ রেফ্যুজী কথাটা উচ্চারণ করবে না। সোনার শহরটার কী হাল করে দিল্যেরা শালারা! মরতে আসার আর জায়গা পেলি না? আমার মামাশ্বশুরের পেনেটির বাগানবাড়িটা জবরদখল করে নিলে। সকলেরই নাকি জমিদারি ছেল সেখানে। জমিদারের পোইই বটে সব।

সেনসাহেবের এখনকার বাড়ি বর্ধমানে। অনেক পুরুষ আগে পূর্ব-বাংলা ছেড়ে, পাটনাতে প্রবাসী হন। তিনপুরুষ হল বর্ধমানেই। রাজেন আর রাধু পশ্চিমবঙ্গীয় হয়েও হতভাগ্য রাজনীতি-কবলিত নিরুপায় উদ্বাস্তুদের জন্যে যতখানি সহানুভূতি রাখে সেনসাহেব সেটুকুও রাখেন না।

সেনসাহেব একটু নড়ে বসলেন চেয়ারে। উ হু হু। কি রে, এ যে কাঁটা বেরিয়ে গেছে। দেকেচো! গোরা বাগটা চুরি করে দিলে ফাঁক করে। কত টাকা ঝেড়েছে শুধু এই চেয়ার সাপ্লাইয়ের ডীলে তাইই বা কে জানে? চেয়ার তো আর অফিসে কম নেই। সবসুদ্ধ দেড়শ দু'শো তো হবেই! তারপরই বললেন, যা-ক্ এই চেয়ারটার আসল দামই বা কি? আমি যতদিন এই চেয়ারে আছি, রিটায়ার না করছি, ততদিনই দাম। তাছাড়া গুজু হালদারের অফিসে রিটায়ার তো কেউ করে না। চেয়ারে একেবারে জম্পেস্ করে বসে পড়লেই হল! চেয়ার তো হয় কাঠের, নয় লোহার, নয় ফাইবার গ্লাসেরই! গদীও হয় কতরকম। চেয়ারে কি এসে যায়। চেয়ারে যে বসে থাকে, সেইই আসল। চেয়ার তো স্রেফ্ জড় পদার্থ।

গজেন বলল, ঠিক বলেছেন স্যার। দ্যা পার্সন্ গ্লোরিফাইজ্ দ্যা চেয়ার, হু সীটস্ অন ইট: চেয়ারের নিজের দাম কি? ঠিকই বলেছেন।

রাজেন সেন চোখ দুটি ছোটো করে হেসে বললেন, আমি জেনারেলী ঠিকই বলে থাকি।

রাধু বলল, ঠিক্ ঠিক্। টিক্‌টিকির মত।

ঠিক সেই সময়ই বিমল ব্যানার্জী কাঁচের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ওর পেছনে পেছনে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের শৈলেন। মাস কয়েক আগে একটি প্রেস্ কনফারেন্সে গুজু হালদারের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক কিছু মন্তব্য করাতে, গুজু হালদার বিমলকে একেবারেই পুতুল করে রেখেছেন। ও কোম্পানীর প্রজেক্ট ম্যানেজার। কিন্তু ওকে কোনোরকম কাজই না করতে দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়েছেন ম্যানেজমেন্ট। মাইনে পাচ্ছে, গাড়ি পাচ্ছে, পার্কস পাচ্ছে, পাচ্ছে না কেবল কাজ। বাইরের কনসালটেন্সী ফার্মকে সেই কাজের ভার দিয়ে বিপুল অর্থহানি সত্ত্বেও গুজু হালদার বিমলকে বসিয়ে রেখেছেন। এ অফিসে বিমলের যারা বন্ধু, তারা ওর আড়ালে বলছে; কী হিউমিলিয়েটিং অবস্থা! ওর কি একটুও সেল্ফ-রেস্পেক্ট নেই?

ওর শত্রুরা বলছে, খুব তেল হয়েছিল। এফ. এম. একেবারে মাথায় করে রেখেছিলেন তো এতদিন! ভেবেছিল, কী বুঝি হনু! চাকরীটা এখন ছাড়ছিস না কেন? যার খাবি, যার পরবি, তারই

মাথায় ডাণ্ডা মারবি এ কেমন সততা? টাইট হয়েছে এবারে।

কি খবর? বিমল? পান চলবে নাকি একটা?

পান ভদ্রলোক খায় না। ওটা নির্বুদ্ধি আর ব্রাউজারদের খাদ্য। অবশ্য তুমি দাদা এক্সেপ্শান। পান খাও অথচ সাহেব; তুমিই একা।

খুক্ খুক্ করে হাসলেন একটু রাজেন সেন। রাধুর সাদা টেরীলিনের জামায় পানের সূক্ষ্ম পিচ্‌কিরির পিক্ আল্‌পিনের মত গিয়ে বিঁধল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। লাল হয়ে গেল জায়গাটা। রাধু দেখল।

ছরী। পান মুখেই বললেন সেনসাহেব।

না, না, ঠিক আছে স্যার। রাধু বলল, সবিনয়ে।

কি খবর বল বিমল?

বিমল বলল, খবর এখন নেই। তবে, তৈরী করব। আমরা দুজনে। গুঁড়িয়ে ফেলব, ভেঙে ফেলব, এই এসটাব্লিশমেন্টের মনোপলিস্টিক অ্যাটিচিউড্‌স। অসহ্য!

বিমলের ইংরেজী উচ্চারণ ভালো। গভীরতা না থাকলেও বিদেশী বইয়ের জ্যাকেট-নির্ভর অল্প-জ্ঞানের জলে পুঁটি মাছের ছর্‌ছরিয়ে সাঁতার কাটার মতই তার চতুর্দিকে জ্ঞানের জল ছেটানোর অভ্যেস আছে। তাছাড়া, আর্টফিল্ম-টিল্মও দেখে। বিমল হচ্ছে, যাকে বলে, "লা আঁতেল।"

শৈলেন নস্যির কৌটো বের করে, সবে নস্যি নেবার তোড়জোড় করছিল। বিমলের বক্তৃতা শুনে হঠাৎ বলে উঠল, আপনার জায়গায় আমি হলে অনেকদিন আগেই রেজিগ্‌নেশান দিতাম। আমার আত্মসম্মানে লাগত। ও বালাই বোধহয় আপনার নেই। আমার কেন, অনেকেরই নেই। আপনি মানুষ হলে অনেকদিন আগেই চাকরি ছেড়ে দিতেন।

বিমল একটু লজ্জা পেল। যদিও লজ্জা ব্যাপারটা ওর চরিত্রে নেই। শৈলেনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, আরে ছাড়ব যখন তখন গুজু হালদারের গদী টলিয়ে দিয়েই ছেড়ে চলে যাব। "আই উইল গো উইথ আ ব্যাঙ্গ, নট উইথ আ হুইমপার।" মাথা নীচু করে বেরিয়ে যাবার লোক আমি নই। অপমান আমি কখনই সহ্য করব না। গুজু হালদার অপমান করবে বিমল ব্যানার্জীকে, তা চলবে না। আরে তার পয়সা থাকতে পারে, তাকে চেনেটা কে? আমার মতো তার পরিচয়? সভা-সমিতি, চেম্বার অফ কমার্সে কাকে লোকে চেনে? তাকে? না আমাকে?

হ্যাঁচ্চো! করে হাঁচল শৈলেন।

নস্যির গন্ধে ঘর ভরে গেল। বলল, অপমানের আপনার আর বাকিই বা কি আছে? তাছাড়া এত যে তড়পাচ্ছেন সবই ফালতু। আপনাকে সবাই-ই গুজু হালদারের চাকর বলেই জানে। আপনি যাইই ভাবুন। এয়ারকন্ডিশানড্ ঘরে উঁচু চেয়ারে বসে আপনার মত যারা কাজ করে তারাও চাকর আর যে বাসন মাজে, খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ায় সেও-ও একইরকম চাকর। মিথ্যে বড়াই কেন করেন? মানুষ হলে চাকরি ছাড়তেন। আপনি মানুষই নন। সেনসাহেবের ঘর বলে বেশি কিছু বললাম না। স্যার রাগ করবেন। নইলে...

বিমল, সুর নরম করে বলল, তুমি বুঝবে কি? ব্যাচেলার, কোন্ দায়িত্ব কর্তব্যটা আছে তোমার? গড়িয়াতে বাড়িটা সবে আরম্ভ করেছি। ছেলেপুলে থাকলে বুঝতে সংগ্রাম করা কি কঠিন। আমাদের মত নামী, যশস্বী কাজের লোকদেরই তো এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অপদার্থ তোষামুদে

চাকর বানিয়ে দেয়। কাজটাজ তো প্রায় ভুলেই গেছি বাঁদর নেচে নেচে। এখন ঝপ্ করে হঠাৎ এতগুলো টাকা মাসে মাসে বন্ধ হয়ে গেলে যে বউ-বাচ্চা নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া গাড়িটা! গাড়িটা ছাড়া বারাক্‌পুরের ভাড়া বাড়ি থেকে গড়িয়াতে গিয়ে বাড়ি শেষ করা অসম্ভব। বাড়িটা শেষ করে তারপর শেখাব গুজু হালদারকে। ঝপ্ করে টাকা বন্ধ হলে...

শৈলেন বলল, তাহলে ঝপ্ করে মালিকের কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে নাও। নিমকহারামী মহাপাপ। হয় ঝপ্ করে চাকরি ছাড়ো নয় ঝপ্ করে ক্ষমা চাও। যারা বিদ্রোহ আর স্বাধীনতার বুকনি ঝাড়ে, তাদের বউ-বাচ্চা, গড়িয়ার বাড়ির চিন্তা মানায় না।

রাজেন সেন ইন্টারপট্ করে বললেন, শৈলেন, তুমি চুপ করো। বড় বাড়াবাড়ি করছ। কিছুই না বুঝে কথা বলাটা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি মনে করো তুমি একাই সব বোঝো।

সঙ্গে সঙ্গে গজেন আর রাধু সেনসাহেবকে সাপোর্ট করে, শৈলনের দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক হাসি হাসল। হুঁ! হুঁ! হিঁ! হিঁ!

বিমল ব্যানার্জী এবারে জোর পেয়ে বলল, আরে ভারী তো কাজ তোমার! লেখো তো তুমি খতিয়ান আর করো তো মালিকের দালালী। 'মনোপলী' কথাটার মানে বোঝো?

বি-কম এ পড়েছিলাম।

নস্যির কৌটোটা নাড়াচাড়া করতে করতে শৈলেন বলল।

"রানেশাঁ?" "অ্যান্টি এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাকটিভিটি"? বোঝো?

শৈলেন দমবার পাত্র নয়। নাক থেকে নস্যি ঝেড়ে নোংরা রুমালে তাড়াতাড়ি মুড়ে সে বলল, রাখুন তো মশাই! হরজাই-খাতে কথাটার মানে জানেন আপনি? নাজাই-খাতে কাকে বলে জানেন? ব্রেক-ইভিন্ পয়েন্ট? বেশি জার্গন্ ঝাড়বেন না। জার্গনস্ সব লাইনেই থাকে। আমিও ঝাড়তে পারি।

সেনসাহেব এবারে ভেটো প্রয়োগ করলেন। বললেন, শৈলেন, বিহেভ ইওরসেল্ফ! সিনীয়র লোকেদের দাদা বলে ডাকো বলেই মনে কোরোনা যে, যা খুশী তাই-ই বলতে পারো। রেসপেক্ট দেবে। অফিসে একটা ডিসিপ্লিন, ডেকোরাম রাখবে। এটা কাজের জায়গা। 'স্যার' বলে অ্যাড্রেস করবে সিনিয়রদের।

২

তাঁর চেয়ারে, সেনসাহেব একা ঘরে। এয়ারকন্ডিশানটা মৃদু ফিস্‌ফিস্ শব্দ করছে। এই জড়পদার্থ চেয়ারটার জন্যে মাঝে মাঝেই দুঃখ হয় ওঁর। উনি যখন থাকবেন না, একজন গবেট, আন্‌স্মার্ট, ইডিয়ট মার্কা লোক এসে বসবে এই চেয়ারে। অধীর রায়।

কাজকর্মের কিস্‌সুই বোঝে না। ড্যাশ নেই, পুশ নেই; পার্সোনালিটি নেই। অন্য কোনো বিষয়েও কোনো ইন্টারেস্ট নেই। একটা ফাইল-ওয়ার্ম। এই চেয়াটাকে উনি বিশেষ ইজ্জত দান করেছিলেন। লোকটা একেবারে বেইজ্জত করবে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। অপারেটর বলল, গুড আফটারনুন স্যার।

"মর্নিং-এ" কখনও অফিসে আসেনি সেনসাহেব। তিনি যে দয়া করে অফিসে আসেন এই-ই গুজু হালদারের সৌভাগ্য। ওঁর যে কী এলেম, কত গভীর প্রতিভা, তার কীই বা বোঝে ঐসব ক্যাপিটালিস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা। তিনি যখনই আসুন আর দয়া করে যতটুকু কাজই করুন তাতেই

তো মালিকপক্ষ কৃতার্থ। তা নইলে তো কবেই বলতে পারতেন তাঁরা; "এবারে আসুন।" উনি তো আর লেবারার নন যে, ইউনিয়ন ওঁকে বাঁচাবে। উনি কারোরই দয়া কোনোদিন চাননি। নিজের যোগ্যতা, মেধা, পভীর অন্তর্দৃষ্টির জোরেই আইসকাটারের মত এসটাব্লিশমেন্টের বরফ কেটে একাই চলেছেন সাফল্যের উত্তরমেরুর দিকে। তাঁর নিঃশব্দ নীরব গতির একমাত্র সাক্ষী বিমল ব্যানার্জী। ও একটা গ্রেট ইনটেলেকচুয়াল। স্বাধীনচেতা মানুষ। এসব ব্যাপার বোঝে এমন মানসিকতার মানুষ এই কোম্পানীতে বেশি নেই।

গুড আফটারনুন। ডাঃ সাধুখানকে দিন তো।

কে?

ডাঃ সাধুখান। হ্যালো। কথা বলছি।

এই যে পিকু। তোমার বৌদির একটু জ্বরভাব হয়েছে। একবার আসবে?

এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার। বৌদি বাড়িতে আছেন তো?

আছেন। তবে এই ভর দুপুরে তোমার মত সুপুরুষের আমার সুন্দরী স্ত্রীর কাছে একা না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সন্ধেবেলা এসো। আমি থাকব।

আচ্ছা স্যার। হেসে বললেন ডাঃ সাধুখান।

তারপর বললেন, স্যার, আপনার অন্তর আর মেধার যে গভীর সৌন্দর্য দিয়ে বৌদিকে মোহিত করে রেখেছেন সেই সৌন্দর্যের মোকাবিলা কি আমার শারীরিক সৌন্দর্য কখনও করতে পারে? যাব। নিশ্চয়ই যাব।

আবার ফোন তুললেন। মিহির ঘোষকে দিন।

অ্যাই যে! তুমি যে খবরই নাও না কোনো। ব্যাপার কি?

বড় ব্যস্ত ছিলাম স্যার।

আরে, আমি এই চেয়ারে আছি বলেই না তোমার ব্যস্ততা। ব্যস্ততা দেখাচ্চো কার কাছে? তোমার সব ব্যস্ততা নিবিয়ে দিতে পারি আমার হাতের পাঁচ।

আপনি খুব রেগে গেছেন মনে হচ্ছে।

ভয়-পাওয়া গলায় মিহির ঘোষ বললেন।

বলুন স্যার, কী করতে পারি আপনার জন্যে?

শোনো। উনিশে আমার ছোট শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন।

বুঝেছি। মাছ তো? কি মাছ এবং কোয়ান্টিটি বলুন। সময়মত পৌঁছে যাবে।

রুই। পাকা। তিরিশ কে-জি।

ওক্কে।

পাবদা। টাটকা। মাঝারী। তিরিশ কে-জি।

ওক্কে! মাত্র তিরিশ কেজি?

ওতেই হবে।

একটা কথা বলি স্যার? কিছু তপ্‌সে পাঠাই। ফ্রাই জমবে ভালো। আফ্‌টার অল্ আপনার শালীর মেয়ের অন্নপ্রাশন! ভি আই পি-রা আসবেন। আপনার ইজ্জত তো রাখা চাই।

আমার ইজ্জত-এর ভার তোমার হাতে নেই। আমার ইজ্জত আমাকে অর্জন করতে হয়েছে মিহির। জীবনে সবকিছুই লড়ে নিতে হয়েছে। আমার জন্মদিন শনিবার। 'স্যাটারডেজ চাইল্ড হ্যাজ

টু ওয়ার্ক হার্ড ফর আ লিভিং"। গল্‌দা চিংড়ি হবে?

এ কি বলছেন স্যার? আপনার জন্যে তিমি মাছও যোগাড় করে দেব। চিংড়ি তো পোকা মাত্র। একেবারে ড্রেস-ট্রেস করে পাঠাব। কি হবে? মেয়োনীজ না কালিয়া।

কালিয়া।

কত পাঠাব?

তিরিশ কেজি।

সবই যাবে! তবে একটা প্রার্থনা আছে স্যার। দাম কিন্তু নিতে পারব না।

ঠিক আছে। প্রেয়ার গ্রান্টেড। কখন পাঠাবে?

সকাল সাতটার মধ্যে।

শোনো, কিছু মিষ্টির বন্দোবস্ত করতে পারো?

স্যার, আপনি বললে বাঘের দুধেরও বন্দোবস্ত করতে পারি।

বাঘের দুধ আমি বিনা পয়সাতে পেলেও খাই না। মিষ্টি হলেই চলবে।

জলযোগ? গাঙ্গুরাম? তিওয়ারী? না গুপ্ত ব্রাদার্স? কার মিষ্টি?

যার যেটা ভালো হয়।

আইটেম বলুন।

তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। এমন পাঠাবে যে, লোকে যেন আহা! আহা! করে। চারশো লোকের মত। ঠিক আছে? ছাড়লাম।

ফোন নামিয়ে নিরুচ্চারে বললেন, ন্যাকা! পয়সা নিতে পারব না স্যার! পয়সাই দেব তো তোকে বলব কেন?

ডাইরেক্টরী বার করে দেখলেন। এখন ডেকরেটর, ফুল আর পানের বন্দোবস্ত করতে হবে। এবং গাড়িরও। কাজের বাড়ি। গোটা তিনেক গাড়ি দুদিনের জন্য লাগবে। নেমন্তন্ন করার জন্যে। আবার কাজের দিনও।

গজেন ঘরে ঢুকল উল্লসিত হয়ে।

বলল, হয়ে গেল স্যার।

কি?

বিরক্ত গলায় সেনসাহেব বললেন।

এখনও অনেক ফোন করা বাকি। এই শালী তাঁর বিশেষ প্রিয়। শালীর বিয়ের আগে একদিন বৃষ্টির দিনে সিনেমা দেখে ফেরবার সময় গাড়িতে চুমু খেয়েছিলেন। পরশটা এখনও ঠোঁটে লেগে আছে যেন!

গাভাস্‌কারের টুয়েন্টিনাইনথ্ সেঞ্চুরি হয়ে গেল স্যার।

মুখোজ্জ্বল হল সেনসাহেবের। গাভাস্‌কারের কথা না তুলেই বললেন, এই একটা খেলা, আমার বিশেষ প্রিয়। দ্যাখো, তোমরা বলেছিলে যে, হবে না। ছোকরাটাকে তোমরা কম অপমান করেছ?

জীবনে সেনসাহেব চোর-চোর আর ডাংগুলি ছাড়া কিছুই খেলেননি। বটতলার বই এবং কোকশাস্ত্র ছাড়া কিছুই পড়েন নি। কিন্তু তিনি আজ যে পজিশানে আছেন, সে পজিশানে তাঁর সর্বজ্ঞ না হয়ে কোনোই উপায় নেই। উনি না হতে চাইলেও ওঁর কৃপাপ্রার্থীরা করিয়েই ছাড়বে।

বিনা চেষ্টাতেই তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে গেছেন। এবং সকলেই তাঁকে সর্বজ্ঞ বলে নির্বিবাদে মেনেও নিয়েছে।

রাধু ঢুকল। হাতে পুজো সংখ্যা নবকল্লোল। পড়েছেন? উপন্যাস? সমরেশ বসুর? জুতো, স্যার জুতো!

বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে সেনসাহেব বললেন, রাম্বা-সাম্বার লেখক তো?

অলমোস্ট! তবে; সাম্বা নয়, শাম্ব। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড উইনার।

ঐ হল। যে লেখার কথা বললে, তাও পড়ে দেখেছি! তবে, এক্ষুনি অ্যানালীটিক্যাল ক্রিটিজিম্ করতে ইচ্ছে করছে না। গা-টা বড় ম্যাজম্যাজ করছে হে।

স্যার, আমার বাড়িতে আগামী শনিবার ঝুনঝুন্ সেন আসবেন। রেডিওর সোনালী চ্যাটার্জী, এমন কি দুর্যোধন দাঁ ও গুগগুল গাঙ্গুলি। সাহিত্য-সঙ্গীত-আবৃত্তির সন্ধ্যা। আপনাকে কিছু বলতেই হবে। এবং সভাপতিত্বও করতে হবে।

বলছ?

বলছি কি স্যার? আপনার নাম করেই তো সকলকে একসঙ্গে করা, নাইলে এই অধমের বাড়িতে কি ওঁরা কেউ আসতেন। সেলিব্রেটিজ সব।

তাহলে আমার ছোট মেয়ের একটা নাচের আইটেমও জুড়ে দাও। দারুণ নাচে। অসম্ভব ট্যালেন্টেড্।

নো ওয়াণ্ডার স্যার। লাইক ফাদার লাইক ডটার। দারুণ হবে। তা কি নাচ নাচেন আপনার ছোট মেয়ে? কত্থক না ওড়িশী না ভরতনাট্যম্ না রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্যর নাচ? কি? তবলচি, সারেঙ্গীওয়ালার যোগাড় রাখব তো?

না, না, ওসব গর্জাস ব্যাপারের মধ্যে ও নেই। পপ্-সংগ্স্-এর সঙ্গেই ও নাচে! অনেকেই সুবিধে। হাটে, মাঠেও নাচা যায়। গান রেকর্ড করা আছে টেপ্-এ। টেপ্ বাজিয়েই ও নাচবে। একটু শুধু সাইকেডেলিক আলোর বন্দোবস্ত রেখো। তা ওঁরা কিছু মনে করবেন না তো?

কী যে বলেন স্যার। ভালো মাল খাওয়ালে ওঁরা নরকেও যেতে রাজী।

কোনো চিন্তা নেই। দারুণ লোককে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে আসব। দেখবেন, কী এফেক্ট হবে। পপ্-ডান্সের পরিবেশের জন্যে আইডিয়াল!

ক'টার সময় যেতে হবে। তোমার বাড়ি তো আমি চিনি না।

আপনি স্যার কি করে চিনবেন? অলি-গলিতে তো আপনার যাওয়ার কথা নয়। আমিই গাড়ির বন্দোবস্ত করে আপনাকে নিয়ে আসব। বৌদি, থুড়ি মেমসাহেব কি আসবেন? এলে, আমরা সকলেই ধন্য হই। রাতে আমার ওখানেই দুটি ডাল-ভাত খেয়ে যাবেন।

উনি, মানে, আমার মিসেস, আমার মত অতটা সোস্যাল নন। তাছাড়া, সেদিন ওঁর নীলের উপোসও আছে। আসতে পারলে ভালোই হত। মেয়ের নাচের সঙ্গে উনি তালি বাজান।

কি বাজান?

তালি।

অ। তাহলে আর কি করা যাবে। কিন্তু তালি বাজাবার লোকের অভাব হবে না স্যার। তালি বাজাবার লোক অনেক আছে।

৩

প্রায় মাসখানেক হলো রাজেন সেন রিটায়ার করে গেছেন। ভেবেছিলেন, এক্সটেন্‌শান পাবেনই। সেলস-এর সান্যাল, মেনটেন্যান্সের ঘোষাল তো এক্সটেনশানের পর এক্সটেনশান্ পেয়ে ষাট পার করে দিল। এই কোম্পানীতে সীনিয়র পোস্ট এক্সটেন্‌শান্‌টা একটা "ম্যাটার অফ্ কোর্স" হয়ে গেছিল। এবং একটা ম্যাটার অফ রাইটও বটে! এক্সটেন্‌শানটা পাবার পরই একবার ফরেনে যাবেন ভেবেছিলেন। নইলে আজকাল 'স্ট্যাটাস' হয় না। সবই ভেস্তে গেল। এ একেবারে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু! হালদার যে অপ্রস্তুত তাঁকে এমন নিঃশব্দে ল্যাং মারবেন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেননি। উনি ছাড়া ওঁর ডিপার্টমেন্ট কি করে চলে দেখতে খুব ইচ্ছা করে ওঁর। উনি ভেবেছিলেন, ওঁকে এক্সটেনশান্ না-দেওয়াতে ওঁর সাবর্ডিনেট স্টাফ গজেন, রাধু এবং অন্যান্য অনেকেই পেন-ডাউন স্ট্রাইক করবে প্রতিবাদে। সাপ্লায়াররাও রিপ্রেজেনটেশন দেবে।

ভেবেছিলেন।

আশ্চর্য।

কেউই ট্যাঁ-ফোঁ করল না!

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেয়েছিলেন ডাকে। নিচে লেখা, "আপনার অনুগত অধস্তন কর্মচারিবৃন্দ।" হাতের লেখাটা চেনেন না। কাউকে দিয়ে লিখিয়ে থাকবে। এই এরাই তাঁকে অনেক ভাল ভাল কথা আর্টিস্টকে দিয়ে লিখিয়ে বাঁধিয়ে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিল যেদিন রিটায়ার করেন সেদিন। চিঠিটা খুব বড় নয়, তবে প্রচন্ড ডিস্‌টার্বিং। এবং নিষ্ঠুর।

রাজেন সেন খচ্চর-শ্রেষ্ঠ,

যে ক'বছর ছিলে অনেকেই জ্বালিয়েছো আমাদের। রিটায়ার করেছো। এবার মরলে বাঁচি। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমরা তোমাকে চিনব না পর্যন্ত। তোমার একতরফা জ্ঞানের বুক্‌নি আর যে সহ্য করতে হবে না আমাদের এই ভেবেই খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি যে কী একখানি মাল এবং তুমি যে কোন ব্যবহারের যোগ্য তা নিশ্চয়ই চেয়ার ছাড়ার পর থেকেই বুঝতে আরম্ভ করেছো। না-বুঝে থাকলে বুঝবে। শনৈঃ শনৈঃ।

আমাদের সমবেত প্রার্থনা এইই যে, তুমি এবার টেসে যাও। তুমি যে কত বড় কাজের লোক, কত বড় খেলোয়াড়, কবি, গায়ক, ফিলসফার এবার তা তোমার বেচারী স্ত্রী এবং তোমার পাড়ার কাকদেরই বুঝিও।

সব ভালো, যার শেষ ভালো। তোমার শেষে, দেশেরই মঙ্গল।

—ইতি তোমার "অনুগত" (হাঃ! হাঃ!)

—কর্মচারীবৃন্দ।

রাজেন সেন সেদিন খাওয়া-দাওয়া করে অফিসের দিকেই বেরুলেন। অফিসের গাড়ি, অফিসের টেলিফোন সবই তাঁর নিজেরই বলে জানতেন। সবই ফেরত নিয়ে গিয়েছে অফিস। এই আকস্মিক ধাক্কাতে সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গেছে আজ।

সকালে নিজেই বাজারে গিয়ে ছোট ট্যাংরা মাছ কিনেছিলেন। এবার থেকে অনেক কাজই করতে হবে। আগে যখন সখ করে বাজার করতেন তখন ব্যাপারটা অন্যরকম ছিলো। এখন মনে হয় জানা-শোনা লোকেরা যেন অনুকম্পার চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। ট্যাংরার দামের কাঁটায় বুকের পাঁজর ফুটো হয়ে গেছে। সাপ্লায়াররা, এই হৃদয়হীন পৃথিবীর স্বরূপ এতদিন তাঁকে বুঝতেই দেয়নি। সাপ্লায়ারগুলো হারামি এক নম্বরের।

মনে মনে বললেন, রাজেনবাবু।

মিনিবাসের জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রায় পঁচিশ মিনিট পর খুব ভীড়ের একটি বাসে উঠলেন। বকা ছেলেটা পা মাড়িয়ে দিল। উনি আপত্তি করতেই বলল, অতই অসুবিধে তো ট্যাক্সিতে গেলেই হয়। এখানে কেন?

ট্যাক্সি করবার কথা এখন দুবার ভাবতে হয়। তাইই কথাটা বাজল। উনি ভেবেছিলেন তাঁর চাকরি আরও বছর পাঁচেক থাকবে। অন্য সকলেরই তো আছে। পেন্সানও চালু হবার কথা ছিল। ওঁর চাকরিতে থাকাকালীন হলো না। ঐ ইডিয়ট রায়টার কপালেই পেন্সান জুটবে অথচ ও কাজের জানেটা কি?

এতদিন গাড়ির জানালা থেকে দোকান-পাট লোকজন একরকম দেখাত। অনুকম্পার চোখেই দেখতেন তিনি। সাপ্লায়ারের দেওয়া বেনারসী-জর্দা এবং ফাইভ-ফাইভ-ফাইভ খেতে খেতে। ভেবেছিলেন, জীবনটা এমনি করেই কেটে যাবে।

খোকাটাও আলাদা হয়ে গেল ছ'মাস আগে। বলতে গেলে, ছেলের বৌয়ের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর দুর্ব্যবহারেই। ছ'মাস আগেও অনেক গরম ছিল তাঁর। ঠাণ্ডা মেরে গেছেন। ছোট মেয়ের এখনও বিয়ে বাকি। বড় মেয়ে খুকুর স্বামী সুধীর নাকি তার অফিসের একটি মেয়ের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করছে। কী দিনকাল হল। মেয়ে প্রায়ই এখানে এসেই থাকে। মিনিবাসের খাঁচা থেকে ঘাড় হেঁট করে ঝাঁকুনি খেতে খেতে যেতে যেতে সমস্ত পৃথিবীটাকেই আশ্চর্য অন্যরকম মনে হচ্ছে আজকে। এ পৃথিবী ওঁর চেনা নয়। কারা যে তাঁর ঘাড়ে শক্ত হাত রেখে তাঁকে এমন করে মাথা নোয়াতে বাধ্য করল কিছুই বুঝতে পারছেন না রাজেন সেন। মাথাটার গোলমাল হয়ে যাবে বোধহয়। মেন্টাল কেস্ হয়ে যাবেন শীগগিরি।

অফিসে ঢোকবার সময়ই প্রথম ধাক্কাটা খেলেন। দারোয়ান মিশির হাতে খৈনী মারছিল। ওঁকে দেখে সেলাম করল না। দাঁড়িয়ে উঠলো না পর্যন্ত। কিছু বললও না! খৈনি টিপে ঠোঁটের নীচে দিল। ওঁর দিকে নৈর্ব্যক্তিক চোখে তাকিয়ে।

উনি ভাবলেন, বাড়িই ফিরে যাবেন। তারপর ভাবলেন, এসব অশিক্ষিত আনকালচারড লোকেদের কাছে কীইবা প্রত্যাশার?

করিডোরে ঢুকেই গজেনের সঙ্গে দেখা। তার গ্রেটেস্ট চামচে ছিল একসময়! ওঁকে দেখেই গজেন ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠে তুত্‌লে বলল, ভালো?

ব্যাস্‌স্‌স্। ঐটুকুই। বলেই, ডিপার্টমেন্টে ঢুকে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজেন সেন। আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। পা টেনে টেনে। খোঁড়া গরুর মত। একদিন ওয়েলার ঘোড়ার মতই টগ্‌বগিয়ে যেতেন। হঠাৎ শৈলেনের সঙ্গে দেখা করিডরে। শৈলেন বসু। বলল, আরে! সেনসাহেব যে! কেমন আছেন? অন্য কিছু কি করছেন? কোথাও জয়েন করলেন? চলুন, চলুন, চা খাবেন আমার টেবল-এ চলুন।

গেলেন। শৈলেনের ছোট্ট টেবলে বসলেনও। ওঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অফিসের এ দিকটাতে উনি একদিনও আসেন নি। ভাব দেখে মনে হল অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য টেবলের কেউ ওঁকে বোধহয় চেনেই না। কে একজন তাঁর পেছন থেকে বলে উঠলো, "মাল।"

ওঁর বুকের ভিতরটাতে ধড়ফড় করতে লাগল। উঠে পড়ে বললেন, চা নাইই বা খেলাম। শরীরটা ভালো লাগছে না। অধীর আছে নাকি?

কে অধীর? ও রায়সাহেব? ডি-পি-এম্ কি আছেন ঘরে? মনি?

মনি বলে একটি ছেলে বলল, আছেন। তবে খুবই ব্যস্ত। আজ ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে

মীটিং আছে। এফ-ডি নিজে যাবেন ব্যাঙ্কে। তাই কাগজপত্র দেখছেন ডি-পি-এম।

তবু সেনসাহেব উঠলেন। আবার পা-টেনে টেনে তাঁর নিজের পুরোনো ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। ইডিয়ট অধীর রায়, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে দরজা খুলে ওঁকে নিয়ে গেল ভিতরে। নিজের পাশের ছোট শোফায় বসে বলল দাদা, আপনি আপনার চেয়ারেই বসুন। যতক্ষণ আপনি এই ঘরে, এই চেয়ার আপনারই।

দুঃখে, হাসি পেল রাজেন সেনের। ভাবলেন, "আয়না তুমি কার?"

মুখে বললেন, না না, তুমি বোসো। আমি এইখানেই বসি।

চা খাবেন দাদা?

না।

ঠাণ্ডা কিছু?

বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে পার্স বের করে কোল-ড্রিঙ্কস্ আনতে দিল অধীর। একটা এনো। আমি খাবো না। এফ-ডির সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে এক্ষুনি। ইন্টারকম্-এ ডেকেছেন উনি। আপনি বসুন ঠাণ্ডা খান, আমি না আসা অবধি এখানে রিল্যাক্স করুন। যাবেন না কিন্তু। ব্যাঙ্ক তো পাশেই। যাবো আর আসবো।

বুকটা আবার ধড়ফড় করে উঠল রাজেন সেনের। বললেন, না, অধীর। ওটা খেয়েই চলে যাব। শরীরটা ভালো নেই।

অধীর বলল, সো-ফার আই অ্যাম কনসার্নড ইউ আর মাই বস্। ইয়েস। ফর দ্যা রেস্ট অফ মাই লাইফ। আপনার কোনো প্রয়োজন বা অসুবিধা হলে একটা ফোন করবেন শুধু। আমি আপনার ছোট ভাইয়েরই মত। আপনার তো নিজের ভাই নেই। ফোন নাম্বার মনে আছে নিশ্চয়ই!

এ জীবনে কি আর ভুলব?

রাজেনবাবু বললেন, অবশ্য বদলে যদি না যায়।

আর এই রইল আমার বাড়ির নাম্বার। কার্ড বের করে দিল অধীর। হেসে বলল, আসলে, আপনার টেলিফোনটাই আপনার বাড়ি থেকে খুলে আমার বাড়িতে লাগিয়েছে। কোম্পানীর ফোন তো। পাড়া এক বলে, নাম্বারটা পর্যন্ত বদলায় নি। সে নাম্বারও আপনার তো মুখস্থই। চলি দাদা! ব্যাঙ্কে যাব এফ ডির সঙ্গে।

যেতে যেতেও দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে অধীর বলল, দাদা, আমার আর আপনার দাম আসলে কিছুমাত্রই নেই। দামী যা, তা হচ্ছে ঐ চেয়ারটাই।

অধীর চলে যেতেই বেয়ারা একটা ক্লোড ড্রিঙ্কস্ এনে দিল। ওর নাম যদু। আগে লম্বা লম্বা সেলাম করত। আজ কোনো কথাই বলল না।

উনি, মানুষটা কি খুবই খারাপ ছিলেন? কারো উপর কি উনি অন্যায় করেছিলেন? সবাইকে কি যথাযোগ্য মর্যাদা দেননি? আশ্চর্য? একবারও সে কথা ওঁর মনে হয়নি কেন যতদিন চেয়ারে ছিলেন?

কোথায় যেন কী গোলমাল হয়ে গেছে! বড় গোলমাল।

কোল্ড ড্রিঙ্কস্-এর বোতলটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়ালেন রাজেন সেন। সেই কাঁটাটা এখনও উঠে আছে চেয়ারের ফ্রেম থেকে। তাঁর ট্রাউজার একবার ফুটোও হয়ে গেছিল। অধীরকে বলেও গেছিলেন কাঁটাটার কথা।

আশ্চর্য।

তবুও অধীর... ....।

মেজকাকিমার গল্প

নবনীতা দেবসেন

মেজকাকিমার অনেক গল্প। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি! এই কালকেরটাই আগে বলা যাক। ছোটকাকু অফিস থেকে দুপুরে লাঞ্চ খেয়ে বাড়ি আসেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করছেন, "মেজবৌদি, আমার কোনো চিঠি এসেছে?"

মেজকাকিমা বললেন, "চিঠি? তা তুমি আসছো না, আসছো না, আমি তো রান্নাবান্না সেরে তোমার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি পিয়ন আসে কি তুমি আসো, এমন সময় পাশের বাড়ির সোমার মায়ের দেখা পেলুম। সোমার মায়ের খবর তো জানো? তার ভায়ের চোখে অপারেশন হয়েছে, ম্যাড্রাসে গেছে। এই সময়েই আবার তার মায়ের হল হার্ট অ্যাটাক। সেও হাসপাতালে। বেচারী একলা ভেবে ভেবে অস্থির। ম্যাড্রাসে ভায়ের খবর নেবে, না পি.জি-তে মাকে দেখতে যাবে, সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তা সোমা অবিশ্যি খুব শক্ত মেয়ে, ছেলেবেলা থেকে পিতৃহীন হলে লোকে অমনি শক্ত হয়ে যায়। সে বললে, মা, তোমাকে ম্যাড্রাসের কথা ভাবতে হবে না, তুমি পি,জি-তেই যাও। কী সুবুদ্ধি, ভেবে দ্যাখো একবার ঠাকুরপো? অতটুকুনি মেয়ে, কলেজে পড়ছে মাত্তর! তরপর সোমার মা তো চলে গেল, আমি ভাবলুম সোমার জন্যে তো পাত্তর দেখা উচিত এবার। মেয়ে বেশ বড় হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে উমেশবাবু যাচ্ছিলেন। দেখেই মনে হল উমেশবাবুর চার ছেলের তো এখনও বিয়ে হয়নি। বিলেতে, না আমেরিকায়, খড়গপুরে না দুর্গাপুরে, কোথায় না কোথায় যেন ছেলে চারটেই দূরে দূরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনোটা পড়ছে, কোনোটা বা চাকরি করছে। কে যে কেমন পাত্তর হয়েছে, ঠিক জানি না। উমেশবাবুকেই বরং ডেকে জিজ্ঞেস করি। তা উমেশবাবু তখন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলেন বিলেতের না আমেরিকার চিঠি ডাকে দিতে। তাঁকে বলে দিলুম ঐ সঙ্গে আমার জন্যেও খান দুই পোস্টকার্ড এনে দিতে। বললুম, দাঁড়ান, তিরিশটা পয়সা নিয়ে যান, তা উনিও দাঁড়াবেন না, আমিও ছাড়বো না। ঐ কত্তে কত্তে ছেলেরা যে কী কচ্চে, কে কী পড়চে সেসব জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেলুম। বয়সের দোষ আর কী, তা উমেশবাবু—"

ছোটকাকু ডাল শেষ করে চচ্চড়ি মাখতে মাখতে বললেন, "মেজবউদি, আমার কি কোন চিঠি এসেছে?"

"সেই কথাই তো বলচি, তা পিয়নেরও দেখা নেই, তোমারো দেখা নেই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম মাথায় তেলটা মেখে নিই। তা তেলের যা অবস্থা হয়েছে। জবাকুসুম-ক্যাথ্যারাইডিন তো মাখিইনি, একদম প্লেন নারকেল তেল। তাতেই কী খর্চা, কী খর্চা! মাঝে মাঝেই ভাবি, দূর ছাই চুলে তেল দেওয়া ছেড়েই দেবো! তা পাকা-কাঁচা যাই হোক চাট্টিখানি চুল

তো আছেই মাথায়, তেল না দিলে মাথা যেন ফেটে যায়, রাগ করে দু'দিন তেল না মাখলেই প্রেসার চড়ে যায়। সে আরেক কেলেঙ্কারী। তা আজকাল সিংঘী মার্কা বদল করে প্যারাসুট মার্কা কিনছিল, এখন আবার সেটাও বদল করে—"

এবার মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে কাকু বললেন "মেজবৌদি, আমার কোন চিঠি এসেছে?" চিরপ্রশান্ত চিরসুস্থির ছোটকাকু ধৈর্যভাবে প্রশ্ন করেন।

"আহা-হা, সেই কথাই হচ্চে। এতটুকুতে এত অধৈর্যি হলে চলবে কেন? ওই চিঠির কথাই তো হচ্চে। তা, আমি ভাবলুম পিয়নের তো দেখা নেই, বরং তেলটা একটু চাঁদিতে ঘষে নিই, তারপর তেল মাখতে মাখতে দেখি, কি সব্বোনাশ! ও-বাড়ির চাঁদুর ছেলেটা ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ওরে বাবা রে—এই ন্যাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়ানোর মতন এতদূর ডেনজারাস খেলা আর নেই! আমি তো অমনি চেঁচাতে শুরু করেছি! অ চাঁদু! অ চাঁদু! তোর ছেলে যে পড়ে মোলো রে। কী কচ্চিস? আগে ছেলেকে নামা! তা চাঁদু বাড়ি ছিল না, সকালবেলা এই সময়ে অবশ্যি সে থাকে না কোনদিনই, তার তো রোজই আপিস—সেই সুযোগেই ছেলেটা ছাদে উঠেছে, তাদের ইস্কুল সব বন্ধ কিনা? গরমের ছুটি দিয়ে দিয়েচে এর মধ্যেই—ইস্কুলগুলো যে ক'টা দিনই বা খোলা থাকে, আর ক'টা দিন বন্ধ—"

"মেজবৌদি?" ছোটকাকু কাঁচা আমের ফটিক ঝোলে চুমুক দিয়ে গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, "আমার কি কোন চিঠিপত্তর এসেছে?"

"আহা, চিঠির কথা বলছি না তো কী কথা বলছি আর? ভাবলুম তেলটা যখন মাখা হয়ে গেল, একেবারে গামছাটা নিয়ে, কাপড়-চোপড় নিয়েই কলতলায় নাবি, তোমার ডাকবাক্সটাও দেখা হবে, চানটাও সারা হবে—এমন সময়ে সাবির টেলিফোন এলো। সাবির শাশুড়ি যায়-যায় জানোই তো? সাবিদের বাড়ি টেলিফোন নেই, খবর যা কিছু আমার এখানেই দেয়। আমি তখন কী করি? কেমন করে সাবিকে ডেকে পাঠাই? ঘরে তো কেউই নেই, তখন বললুম—তা খবরটা বরং আমাকে দিয়ে দাও, দুপুরবেলা যখন ছোটঠাকুরপো ভাত খেতে আসবে তার হাতে সাবিকে খবর দিয়ে দেবো। তা, হাতে তেল নিয়ে ফোন ধরা যদি বা যায়, কলম ধরা বড়ই শক্ত। তখন সাবির দেওরকে বললুম, ধর, তেল হাতটা ধুয়ে আসি।"

দইয়ের বাটিটা নামিয়ে রেখে ছোটকাকু বললেন, "মেজবৌদি, আমার কি কোন চিঠি—"

"আহা, শোনই না সবটা, এত অধীর হলে কি সংসারে চলে? আপিসের কাজকর্ম করোই বা কেমন করে তোমরা? তাড়াতাড়ি তেলহাত ধুয়ে সাবির দেওর যা যা বললে সব একখানা কাগজে লিখে নিলুম। সেই চিঠি লিখে ওকে বললুম, ছোটঠাকুরপোকে দেবো—সে ঠিক ভাত খেয়ে আপিসে যাবার পথে সাবিকে দিয়ে যাবে তার শাশুড়ির খবরটা। চিঠি চিঠি করে যে পাগল করে দিচ্ছো, তা সেই চিঠির কথাই তো বলছি। শুনলে তো?"

ছোটকাকু হাত ধুয়ে মেজকাকিমার হাত থেকে মশলা নিয়ে খেতে খেতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, "তাহলে, মেজবৌদি, সাবির চিঠিটাই দিয়ে দাও। যাবার পথে দিয়ে যাচ্ছি।"

"সে কি আর আছে? রাস্তা দিয়ে তক্ষুণি মনমোহন ছুতোর মিস্তিরি যাচ্ছিল, সে তো সাবিদের পাশের বাড়িতেই কাজ করছে। তার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তখনই পেয়ে গেছে। ওসব খবর ফেলে রাখতে হয়?"

ছিটকিনি খুলতে খুলতে ছোটকাকু বললেন, "তাহলে আজকে সকালের ডাকে আমার কোন

চিঠি আসেনি?"

মেজকাকিমা পিছু পিছু গেছেন দেওরকে এগিয়ে দিতে। ফস করে জ্বলে উঠলেন, "কে বললে আসেনি? আমি কি বলেছি একবারও যে তোমার কোন চিঠি আসেনি? কেন আসবে না চিঠি? আমি পিয়নকে দেখতে পাইনি বলেই যে চিঠি আসবে না তেমন কি কোন নিয়ম আছে? এই তো তোমার দু'খানা পত্তর এসেছে। এই দরজার কাছেই টেবিলের ওপর খবরের কাগজ চাপা দিয়ে তুলে রেখেছি, পাছে উড়ে যায়।"

খবরের কাগজের গোছা তুলে বীরদর্পে মেজকাকিমা দুটি খাম এগিয়ে দিলেন ছোটকাকুর হাতে।

(২) অতিথিসৎকার

কেউ যদি কড়া নেড়েছে তবে আর রক্ষে নেই। অমনি মেজকাকিমা চেঁচাবেন, "বউমা, বউমা, মিষ্টি আনো, শরবৎ করো, অতিথিনারায়ণকে অমনি ফেরাতে নেই।" তারপর তো দরজা খোলা হল। মেজকাকিমা ছুটে এসে মোড়া পেতে দিয়ে পাখা খুলে বলবেন, "কাকে চাই আপনার?" যদি অচেনা হয়, তবু—"বউমা, শরবৎ করো, মিষ্টি আনাও।" তিনি হয়তো কোন সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। ভাব দেখে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন অতিথি বলতে সব বাড়িতেই এঁরাই প্রধান। এরোপ্লেনের সুটকেস, ইলেকট্রিকের ঝাঁটাবালতি, গ্যাসের উনুন, বাসকোসন, তেল, সাবান, খাবার-দাবার, কী না আনেন এঁরা? এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত। মেজকাকিমার সব কিছু দেখা চাই। শোনা চাই। তারপর অতিথিকে মিষ্টির থালা দিয়ে শরবৎ খাইয়ে জিনিসপত্র কিনে, বিদায় করা চাই। জিনিস লাগুক না লাগুক মেজকাকিমা কিনবেনই। যদি না বড্ড বেশি দামী হয়। শ'খানেকের মধ্যে হলে তাকে খালি হাতে ফিরতে হবে না এই বাড়ি থেকে। মেজকাকিমার কল্যাণে বাড়ি খেলো সাবানে, জোলো ফিনাইলে, বেফিট অন্তর্বাসে, স্যানিটারি ন্যাপকিনে, শ্যাম্পুতে, পাউডারে, ম্যাগিতে, বোর্নভিটাতে ভর্তি। অতিথিকে ফেরাতে কষ্ট হয় মেজকাকিমার। এত রোদ্দুরে আহারে লোকের দোরে দোরে ঘুরছে, ওদের বুঝি কষ্ট হয় না? কিছু না কিনলে চলবে কেন? আজ দরকার নেই? কাল হবে। যাকে রাখো সেই রাখে। মেজকাকিমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বড়বৌদির মতো এমন পুত্রবধূ জগতে হয় না। বড়বৌদির সহ্যের সীমা নেই। ভালোবাসার অন্ত নেই। আমরা অধৈর্য হয়ে যাই, বউদি শুধু হাসেন। দাদার মৃত্যুর পর থেকে বড়বউদি একদম একা। দিনের বেলাটা ইস্কুলে পড়ান, বাকি সময়টা মেজকাকিমাকে নিয়ে। মেজকাকিমা তাঁর অতিথিদের গলা নীচু করে বলেন—বড়বউমা আবার একটু কৃপণ আছে, ছোট্ট ছোট্ট গেলাসে শরবৎ দেয়, আটআনা দামের রসগোল্লা আনায়, তবু দেয় তো। আমার মেয়ে হলে? ও বাবা, এ যদি সন্ধ্যারাণী হতো, কিছুই দিতো না! এই দিচ্ছি মা দিচ্ছি মা করেই সন্ধ্যে উতরে দিত। তোমরা চলে যেতে। চিরকাল কি কেউ জলখাবারের লোভে বসে থাকতে পারে?" তখনও জলখাবারের আশায়-বসে-থাকা, অথবা জলখাবার-খেতে-ব্যস্ত অতিথিরা এই অতি স্পষ্ট কথোপকথনে যারপরনাই অস্বস্তি বোধ করেন, কিন্তু অনুপায়। না খাইয়ে ছাড়বেন না মেজকাকিমা। লৌহভীমচূর্ণ করার মতো যত্ন তাঁর। হ্যাঁ, সন্ধ্যা হলে বলত, 'মা তোমার সবটাতে বাড়াবাড়ি। এসেছে জিনিস বেচতে। তোমার আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জ্ঞাতপুত কেউ নয়, তাকে মিষ্টির থালা ধরে দেবার কী দরকার?' আমি বলি, কী দরকার সেটা তুই কি বুঝবি রে সন্ধ্যা?

বুঝি আমি আর বোঝে তারা। আমার এতেই পুণ্যি। অতিথি অতিথি। কী জন্যে এসেছে, চাঁদা চাইতে না সাবান বেচতে, সে আমার জেনে কাজ নেই, যেই এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবে, সেই নারায়ণ, তাকে সেবা করা অবশ্য কর্তব্য।" বক্তৃতার পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু শরবৎ খেয়ে চলে যান, মিষ্টির থালায় হাত দেন না অতিথিরা। এতো গেল অচেনা অতিথিদের বেলায়। যখন সত্যি চেনা লোক, মেজকাকিমা উচ্ছ্বসিত। "এসো, এসো বউমা, খাবার সাজাও, বুলু-বাচ্চু এসেছে, বউমা, খাবারটা সাজাতে কত দেরি করছো। বুলু-বাচ্চুকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে। বউমা খাবার থালাগুলো তুলে নাও, বুলু-বাচ্চুকে হাত ধোবার জল দাও, ওরা এবার চলে যাক, ভীষণ ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে আর বসে কাজ নেই।" অথবা, বুলুর বাচ্চা ছোট, বাড়িতে রেখে এসেছে আর কতক্ষণ বসবে এখানে। অথবা বাচ্চু রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে রেখেছে, কেউ না চুরি করে নিয়ে যায়! ওদের ছেড়ে দাও ট্রামবাসে ভীষণ ভীড় হয়ে যাবে এবার, ওদের এক্ষুণি না গেলে নয়। অথবা কাত্তিক মাসের কাঁচা হিম লেগে যাবে মাথায় আরও দেরি করে গেলে। অথবা বুলুর মায়ের শরীর ভাল নয়, বেশিক্ষণ বাইরে থাকা উচিত নয় ওর অথবা এই বেলা না গেলে রোদটা আরও চড়ে যাবে, ওরা বরং বেলাবেলি চলে যাক—মেজকাকিমার ঝুড়িতে ওজরের সংখ্যা অগুন্তি। ঋতুমাফিক রোদ আসা, হিম লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, ঝড়, বৃষ্টি, চোর-ডাকাত, নয় তো বাড়িতে মা, শ্বশুর, ছেলেপুলে, নয় তো চাকরি-বাকরি, নয় তো গাড়িতে ভিড়, শেষ অবধি গাড়ি চুরির ভয় পর্যন্ত দেখান মেজকাকিমা। আত্মীয় বন্ধুদের খাওয়া হলেই আর এক মিনিটও নয়, তক্ষুণি বিদায় করা চাই। বসতে দেন যতক্ষণ খুশি কেবল সেলসগার্ল-সেলসম্যানদের। ওরা তো 'বেড়াতে' আসেনি, 'কাজে' এসেছে। ওদের কথাই আলাদা। সত্যি কথাই তো।

(৩) পয়া-অপয়া

"এই যে, এই কাপড়টা আর পরবো না বউমা, তুলে রাখো"—মেজকাকিমার হাতে ফর্সা লালপেড়ে শান্তিপুরী ধুতি একটি। মেজকাকিমা বললেন, "বড় বিশ্রী কাপড় এখানা বউমা, এটা পরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, ওপাশে একখানা রিকশা উল্টে বিয়েবাড়ির বাসনকোসন সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। কি কাণ্ড বলো দেখি? ওই বাঁড়ুয্যেদের বাড়ির বিয়ের ভিয়েন বসছে, তার জন্যেই যাচ্ছিল মনে হয়। আসলে হয়েছে কি, একটা গাড়ি একটা কুকুরকে প্রায় চাপা দিচ্ছিল, যেই গাড়িটা এদিকে হঠাৎ করে সরে এসেছে, অমনি এই বাসনভর্তি রিকশাটা উলটে পড়ল। কেউ কাউকে ধাক্কা মারেনি। সব আপনি-আপনি, সব এই কাপড়খানার জন্যে। সেদিনই এটা তুলে রাখা উচিত ছিল। মনে আছে, সেদিন এইটে পরে ভাত খাচ্ছিলুম, আর বিন্দুর মা পা হড়কে পড়ে গেল কলতলাতে?" বড়বউদি কিছু বললেন না। তবে আর ঐ আলমারিটাতে জায়গা কুলোচ্ছে না। ঠাসা হয়ে আছে অপয়া শাড়িতে। তা দিয়ে বাসনও কেনা চলবে না। অপয়া বাসন হয়ে যাবে সেসব। পরাও চলবে না। মেজকাকিমা চেনেন যে। প্রত্যেকটা কাপড় তাঁর মনে থাকে এত অপয়া শাড়ি কি আর একদিনে জমেছে? তা নয়, পঁচিশ বছর ধরে জমেছে। মেজকাকা মারা যাবার দিন থেকেই সেই প্রথম অপয়া শাড়ি বাছা শুরু হল। যেটা পরা অবস্থায় একাকার মৃত্যু ঘটল। তারপর থেকেই অপয়া ঘটনা বড্ড বেড়েছে। "পাশের বাড়ির মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়ে, সেই খবরটা এই কাপড় পরে শুনতে পেলুম।

এটা বড্ড অপয়া।" —"এই কাপড়টাই আমি পরেছিলুম যেদিন পদ্মপুকুরে সেই ভীষণ মারামরিটা হলো।" —"এই কাপড়টা আমি পরেছিলুম যেদিন মিত্তিরদের কত্তা গিন্নীতে বেদম ঝগড়া হয়েছিল—গিন্নি বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন চিরদিনের জন্যে। শেষে মিত্তির মশাই নিজে গিয়ে বহু সাধ্য-সাধনা করে দশ দিনে ফেরৎ আনলেন।" এরকম কত! কত!

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় ছোটখোকার বউয়ের প্রথম বাচ্চাটা নষ্ট হবার খবর পেয়েছিলুম।"

"এই কাপড়টা পরা অবস্থায় বুলুর ছেলের ডিভোর্সের খবর শুনলুম," "এটা পরেছিলুম যেদিন রামু ধোপা ট্রাম চাপা পড়েছিল," "এই কাপড়টা পরা অবস্থাতেই সেজ ঠাকুরপোর চাকরি যাবার খবর এল।"

"এই কাপড়টা পরেছিলুম যখন রেডিওতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুসংবাদ দিলে।"

এমনি, নেহেরুর মৃত্যুসংবাদের শাড়ি, উত্তমকুমারের মৃত্যুদিনের শাড়ি, ভোলাদ্বীপ-উড়ির চরে প্রবল বন্যা হবার দিনের শাড়ি, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনর শাড়ি, 'কণিষ্ক' প্লেন বিপর্যয়ের শাড়ি, বিশুর ঠাকুমার পা পিছলে পড়ে কোমর ভাঙবার দিনের শাড়ি, পাড়ার ভূতো কুকুর চাপা পড়বার দিনের শাড়ি, দ্বিজুর বাবাকে পুলিশে ধরবার দিনের শাড়ি, শুভেন্দুর বাড়িওয়ালার হুজ্জুতি করার দিনের কাপড়, প্রতিমা ফেল করার দিনের, ফেলুর শ্বশুরের হার্ট অ্যাটাক হবার রাত্তিরের, বেঁটের শিবুর নামে হুলিয়া বেরুনোর দিনের, ফুলবাগানের বাড়িতে চুরি হবার দিনের, দেওঘরের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার দিনের, সরোজের বউয়ের পালিয়ে যাবার দিনের, কুমারের বাপের পক্ষাঘাত হবার দিনের। এরকম অজস্র মন্দ দিন-রাতের স্মৃতিতে ভর্তি মেজকাকিমার অপয়া শাড়ির আলমারিটা। বড়-বউদি মাঝে মাঝে পুরনো দুটো-একটা চুপিচুপি বের করে বিলিয়ে দেন আমাদের। আমরাও চুপিচুপি ছাপিয়ে নিয়ে পরি। নইলে জায়গায় আঁটবে কেন? অপয়া ঘটনা তো জগৎজুড়ে রোজই ঘটছে। কানপুরে তিনটে কচি কচি মেয়ের গলায় দড়ি দেবার দিনের শাড়িটাও ওতে উঠে গেছে। সক্কালবেলা উঠেই কাগজে ঐ ছবি দেখার পরও সে কাপড় কি আর পরা সম্ভব? যে-কোনো মানুষের পক্ষেই?

(৪) ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে

জগতে কিছু কিছু মানুষ রেডিও-অ্যাকটিভ হন। সুবীর যেমন। মেজকাকিমাও খুব রেডিও-অ্যাকটিভ প্রাণী। চব্বিশ ঘণ্টা রেডিও শুনতে ভালবাসেন। চিরটাকাল। গ্রামোফোন? হ্যাঁ, তা মন্দ কি? তবে রেডিওর মতন নয়। ওই রেকর্ড লাগাও রে, ওসব পঞ্চাশটা ঝনঝাট নেই রেডিওর। চাবি ঘোরাও আর গান শোনো। শুধুই কি গান? সংবাদ, আবহাওয়ার খবর, ধর্ম আলোচনা, নাটক, যাত্রা কী নেই। রেডিও একখানা ঘরে থাকলে আর ঘরে মানুষ লাগে না। মেজকাকিমা ঘুমিয়ে থাকলেও রেডিওর চলা চাই। ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, অক্লান্ত রেডিও চালক মেজকাকিমা। কখনও 'ক', কখনও 'খ' কখনও 'বিবিধ ভারতী', কখনও 'ঢাকা' চাবি ঘুরিয়ে দিব্যি এদিক-সেদিক শোনেন। প্রায়ই শুনি ইংরিজি ঝিনচাক বাদ্যি বাজছে রেডিওয়, আর মেজকাকিমা তাকিয়া মাথায় ফুরুর ফুরুর নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, রেডিওটি মাথার কাছে নিয়ে। যখন থেকে ট্রাজিস্টার চালু হয়েছে, গাঁয়ে-গঞ্জের রাখাল বালকরা শুনেছি একটি করে

ট্রানজিস্টার হাতে ঝুলিয়ে গরু চরাতে যায়। আর মেজকাকিমাও ট্রানজিস্টারটি সমেত রান্নাঘর, স্নানের ঘর সর্বত্রই বিচরণ করেন। সর্বভূতে আকাশবাণীর সাহচর্য মেজকাকিমার পক্ষে অত্যাবশ্যক। তিনি রেডিওর অত্যাগসহন সঙ্গী এবং রেডিওর মতিবুদ্ধি মতোহ তিনি জীবনযাপন করেন।

সেদিন বাড়িতে ঢুকেই দেখি মেজকাকিমা দরজা জানলা বন্ধ করেছেন। ভারি সুন্দর একটা ফুরফুরে মিষ্টি বাতাস বইছিল। এরকম বাতাসকেই বোধহয় 'মলয় পবন' বলে, আমি মেজকাকিমাকে বারণ করি দরজা জানলা বন্ধ করতে। এত সুন্দর হাওয়াটা বন্ধ করে দেবার কোন মানেই হয় না। গম্ভীর মেজকাকিমা বললেন, 'এখন মিষ্টি হলে কি হবে, ও যে প্রচণ্ড লোকসান সঙ্গে নিয়ে আসছে বাবা!'

"মানে?"

"মানে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা আসছে। তুমি বাড়ি চলে যাও। আর এখানে থেকো না।"

"যাব মানে? এই তো এলুম।"

"কিন্তু এত ঝড়-বাদলে বাইরে থাকলে তোমার শাশুড়ি ভাববেন। তুমি বাড়ি যাও।"

"কোথায় ঝড়-বাদল? শুকনো তো।"

"আসছে। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে।"

"মোটেই আসছে না। বাইরে পরিষ্কার আকাশ, খটখটে। আমি তো এই এলুম বাইরে থেকে।"

"রেডিওতে বলেছে। সতর্কবাণী দিয়েছে, তুমি জানবে কোত্থেকে? তোমরা তো রেডিও শুনবে না। প্রবল বান ডেকেছে। এখানেও এলো বলে।"

"কোথায় বান? অন্ধ্রে? না বাংলাদেশে?"

এই দুটো দেশকে প্রতিবছর সমুদ্র একবার করে মার দিয়ে যায়। শয়ে শয়ে পশুপাখি, ঘরবাড়ি সমেত মানুষ মরে।

"অন্ধ্র আর চাটগাঁ ছাড়া আর কি দেশ নেই? প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে চীনে। চীন তো আমাদের গায়ের ওপর। চীনে ঝড়-ঝঞ্ঝা মানেই সেটা কলকাতাতে এসে পড়লো বলে!"

মেজকাকিমা দ্রুত হাতে জানলা বন্ধ করতে থাকেন, চীনের ঝড় থেকে সাবধান হওয়া দরকার।

বড়বউদি চুপিচুপি বলেন, 'চীন তো ভালো। হনলুলুতে ঝড় হয়েছিল রেডিওতে শুনেই তো মা ছাদ থেকে সমস্ত ভিজে কাপড় তুলে ফেললেন। আর ফ্লোরিডাতে সেই যে একটা সাইক্লোন এসেছিল তার নাম ওরা দিয়েছিল 'সোনিয়া'। তাই থেকে মার কী ধারণা হয়েছে কে-জানে? রেডিওতে 'সোনিয়া' নাম উচ্চারণ হলেই দৌড়ে গিয়ে দরজা জানলা বন্ধ করেন!"

টেলিভিসনটাকে মেজকাকিমা এখনও মেনে নিতে পারেননি। টেলিভিসনের ঘরে উনি ঢোকেনই না। কেবল 'রামায়ণ' হলে শুধু ওটা দেখতে ইদানীং যাচ্ছেন। টি.ভি.-কে রেডিওর সতীন বলে মনে করেন মেজকাকিমা। টি.ভি.-র ওপরে মনে মনে তাই তাঁর রাগ। টি.ভি. এসে রেডিওর মান-মর্যাদা নষ্ট করেছে। ছোটকাকুর মতো বড়বউদিও মেজকাকিমাকে স্নেহের প্রশ্রয় দেন। তাঁর সব অযৌক্তিক কাণ্ড-কারখানাই মেনে নেন। আর হাসেন। আশ্চর্য মানুষ বউদি।

(৫) ত্রিফলা

মেজকাকিমা খুব ভক্তিমতী। মেজকাকিমার ইচ্ছা আমরাও সকলে ভক্তিমতী হই। কিন্তু কাউকেই মানাতে পারেননি। এমনকি ওঁর ওই অদ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবিকা 'ওয়ান উওম্যান ভলান্টিয়ার ফোর্স' বড়বউদিকেও না।

রাত্রে সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে খোলা রেডিওর পাশে শুয়ে মেজকাকিমা ঘুমিয়ে পড়েন। আর এগারোটায় রেডিও বন্ধ হলেই উঠে পড়েন। বড়বউদি ততক্ষণে স্কুলের খাতা-টাতা দেখে সবে এসে শুয়েছেন। মেজকাকিমাকে রাত্রে দেখতে হয়, পাশে একজনের না শুলেই নয়। ওঁর বয়স যদিও সত্তর হয়নি, কিন্তু হার্টটা ভালো নয়। দুবার অ্যাটাক হয়ে গেছে। পেসমেকার বসানো আছে। সে আরেক গল্প। ঘুম থেকে উঠেই মেজকাকিমা ঘড়ি দেখেন। তারপর ডাকেন, "ও বউমা? বউমা? ঘুমোলে? বলি ঘুমোলে নাকি? ঘুমোলে?"

বড়বউদি বলেন, "কি মা? কিছু বলছেন?"

"না মা, না। কিচ্ছু বলিনি। বলছি ঘুমোও। ঘুম তোমার দরকার। সারাদিন খেটেখুটে আসো বাড়িতেও তো বুড়ি শাশুড়ীটাকে নিয়ে তোমার বিশ্রাম নেই। ঘুমোও মা, ঘুমোও। ঘুম না হলে তোমার শরীর দেবে কেন? এত কাজ মানুষে পারে? ঘরে খাটনি, আবার বাইরে খাটনি। বিশ্রামের সময় বলতে তো রাতটুকুনি। তা না ঘুমোলে কি চলে মা? তাই বলছি ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুম মানুষের দেহে খাদ্য, পথ্য, ওষুধের মতোই জরুরি। ওটা তোমার দরকার।"

বড়বউদি চুপ করে শুয়ে থাকেন। উত্তর দেন না।

"অ বউমা। বউমা! বলি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অ্যাঁ? এ যে দেখি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। তেষ্টা পেয়েছে, অ বউমা, জল খাবো।"

অকস্মাৎ মেজকাকিমা মরিয়া হয়ে ওঠেন।

বউমা যে ঘুমোননি, তাও প্রমাণ হয়ে যায়। বউদি উঠে পাশের টেবিল থেকে পাথরের গেলাসটি শাশুড়ির হাতে তুলে দেন। মেজকাকিমার হাতের কাছেই ছিল গেলাস ভর্তি জল। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে মেজকাকিমা বলেন, "নাও, শুয়ে পড়ো। ঘুম তোমার দরকার।"

বউদি হাসতে হাসতে শুয়ে পড়েন। একসময়ে ঘুমিয়েও পড়েন, মেজকাকিমার মুখের নানান গল্প শুনতে শুনতেই। মেজকাকিমা ঘুমোন না--দাদার ছেলেবেলার গল্প করেন বউদির কাছে। মেজকাকিমার ওই একই ছেলে ছিল। আর একটি মেয়ে আছে। বম্বেতে থাকে। তার ছেলেবেলার গল্পও শুনতে হয় বউদিকে। তারপর ভোর তিনটে বাজতেই ঘড়ি ধরে, "অ বউমা! বউমা! উঠে পড়ো, ওঠো, ওঠো, শীগগির বাথরুমে যাও। হিসি করে এসো, নইলে শরীর খারাপ হবে যে। এতোক্ষণ বাথরুমে না গিয়ে থাকতে হয়? শরীরের বিষ শরীরে বসে যাবে যে? ওঠো? বাথরুমে যাও। কিডনি শেষ হয়ে যাবে। যাও বাথরুমে যাও।"

"আপনি যাবেন মা? চলুন, আমি আলো জ্বেলে দিচ্ছি।"

"আমি তো যাবোই। সে কথা হচ্ছে না। আমি বলছি তুমি যাও। এই যে তোমার একটানা ঘুমুনো, বাথরুমে না গিয়ে, এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় একটুও। খুব খারাপ অভ্যেস।"

মেজকাকিমার অনুরোধমাফিক বড়বউদির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রথম পর্ব শেষ হয়। বউদি ফের ঘুমুতে যান।

চারটে বাজে দেয়াল ঘড়িতে। মেজকাকিমা ডাকেন, "অ বড়বউমা, বড়বউমা। ওঠো মামণি ওঠো চাট্টে বেজে গেল যে—বড়বাইরে ফিরে আসবে না? এর পর যে অনিয়ম হয়ে যাবে। শরীর শুদ্ধি না করলে কি চলে মা? যাও বড়বাইরে যাও। চারটে বেজে গেছে।"

মেজকাকিমার একেবারে কড়া নিয়ম। বড়বউদির ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বা শারীরিক প্রয়োজন, তাঁর বাথরুম যাবার কোন ভিত্তিই হতে পারে না। এ ব্যাপারে মেজকাকিমার ঘড়ি দেখাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। এতেও বউদির হাসি মোছে না।

বাথরুম থেকে এসে বউদি আবার শুতে চেষ্টা করেন। মেজকাকিমার নাম হওয়া উচিত ছিল 'কমলি'। উনি, 'নেহি ছোড়েগী'। ঠিক পাঁচটার সময়ে মেজকাকিমা উঠে পড়ে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে ধূপ জ্বেলে ঘণ্টা নেড়ে ধূপ নেড়ে নেড়ে, ঘরময় দেয়াল ভর্তি টাঙানো ক্যালেণ্ডার থেকে বাঁধানো অপূর্ব সব দেবদেবীর ছবিতে এবারে আরতি করতে শুরু করেন। হেঁটে হেঁটে ঘরময় ঘুরে ফিরে মন্ত্র পড়তে পড়তে।

"অ বউমা, বউমা। ওঠো। ওঠো শাঁখটা ধরো। বাজাতে হবে না, কেবল ধরে ধরে এমনি নাড়ালেই হবে। যাও, বাসি কাপড়টা আগে ছেড়ে এসো। তারপর শাঁখটা নাড়াও। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত বড় জাগ্রত মুহূর্ত। এই সকালে দেবতাদের আরতির সময়ে সবাইকে উপস্থিত থাকতে হয়। ওঁরা সব সশরীরে এসে পুজো নেন। এই সময়টাই স্বর্গের সঙ্গে মর্তের, দেবতার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের প্রকৃষ্ট সময়। এই মুহূর্তটা ঘুমিয়ে নষ্ট করতে নেই মা, উঠে পড়ো। দ্যাখো কি সুন্দর সূর্যি উঠবে এবার। ছাদে যাও। ছাদে গিয়ে পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলো 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং—ওঠো বউমা? ও কি? পাশ ফিরছো কেন? অ বউমা? ওঠো?"

পিঠে জোরসে ঠেলা খেয়ে বড় বউদি ঘুম চোখে এইবার বলেন, "এই যে উঠছি। উঠছি মা আপনার ত্রিফলাটা ভেজান আছে। এই আমি উঠেই দিচ্ছি।"

হঠাৎ আশ্চর্য পটপরিবর্তন হয়। নরম সুরে মেজকাকিমা বলেন "ত্রিফলা? আবার তুমি ত্রিফলা ভিজিয়েছ? কোবরেজ মশাই বুড়ো হয়েছেন, কি বলতে কি বলেছেন—আমি বলেছি, না; আমি ত্রিফলা খাই না, ত্রিফলা খাবো না আমি।"

"না মা, তা হয় না। কবিরাজ মশাই রাগ করবেন।"

"তুমি শোও ততক্ষণ। চোখে একফোঁটা ঘুম নেই মেয়ের। ভোর না হতে হতে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগে গেছো? 'মা ত্রিফলা খাও?' শুধু শুধু এক্ষুণি ওঠবার কোন দরকার নেই। তোমার তো মরনিং ইস্কুল নয়, বউমা? তুমি বরং আর একটু রেস্ট নাও। বিশ্রাম করো। আরেকটু ঘুমোও দিকিনি, বউমা। ঘুমটা খুব জরুরী। তোমার শরীরের পক্ষে ঘুমটা খুবই দরকার।" বলতে বলতে মেজকাকিমা একা একাই ছাদে পালান।

বড় বউদি মৃদু হেসে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এখন দু'ঘণ্টা নিশ্চিন্ত। সেই সাতটায় সুরবালা আসে। এসে চা তৈরি করে। চান করে, পুজো করে, চা খেয়ে কাগজ পড়ে একেবারে তারপরে মেজকাকিমা এসে চায়ের কাপ হাতে আদর করে বউদিকে তুলবেন, "বউমা! অ বউমা? ওঠো, ওঠো, চা খাও। আর কতক্ষণ ঘুমোবে? তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল যে?' মেজকাকিমার রেডিওতে তখন লোকসঙ্গীত চলবে। ত্রিফলার টাইম ওভার।

শুক্রে শনি

দিব্যেন্দু পালিত

নিজের ছকের বাইরে কোনও দিনও এক পা হাঁটেনি দিবাকর। ছকটা সে চেনে। জল, ঝড়, সাময়িক অশান্তি যাই আসুক, সেখানে যাওয়া, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও নির্দেশ নেই।

কোনও দিনও হাঁটেনি বললে অবশ্য ভুল হবে। বত্রিশ বছর বয়সে যে-ছকটা তার কাছে আগাগোড়া বাঁধানো মনে হয়, ষোল বছর বয়সেও সেটার অস্বিত্ব নিশ্চয় ছিল; কিন্তু তার কাছে নয়। ঠিক সেই বয়সেই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছকটা সোজাসুজি উঠে এল তার চোখের সামনে।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় অনায়াসে ফেল করে বসল দিবাকর। ইংরিজিতে ফেল, ভূগোলে ফেল, এমনকী অঙ্কও—যেটায় মাথা পাকা বলে কোনও দিনও মাথা ঘামাত না সে—ডুবিয়ে দিল তাকে। দিবাকরের জীবনে এটাই প্রথম শক্। তাদের পরিবারের পক্ষেও প্রথম শোক। দুটো মিলে এমনই মুহ্যমান করে দিল তাকে যে ঘরের দরজা বন্ধ করে একা চুপচাপ মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে লাগল দিবাকর। রেজাল্ট বেরুনোর দিন পাঁচেকের মধ্যেই তার ফরসা, নাদুসনুদুস চেহারাটি বদলে গেল বেমালুম, কালি পড়ল চোখে কোলে, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল যার-পর-নাই অসহায়তা।

দিবাকরের বাবা প্রভাকর ব্যবসাদার হলেও শান্ত স্বভাবের নিরীহ মানুষ। সারা জীবনের পরিশ্রমে কেটারিংয়ের কারবারে যশ ও পসার দুই-ই জমিয়েছে ভাল। স্ত্রীর নামে নাম—অনুরাধা কেটারিং বলতেই একনামে চেনে লোকে। নিজের বাড়ি, নিজের গাড়ি, ব্যাঙ্কে টাকাকড়িও কিছু কম নেই। প্রথম সন্তান মেয়েটির অল্প বয়সে ভাল ঘরে বিয়ে দেবার পর একমাত্র পুত্রটিকে দাঁড় করানোই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। ফেল করে বাপকেও কুঁজো করে দিল দিবাকর। হতাশা ছাড়াও, ছেলের হাবভাব দেখে অদ্ভুত একটা ভয়ও ঢুকে গেল প্রভাকরের মনে। সুইসাইড করবে না তো!

এরই কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে এক অদ্ভুত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। প্রভাকরই নিয়ে এল। ছোটখাট অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক, মাথা জুড়ে টাক, সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে মুখে। নাম অরবিন্দবাবু। বোঝা গেল প্রভাকরের সঙ্গে পুরনো খাতিরের সম্পর্ক। ভদ্রলোককে যথাবিহিত আদর যত্ন, আপ্যায়ন করে বসিয়ে বিনীত গলায় প্রভাকর বলল, 'ওর ছকটা তাহলে দেখাই?'

'ছক তো দেখবই। তার আগে ছেলেকে দেখি—!' বললেন অরবিন্দবাবু, 'মেয়ের বিয়েতে এলাহি খাইয়েছিলেন মনে আছে? ছেলে কোথায়?'

'শুনছ!' আড়ালে থাকা স্ত্রীকে শুনিয়ে প্রভাকর বলল, 'খোকাকে ডেকে দাও তো—'

দিবাকর এল। উদাসীন মুখচোখ। কিছুদূর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মুখ নিচু করে।

'বাঃ! চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে শুক্রের জাতক।' এক পলক দেখেই অরবিন্দবাবু বললেন, 'নাম কী?'

'দিবাকর।'

'রবির প্রভাবও বর্তমান।'

হাত ধরে ছেলেকে কাছে টেনে প্রভাকর বলল, 'কাকাবাবুকে প্রণাম করো। নামী লোক। ভাগ্য বলে দেন।'

'বোসো ভাই, বোসো।' ভ্যাবচ্যাকা খাওয়া ছেলেটির হাতের ছোঁয়া থেকে নিজের পা দুটি আলাদা করে ডিভানের ওপর বাবু হয়ে বসতে বসতে প্রভাকরের দিকে হাত বাড়ালেন অরবিন্দবাবু।

'দিন দেখি ছকটা এবার।'

দৃশ্যটা পরিষ্কার মনে আছে দিবাকরের। হলদে রঙের তুলোট কাগজের ওপর লাল কালিতে ঘরকাটা বস্তুটির ওপর ঝুঁকে পড়েছেন অরবিন্দকাকা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'বছর চারেক আগে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছিল? আঘাত টাঘাত?'

দিবাকর তখন হাঁ করে গিলছে কথাগুলো। স্মরণ করার চেষ্টায় প্রভাকর মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে বলেছিল সে, 'বল খেলতে গিয়ে হাত ভেঙেছিল—দিদির বিয়ের আগে—'

'ভেঙেছিল তো! ভাঙতেই হবে।' হাসিটা পুরোপুরি ছড়িয়ে গেল অরবিন্দকাকার মুখে। রেকাবি থেকে এক খিলি পান তুলে গালে পুরতে পুরতে প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কন্যা লগ্ন! শনির প্রবেশ—ঠিকই আছে। শেষ ধাক্কাটা দিয়ে গেলেন—'

'কী বলছেন!'

'ছক ঠিকই আছে। সময় খারাপ ছিল। শোনো ভাই, সুসময় এসে যাচ্ছে। শুক্রের দশা পড়ছে, চলবে টানা কুড়ি বছর। মন দিয়ে পড়ো, সামনের বছর পাশ করবেই। কলেজেও যাবে। তারপর বাবার ব্যবসা—শুক্রের দশা, শুক্রের জাতক। শুধু ভোগ—। তবে, বিবাহ কিঞ্চিৎ দেরিতে। শুক্রের দশার অন্তিমে। বউয়ের রং চাপা, কিন্তু সুন্দর মুখশ্রী—। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, ব্যবসাই টানবে—'

নিজের ছকটাকে সেদিন থেকেই পুজো করে দিবাকর। পরের বছর ঠিক-ঠিক পাশ করে কলেজে ঢোকার পর বিশ্বাসটা বেড়ে যায় আরও। ঠিকানা খুঁজে, গলদা চিংড়ির মালাইকারি আর রাজভোগ নিয়ে অরবিন্দকাকাকে প্রণাম করে আসে একদিন।

এরই বছর দুয়েক পরে আর একটি ঘটনায় বিশ্বাসটা পাকা হয় আরও। দিবাকর তখন কলেজে। কোথাও কিছু নেই, বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল প্রভাকর। জ্ঞান ফিরল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। ডাক্তার বললেন, সেভেনটি-টু আওয়ারস্ না গেলে বলা যাবে না কিছু। ততদিনে দিব্যি গাড়ি ড্রাইভ করতে শিখে গেছে দিবাকর, সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিল অরবিন্দবাবুর কাছে। সব শুনে ও চিন্তা করে অরবিন্দবাবু বললেন, 'মৃত্যুযোগ নেই। তবে ভোগাবে। মঙ্গল, শনি, উভয়েই বক্রী। চিন্তা কী, ব্যবসাটা তুমিই দ্যাখো—'

দিবাকর জানে, ছক যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যেতে হবে। পরের দিন থেকেই ব্যবসা দেখতে শুরু করল সে। কাজের চাপে টান পড়তে লাগল সময়ে। কিছুদিন অনিয়মিত হল

কলেজে, তার পর আস্তে আস্তে কলেজ যাওয়া বন্ধ করল। মনটা অল্প খুঁতখুঁত করলেও খারাপ লাগল না খুব। ক্রমশ টের পেতে লাগল বইয়ের চেয়ে টাকায় সুগন্ধ বেশি। আর আশ্চর্য, প্রভাকরের আমলে কখনও যা হয়নি, দিবাকর দেখাশুনা শুরু করতে না-করতেই রমরম করে বাড়তে লাগল অনুরাধা কেটারিং। একটা অর্ডার সামলাতে না সামলাতেই এসে পড়ে আর একটার ধাক্কা। বালিগঞ্জ সামলে ছুটতে হয় সাহেবপাড়ায়। লক্ষ্মী আসেন পার্সোনাল সুপারভিসনে। যশ বাড়ে। টাকাও। ঢাকুরিয়ার তিনতলা ভিতের বাড়ির একতলা শেষ করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল প্রভাকর। চার বছরের মধ্যেই চটপট আরও দুটি ফ্লোর তুলে ফেলে দিবাকর। রাশিচক্রে বিভিন্ন গ্রহের ছবি দিয়ে তৈরি অনুরাধা কেটারার্সের চমৎকার ক্যালেণ্ডার ঝুলতে থাকে কাস্টমারদের ঘরের দেয়ালে কিংবা অফিসে। ব্যবসাটা ভালোই বোঝে দিবাকর। অর্ডার এমনিতেই আসে, তবু বড় অর্ডারের গন্ধ পেলেই হল—যে-কোনও রাস্তা ধরে শুরু হয়ে গেল ছুটোছুটি। কনে-বাড়ির কেটারিং পেলে নিউ মার্কেটের বাহারি ফুলের বোকে পাঠায় বরের বাড়ি। লেগে থাকে। জানে তো, সুযোগ সদ্ব্যবহারের জন্যেই।

এইভাবে সুখের ঢল নামে চারিদিকে। ছকে যে সারাক্ষণ চোখ বোলায় তা নয়। তবে একটা হিসেব রাখে মনে মনে। শুক্রের দশা চলবে কুড়ি বছর। এরই মধ্যে পার হয়ে গেল তার চোদ্দটি। বাকি থাকে ছয় বছর। কম কি! নারী সঙ্গের জন্যে মাঝে মাঝে মনও শরীরটা কুঁইকুঁই করলেও কষ্টটা চাপা দেয় ভাবে, দশা থাকতে থাকতেই বিয়েটা হুট করে লেগে যাবে একদিন—যে আসবে, রং চাপা হলেও তার মুখশ্রী সুন্দর। ভাবনাটা এলিমিনেশনের প্রসেস শিখিয়ে দেয় দিবাকরকে। যাতায়াতের রাস্তায় ফর্সা মেয়ে দেখলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না কোনওভাবে। ভাবে, লাভ কী!

একটা ঘটনা ঘটে যায় একদিন।

নিউ আলিপুরে স্টিল ফেবরিকো লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সেহানবিশের মেয়ের বিয়ের কেটারিংয়ের তদারকি করে বাড়ি ফিরছিল দিবাকর। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে, সেহানবিশের বড় ছেলে সুশান্ত ছুটে এল হঠাৎ।

'কোনদিকে যাবে, দিবাকর?'

'বাড়ি ফিরব, স্যার। ঢাকুরিয়া—'

'ওহ্! তাহলে তো ভালোই হল—'। পাতলা হতে শুরু করেছে নিমন্ত্রিতদের ভিড়। হই-হট্টোগোল কমে যাবার পর সানাইয়ের সুরেলা আওয়াজ মিঠে লাগছে কানে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে সুশান্ত হাঁকল 'এই যে, কমলিকা, তুমি গোলপার্কে যাবে তো? উঠে পড়ো এই গাড়িতে—'

ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে দিবাকর। অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে মেয়েটি এগিয়ে আসার সময় লক্ষ করল, মেয়েটির রঙ ময়লা, টান-টান স্বাস্থ্য। টিকালো নাক আর বড় বড় চোখে ফুটে উঠেছে কেমন একটা অহঙ্কারের ভাব। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁকা লেগে গেল বুকে। কেমন মিলে যাচ্ছে যেন!

গাড়ির কাছে এসে পড়েছে মেয়েটি। দিবাকর ভেবেছিল পিছনের সীটে বসবে। কিন্তু—সত্যিই কি ছক টানছে তাকে? সে কিছু করবার আগেই সামনের দরজাটা খুলে ধরে সুশান্ত বলল, 'উঠে পড়ো। দিবাকর, এ কমলিকা। তনুর ক্লাসফ্রেন্ড। রাত হয়েছে, ওকে একটু নামিয়ে দিও বাড়ির সামনে। মেনি থ্যাঙ্কস্।'

কী সুখ! গাড়ি ছেড়ে দিল কথাগুলি ভাবতে ভাবতে! বেনারসী, প্রসাধন সবকিছু মিলিয়ে বিয়ে বাড়ির গন্ধ কমলিকার শরীরে। গন্ধটা নাকে সইয়ে নিতে যতক্ষণ সময় লাগে তার আগেই ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছে গেল ওরা। পিছন থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের সুর। স্মার্ট হবার চেষ্টায় দিবাকর বলল, 'গোলপার্কের কোন জায়গায় যাবেন?'

'রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে—'

'ঠিক জায়গাটা বলে দেবেন, নামিয়ে দেব।'

কাঁধ তুলে ঠোঁটের ওপরটা ঘষে নিল দিবাকর। কপালে ও ঠোঁটের ওপর হালকা ঘাম জমতে শুরু করছে ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে। ফাঁকা রাস্তা হলেও এমন স্পিডে গাড়ি চালাতে লাগল যাতে মনে হবে যাবার তাড়া নেই কোনও।

'আপনার অসুবিধে করলাম না তো!'

নিজে থেকেই যখন কথা বলছে তখন নিশ্চয় স্মার্ট বলা যেতে পারে মেয়েটিকে। মাপা হেসে দিবাকর বলল, 'নট অ্যাট অল। আমি ঢাকুরিয়ায় যাব—গোলপার্ক দিয়েই যেতে হত—'

'আপনি কি তনুদের আত্মীয়?'

'না। তবে অনেক দিনের আলাপ।' দিবাকর বলল, 'আমার নাম দিবাকর গুহ। আপনার বন্ধুর বিয়েতে কেটারিংয়ের ভার আমাদের ছিল।'

'অনুরাধা কেটারার্স?'

দিবাকর হাসল। কনফিডেন্ট হাসি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে রীতিমতো হ্যান্ডসাম মনে হয় তার। মনে হয়, ছকের নির্দেশ না থাকলে সিনেমাতেও নামতে পারত।

'ও মা!' উচ্ছ্বাসের গলায় কমলিকা বলল, 'কী ভাল খাবার আপনাদের! মালাইকারিটা—সত্যি—ডেলিসাস!'

সম্ভবত খেতে ভালোবাসে কমলিকা। দিবাকর ভাবল, যদি এই মেয়েটি তার ভবিতব্য হয় তাহলে এই একটি ব্যাপারে সরবরাহে কোনও ত্রুটি থাকবে না তার। রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে ছকের টানেই এগোচ্ছে তারা। আসবার সময় গাড়ির সাস্‌পেনসারে একটা আওয়াজ হচ্ছিল, সেই শব্দটাও এখন আর নেই। অসুবিধে হল, যতই আস্তে গাড়ি চালাক, গোলপার্ক আর দার্জিলিংয়ের দূরত্ব এক নয়। পৌঁছে গেল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে কমলিকা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'গুড নাইট।' চমৎকার গলায় বলল দিবাকর। বাড়িটা ঠিক ঠিক চিনে নিয়ে ফেরার সময় দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে কমলিকা। এ ক্ষেত্রে ভাবল, 'আবার দেখা হবে' কথাটা বলা বাড়াবাড়ি হত।

সেদিন রাতে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুম এল না দিবাকরের। এত দিনের পরেও বিয়েবাড়ির গন্ধে যে নতুনত্ব আছে কোনও, এটা যেন আজই টের পাচ্ছে। মাথা জুড়ে একটিই দৃশ্য—নিজেই নায়ক, গাড়ি চলছে, পাশে কমলিকা, হাত নাড়ছে দরজায় দাঁড়িয়ে, ইত্যাদি। অবশেষে ঘুম যখন এল তখন শুক্ল পক্ষের চাঁদ নেমেছে তার দোতলার ঘরের জানলায়; নীচের তলায় প্রভাকরের ঘরের দেয়ালঘড়িতে তিনটে বেজে গেল।

ঘুম ভেঙে উঠতে উঠতে প্রায় সাড়ে নটা। অন্যদিন বেলা আটটা বাজতে না বাজতেই কাজে বেরিয়ে পড়ে সে, সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছে যায় ল্যান্সডাউন রোডে নিজের অফিসে কতদিন পরে আজ অভ্যস্ত রুটিনে ছেদ পড়ল মনে পড়ে না। তবু খারাপ লাগল না। এক আধ

দিনের অনিয়ম কিছু খারাপ নয়, এইভাবে যুক্তি সাজাতে গিয়ে আবার সে ঢুকে পড়ল গতরাতের দৃশ্যের মধ্যে। বড্ড বড় আর খটোমটো এই কমলিকা নামটা—ছোট করলেই কমলি হয়ে দাঁড়ায়। না, না—সেটা বিচ্ছিরি শোনায় কানে। তার চেয়ে ছক যখন এই নামটিই ছুঁড়ে দিয়েছ তার দিকে, মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি!

একই ভাবনার জের টেনে সাড়ে দশটা নাগাদ ঢাকুরিয়া থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছিল দিবাকর—প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত স্পিডে—যতটা দেরি মেকআপ করা যায়। কিন্তু, গোলপার্কের কাছাকাছি পৌঁছতেই মন্থর হয়ে পড়ল। বাসস্টপে কে? কমলিকা না! পোশাক বদলালেও মুখ কি আর বদলায়! হ্যাঁ, কমলিকাই। একটা বাস আড়াল করে দিয়েছিল—আড়ালটা সরে যেতেই গাড়িটা আস্তে আস্তে বাসস্টপের সামনে এনে দাঁড় করাল দিবাকর। মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কোনদিকে যাবেন?'

'আ-রে আপনি!' কমলিকা এগিয়ে এল, 'আমি ইউনির্ভাসিটি যাব।'

'তার মানে কলেজ স্ট্রিট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে দিবাকর বলল 'শ্যামবাজার। আসুন, উঠে পড়ুন।'

এ নিশ্চয় ছকের খেলা। তা না হলে কমলিকা তার সঙ্গী হবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেন! দিবাকর ভাবল, দেরি যখন হয়েইছে, আরও একটু হোক।

'আপনার জন্যে তবু একটা দিন বাসের উপদ্রব থেকে বাঁচা গেল!' কমলিকাই শুরু করল, 'যা ভিড় আর ঠেলাঠেলি!'

'আপনি রোজ এই সময়ে যান?'

'প্রায় এই সময়ে—'

অল্প মুষড়ে পড়ল দিবাকর। তার সময়ের সঙ্গে কমলিকার সময়ের ব্যবধান প্রায় দু ঘণ্টা। এতটা সময় মেক-আপ করবে কী করে! অবশ্য এখনই সমস্যার সমাধান করে দরকার নেই। তীক্ষ্ণ হর্ণ দিয়ে একটা মিনিবাস তাড়া করে আসছে পিছনে। সেটাকে পাশ দিয়ে দিবাকর বলল, 'কী সাবজেক্ট আপনার?'

'ইংলিশ লিটারেচার।'

'গুড।' কথাটা স্মার্টলি বললেও ভিতরে একটু গুটিয়ে গেল দিবাকর। এরপর কমলিকা যদি শেক্সপিয়ার না হ্যামলেট কী সব বলে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেয়, কী জবাব দেবে সে! বাবার অসুখ, ব্যবসা—এইসব অজুহাত দেখিয়ে একটি লেখাপড়া জানা মেয়ের কাছে পার পাওয়া যাবে না। তবে! অস্বস্তি নিয়েই অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে গেল সে। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে কতটা কনসেনট্রেশন দরকার হয় কমলিকা বুঝে নিক।

কমলিকা কিন্তু লেখাপড়ার লাইনেই গেল না।

'আপনাকে খুব খাটাখাটি করতে হয়, না?'

'তা হয়। অলমোস্ট ফোরটিন আওয়ারস, ডেইলি—'

'ইস!'

সহানুভূতিটা নকল নয়। তবে কিনা পুরোপুরি জমে ওঠার আগেই [illegible] স্ট্রিট এসে গেল আজ আর থ্যাঙ্ক ইউ বলল না কমলিকা। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ফুটপাথে। সোজাসুজি তাকাল দিবাকরের মুখের দিকে।

'চলি, আবার দেখা হবে—'

পরের দিন সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ আবার গোলপার্কে ফিরে এল দিবাকর এবং প্রায় মিনিট পনেরো ধরে বেশ কয়েকবার গোলপার্কটা চক্কর দেবার পর দেখল কমলিকা আসছে। আশেপাশে যারা ছিল তারা দেখল একটি যুবক গাড়ি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই একটি যুবতী ঝটপট উঠে পড়ল তাতে। এবং ইত্যাদি।

ব্যাপারটা জমে গেল। মাসখানেকের মধ্যেই পরস্পরের গভীর প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করল দিবাকর আর কমলিকা। এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এসেছে তারা। কলেজ স্ট্রিটের রাস্তাটা দিন দুয়েক বেঁকে গেছে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। চুমু খাবার একান্ত ইচ্ছা ম্যানেজ করতে হয়েছে হাফ-চুমু দিয়ে, তবে ছোঁয়াছুঁয়ি কম হয়নি। কমলিকা এখন কুমু। ছকের ব্যাপার—দিবাকর জানে, ছক যেদিকে নিয়ে যাবে সেদিকেই যেতে হবে তাকে।

বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরে তার অফিসে ফোন করল কমলিকা।

'শোনো, এক্ষুণি একবার দেখা করতে পারবে?'

'কী হল!'

'দেখা হলে বলব। আমি মেট্রোর সামনে দাঁড়াচ্ছি। তুমি চলে এসো।'

মাঘ মাস। বিয়ের মরসুম। রাশি রাশি অর্ডার আসছে, ম্যানেজ করা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। ব্যবসা ছেড়ে যখন তখন বেরিয়ে যাবার সময় নেই। খুঁতখুঁত করে মনটা। তবু উঠতেই হল দিবাকরকে।

কমলিকার মুখ ব্যাজার। বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। ওকে গাড়িতে তুলে সোজা পার্ক স্ট্রিটে তাদের চেনা রেস্তোরাঁটির নিরিবিলিতে নিয়ে এলো দিবাকর।

'কী খাবে? চিংড়ি কাটলেট?'

'তুমি খাও, আমার মুড নেই।'

'কী হয়েছে!'

কমলিকা জবাব দিল না। গালে হাত, মুখ নামানো। বোঝাই যায়, আজ সে ইউনিভার্সিটি যায়নি; এমনকী মিনিমাম সাজগোজটুকুও করেনি। অগত্যা দুটো কফির অর্ডার দিল দিবাকর।

'কী হয়েছে বলবে তো!'

কমলিকা হঠাৎ বলল, 'তুমি কবে বিয়ে করতে পারবে আমাকে?'

'বিয়ে! এখনই! এম-এ পরীক্ষাটা দাও!'

'চুলোয় যাক পরীক্ষা। তুমি পারবে কি না বলো?'

'কী আশ্চর্য! হঠাৎ যে কী হল বলবে তো!'

কমলিকা ঠোঁট কামড়ে ধরল। কফির কাপটা তুলতে যাচ্ছিল, খানিকটা কফি চলকে পড়ায় কাপটা নামিয়ে রাখল আবার।

'বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে—'

'অ্যাঁ!'

'অনেকদিন ধরেই কথা চলছিল। তোমাকে বলিনি।' হঠাৎ দিবাকরের হাত চেপে ধরল কমলিকা, 'বিশ্বাস করো। আমি ভাবতেই পারিনি—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল দিবাকর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে আমার এই ইয়েটা বাড়িতে জানে?'

কমলিকা মাথা নাড়ল, 'জানলে খেয়ে ফেলবে।'

'পাত্রটি কে?'

'ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে বাড়ি। একান্ন বাই তিনের পাঁচ—বাপ ব্যারিস্টার মিটার।'

কমলিকা দম নিল। তারপর বলল, 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পাশ করা। ওখানেই পড়ায়। চার পাঁচ মাস আগে দেখে গিয়েছিল, তখন কিছু বলেনি। কাল ওর বাবা এসেছিল। ছেলে নাকি একমাসের ছুটি নিয়ে আসছে—ফাল্গুনেই বিয়ে দিতে চায়। উঃ! অ্যাবসার্ড! আমি যে কী করব!'

কান্নার বেগ চাপা দিতে চোখে আঁচল চাপা দিল কমলিকা।

ঘটনাটা শুনেই চুপসে গিয়েছিল দিবাকর। কমলিকাকে কাঁদতে দেখে জোর পেয়ে গেল মনে। শুক্রের জাতক, শুক্রের দশা—হঠাৎ মনে হল, তার ছকে ভুল নেই কোনও। লণ্ডনই হোক বা নিউইয়র্ক, উড়ে এসে তার হবু বউকে বিয়ে করবে বললেই তো হয় না। সত্যিই অ্যাবসার্ড। এটা ছকের ব্যাপার। কিন্তু, আবার ভাবল, কমলিকার ছক কী বলে একটু দেখিয়ে নিলেই তো হয়।

'শোনো, আপসেট হবার কিছু নেই। তোমার ছক আছে?'

'ছক!'

'হ্যাঁ। কুষ্ঠি?'

দিবাকরের কথা শুনে কেমন অন্যরকম হয়ে গেল কমলিকা। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল 'আছে—'

দিবাকর বলল, 'আমার ছকে আছে তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবে। এখন তোমার ছকটা দেখিয়ে নিলেই হয়—'

'তুমি অ্যাসট্রোলজি জানো না কি?'

'না। অরবিন্দকাকা জানে। তাঁকে দেখাব।'

ব্যস্ত গলায় কমলিকা বলল, 'মায়ের দেরাজে আছে। আমি আজই দেখাতে চাই—'

দিবাকর বলল, 'অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন! এনে দিও। কাল দেখালেও চলবে।'

'আর ইউ সিওর, তোমার ছকে আছে?'

'সিওর রে বাবা, সিওর—'

বিশ্বাস-অবিশ্বাস মেশানো একরকম চোখে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির ভাবটা ফিরিয়ে আনল কমলিকা। আঁচলে মুখ মুছে বলল, 'আমার খিদে পাচ্ছে।'

পরের দিন সকালে অফিসে না গিয়ে দুটো ছক সঙ্গে করে অরবিন্দবাবুর বাড়িতে চলে গেল দিবাকর। রিটায়ার করলেও এখনও তেমনিই আছেন—অমায়িক, হাসিখুশি। সব শুনে বললেন, 'শুক্রের দশা কতদিন হল যেন?'

'প্রায় ষোল বছর।'

'মনে তো হয় হয়ে যাবে। মেয়েটির ছকটা কি এনেছ?'

কমলিকার ছকটি দেখানোর জন্যে অনেকক্ষণ ধরেই হাঁকুপাঁকু করছিল দিবাকর। চাইবার সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিল।

সরু রুপোর ফ্রেমের চশমাটা চোখে লাগিয়ে ছকটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন অরবিন্দবাবু। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠলেন।

'করেছ কি হে! অ্যাঁ! জাতিকার লগ্নে বৃহস্পতি। বিদুষী মেয়ে। কিন্তু কস্মিনকালেও এর

প্রেম করে বিবাহ হবে না।'

'কী বলছেন কাকাবাবু!'

'আমি কী বলব হে! ছকই বলছে। এ মেয়ের যার সঙ্গে বিবাহ হবে সে জাতিকার চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধিতে অনেক বড় হবে। ওই লণ্ডনের স্কুল না কি বললে?'

দিবাকর ডুবে যাচ্ছিল। বাঁচার শেষ চেষ্টা করে বলল, 'কিন্তু আমার ছক? কোনও উপায় দেখছেন না, কাকাবাবু?'

'মনে তো হয় না। তবু দেখি—'

কমলিকার ছকটি পাশে সরিয়ে দিবাকরের ছকটা হাতে তুলে নিলেন অরবিন্দ।

'সর্বনাশ! শুক্রে শনি বসে আছেন। জৈষ্ঠ্য মাসের আগে বিবাহের ধারে কাছে যেও না। এখন—এখন তোমার ব্যবসার খুব ভাল সময়। ধনলাভের সম্ভাবনা প্রবল—'

ছক দিবাকরকে সব দিয়েছে; ছকের বাইরে কোনও দিনও এক পা হাঁটেনি সে। যতই ভালোবাসুক কমলিকাকে, যন্ত্রণায় ফালা ফালা হয়ে যাক বুক—যা সম্ভব নয় তা ঘটবে কী করে! ফেরার পথে দুটো ছক আলাদা করে দু পকেটে রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে আঘাতটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করল দিবাকর। নিজের জন্যে কিছু নয়, সমস্যা কমলিকাকে নিয়ে। ঠিক দুটোর সময় ও অপেক্ষা করবে পার্ক স্ট্রিটের সেই রেস্তোরাঁর সামনে। হবে না বলা মানেই তো প্রত্যাখ্যান করা! কিন্তু উপায় নেই। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

দুটোর আগেই মন বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল দিবাকর। সকাল থেকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এরই মধ্যে অনেকটা জায়গা দখল করে ফেলেছে সে, ছকের ওপর আস্থাটা বেড়ে গেছে আরও। এখন ব্যবসার পক্ষে ভাল সময়। শুক্রে শনির ব্যাপারটা আগে জানতে পারলে কখনই ঝুলত না কমলিকার সঙ্গে। তবু ভাল, আরও দূর গড়াবার আগেই ব্যাপারটা জানা গেল।

কমলিকা এল কাঁটায় কাঁটায় দুটোয়। তাড়াতাড়ি হেঁটে আসার কারণে এবং উত্তেজনায় মুখের চাপা রঙে ফুটে উঠেছে বেগুনি আভা। হাঁপাচ্ছে অল্প। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'ভিতরে চলো, বলছি।'

ইচ্ছে করেই আজ পাশাপাশি না বসে প্রথমে কমলিকা কোথায় বসছে দেখে নিল দিবাকর এবং ঠিক তার উল্টোদিকে, মুখোমুখি বসল। গা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা কালকেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া, আর একটা কথাও ভাবছিল দিবাকর—সামনের দৃশ্যটি ভয়ঙ্কর, বেচারী কমলিকা, উত্তেজনায় মাথায় কামড়ে-টামড়ে দিলে ওকে দোষ দেওয়া যাবে না। বরং আগে থেকেই নিরাপদ দূরত্ব খুঁজে নেওয়া ভাল।

দুটো ফ্রেশ লাইম অর্ডার করল দিবাকর এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় পকেট থেকে কমলিকার ছকটা বের করে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'এটা ব্যাগে রাখো।'

'কী হল বলবে তো!'

'বলছি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! ওটা আগে ব্যাগে রাখো।'

ঈষৎ সন্দেহের চোখে দিবাকরের দিকে তাকাল কমলিকা। তারপর ছকটা ঝটপট ব্যাগে ভরে নিয়ে বলল 'বলো!'

ইতিমধ্যে ফ্রেশ লাইম এসে গিয়েছিল। নিজের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে দিবাকর বলল, 'বলছি। আগে ওটা খেয়ে নাও। তুমি এখনও হাঁপাচ্ছ—'

আবার দিবাকরের দিকে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে গ্লাসটা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখল কমলিকা।

'আর কী ফরমাশ আছে তোমার?'

'রাগ করছ!' দিবাকর নরম হল এবার, 'কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না!'

'তার মানে?'

দিবাকর সাহস সঞ্চয় করল এবং নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'তোমার লগ্নে বৃহস্পতি। আমার সঙ্গে হবে না। মনে হচ্ছে ওই লোকটার সঙ্গেই—'

সমস্ত বেগুনি আভা হারিয়ে ফেলল কমলিকার মুখ। ক্রমাগত ছোট ও বড় হতে হতে স্থির হয়ে এল টিকালো নাকটা। ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল অদ্ভুতভাবে। কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত চোখে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বদমাইশ! তাহলে এতদিন ঘোরালে কেন?'

'আমি কোথায় ঘোরালাম, তুমিই তো ঘুরলে!' দিবাকর তৈরিই ছিল; জানে, কমলিকা আপসেট হবে, যা-তা বলবে। কিন্তু তাকে ঠিক থাকতে হবে। বলল, 'আমি কি করব! তোমার ছকে আছে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, খুব বিদ্বান লোকের সঙ্গে আমি একটা গ্র্যাজুয়েটও নই। তা ছাড়া—' শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল দিবাকর, 'আমার এখন শুক্রে শনি চলছে—'

'শুক্রে শনি চলছে!' চাপা গলায় ফুঁসে উঠল কমলিকা, 'ইললিটারেট, লোফার কোথাকার! এখন কুষ্ঠি দেখাচ্ছ!'

'কুমু শোনো—'

'চুপ করে থাকো!' পাশে রাখা ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কমলিকা, 'লামপিশ্ পিগ! তোমার জন্যে আমার বিয়ে আটকাবে না—'

এমনই ঝটকা দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করল কমলিকা যে টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটা উল্টেই পড়ছিল, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল দিবাকর। এবং দেখল, আঁচল উড়িয়ে দ্রুত বেরুবার দরজার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে কমলিকা। তারপর সত্যি সত্যিই বেরিয়ে গেল।

বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল দিবাকরের। বেয়ারা এগিয়ে আসতে একটা কফির অর্ডার দিল সে এবং ব্যথাটা সহ্য করতে করতে ভাবল, কমলিকা তার সততার দাম দিল না। মাঝখান থেকে কতগুলো ইংরিজি গালাগাল দিয়ে গেল। লামপিশ্ না কি, কথাটার মানে সে জানে না। পিগ মানে অবশ্য শুয়োর। যাক্ গে—এ সবই হয়তো তার প্রাপ্য। ছকই দিচ্ছে। একটা পর্ব চুকে গেল। ছকের নির্দেশে শিগগিরই কমলিকার বিয়ে হয়ে যাবে ব্যারিস্টার মিটারের লণ্ডনে থাকা ছেলের সঙ্গে। হয়তো বিয়ের পরই চলে যাবে লণ্ডনে। গোলপার্কের কাছে বাসস্টপে আর ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আর তাকে—তাকে মন দিতে হবে ব্যবসায়। অরবিন্দকাকা বলেছিল—

এই সময় ধাঁ করে অন্য একটা কিছু চিন্তা মাথায় ঢুকে পড়ল দিবাকরের। বিয়ে মানেই তো খাওয়া দাওয়া, কেটারিং! ব্যবসা! কমলিকার বিয়ের অর্ডারটা নিশ্চয় সে পাবে না। কিন্তু পাত্রপক্ষ তো কিছুই জানে না। ব্যারিস্টার বাপের বিলিতি ছেলে—নিশ্চয়ই এলাহি খরচ করবে। দারুণ প্রসপেক্ট! ঠিকানাটা কী যেন বলেছিল কমলিকা? ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে—হ্যাঁ, একান্ন বাই তিনের পাঁচ কি?

না, এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ঠিকানা খুঁজে কালই যেতে হবে। বেয়ারা কফি নিয়ে আসতেই দিবাকর বলল, 'ভাই, তোমাদের টেলিফোন ডিরেক্টরিটা নিয়ে এসো তো—'

উনসত্তর আর তেষট্টি

স্মৃচিস্মিতা ভট্টাচার্য

হানিমুনে চলেছেন তপোধীর আর করুণা। ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট দশেক বাকি, শেষ বারের মতো মালগুলো গুনে নিচ্ছেন তপোধীর। সুটকেস এক, প্লাস্টিকের থলি দুই, বালতিব্যাগ এক, ঢাউস কিটব্যাগ এক, কাঁধঝোলা ব্যাগ এক, টিফিন কেরিয়ার এক, ওয়াটারবটল্ এক। ওহো, ছোট বেডিংটাও তো আছে, ট্রেনের জন্য। মোট তবে হল গিয়ে নয়। সঙ্গের গন্ধমাদনটিকে ধরলে অবশ্য হয় দশ। হাঁটতে চলতে দিশা পায় না, ধপাধপ যেখানে সেখানে বসে পড়ে, কোথাও একবার দাঁড়িয়ে পড়লে নড়ায় কার সধ্যি, এমন মেয়েমানুষ গন্ধমাদন ছাড়া আর কী! জানলার ধারে কেমন ঘটটি হয়ে বসে পড়েছে দ্যাখো! সাংসারিক নির্দেশ দেওয়া চলছে পুত্রবধূকে।

তপোধীর অধৈর্যভাবে বললেন,—পা'টা একটু তোলো তো। সুটকেসটা ভেতরে ঠেলি। একগাল জরদা পান মুখে অবহেলা ভরে তাকালেন করুণা,—তাড়া কোরো না তো। সব হবে। রন্টু সব ঠিক করে দেবে।

'আমার তাড়া আছে। পা সরাও।'

'আহ্, চুপ করে একটু বোসো তো। কাজের কথা সেরে নিতে দাও।'

কাজের কথা, না গুষ্টির পিণ্ডি। তপোধীর উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঠেলে ঠেলে বালতি ব্যাগ ঢোকাচ্ছেন বার্থের নীচে। সাত দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া, তার জন্য মালও কিছু নিয়েছেন বটে করুণা! নিয়েই দায় শেষ। এখন ম্যাও সামলাবে এই বুড়ো চাকর। তপোধীর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এবার টানলেন সুটকেসটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে রন্টু, 'ওটা ওখানে থাক বাবা। মা পা রাখবে।'

'তারপর রাতে কেউ নিয়ে নেমে গেলে কী হবে? তোমার মার ঘুম ভাঙবে?'

'ব্যস্ত হতে হবে না। চেন দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। চাবিটা শুধু কাছে ঠিক করে রাখো, তা হলেই হবে।'

তপোধীর সোজা হলেন অগত্যা। গিন্নির কাছে হেরে যাওয়া মুখে বসেছেন এক কোণে। মরুক গে যাক, যে যা খুশি করুক। এখন তিনি এদের হাতের পুতুল। যেমন ইচ্ছে নাচাচ্ছে। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে দুখানা টিকিট এনে হাতে ধরিয়ে দিল। তোমাদের দুজনের তো এক সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় না বাবা, যাও একবার জোড়ে সমুদ্র ঘুরে এসো। আর এই রইল হোটেলের রিজারভেশন, সাত দিনে একটু চাঙ্গা হয়ে এসো তো দেখি। প্ল্যানটা অবশ্য রন্টুর একার নয়, এর পিছনে মেয়ে জামাইয়েরও ষড়যন্ত্র আছে। ভালমানুষ মুখ রন্টুর বউটিও কম যায় না।

আর ওই যে রিন্টির মেয়ে বাবলি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চুকুর চুকুর করে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাচ্ছে, সে বেটিরও সেদিন কী উল্লাস! ইইহ্, কী থ্রিলিং! দাদু দিদা হানিমুনে যাচ্ছে! ভূভারতে কেউ শুনেছে বাবা-মার বিবাহবার্ষিকীর দিন এই সব মতলব ভাঁজে ছেলেমেয়েরা! ট্রেনের টিকিট, হোটেলের বুকিং উপহার দিয়ে বাবা মার বিয়ের চল্লিশ বছর পালন করে! ফাজলামি।

কামরার জানলায় অরুণাংশু। জামাই। ছেলেরই সমবয়সী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ক্লাসমেট ছিল, তখনই রিন্টিকে গেঁথেছে। হাইপাওয়ারের চশমার আড়ালে ছোকরার চোখ হাসছে ফিক ফিক, 'বাবা, চা খাবেন?'

তপোধীরের তেমন কোনও নেশা নেই, তবু চায়ের নাম শুনলেই জিভ যেন একটু শুলিয়ে ওঠে। বললেন, 'লিকার চা হবে?'

রন্টুর বউ ফুট কাটল, 'এখানে লিকার চা কোথায় পাবেন বাবা?'

'থাক তা হলে। দুধ চা আমার... তোমার শাশুড়িকে দাও বরং।'

'আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিয়েছি। নেশার জিনিস বলে কথা।' সন্তর্পণে পিক ফেললেন করুণা, 'ট্রেন ছাড়লে একটু কফি খাব।'

ধন্যি মেয়েমানুষ! কত যে নেশা! চা কফি পান জরদা মৌরি সুপুরি জোয়ান...। দাঁত মাজার সময়ে আবার গুড়াখু চাই। সুযোগ পেলে বোধহয় বিড়ি সিগারেট নস্যিটাও ধরে ফেলতেন।

সিগন্যাল হয়ে গেছে। বউয়ের ইশারায় রন্টু নেমে গেল কামরা থেকে। সামনের স্টল থেকে ম্যাগাজিন হাতে দৌড়ে এল রিন্টি। তপোধীরের হাতে পৌঁছনোর আগে করুণা খপ্ করে নিয়ে নিলেন পত্রিকাটি। এক গাল হাসিতে মুখ ভরে গেল, 'ওমা, এ যে দেখি শচীনের ছবি।'

তপোধীর সরু চোখে তাকালেন, 'তুমি আবার শচীনকে কবে থেকে চিনলে?'

'আমি সব্বাইকে চিনি। শচীন আজাহার মোঙ্গিয়া শ্রীনাথ...তারপর আমাদের ওই ছেলেটা... সৌরভ গো। আহা, কী মিষ্টি মুখখানা।'

'এই করেই তো দেশের ক্রিকেটটা ডুবল। যত মূর্খের দল এখন খেলার সমঝদার হয়েছে।' তপোধীর ভেংচে উঠলেন, 'আহা, কী মিষ্টি মুখখানা। হ্যাহ্।'

'অ্যাই, মূর্খ মূর্খ করবে না তো।' মেয়েরা কি খেলা বোঝে না? গালি থার্ডম্যান মিডঅন মিডঅফ সব নাম আমি জানি। এই তো সেদিন রাহুল স্লিপে কী সুন্দর একটা ক্যাচ ধরল...

'থাক, নাতি নাতনির মুখের ঝাল খেয়ে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না।'

ট্রেন দুলে উঠল। রিন্টি জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে ছুঁল মাকে, 'সাবধানে যেও। দুজনে যেন সারাক্ষণ লড়াই কোরো না।'

'আমাকে বলছিস কেন? তোর বাবাকে বলে দে।'

'বাবা, তুমি কিন্তু একদম মাথা গরম করবে না।'

তপোধীর জবাব দিলেন না। প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সরে যাচ্ছে কোলাহল। সরে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ জামাই নাতনি। হাত নাড়ছে। রন্টুর গলা উড়ে এল, 'কেসটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেল রে। পুরীর সি-বিচে না দুটো লাশ পড়ে থাকে। স্কন্ধ কাটা!'

তপোধীর গুম হয়ে গেলেন। সবই যখন জানা, তখন জোর করে পাঠানোর কী দরকার ছিল? কেন যে টিকিট দুটো কুঁচিয়ে ফেলেননি তপোধীর!

ট্রেন কারশেড পেরোল, এগোচ্ছে ঘটাং ঘটাং। এখনও শহরের আলো ঘিরে আছে

ট্রেনটাকে। তপোধীরের কুপের মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল। সামনের তিন যুবক, সম্ভবত সেলসে চাকরি করে, উচ্চৈস্বরে গল্প জুড়েছে। উল্টোদিকের দুই জানলায় দুই ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনী ভাবলেশহীন মুখে বাইরে তাকিয়ে। সব প্যাসেঞ্জার এখনও থিতু হয়নি, অনেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। পাশের কুপে দুটো বাচ্চা কাঁউমাউ করে ঝগড়া করছে। যে দঙ্গলটা একটু আগেও এ জায়গাটা বোঝাই করে রেখেছিল, বোধহয় তাদেরই কেউ। অসহ্য।

করুণা হাতের ম্যাগাজিন তপোধীরের কোলে ফেলে দিলেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, 'সকালে কটায় ঠিক আমরা পৌঁছব গো?'

তপোধীর বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি ট্রেনের টাইম টেবিল নই। বলতে পারব না।'

'সে তো জানিই। তুমি হলে গিয়ে খাওয়ার টাইম টেবিল। সাড়ে সাতটায় এই চাই, নটায় এই চাই, সওয়া বারোটায় এই চাই...'

'দাও কেন? না দিলেই পারো।'

'ওখানে গিয়ে দেব না। তোমার এই পৌনে চারটের মুসুম্বি, সওয়া পাঁচটায় ছানা, ওসব তুমি নিজে জোগাড় করবে।'

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'না, বলে দিচ্ছি। বেড়াতে গিয়ে আমাকে দিয়ে খাটাবে, ওটি হবে না।'

'তা হলে করবে কী সারা দিন? ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে?'

'মোটেই না। ঘুরব, ফিরব, সকাল বিকেল প্রাণ ভরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করব ছেলেমেয়ের দয়ায় সুযোগটা যখন এসেই গেল...

একেই বলে নেমকহারাম। বিয়ের সময়ে ক'টাকাই বা মাইনে ছিল তপোধীরের যে বছর বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন। করতেন তো কলেজের মাস্টারি, সাকুল্যে তেন দেড়শো টাকা, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যেত। তারপর যখন মাইনে টাইনে বাড়ল, তখন ছেলে মেয়ের পড়াশুনো নিয়ে হিমশিম দশা। তার মধ্যেও কি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরোননি দু-চারবার? এই পুরীতেই তো গিয়েছিলেন। বছর ঘুড়ি আগে। কপাল খারাপ, পৌঁছেই রিস্টির খুম জ্বর। কোথাও বেরনো হল না, সমুদ্রে নামা হল না, শুধু হোটেল আর ডাক্তারখানা। তাও মেয়ের জ্বর কমার পর একদিন সবাইকে নিয়ে কন্ডাক্টেড্ ট্যুরে বেরিয়েছিলেন তপোধীর। কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন। ফেরার দিন সকালে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়াও হয়েছিল করুণার। সে সব কথা কি করুণা ভুলে গেছেন!

তপোধীরের ঈষৎ অভিমান হল। ভার গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, ছেলেমেয়েই তো তোমায় ঘোরাচ্ছে জীবনভর।'

'ঘোরাচ্ছেই তো। মেয়েজামাই নিয়ে গেল বলে তবু কেদার-বদরি দর্শন হল। ছেলের কল্যাণে তিরুপতি-কন্যাকুমারিকা।'

'তার আগে তো জীবনভর তুমি ঘরেই বন্দি থেকেছ!'

'ছিলামই তো। ধম্মের মধ্যে কম্মো, একবার পুরী, একবার দার্জিলিং, আর একবার সিমলা! তারপর থেকে তো শুধু ঘাটশিলা আর শিমুলতলা, শিমুলতলা আর ঘাটশিলা।'

'তুমি একটি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। রিটায়ারমেন্টের আগে এই পুরী যাওয়ার জন্য

তোমাকে দুবার সেধেছিলাম আমি। টোয়াইস্। মনে পড়ে?'

'হবে হয়তো।' করুণা অবলীলায় এক টিপ জরদা ছুড়লেন মুখে, 'আমার শুধু মনে পড়ে তোমার সঙ্গে একবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল। গরুর মতো হেট হেট করতে করতে মন্দিরে ঢোকালে, আর পাঁচন বড়ি দিতে দিতে বার করলে।'

'সে তো ফেরার ট্রেনের তাড়া ছিল বলে।' চটপট বলে উঠলেন তপোধীর।

'ট্রেন কিন্তু ছিল সন্ধেবেলা।'

তপোধীর অপ্রতিভ মুখে হাসলেন একটু, 'সেই কথা এখনও মনে পুষে রেখেছ!'

করুণার গাল ফুলল, 'আমার সব মনে থাকে। কিছু ভুলি না।'

তপোধীর চুপ মেরে গেলেন। আড়চোখে একবার সহযাত্রীদের দেখলেন, একবার স্ত্রীকে। ওই গোলগাল ফরসা মুখ, পুতুল পুতুল চোখের মহিলাটিকে চল্লিশ বছরেও ঠিক চেনা গেল না। কত দরকারি কথা অনায়াসে ভুলে যায়, অথচ বিশ বছর আগের তুচ্ছ স্মৃতিও যত্ন করে সাজিয়ে রাখে মনে। কেন যে এমন হয়!

শহরতলি পার হয়ে ট্রেনের গতি বেড়েছে। দুদিকে এখন জমজমাট অন্ধকার, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আলোর ফুটকি। মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি শোভিত উঠে পড়েছে উপরের বার্থে, এখন শোওয়ার তোড়জোড় করছে। দুই সন্ন্যাসিনীও শোওয়ার সিট জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে, মুখোমুখি বসে কথা বলছে। তিন যুবকের একজন তপোধীরের পাশে এসে বসল, হাঁটুতে ব্রিফকেস রেখে তিন সঙ্গী তোড়জোড় করছে তাস খেলার। তপোধীর একটু সরে এলেন করুণার দিকে। শেষ ফাগুনের বাতাস হু হু করে ঢুকছে জানলা দিয়ে। ঠাণ্ডা হ'ওয়া, তবে কামড় নেই। ভারী নরম, মিঠে।

কফিওলা এসে গেল। হেঁকে হেঁকে কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছে। তপোধীর গলাতে চাইলেন করুণাকে, 'কফি খাবে না?'

করুণার চোখ জানালার বাইরে। ঘুরলেন। গুমগুম স্বরে বললেন, 'থাক।'

'থাকবে কেন? খাও না।' বলেই কফিওলার দিকে অর্ডার ছুড়েছেন তপোধীর, 'দুটো কফি দাও দিকি। একটাতে দুধ একটু কম।'

'দুধ তো আমাদের মেশানোই থাকে দাদু।'

'ঠিক আছে, তবে তাই দাও।'

'তুমি এখন কফি খাবে নাকি?' করুণার ভুরু কপালে জড়ো, 'তোমার না কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না!'

'একদিন, কিছু হবে না।'

'না। এর পর কাল সকাল থেকেই তো বুক জ্বালা অম্বল এসব শুরু হবে।'

'সকালের ভাবনা সকালে।' কাগজের গ্লাস করুণার দিকে এগিয়ে দিলেন তপোধীর। নিজেরটাও নিলেন। চুমুক দিচ্ছেন। একটু ঝুঁকলেন স্ত্রীর দিকে। যুবকদের কান বাঁচিয়ে নীচু গলায় বললেন, 'একটা রাত নয় নাই ঘুমোলাম।'

'হঠাৎ এমন বদ খেয়াল?'

'আমাদের তো আর আগে হানিমুন হয়নি। ছেলেমেয়েরা যখন পাঠালই, তখন নয় আজ রাত থেকেই...

'ন্যাকামো। সকালবেলা যদি বলো ঘুম হয়নি বলে পেটে গ্যাস হয়েছে, তখন কিন্তু আমি তোমার ধুধধুড়ি নেড়ে দেব।'

কফির গ্লাস বাইরে হাওয়ায় ছুড়ে দিলেন তপোধীর। দুহাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন স্ত্রীকে, 'আমার কাঁচকলা হবে। গিয়েই একটা এমন সমুদ্রে স্নান করব, শরীরটা তর হয়ে যাবে।'

'সে কী! তুমি সমুদ্রে নামবে নাকি!'

'তা হলে আর পুরী যাওয়া কিসের জন্য!' আবার গলা নামালেন তপোধীর, 'কেন, তুমি নামবে না?'

'মরে গেলেও না।' করুণাও ফিসফিস করছেন, 'জলে নামলে কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না। মনে নেই সেবার দিঘায় গিয়ে কী অবস্থা! বাবলি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল...

'ও, এই কথা। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কী হবে?'

'আমার সব খেয়াল থাকে। তোমার জন্য একটা এক্সট্রা আন্ডারওয়ার এনেছি।'

'আমি আন্ডারওয়্যার পরে সমুদ্রে নামব!' বিস্ময়ে কথাগুলো ঠিকরে এল করুণার গলা থেকে, 'তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?'

তিন যুবক তাস খেলতে খেলতে টেরচা চোখে তাকাচ্ছে। মুখ টিপে হাসছেও যেন। তপোধীরের লোমঅলা বড় বড় কান লাল হয়ে গেল। মিনমিনে, কিন্তু মরিয়া স্বরে বললেন, 'অসুবিধের কী আছ। শাড়ি সায়ার নীচে পরবে।'

'ছিঃ।'

'অতই যদি লজ্জা, তবে কারুর একটা সালোয়ার কামিজ আনলে না কেন?'

'চুপ করো তো। পাগলের মতো কথা বোলো না।' করুণা কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে নিলেন, 'তোমাকেও জলে নামতে হবে না।'

'কেন?'

'প্রেশারের রুগি, সমুদ্রে নামবে কী?'

'কালকেই আমি প্রেশার চেক করিয়ে এসেছি। ওষুধও আছে সঙ্গে।'

'থাকুক। রন্টু আমাকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে, 'বাবা যেন নুনজলে না নামে।'

'বললেই হল। রন্টু কি আমার গার্জেন?' তপোধীরের গলায় ঝাঁঝ ফিরে এল।

'দেখাশুনো যখন করে, তখন গার্জেন তো বটে।'

'এই করে করে তো ছেলেকে মাথায় তুলেছ। বাপকে কেয়ার করে না।'

'অমান্যিটা কী করেছে?'

'করেনি! ওইটুকু ছেলেকে পই পই করে হস্টেলে পাঠাতে বারণ করলাম। হস্টেলে না পাঠালে কি ছেলে মানুষ হয় না?'

'তা ওদের ছেলে, ওরা যা খুশি তাই করেছে। তোমার কী?'

'আমার শরীর নিয়েও আমি যা খুশি করব। জলে নামব।'

'নেমে দেখো। আমি পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব।'

অসহায় ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করলেন তপোধীর। করুণা সব পারেন। বপুতেই শুধু

গন্ধমাদন নয়, তাঁর মতটিও নড়ানো বড় কঠিন কাজ। এক সময়ে, তখন রিন্টি কোলে, রন্টু বছর চারেকের, খুব ব্রিজ খেলার নেশা হয়েছিল তপোধীরের। কলেজ থেকে চলে যেতেন তাসের আড্ডায়, ফিরতেন সেই সাড়ে দশটা এগারোটায়। করুণা খুব রাগারাগি করতেন, বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে ভয় দেখাতেন। তপোধীর আমল দেননি। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘর শুনশান, ছেলেমেয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি কোন্নগর চলে গেছেন করুণা। পাঁচ সাতদিন মাথা ঘামাননি তপোধীর, হাত পুড়িয়ে রেঁধে বেড়ে কলেজ করেছেন। তারপর এক সময়ে টনক নড়ল। কোন্নগরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আরও বিপত্তি। করুণার এক গোঁ। ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্যি গালতে হবে আর কখনও তাস ছোঁবেন না তপোধীর, তবেই ফিরবেন করুণা। তপোধীরকেই হার মানতে হয়েছিল সেবায়। সে নিয়ে অবশ্য এখন আর কোনও খেদ নেই তপোধীরের, তাস ছেড়ে ছেলেমেয়ের পিছনে সময় ব্যয় করা আখেরে ভালই ফল দিয়েছে। দুজনেই কৃতী হয়েছে লেখাপড়ায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে তপোধীরের। বাপ মাকে যথেষ্ট মান্যিগন্যিই করে ছেলে মেয়ে।

তবে এই মুহূর্তে সে কথা স্মরণে আনতে রাজি নন তপোধীর। গাল ঝুলিয়ে বসে আছেন। প্রচণ্ড গতিতে একটা ছোট্ট ব্রিজ টপকে গেল ট্রেন। জানালার দিকে তাকালেন না তপোধীর।

করুণা হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমে যাচ্ছেন। দুই সন্ন্যাসিনীর মাঝে কোথ্থেকে এসে বসেছে এক দাড়িওলা সাধু, ঝালমুড়ি খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। টিটিকে কাছে আসতে দেখে শুট করে উঠে দাঁড়াল, গেরুয়া সামলে কেটে পড়ছে দরজার দিকে। তিন যুবক ডুবে আছে রামিতে, কাগজে হিসেব লিখছে বার বার।

খেলার পত্রিকাটা উলটোলেন তপোধীর। অসংলগ্নভাবে। দু-চারটে পাতা রেখে দিলেন ম্যাগাজিনটা।

করুণা ফিরে এসে বললেন, 'ম্যাগোঃ, বাথরুম কী নোংরা।'

তপোধীর উত্তর দিলেন না।

করুণা মুখ টিপে হাসলেন, 'রাগ করো কেন? আমি যা বলি, ভালর জন্যই বলি।'

তপোধীরের কথা বলার ইচ্ছে হল না। করুণা এক দৃষ্টে দেখছেন স্বামীকে, 'ঠিক আছে বাবা, নেমো সমুদ্রে। বেশিক্ষণ থেকো না।'

'আর তুমি?' তপোধীরের ঘাড় শক্ত।

'গিয়ে দেখা যাবেখন।' করুণার হাসি ছড়িয়ে গেল, 'এবার টিফিন কেরিয়ারটা পেড়ে দাও দিকি। নটা বাজে, খাওয়াটা আগে সেরে নাও।'

তপোধীরের রাগ নিবে এল। নিঃশব্দে উঠে চার থাকের কৌটোখানা নামালেন,

'মেনু কী?'

'তোমার জন্য মালাই চমচম আছে। নরম পাকের সন্দেশও। তোমার মেয়ে এনেছিল।'

'বউমা দুপুরে আলুর দম বানাচ্ছিল না! গন্ধ পাচ্ছিলাম!'

'আছে গো আছে। তোমার আলুর দমও আছে। দুপিস মাছভাজাও।'

'তুমি মাছভাজা ভালোবাসো, ও দুটো তুমিই খাও। আমাকে খালি লুচি আলুর দম দিলেই হবে।'

'লুচি কোথায় পাব?'

'পাবে মানে! রিন্টি আর বউমা যে তখন লুচি ভাজছিল।'

'সে তো ওদের জন্য। আমাদের জন্য ওরা নরম করে রুটি বানিয়ে দিয়েছে।'

'লুচি দেয়নি!' তপোধীর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'অমন করো কেন? তোমার না ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। ঠাণ্ডা লুচি খেলে তুমি হজম করতে পারবে?' টিফিন কৌটোর ঢাকনা খুললেন করুণা, 'বউমা দিতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।'

তপোধীর রাগ করতেও ভুলে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন:

'শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বান্ধি কোথা!' বউই যদি শত্রু হয়...। 'দুধ নেই, কিছু নেই, আমি রুটি চিবোতে পারব না।'

'তোমার জন্য সেই আচারটা এনেছি গো।' করুণা যেন শিশুকে ভোলাচ্ছেন, 'সেই যে গো মিক্সড পিক্‌ল্। তুমি ভালোবাসো বলো সেলস্ গার্লের কাছ থেকে কিনেছিলাম।'

ট্রেনের গতি কমছে। খড়গপুর এসে গেল। ভেন্ডাররা জানলায় খাবার হাঁকছে। ছেলে তিনটে তাস বন্ধ করে পুরি তরকারির হুকুম ছুড়ল। ওপরের বার্থের লোকটা তরতরিয়ে নেমে চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। দুই সন্ন্যাসিনী উদাসীন স্বরে ডিমওলাকে ডাকছে।

তপোধীরও উঠে জানালায় গেলেন, 'অ্যাই আমাকে দুটো বয়েলড এগ দাও তো।'

টিফিন কেরিয়ার পাশে রেখে বাবু হয়ে বসেছেন করুণা। ঝুলি থেকে প্লেট বার করেছেন, গ্লাস বার করেছেন, আলুর দম তুলছেন চামচ দিয়ে। অবাক মুখে বললেন,

'তুমি এখন ডিম খাবে?'

'খাব। অ্যাই, দুটো ডিমের দাম কত?'

'আমি কিন্তু খাব না।'

'খেয়ো না। আমি একাই খাব।'

'আর সারা রাত বেলুনের মতো ফুলব!' করুণার চোখ থমথমে, 'নুন ছাড়া খাবে কিন্তু।'

'সব ব্যাপারে হুকুম ফলাবে না। আমি দুটোই খাব। উইথ সল্ট।'

কচকচ ডিমসেদ্ধ চিবোচ্ছেন তপোধীর। নুন মাখিয়ে। করুণাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন করুণা, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

ট্রেন ছাড়ল। তিন যুবক খাওয়া সেরে মৌজ করে সিগারেট ধরিয়েছে, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে কূপে। মাঝবয়সী লোকটা আধ ডজন কলা হাতে পাকা মাদারির মতো টঙে উঠে গেল। ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনীরাও রাতঘুমের নিরাসক্ত তোড়জোড় চালাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব বেড়েছে সামান্য। এমন কিছু বেশি নয়।

বাথরুম সেরে ধুতি বদলে লুঙ্গি পরে এলেন তপোধীর। করুণা ইতিমধ্যেই তিন যুবকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন, তাদের হাঁড়ির খবর বার করছেন টেনে টেনে।

তপোধীর গিন্নির মেজাজটা পড়ার চেষ্টা করলেন। একটু খোশামোদের সুরে বললেন, 'তোমার চাদর বার করে দিই?'

করুণা শুনেও শুনলেন না।

তপোধীর আবার বললেন, 'সুতির চাদরটা বার করব?'

'না।'

'বাপস্ কী তেজ গলায়!' তপোধীর মুখ হাসি হাসি রাখারই চেষ্টা করলেন, 'আনালাটা বন্ধ করে দাও না।'

'কেন?'

'কেন আবার কী? তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'জানালা বন্ধ করলে আমার গরম লাগবে।'

এরই নাম বাতিক। ইনি আবার অন্যের পিছনে লাগেন! তপোধীর গার্জেনের গলায় বললেন, 'রাতের ট্রেনে কারুর গরম লাগে না।'

'আমার লাগে।'

'শুনলে পাগলেও হাসবে।' স্ত্রীকে টপকে ঝুপ করে কাচ নামিয়ে দিলেন তপোধীর। দুটো জানালারই। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'একটু গরম লাগুক। কদিন আগেই গলা ব্যথা হয়েছিল। সে খেয়াল আছে?'

করুণা বিশেষ পাত্তা দিলেন না, আবার গল্প জুড়েছেন সামনের ছেলেটির সঙ্গে। ভাঁজ করা ধুতি কিটব্যাগের ওপর রেখে পাশের চেন খুললেন তপোধীর। হাতড়াচ্ছেন। 'আমার প্রেশারের বড়িগুলো গেল কোথায়?'

'যেখানে রেখেছিলে সেখানেই আছে।' করুণার উদাস জবাব।

'সেখানে নেই।'

'তা হলে ওখানে রাখোনি।'

'বললেই হল! আমি নিজে হাতে কিট ব্যাগে তুলেছি।'

'এটা তা হলে কী?' কোলের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওষুধের পাতা বার করলেন করুণা।

'লুকিয়ে রেখেছিলে!'

'আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার ওষুধ লুকোব!' টেবিলে ফেলে এসেছিলে, আমি মনে করে নিয়ে নিয়েছি। বলতে বলতে ছেলে তিনটেকে সালিশি মানছেন করুণা, 'দেখেছ তো, কী বেখেয়ালি মানুষ নিয়ে আমার ঘর করা?'

তেলো হাঁড়ির মতো মুখ করে ট্যাবলেট গিললেন তপোধীর। ঢকঢক খানিকটা জল খেলেন। বেডিং খুলতে গিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল। হঠাৎই থামলেন, 'তোমার মালিশটা নিয়েছ?'

'আমার তোমার মতো ভুলো মন নয়। বালতিব্যাগে আছে।'

'বটেই তো, বটেই তো।' খোলা কিট ব্যাগের পকেট থেকে একখানা টিউব বার করলেন তপোধীর। করুণার নাকের সামনে নাচাচ্ছেন, 'এটা তা হলে কী?'

খপ করে ওষুধটা কেড়ে নিলেন করুণা, নিজের হ্যান্ডব্যাগে পুরে ফেললেন, 'ও, এটা তোমার কাজ! তাই আমি বেরনোর সময়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

'আমার কাজ নয়, তোমারই বেআক্কেলেপনা।'

'কেউ যদি সরিয়ে রাখে কী করব?'

'সরাইনি, মনে করে সঙ্গে নিয়েছি।' বলেই ছেলে তিনটের দিকে ফিরলেন তপোধীর, 'দ্যাখো দ্যাখো, কী চিজ নিয়ে ঘর করি আমি।'

মজা পেয়ে হাসছে তিন যুবক। হাসতে হাসতেই টপাটপ মাঝের বার্থ নামিয়ে ফেলল, ফুঁ দিয়ে বালিশ ফোলাচ্ছে, পেশাদারি ভঙ্গিতে আয়োজন করছে শোওয়ার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডান কাত ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজন।

তপোধীর বসে বসে হাই তুলছেন, 'এবার তো আমাদেরও শুতে হয়।'

'সারা রাত জাগবে বলেছিলে না?' করুণার কণ্ঠে উপহাস।

'ঘুম পাচ্ছে যে।'

'তবে শোও। দাঁড়াও, বিছানা করে দিই।'

'এখানে কেন?' আমি মাঝের বার্থে যাচ্ছি।

'উহুঁ, ওটা এখন নামাবে না।'

'কেন?'

'কারণ আমি ঘুমোব না, তাই। ওটা নামালে আমার বসতে অসুবিধে হবে।'

তপোধীর কথা বাড়ালেন না। বাধ্য ছেলের মতো নীচের বার্থেই শুয়ে পড়লেন। করুণাকে আলগা ছুঁয়ে।

তপোধীরের মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন করুণা, আনমনা চোখে দেখছেন পৃথিবীটাকে। বন্ধ কাচের এপার থেকে।

রাত নিঝুম হয়ে এল। কামরায় জেগে আছে নীলচে রাতবাতিরা, জেগে আছেন করুণা। স্বপ্ন স্বপ্ন বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে কুপে সে কুপে। আঁধার ছিঁড়ে ছুটছে রেলগাড়ি, ঝমঝম ঝমাঝম। থামছে, ছুটছে, থামছে, ছুটছে। পার হচ্ছে নদী, পার হচ্ছে প্রান্তর, পার হচ্ছে একটার পর একটা সেতু।

গভীর রাতে তপোধীরের ঘুম ভেঙে গেল। করুণা ঠেলছেন জোরে জোরে, 'অ্যাই শুনছ?'

'উঁ?'

'বাপ্, কী ঘুম রে! কামরা যে একেবারে মাত করে দিলে। পাশ ফিরে শোও।'

ঘুম চটকে গেল। চোখ বড় করে উঠে বসলেন তপোধীর, 'চিল্লাচ্ছ কেন? হলটা কী?'

'সিংহের মতো নাক ডাকাচ্ছ কেন?'

'তোমার তাতে কী?'

'আমার ঘুম আসছে না। ট্রেনে আমার ঘুম আসবে না।'

'শুলেই আসত। বললাম ওপরে উঠে যাচ্ছি।'

'না। ওপরে উঠলে তোমাকে আর ঠেলা যাবে না। অভ্যেস তো জানি, না ডাকলে তোমার গর্জন থামে না।'

'সঙ্গে একটা পাখা আনলে পারতে। ডাঁটি দিয়ে খোঁচাতে মনের সুখে।'

'তাই উচিত ছিল। কী লোকের সঙ্গেই না বেড়াতে বেরিয়েছি। কুম্ভকর্ণ একটা।'

করুণার যেন গলা কাঁপল একটু। তপোধীর অপাঙ্গে তাকালেন। হঠাৎ কোথ্থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ঝাপটা মারে ঊনসত্তর বছরের মনটায়। বাতাসটা এত বেশি দূরের, যে চিনেও চিনতে পারলেন না তপোধীর।

এবার একটা নদী পার হচ্ছে রাতের গাড়ি। ধীরে, অতি ধীরে। বৈতরণী নদী। এ নদী পার

হলে নাকি এ পারের টান কমে যায়।

তপোধীর চুপটি করে বসে আছেন। করুণাও নীরব। বয়ে যাচ্ছে এক মৌন মুহূর্ত।

এক সময়ে তপোধীর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, 'ওয়াটার বটলটা দাও তো।'

করুণা জানালার কাছে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, 'নিজে উঠে নাও।'

মুহূর্ত মিলিয়ে গেল। তপোধীর অসহিষ্ণু হলেন, নিয়ম মতোই।

বললেন, 'তোমার সামনে ঝুলছে বলে বলা। থাক্, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে নয় মরেই যাব।'

'কী কথার ছিরি!' হাত বাড়িয়ে জলের বোতল পাড়লেন করুণা, 'সবটা শেষ কোরো না। আমিও খাব।'

এক ঢোক খেয়েই প্লাস্টিকের বোতল এগিয়ে দিলেন তপোধীর, 'খাও, নিজে আগে প্রাণ ভরে খাও।'

'ইইহ, মেজাজে একেবারে চাঁদি ফাটে দেখি।'

উত্তরে কিছু একটা বললেন তপোধীর। তার উত্তরে করুণা। তার উত্তরে তপোধীর। চলছে, কলহ চলছে। বিনবিন ঝগড়া বন্ধ কাচ ফুঁড়ে চলে গেল বাইরে। নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে।

রাত এখন বড় মায়াময়। চাঁদের বুড়ি রুপোলি সুতো কেটে চলেছে চরকায়। সেই সুতোয় বোনা মসলিন এখন ভাসছে চরাচরে। রুপোলি সর মেখে ছুটছে অলৌকিক গাছপালা, ছুটছে মাঠ, ছুটছে নদী, ছুটছে বালির চর।

বৃদ্ধ পৃথিবী ছুটছে সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না মেখে। জ্যোৎস্না হয়ে। সেই জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেল কলহরাজি। জ্যোৎস্না চলেছে সমুদ্রের পানে। বড় বাঙ্ময় জ্যোৎস্না। হানিমুনে চলেছেন ঊনসত্তর আর তেষট্টি। তপোধীর আর করুণা।

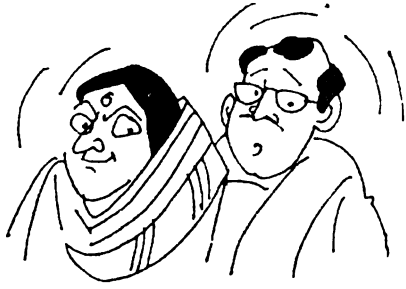

ডিগবাজিল্যান্ড

উজ্জ্বলকুমার দাস

গত কয়েক বছরে বিভিন্ন শহরের নাম বদল করার জন্য কিছু সংখ্যক মানুষ জোরদার আন্দোলন ক'রে, নাম বদলে দিয়েছে। যেমন মাদ্রাজের নাম চেন্নাই, বোম্বাইয়ের নাম মুম্বাই, অবশেষে ক্যালকাটার নাম কলকাতা।

এখন আবার কিছু সংখ্যক মানুষ ক্ষেপে উঠেছে, আস্ত একটা দেশের নামই নাকি তারা বদলে দেবে। সেই দেশের নাম রাখতে চাইছে তারা 'ডিগবাজিল্যান্ড'।

কিছুদিন হয় মর্তের এই খবরটা স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রর কানে কে যেন তুলে দিয়েছে। 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর খবর পেয়ে তিনি তো একেবারে 'থ'। তিনি এতদিন 'স্কটল্যান্ড', 'নেদারল্যান্ড' এমনকি 'ডিজিনিল্যান্ড'-এর নাম শুনেছেন, কিন্তু 'ডিগবাজিল্যান্ড'!

এ ব্যাপারে দেবরাজের দারুণ কৌতূহল হল। তিনি একদিন এই 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর খবরা-খবর নেওয়ার জন্য চিত্রগুপ্তকে ডেকে পাঠালেন।

চিত্রগুপ্ত দেবরাজের মুখে সব কথা শুনে চিত্রগুপ্তর দপ্তর থেকে একজন বিশ্বস্ত লোককে 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর খবরা-খবর আনতে মর্তে পাঠালেন।

চিত্রগুপ্তর বিশ্বস্ত অনুচর চুপি চুপি মর্তে এসে 'ডিগবাজিল্যান্ড' পরিদর্শন করে দিন কয়েকের মধ্যে আবার স্বর্গে চলে যান, মর্তের 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর কাক-পক্ষী পর্যন্ত এ বিষয়ের ব্যাপারে টের পেল না।

চিত্রগুপ্তের অনুচর 'ডিগবাজিল্যান্ড' সফর করে স্বর্গে যাওয়ার পর দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় তার ডাক পড়ল। সেই অনুচরকে ঘিরে স্বর্গের দেব-দেবীদের বিশাল কৌতূহল!

'ডিগবাজিল্যান্ড' ঘুরে সেই অনুচর কি কি দেখে এল, দেবরাজ ইন্দ্র তাকে এক এক করে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—

'আচ্ছা ও দেশের আসল নাম বদল করে হঠাৎ এই অদ্ভুত ধরনের নাম 'ডিগবাজিল্যান্ড' রাখতে চাইছে কেন? ওখানকার লোকজনেরা কি দিনরাত ডিগবাজি খাচ্ছে, সেরকম কিছু কি তুমি দেখতে পেলে?'

'না, তা অবশ্য দেখিনি। তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পার্কে, মাঠে, ময়দানে, ইস্কুলের বেঞ্চিতে এমন কি বাড়ির সোফায় দিনরাত ডিগবাজি প্র্যাকটিস করছে!'

'বলো কি হে! ডিগবাজি খাওয়া প্র্যাকটিস করছে?'

'ও আর একটা কথা তো আপনাদের বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। 'ডিগবাজি'টা ওদের

ইস্কুলের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত করবার জন্য ওদেশের শিক্ষাবিদেরা সম্প্রতি জোরদার আন্দোলনে নেমে পড়েছেন।

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ ডিগবাজি খাওয়া ওদেশের মানুষের এখন জাতীয় অভ্যাস, ডিগবাজি এখন ওদের লাইফ। ওদের দেশের যে কোনও সমস্যায় ডিগবাজি খাওয়াটা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ওদেশের লোকেরা ডিগবাজি না খেয়ে বাসে-ট্রামে ওঠা-নামা করতে পারে না।

'ওদের দেশের ডিগবাজি খাওয়াটা খুব সহজ তাই না?'

'এখনও খুব একটা সহজ হয়ে ওঠে নি! তা আমি যা দেখে এলাম, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ডিগবাজি খাওয়াটা খুব সহজ হয়ে যাবে বলে আমার অনুমান।'

'ওদের দেশের সব মানুষই কি ডিগবাজি খেতে পারে?'

'না, না, সবাই পারে না!'...

'আরে থামলে কেন, বলো?'

'ওদের দেশের লোকদের মধ্যে যে একদম ডিগবাজি খেতে পারে না, তাকে ওরা ঠাকুর জগন্নাথের মতো দেশের প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়ে রাখে।

'আর যারা খুব ভালো ডিগবাজি দিতে পারে?'

'তারা, সব রাজা-উজির-মন্ত্রী হন।'

'ওদেশের মন্ত্রীরা কিভাবে ডিগবাজি খায়?'

'খুবই সিম্পল, এই ধরুন ভোটের আগে সুযোগ বুঝে নিজের দল ছেড়ে, ডিগবাজি খেয়ে অন্য দলে গিয়ে নাম লেখায়। সেই দলের টিকিট পেয়ে ভোটে জিতে গেলে ঠিক আছে, না জিতে ভরাডুবি হলে, আবার ডিগবাজি খেয়ে নিজের দলে ফিরে আসে বা অন্য হেরো মন্ত্রীদের নিয়ে নতুন কোনও দল গঠন করে!'

'বলো কি হে! ওদেশের মন্ত্রীদের কোনও নৈতিকতা নেই?'

'আরে নৈতিকতাকে ওরা অনেক দিন আগে জীবনের অভিধান থেকে ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলেছে। ওদের ধারণা, ওসব আঁকড়ে বসে থাকলে কখনও নাকি বড় হওয়া যায় না!'

'তা ভাল, ভাল! আমাকে যে আরও কত কী শুনতে হবে!'

'একথা কি জানেন, রাজা-উজির-মন্ত্রীদের ডিগবাজি খাওয়া নিয়ে একটা স্যাটেলাইট চ্যানেলে রমরম করে একটা সিরিয়াল চালাচ্ছে?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আরে আমি 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এ গিয়ে যে হোটেলে উঠেছিলাম, সেই হোটেলে টি.ভি চলছিল, তাতেই সব দেখতে পেলাম!'

'তা সেই সিরিয়ালে কি দেখলে?'

'একজন অ্যাঙ্কর ডিগবাজি খাওয়া নিয়ে নেতাদের সব নানা প্রশ্ন করছে।'

'আর নেতারা কি উত্তর দিচ্ছে?'

'নেতারা তো এই ডিগবাজি খাওয়ার কথা শুনে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছে। একজন নেতা তো রেগে গিয়ে অ্যাঙ্করকে পাল্টা প্রশ্নই করে বসলো—হোয়াট ইজ্ ডিগবাজি?'

চিত্রগুপ্ত এতক্ষণ চুপচাপই ছিলেন, তিনি এবার ফুট নোট কেটে বললেন, 'রাগবে না! সত্যি কথা বললে সবাই রেগে যায়, কি বলেন দেবরাজ ইন্দ্র?'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই।'

'আচ্ছা, অনুচর, 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে?'

'হ্যাঁ, দেবরাজ, 'ডিগবাজিল্যান্ড'-এর ইতিহাস নিয়ে সেখানে বিশাল গবেষণা চলছে।'

'তাই নাকি! বলো বলো শুনি!'

'ওদেশের পুরাতাত্ত্বিকেরা বলছেন প্রাচীনকালে সেখানে নাকি অনেক দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বসবাস করতেন। সেই সময় নাকি ওদেশের নাম 'দিগ্‌গজল্যান্ড হওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু যে কোনও কারণে তা হয়ে ওঠেনি।

চিত্রগুপ্ত আবার টিপ্পনি কেটে বললেন 'হয়তো সেই সময় নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যাগড়া দিয়েছিল'।

দেবরাজ মাথা চুলকিয়ে নিয়ে বললেন 'তা হতে পারে। তা দিগ্‌গজি-র সঙ্গে ডিগবাজির সম্পর্ক কি? এটা তো বুঝতে পারলাম না।'

চিত্রগুপ্তের অনুচর বলল, 'না ওখানকার ভাষাবিদ্‌রা বলেছেন, "দিগ্‌গজি" আর "ডিগবাজি" নাকি একই জাতীয়!'

দেবরাজ এবার আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তা ভাল! আমার আর কিছু বলার নেই!'

এসময় চিত্রগুপ্ত আবার তাঁর অনুচরকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা প্রাচীনকালে ওদের দেশে যে, দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বসবাস করতেন, তার কি কোনও প্রমাণ পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে আছে?'

চিত্রগুপ্তর অনুচর বলল, 'হ্যাঁ আছে ওদেশের মাটি খুঁড়ে পুরাতাত্ত্বিকরা দু'হাজার বছরের পুরনো একটা 'টিকি'-র ফসিল খুঁজে পেয়েছে।'

চিত্রগুপ্ত এবার বললেন 'সত্যি দারুণ সংবাদ!'

চিত্রগুপ্তর কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র এবার অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোমার এই টিপ্পনি কেটে কথা বলা থামাবে?'

চিত্রগুপ্ত লজ্জিতভাবে উত্তর দিয়ে বললেন, 'যেমন বলবেন স্যার!'